বিদ্যালয়-বিধায়ক

বিবিধ বিধান।

বালকবালিকার

অধ্যাপক ও অভিভাবকের

সাহায্যার্থ

কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া ট্রেনিং কলেজ এবং জব্বলপুর ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষাপ্রাপ্ত,

ট্রেনিং ও নর্ম্মাল স্কুলের পরীক্ষক,

শিলচর নর্ম্মালস্কুলের বর্ত্তমান সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট

শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী

প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ—শতাধিক চিত্র সম্বলিত)

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীটস্থ ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

প্রকাশিত

অক্টোবর, ১৯০৯]   [মূল্য দুই টাকা।
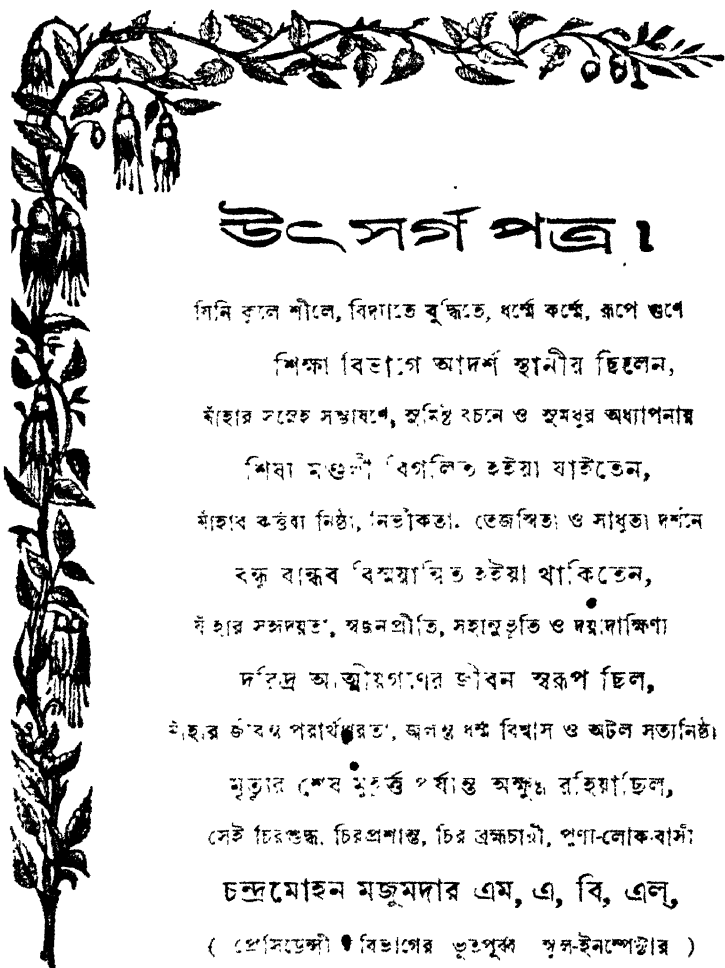
উৎসর্গ পত্র।

যিনি কুলে শীলে, বিদ্যাতে বুদ্ধিতে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, রূপে গুণে

শিক্ষা বিভাগে আদর্শ স্থানীয় ছিলেন,

যাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণে, সুমিষ্ট বচনে ও সুমধুর অধ্যাপনায়

শিষ্য মণ্ডলী বিগলিত হইয়া যাইতেন,

যাঁহার কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও সাধুতা দর্শনে

বন্ধু বান্ধব বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকিতেন,

যাঁহার সহৃদয়তা, স্বজনপ্রীতি, সহানুভূতি ও দয়াদাক্ষিণ্য

দরিদ্র আত্মীয়গণের জীবন স্বরূপ ছিল,

যাঁহার জীবন্ত পরার্থপরতা, জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও অটল সত্যনিষ্ঠা

মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল,

সেই চিরশুদ্ধ, চিরপ্রশান্ত, চির ব্রহ্মচারী, পুণ্য-লোক-বাসী

চন্দ্রমোহন মজুমদার এম, এ, বি, এল,

(প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল-ইনস্পেক্টার)

মহাশয়ের পবিত্রনামে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।
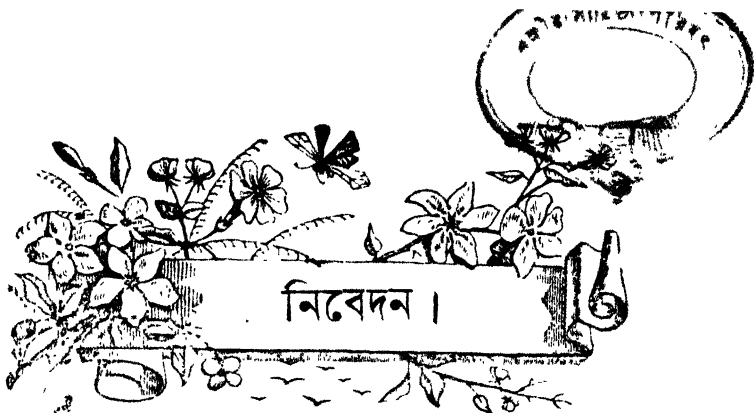
গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য।—কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সুযোগ্য এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার বাবু শশধর সেন একবার লিখিয়াছিলেন :—"* * * পান্নালাল বলিল তুমি যদি একখান শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক পুস্তক লেখ তবে বেশ হয়। কারসিয়ং ফেরত বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আরও অনেকে তোমার নামই করিয়াছেন। আমারও সেই মত। তোমার নোটগুলি আমি দেখিয়াছি; অন্ততঃ এই নোটগুলি ছাপাইলেও অনেক উপকার হইবে। তুমি নিজে না ছাপ, আমাকে সমস্ত পাঠাইয়া দিও, আমি ছাপিতে চেষ্টা করিব। একখান বাঙ্গালা পুস্তকের বড়ই অভাব বোধ হইতেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রগণকে সমস্ত শিখাইয়া দেওয়াও যায় না আর লেখাইয়া দেওয়াও যায় না।* * *" শশধর সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিল। আমার সমস্ত নোট শশধরকে দিয়াছিলাম। তাহার হাতে এই কার্য্য নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু শশধরের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত কল্পনা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাবনা জজ কোর্টের একজন প্রতিভাশালী উকিল (পুত্রের প্রমোশন উপলক্ষে) লিখিয়াছিলেন "* * * তুমি বলিয়াছিলে যে কেবল একখান সাহিত্যপুস্তক কিনিয়া দিলেই চলিবে, অন্যান্য বিষয় শিক্ষকগণ মুখে মুখে শিখাইয়া দিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি একঝুড়ি পুস্তকেও কুলায় না। এই আমার ছেলের পুস্তকের ফর্দ্দ :—সাহিত্য কুসুম, পদ্যমালা, ব্যাকরণশিক্ষা, ভারতের সরল ইতিহাস, সরল ভূগোল, প্রাথমিক জ্যামিতি, শিশু পরিমিতি, যাদবের পাটীগণিত, অমুকের ড্রইং, ম্যাকমিলানের বিজ্ঞানপাঠ, দলিল লিখন, জমিদারী মহাজনী, জরিপ শিক্ষা, বাঙ্গালা কাপিবুক, সাহিত্যকুসুমের অর্থ, পদ্যমালার অর্থ, ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর, বিজ্ঞানপাঠের প্রশ্নোত্তর, বস্তু উপলক্ষে পাঠ, আরও যেন দুচারখানি

কি মনে নাই ; সর্ব্বসমেত দুই ডজনের বেশী বই কম নহে। এই ফর্দ্দ দেখিয়া বেশ বুঝিতেছি যে তোমাদিগের এই নূতন প্রণালীর মর্ম্ম অনেক শিক্ষকও বুঝিতে পারেন নাই। তুমি আমাকে যে যে পুস্তক পড়িতে বলিয়াছিলে তাহার কিছু কিছু পড়িয়াছি কিন্তু পুস্তকগুলি খুব বড় বলিয়া শেষ করিতে পারি নাই। এমন একখানি পুস্তক পাওয়া যায় যাহাতে সকল কথাই অল্প মাত্রায় থাকে তাহা হইলে আমাদিগের সুবিধা হয়। বিশেষ বাড়ীর মেয়েদের জন্য একখান বাঙ্গলা পুস্তক মুদ্রিত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। তোমার খাতাপত্রগুলি কি বস্তাবন্দী করিয়া রাখিবে না তাহার কোন সদগতি করিবে? দশের উপকার হউক না হউক তোমার অনেক বন্ধুবান্ধবের উপকার হইত। * * *" পত্র লেখককে আমি H. Spenser's Education, Garlick's New Manual of Method, Garlick and Dexter's Psychology in the School Room, Murche's Object Lessons for Infants, Murche's Object Lessons in Science and Geography, Wiebe's Paradise of Childhood এবং Cowham's School Organization পড়িতে বলিয়াছিলাম। ইংরাজী অভিজ্ঞ অধ্যাপক ও অভিভাবকগণকেও আমি এই কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। [আমার অপর একটী বন্ধু এই ফর্দ্দকে Allopathic prescription বলিয়া উপহাস করেন ও আমাকে একটী Homeopathic prescription করিতে বলেন। আমি তাঁহাকে Joyce's Hand Book of School Management ও Mrs. Brander's Kindergaten Teaching in India (Mac Millan) পড়িতে বলিয়াছিলাম]।

বর্দ্ধমান হইতে আমার সুপরিচিতা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এইরূপ লিখিয়াছিলেন:— "* * * পুত্রকন্যার শিক্ষা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। Private tutor নিযুক্ত করিয়াছি বটে কিন্তু তাহাতে কাহারও সুবিধা হইতেছে না কারণ ইহারা art of teaching জানেন না। আমি নিজে ইংরাজী ভাল বুঝিতে পারি না বলিয়া ইংরাজী পুস্তক পড়িতে পারিতেছি না। * * আপনারা বক্তৃতায় বলেন যে এদেশের মাতারা সন্তান শিক্ষায় অশক্ত কিন্তু তাহাদিগের সাহায্যার্থ আপনারা কিছুই করিতেছেন না। * * প্রতিবৎসর দামোদরের বন্যার ন্যায় দেশ নাটক নভেলে প্লাবিত হইতেছে কিন্তু শিক্ষাদানের প্রণালী ত কেহই লিখিতেছেন না। ইংরাজীতে নাকি এই বিষয়ে দশ হাজারের অধিক পুস্তক আছে। কিন্তু আমাদিগের দেশে দশখানাও হইল না। শ্রীমতী—লিখিয়াছিল আপনি নাকি এতদিন পরে একখান পুস্তক প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনার ইচ্ছা

কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদিগের অভাব দূর হইবে বলিয়া মনে হয়। * * *।" মনে করিয়াছিলাম যে এই অভাব দূর করিতে কোন মহারথী অগ্রসর হইবেন। কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া নিজেই অগ্রসর হইলাম। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে "যে কার্য্যে দেবতারা প্রবেশ করিতে শঙ্কান্বিত হন, বাতুলেরা সে কার্য্যে অনায়াসে প্রবেশ করে।"

ছাত্রগণ কার্য্যস্থলে গিয়া নানা বিষয়ের পদ্ধতির জন্য পত্র লিখিয়া থাকেন। এই সকল পত্রের উত্তরে এক একটী প্রবন্ধ লিখিতে হয়। শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেকে (অবশ্য যাঁহারা পরিচিত) নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—তন্মধ্যে relief-map প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়ক প্রশ্নই অধিক। সময় সময় ভিন্ন প্রদেশ হইতেও পত্র পাইয়া থাকি:—No 787, From K. B. Williamson Esqr. M. A., Inspector of Schools, Jubblepur Division, To Mr. Aghornath Adhikari, Superintendent, Training School, Silchar, Dated Jubblepur, the 25th February 1907, Sir, I shall be much obliged if you will be good enough to write a short account (of about one page foolscap or as long as may be necessary) of your methods of preparing relief maps and globes (giving practical details and some idea of cost) which you kindly described to us at the Educational Conference at Jubblepur. I have &c."—এই গ্রন্থের দ্বারা আমার ছাত্রগণের উপকার হইবে বিশ্বাসে ইহার প্রচার। বন্ধুবান্ধবের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে কৃতার্থ হইব।

এই আমার কথা। এখন এই পুস্তক সাধারণের প্রীতিকর না হইলে আমি বিশেষ দুঃখিত হইব না। কারণ আমি সাধারণের সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার রচনা করি নাই। সাধারণের মনস্তুষ্টি করা আমার সাধ্যাতীত ও আশাতীত।

গ্রন্থপ্রচারে অধিকার—তবে কেহ অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন। তাহারও নজীর আছে। সর্ব্বপ্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত "ধর্ম্মনীতি" গ্রন্থে শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শিক্ষাদান বিষয়ে এই প্রথম লেখা। তারপর ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় "শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই প্রথম পুস্তক। তৎপর গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় "শিক্ষা প্রণালী" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেই গ্রন্থ বহুকাল পর্য্যন্ত নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাদরে পাঠ করিয়াছে।

ইহার পর দীননাথ সেন "শিক্ষাদান প্রণালী" নামে একখান পুস্তক প্রকাশ করেন। এ সকল ছাড়া আর যে দু চারি খানি শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যদুনাথ রায় লিখিত "শিক্ষা বিচার" গ্রন্থে (H. Spencer's Education নামক গ্রন্থ অবলম্বনে) সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার, ভূদেবচন্দ্র, গোপালচন্দ্র ও দীননাথ এককালে নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আমিও নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (বেঙও চতুষ্পদ) সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ প্রচারে আমারও অধিকার আছে। আর বিশেষ কথা এই যে যাঁহারা শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা ভিন্ন এ শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিবেই বা কে? তবে যোগ্যতার কথা—তা কি করিব?—যখন যোগ্যতর কেহই মনোযোগ করিলেন না, তখন নিজকেই অগ্রসর হইতে হইল। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ শ্রেণীর পুস্তকের বড়ই অভাব।

গ্রন্থের ভাষা—অনেকগুলি নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। সে গুলি যে সমস্তই ভাল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র ও পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রকাশিত হইলে, এই পুস্তকের বৈজ্ঞানিক শব্দাদির পরিবর্ত্তন করা যাইবে। তবে আমি কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহা বলা আবশ্যক। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। 'তাপমান' কথা ব্যবহার করিয়াছি—'উষ্ণতামান' কথা ব্যবহার করি নাই। তবে অনেক স্থলেই 'থারমমেটার' কথা লিখিয়াছি। বাড়ীর মেয়েরাও বলিয়া থাকেন "থারমমেটার আন, জ্বর কয় ডিগ্রি দেখি"; কাহাকেও "তাপমান (বা উষ্ণতামান) আন, জ্বর কত তাপাংশ দেখিব"—বলিতে শুনি না। ইংরাজ প্রদত্ত দ্রব্যগুলির ইংরাজী নাম রক্ষাই যুক্তি সঙ্গত—দ্রব্যবাচক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিবেনা। রেলওয়ে ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ, স্কুল, বেঞ্চ, বোর্ড প্রভৃতি কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চলিল না। তারপর action song এর প্রতিশব্দে 'ভঙ্গী সঙ্গীত' লিখিয়াছি, কারণ এখানে action অর্থ gesture। Notes of Lessons এর স্থানে 'পাঠনার নোট' লিখিয়াছি কারণ এখানে Lessons মানে 'পাঠ' নয় ও Note মানে 'টীকা' নয়। তবে Note কথার একটা প্রতিশব্দ করা যাইতে পারিত। কিন্তু চলিবেনা ভয়ে করি নাই। Object Lessons এর প্রতিশব্দ 'পদার্থ পরিচয়' করিয়াছি। রায় রাম ব্রহ্ম সান্যাল বাহাদুরও এই কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় অনেক রঙের নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন্ নামের দ্বারা কোন রঙ বুঝায় তাহার পরিচয় করাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই জন্য একটা রঙ পরিচায়ক চিত্রের (১৮০ পৃঃ) রচনা করিয়াছি ইত্যাদি।

এই নোটগুলি ছাত্রগণের জন্য লিখিত বলিয়া ইহাতে অনেক স্থলেই 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর এক কথা—শিক্ষকতা কার্য্যে অন্য যে সকল গুণ থাকুক না কেন, একটা বিশেষ দোষ এই যে, ক্রমাগত ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে দিতে আর ক্রমাগত তাহাদিগের ভুল ধরিতে ধরিতে, অজ্ঞাতসারে নিজকে কেমন যেন একটা দাম্ভিকতার ভাবে অধিকার করিয়া বসে। যদি কেহ ভাষায় কি ভাবে সেরূপ কোন দোষ পান, 'তবে ব্যবসায়ের দোষ' বিবেচনায় ক্ষমা করিবেন। একে শিক্ষক জাতি মাত্রেইত "সবজান্তা", আমি আবার তাহার উপরও এক ডিগ্রি চলিয়া গিয়াছি—কতকগুলি ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়াছি। ভঙ্গী সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত দিতে হইল—কি করিব ? তবে দৃষ্টান্ত কবিতার, কবিত্বের নয়।

মধ্যে মধ্যে সামান্য দুই একটী ভুলভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে—কোথাও বিষয়গত, কোথাও ভাষাগত, কোথাও মুদ্রাঙ্কনগত। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না। আর যেরূপ আগ্রহসহকারে পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকের চোখে ভুলভ্রান্তি পড়িতে পারে এ গ্রন্থের অদৃষ্টে সেরূপ পাঠক জুটিবেনা—সুতরাং ভুল চোখে পড়িবে বলিয়া তেমন আশঙ্কা নাই।

গ্রন্থের ছাপা ও ছবি—এত দূরে বসিয়া কেবল পত্রের সাহায্যে কলিকাতায় বই ছাপান ও ছবি কাটান যে কি পরিমাণ কষ্টকর ব্যাপার তাহা, যাঁহারা একবার এই অপরাধ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কাজেই ছাপা ও ছবি মনোমত হয় নাই। তবে দুটী চিত্রের সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। পাঠশালা গৃহের চিত্রখানি (২৮ পৃঃ) perspective হিসাবে কিছু ভুল হইয়াছে। ইহার design করিয়াছিলেন একজন শিক্ষক—বয়স ৪৫ বৎসর—১৮দিন মাত্র Model drawing অভ্যাস করিবার পর। আর "বালকগণের হাত বাড়ান" চিত্রখানিও (৬৭ পৃষ্ঠা) তেমন সুন্দর হয় নাই। ইহার design কর্ত্তা অপর একজন ছাত্রশিক্ষক, বয়স ৪২বৎসর, চিত্রাঙ্কন শিক্ষার এই প্রথম আরম্ভ; কেবল ৩ মাসের চেষ্টায় এই পর্য্যন্ত হইয়াছে। শিক্ষকতা কার্য্যে চিত্রাঙ্কন বিদ্যার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। এই দুইটী চিত্রের বৃত্তান্ত পড়িয়া বোধ হয় আর কোন শিক্ষকই চিত্রাঙ্কন শিক্ষা অসাধ্য বলিয়া মনে করিবেন না।

কৃতজ্ঞতা—অনেক স্থলে ইংরাজী পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। দুচার খানি বাঙ্গালা পুস্তকেরও সাহায্য লইয়াছি। এই নোটগুলি কোন দিন মুদ্রিত হইবে বলিয়া মনে করি নাই। সেই জন্য কোন স্থলে কোন্ পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহা লিখিয়া রাখি নাই। এখন ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

এই পুস্তক প্রকাশে আমার প্রিয় ছাত্রগণই বিশেষ উদ্যোগী। তাহারাই সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছে, তাহারাই সমস্ত নকল করিয়াছে আর তাহারাই সমস্ত প্রুফ দেখিয়াছে।

তারপর আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও আত্মীয়, কলিকাতা সান্যাল কোম্পানীর অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীমান বিজয়কুমার মৈত্র এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ভার গ্রহণ না করিলে ইহা চিরদিন বস্তাবন্দী হইয়াই থাকিত ইতি।

শিলচর নর্ম্মাল স্কুল
২১ অক্টোবর ১৯১৯

নিবেদক
শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী।

অশুদ্ধি সংশোধন।

পৃষ্ঠা		পংক্তি		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২	...	২১	...	যণ্ডামার্ক	...	যণ্ডামর্ক
৯	...	৫	...	হানিব	...	হানিবল
১৪	...	৯	...	দীর্ঘ	...	দৈর্ঘ্য
১৪	...	২১	...	·৪	...	·০৪
২৩	...	৪	...	raise	...	raised
২৯	...	২৪	...	যে পুনঃ	...	সে পুনঃ
১১৯	...	২৪	...	প্রথম	...	দ্বিতীয়
১২০	...	১	...	দ্বিতীয়	...	প্রথম
১৫৭	...	২০	...	হাক	...	হকী
১৪৬	...	৮	...	তাণ্ডব	...	তাণ্ডব
১৬৮	...	২	...	পরিচালিত	...	পরিচালনা
২১৩	...	১৯	...	ম ণবন্ধ	...	মণিবন্ধ
৩২৬	...	১০	...	১,২,৩,৪,৫	...	১,২,৪,৫
৩৪৯	...	২১	...	কিন্তু প্রায়	...	কিন্তু এখন প্রায়

এইরূপ আরও ২।৪টী ভুল থাকা সম্ভব।

প্রথম ভাগ।—সাধারণ বিধান।

উপক্রমণিকা

প্রথম অধ্যায়।—সুব্যবস্থা বিষয়ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।—সুশাসনবিষয়ক।

তৃতীয় অধ্যায়।—সুশিক্ষাবিষয়ক।

দ্বিতীয় ভাগ—বিশেষ বিধান

প্রথম প্রকরণ ।—শরীর পালনবিষয়ক ।

দ্বিতীয় প্রকরণ ।—শিশুশিক্ষা বিষয়ক ।

তৃতীয় প্রকরণ।—ভাষাবিষয়ক।

১। সাহিত্য।

২। ব্যাকরণ।

চতুর্থ প্রকরণ।—গণিত বিষয়ক।

১ পাটীগণিত।

২। জ্যামিতি।

৩। পরিমিতি।

পঞ্চম প্রকরণ।—ভূগোলেতিহাস বিষয়ক।

ষষ্ঠ প্রকরণ।—বিজ্ঞান বিষয়ক।

সপ্তম প্রকরণ।—শিল্প বিষয়ক।

অষ্টম প্রকরণ।—ধর্ম্মনীতি বিষয়ক।

নবম প্রকরণ।—নানা বিষয়ক।

১। পাঠনার নোট।

২। পাঠনা-সমালোচনা।

৩। পরীক্ষা।

উপসংহার।

পরিশিষ্ট।

বিদ্যালয়-বিধায়ক

বিবিধ বিধান।

প্রথম ভাগ—সাধারণ বিধান।

"There is but one question in the world: How to make man better? And but one answer: Education."

উপক্রমণিকা।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" কঠ।

উদ্বোধন।—এক ফকিরের একটি কুকুর ছিল। এইরূপ একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে; ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানিনা, তবে গল্পটী যে বেশ জ্ঞানপ্রদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কুকুরটী বড়ই রোগা। ফকির সেই কুকুরটীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন এক গ্রামের মেয়েরা সেই শীর্ণকায় কুকুরটীকে লক্ষ্য করিয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা

করিল "ফকির সাহেব তোমার ঐ মরা কুকুরটী কি কাজে লাগে?" ফকির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন "কুত্তা আচ্ছাহায়, শের মারণে-বি সেকতা হায়।" ('শের' মানে বাঘ)। তখন মেয়েরা ফকিরকে বলিল "ফকির সাহেব, একটা বাঘে আমাদের গাঁয়ের সব গরু, বাছুর মেরে ফেল্‌ছে। তোমার কুকুরটাকে দিয়ে যদি বাঘটা মেরে দিতে পার, তবে তোমাকে খুব খুসী কর্‌ব।" "আচ্ছা হোগা" বলেত ফকির বিদায় হইয়া গেলেন। কিন্তু দিনের মত দিন চলিয়া যায়, বাঘ মরা দুরে থাকুক, বাঘের উৎপাত দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। এক দিন গ্রামের মেয়েরা খুব রাগ করিয়া ফকিরকে বলিল "যাও ফকির সাহেব, তোমার সব কথা মিথ্যা, তোমার ঐ কুড়ে কুকুর নড়তেই পারেনা, তাতে আবার বাঘ মারবে।" ফকির তখন একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "মাই, কুত্তা মন করেত শের মারে, লেকিন্ মনেবি মন না করে।"

কথা ঠিক্, মন করিলে অনেকেই বাঘ মারিতে পারে, কিন্তু কেহই বে তেমন মন করেনা ইহাইত দুঃখ। তাই বলি, একবার মন কর—মন করিলেই পারিবে, অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। এই সাহিত্য, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান, পড়াইয়া অন্যান্য দেশের শিক্ষকগণ কেমন শতশত জীবন্ত কর্ম্মবীর ও প্রশান্ত ধর্ম্মবীরের সৃষ্টি করিতেছেন; আর আমরা সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া কি সৃষ্টি করিতেছি? হয় কতকগুলি চেতনাশূন্য জড়ভরত, নাহয় কতকগুলি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ষণ্ডামার্ক। ইহার কারণ কি? কারণ, আমরা কার্য্যে তেমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়াদিতে জানিনা, বা তেমন মন দিয়া কাজ করিনা। তাই বলি শিক্ষকগণ, আর অচেতনে থাকিওনা। দেশের প্রকৃত উন্নতির ভার তোমাদের হাতে; দেশকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত করিতে হইবে, দেশকে ধর্ম্মে ও চরিত্রে উন্নত করিতে হইবে; একবার মন প্রাণ দিয়া

কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। দেখ, সকল দেশই বিদ্যাতে বুদ্ধিতে আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে লাগিল। একবার মন কর, মন করিলেই শিব গড়িতে পারিবে। এদেশের পবিত্র মৃত্তিকা চিরদিনই শিব গড়িবার উপযোগী।

শিক্ষকতা কার্য্যে লাভালাভ।—যদি ধনের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিওনা। যদি মানের প্রত্যাশা থাকে, তবেও এদিকে আসিও না। যদি যশের কামনা থাকে তাহা হইলেও শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিও না। সেকালের সেই নিষ্কাম, নিস্পৃহ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের মত যিনি "তিন্তিড়ি পত্রের অম্বলে" পরম তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ, তিনিই একার্য্যের উপযোগী।

যদি তুমি বহুপরিবার যুক্ত হও, আর যদি কেবল তোমার আয়ের উপর সংসারের সমস্ত ব্যয় ভার নির্ভর করে, তবে একার্য্য কখনই গ্রহণ করিবেনা। আর যদি শিক্ষকতা কার্য্যের প্রতি তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ না থাকে তবেও একার্য্যে আসিও না। যে ব্যক্তির পরিবার প্রতিপালনের অনুরূপ সংস্থান আছে, বা যে ব্যক্তি বহুপরিবারগ্রস্ত নহে, আর যে ব্যক্তির শিক্ষকতা কার্য্যে একটা আন্তরিক অনুরাগ আছে, কেবল তাহার পক্ষেই একার্য্য প্রশস্ত।

ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন "যদি অর্থ প্রয়াসে আসিয়া থাকেন, তবে শীঘ্র এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর অনুসন্ধান করুন। যে হেতু শিক্ষকের কর্ম্মে যথাকথঞ্চিৎ রূপেও ধনাশা পরিপূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন দেখিবেন যে, আপনাদিগের অপেক্ষা অল্পবুদ্ধি, অল্পবিদ্য, অল্পপরিশ্রমী এবং অল্পবয়স্ক লোকে, অন্যান্য রাজকার্য্যে বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদিগের অপেক্ষা ধনশালী এবং জনসমাজে অধিক মাননীয় হইতেছেন, তখন আপনাদিগের মনোবেদনার পরিসীমা থাকিবেনা। তখন স্বীয় ব্যবসায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবে।" কোন সুমহৎ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি কহিয়াছেন "ইহলোকে মনুষ্যের উপকার করা এবং পরলোকে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া, শিক্ষকের প্রতি ইহাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ।"

শিক্ষকতা কার্য্য অর্থ উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ নহে বটে, কিন্তু সর্ব্ব অর্থের শ্রেষ্ঠ পরমার্থরূপ ধনলাভের যথেষ্ঠ সহায়তা করে। বিদ্যালয় প্রেমের রাজ্য, শিক্ষকতা প্রেমের কার্য্য। যদি ইহ সংসারেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তবে এস এই নন্দন কাননে প্রবেশ কর, নন্দন গণের কমনীয় কোমল কোরক সদৃশ মুখকমলে স্বর্গের শোভা সন্দর্শন কর। ইহারা এই মাত্র স্বর্গরাজ্য হইতে নামিয়া আসিয়াছে; এখনও স্বর্গের সুবাসে ইহাদিগের অঙ্গ পরিপ্লুত। এই দেব-নন্দনগণের সঙ্গ সুখভোগ করিয়া জীবন পবিত্র কর। নির্ভয়ে প্রবেশ কর, আবিলতায় এ কানন অপবিত্র হয়না, কলুষ কালিমায় এ কানন কলঙ্কিত হয়না। চিরশান্তি বিরাজিত এ প্রেমের রাজ্যে শুদ্ধ শান্তভাবে রাজত্ব করিতে পারিলে, আর অন্য সাধনের আবশ্যক হয়না।

অন্যত্র যে বিভাগেই প্রবেশ করনা কেন, দেখিতে পাইবে, প্রলোভন তোমার পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে। তুমি দুর্ব্বলচিত্ত মানুষ, অতি সহজেই ফাঁদে জড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশে পতিত হইবে। কিন্তু এখানে পাপ প্রলোভন নাই। উপরন্তু পূর্ণমাত্রায় পুণ্য সঞ্চয়ের সুবিস্তীর্ণ পথ প্রশস্ত রহিয়াছে। যদি এই সমস্ত অপার্থিব পদার্থের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এ বিভাগে প্রবেশ কর, তোমাকে সাদরে আবাহন করিতেছি। শিক্ষকতা কার্য্য অপেক্ষা সুখ-শান্তিময়, চিন্তা-উদ্বেগ-শূন্য, চিরপবিত্র ব্যবসায় আর নাই। ধন, মান, যশাদি উপার্জ্জনে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা জ্ঞানার্জ্জন জনিত আনন্দের সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। শিক্ষকতা কার্য্যে এই চিরানন্দ-দায়ক জ্ঞানোপার্জ্জনের যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে।

*শিক্ষকতা কার্য্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, কি প্রকারে ছাত্রবর্গের সুশিক্ষা সম্পন্ন করিবেন, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাহাদিগের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পাছে কোন কুসংস্কার সংলগ্ন হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া, আপনারা স্ব স্ব চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা

পাইবেন। যদি কোন ভ্রান্তি শিক্ষাবশতঃ তাহাদিগের কদাপি কোন অমঙ্গল ঘটে এইজন্ত আপনার ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত যত্ন করিবেন, শিশুগণের প্রণয়ভাজন না হইলে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাসম্পন্ন করা যায় না, ইহা জানিয়া আপনাদিগের আমোদ প্রমোদও তাদৃশ বিশুদ্ধ করিবেন। এইরূপে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ থাকিলেই, আপনাদিগের মন বিশদ, বুদ্ধি পরিস্কৃত, বিদ্যা প্রমাদশূন্য এবং আমোদ অনিন্দ্রিয়পর হইবে। এই সকল গুণ উপস্থিত হইলে সুখেরই বা অভাব কি? (ভূদেব বাবুর "শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব")

শিক্ষকের দায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।—শিক্ষকতা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধনপতি বণিক, সূক্ষ্মদর্শী ব্যবহারাজীব, ধন্বন্তরি সদৃশ চিকিৎসক, স্থপতিবিদ্যা-পারদর্শী ইঞ্জিনিয়ার, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক প্রভৃতি যাবতীয় সম্প্রদায়ের লোক কেবল ইহকালের হিতসাধনে ব্যস্ত। আবার পরম ধার্ম্মিক মন্ত্রদাতা, আচারনিষ্ঠ পুরোহিত, উদারচিত্ত ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায় কেবল পরকালের মঙ্গলের জন্যই উৎকণ্ঠিত। কিন্তু জনসমাজ-উপেক্ষিত দীন, দরিদ্র, শিক্ষককে ইহকাল ও পরকাল, উভয়ের জন্যই সুব্যবস্থা করিতে হয়। শিল্প বিজ্ঞানাদির শিক্ষার দ্বারা যেমন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় বিধান করিয়া দিতে হয়,—সেইরূপ নীতিশাস্ত্রাদির অনুশীলন দ্বারা আবার দিব্য চক্ষুও উন্মীলন করিয়া দিতে হয়।

"যাঁহার প্রসাদে বলবীর্য্য বিহীন, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা রহিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃতপিণ্ডপ্রায় শিশু, বীর্য্যবান জ্ঞানালোকসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, যাঁহার প্রসাদে জন্মকালে সর্ব্বজীব অপেক্ষা বলহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াও, মনুষ্য পরে আপন প্রভাব ও বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া সকল জীবের উপর স্বীয় প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বকীয় পদের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি নানা শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া পরম পবিত্র প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে অনুক্ষণ নিরতিশয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে থাকেন, যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য জগদীশ্বরের পরমাত্মক

সুকৌশলসম্পন্ন কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, অপরিসীম জ্ঞান, অনুপম করুণা ও অপার মহিমার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এককালে বিমোহিত হইতে থাকেন এবং যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় জন্মের সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হন, সেই পরম পবিত্র দুর্লভ সুহৃত্তম শিক্ষক অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি অধিক গৌরবান্বিত, পূজাপাদ ও প্রেমাস্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন ? অনেক সুবিজ্ঞ মহাশয় ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে রাজ্যমধ্যে শিক্ষক না থাকিলে যত ক্ষতি হয়, ধর্ম্মোপদেশক যাজক না থাকিলে তত ক্ষতি হয় না। কারণ বয়োবৃদ্ধদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান অপেক্ষা শিশুদিগকে সদুপদেশ দানই অধিক আবশ্যক ও অধিক ফলোপধায়ক।" (গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত "শিক্ষাপ্রণালী")

শিক্ষাদানবিষয়ক পুস্তক পাঠের আবশ্যকতা।—শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ক গ্রন্থে সুশিক্ষকগণের বহুদর্শিতার ফল লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ভূয়োদর্শনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া নবীন চিকিৎসকগণ লাভবান হইয়া থাকেন, যেমন সুদক্ষ শিল্পীগণের শিল্প-কৌশলাদি সন্দর্শন করিয়া নবীন শিল্পী কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের শিক্ষা-পদ্ধতি আলোচনা করিয়া নবীন শিক্ষকগণ শিক্ষা কার্য্যে দক্ষতালাভ করিয়া থাকেন।

শিক্ষকতা করিতে করিতে একটা অভিজ্ঞতা জন্মে বটে, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্ব্বে কত লোকের যে মাথা খাইতে হয়, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যদি প্রত্যেক চিকিৎসক, প্রত্যেক রোগীর উপর তাঁহার ঔষধাদির পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভের পূর্ব্বে কত ব্যক্তির যে অকালমৃত্যু সংঘটিত হইবে তাহা ভাবিলেও ভয় হয়। যদি প্রত্যেক শিল্পীকে কেবল নিজ কার্য্যের দ্বারাই শিল্পকৌশল শিক্ষা করিতে হইত, তবে স্বর্ণকার-পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে স্বর্ণের সর্ব্বনাশ হইত, নরসুন্দরের পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে মাথা কাটা যাইত এবং দর্জ্জির পুত্রের দ্বারা কত লোকের যে কাপড় নষ্ট হইত তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। প্রত্যেক ব্যবসায়েতেই বিশেষ বিশেষ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। নূতন লোকের পক্ষে এই সকল কৌশল শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। শিক্ষা বিষয়ক

পুস্তকে সুশিক্ষার নানাবিধ কৌশল বিবৃত হইয়া থাকে। 'শিক্ষাশাস্ত্র আলোচনার প্রধান ফল এই যে, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব বুদ্ধি পরিচালন হওয়াতে জনগণ আপন আপন উপযুক্ত পন্থা দেখিয়া লইতে পারেন'।

শিক্ষকের ধর্ম্ম।—মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ—যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। তাহার নাম কি? 'মনুষ্যত্ব'। (বঙ্কিম)

শিক্ষকের ধর্ম্ম কি? যাহা থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক—না থাকিলে শিক্ষক শিক্ষক নয়—তাহাই শিক্ষকের ধর্ম্ম। তাহার নাম কি? শিক্ষকত্ব। কি কি গুণের অনুশীলনে এই শিক্ষকত্ব লাভ করা যায়?

(১) মানসিক গুণ—শিক্ষকের বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ পক্ষে বিদ্যালয়ের অধীত বিষয় সমুদায়ে তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিক্ষকতা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে চিরজীবন নব নব জ্ঞান সঞ্চয়ের নিমিত্ত অধ্যয়নে রত থাকিতে হইবে। অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত তাঁহাকে সদ্ভাব রাখিতে যত্ন করিতে হইবে। ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা-লাভ হইবে ও নিজের বিদ্যাজনিত দাম্ভিকতার ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। নিজের বা অন্যের মনোগত ভাব বাক্যের দ্বারা অপরের মনের মধ্যে রোপণ করাই শিক্ষকের কার্য্য। সুতরাং তাঁহার বিষয় বর্ণনা-শক্তির সম্যকরূপ অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারাই এই শক্তি বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে। বালকগণকে যাহা বলিবেন বা শিক্ষা দিবেন তাহা যেন বিশুদ্ধ ও তাহাদের পক্ষে হিতকারী হয়। উদ্ভাবনী শক্তি (অর্থাৎ জটিল বিষয়াদি বালকগণকে সরল করিয়া বুঝাইবার জন্য নব নব পন্থা নির্দ্ধারণ), প্রতিভা (অর্থাৎ নব নব উন্মেষ-কারিণী বুদ্ধি), কল্পনা-শক্তি (অর্থাৎ অদৃষ্ট বিষয়াদির বর্ণনা পাঠ করিয়া তাহাদের অবস্থার উপলব্ধি)

প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিশেষরূপ অনুশীলন আবশ্যক। স্মৃতি-শক্তির বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, কারণ শিক্ষককে অনেক বিষয় মনে রাখিয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে হইবে। কেবল অবিরাম আলোচনার উপরই এই সকল বৃত্তির উন্মেষ নির্ভর করে।

২। নৈতিক গুণ—শিক্ষকের চরিত্র পবিত্র হওয়া আবশ্যক। শিক্ষকের কার্য্যাদি সাধারণে যতদূর পর্য্যালোচনা করিয়া থাকে বোধ হয় অন্য কাহারও কার্য্য ততদূর করে না। সুতরাং শিক্ষকের চরিত্র এমন নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক যে, কেহ যেন কোনরূপ সন্দেহও না করিতে পারে। সত্যনিষ্ঠা একটা প্রধান গুণ। শিষ্য যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষকের কথার প্রকৃতত্ত্ব খুবই কম, তবে যে সেই শিক্ষকের প্রতি তাহার কেবল শ্রদ্ধা কমিয়া যাইবে তাহাই নহে, সেও অধিকতর মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যাস করিবে। যে ধর্ম্মে হউক শিক্ষকের আস্থাবান হওয়া উচিত। ছাত্র, এ বিষয় প্রথমে গুরুর অনুকরণেই শিক্ষা করিবে। ন্যায়-পরায়ণতার দিকে যেন শিক্ষকের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাঁহার দ্বারা যেন কখনও কাহার অনিষ্ট সাধিত না হয়। সাধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অসাধু-ত্বের প্রতি ঘৃণা ন্যায়পরায়ণতার লক্ষণ। শিক্ষককে সমদর্শী হইতে হইবে। সমস্ত শিষ্যবৃন্দকে তিনি সমান চক্ষে দেখিবেন। ধনী নির্ধন বিচার করিয়া তিনি স্নেহ মমতা বিতরণ করিবেন না। রাজপুত্র ও ভিক্ষুকসন্তান তাঁহার নিকট সমান আদরের পাত্র। তাঁহাকে সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে। চঞ্চলমতি বালকেরা কত উৎপাত করিবে, কত অপরাধ করিবে কিন্তু তিনি শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া ও উদারচিত্তে সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহাদিগকে উন্নতির পথে পরি-চালিত করিতে যত্ন করিবেন। আত্মশাসন একটা মহাগুণ। ক্রোধা-দিকে শাসনে রাখিতে হইবে। শিক্ষককে শ্রমশীল হইতে হইবে। শ্রমশীল শিক্ষকের ছাত্রেরাই পরিশ্রমী হইয়া থাকে, আর অলস শিক্ষ-

কের ছাত্রগণ আলস্যপরায়ণ হয়। শিক্ষকের অন্তর সদা সন্তোষপূর্ণ ও বদন প্রফুল্ল না হইলে ছাত্র আকৃষ্ট হইবে না। ভ্রূকুটিতে সাময়িক ভয় উৎপাদন করে, প্রফুল্ল বদনে চির-স্নেহের সম্বন্ধ সংস্থাপন করে। বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি জগৎগুরুবৃন্দ স্নেহে যত দেশ অধিকার করিয়াছেন, হানিব, আলেক্‌জেণ্ডার, নেপোলিয়ান অস্ত্রের দ্বারা তাহার সহস্রাংশের এক অংশও জয় করিতে পারেন নাই। সে স্নেহলব্ধ রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজিত, কিন্তু সে অস্ত্রলব্ধ রাজ্য কোন দিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। শারীরিক গুণ—সুস্থ ও সবল ব্যক্তিই শিক্ষক পদের উপযুক্ত পাত্র। রুগ্ন ব্যক্তির মনও রুগ্ন হইয়া পড়ে; ধৈর্য্য, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রভৃতি গুণ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি বিশ্রী হইলেও সুশ্রী, কিন্তু রুগ্ন ব্যক্তি সুশ্রী হইলেও বিশ্রী। উত্তম শ্রী চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই। বালকের হৃদয় সৌন্দর্য্যে অতি সহজেই বিমোহিত হয়। বিকলাঙ্গ ব্যক্তি শিক্ষকতাকার্য্যের উপযোগী নহে। অন্ততঃ পক্ষে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনটীর বিকলত্ব না থাকিলেও শিক্ষকতা কার্য্য চলিতে পারে। গলার স্বর সুস্পষ্ট, সুললিত ও সুশ্রাব্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। চিত্ত প্রফুল্ল থাকিলে, স্বর প্রায়ই সুমিষ্ট হইয়া থাকে। স্বরের সুশ্রাব্যতা উত্তম উচ্চারণের উপর নির্ভর করে; আবার উচ্চারণের উন্নতি কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। যিনি সর্ব্বদা সুস্পষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ (বাক্য কথনের) ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে অভ্যাস করেন, যিনি সুবক্তাদিগের উচ্চারণ অনুকরণ করেন, তিনি সহজেই এই গুণ লাভ করিয়া থাকেন। পরিচ্ছদাদির প্রতিও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। পরিচ্ছদ সুরুচিসম্পন্ন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। জাঁকজমকযুক্ত পরিচ্ছদ বা অতি হীন পরিচ্ছদ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। এই সমস্ত সাধারণ গুণ না থাকিলে শিক্ষকতা কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করা কঠিন।

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণ।—হিন্দুশাস্ত্রাদিতেও গুরুর উক্ত লক্ষণ সমূহের উল্লেখ আছে।

মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতা চারুতৎপরঃ। আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ। শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্ব-ভূতহিতে রতঃ। ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা-বিমর্ষকঃ।

সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ, নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপারয়ণঃ। ঊহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ, ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্‌গরিমাম্বুধিঃ॥"

মন্ত্রমুক্তাবলীগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—"যিনি সদ্বংশজাত, যিনি পবিত্র স্বভাবসম্পন্ন, যিনি নিজের ধর্ম্মানুযায়ী আচার পালনে তৎপর, যিনি গৃহস্থাশ্রমী অর্থাৎ যিনি উদাসীন নহেন, যিনি অক্রোধী, যিনি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষাদি সকল গ্রন্থেতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, যিনি শ্রদ্ধাবান, দ্বেষরহিত, প্রিয়ভাষী, প্রিয়দর্শন, শুদ্ধচিত্ত, পবিত্রবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সর্ব্বপ্রাণিহিতে রত, সুশ্রী, অনুদ্ধতস্বভাব, সর্ব্বকার্য্যে তৎপর, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক্ষম, গুণশালী, ভগবদর্চ্চনাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহকার্য্যে সক্ষম, হোমজপাদি কার্য্যে নিয়তচিত্ত, তর্কবিতর্ক-পারদর্শী, বিশুদ্ধাত্মা, ও কৃপাশীল—এই সকল লক্ষণযুক্ত গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু।

পুনশ্চ বিষচস্মৃতৌ—পরিচর্য্যা-যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি কৃপাসিন্ধুঃ সুখং পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃসিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়চ্ছেত্তানলসো গুরুর্বাহৃতঃ।

যিনি শিষ্যের নিকট পরিচর্য্যা অথবা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, কৃপালুস্বভাব, সর্ব্বপ্রাণীর উপকারে রত, ধনাদিলাভে নিস্পৃহ, সর্ব্বমন্ত্রাদিতে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, সর্ব্বপ্রকার সংশয়চ্ছেদনে সমর্থ, আলস্যবিহীন,—এইরূপ ব্যক্তি গুরুপদবাচ্য।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা কেবল গুরুর এই সকল প্রশংসনীয় লক্ষণাদি নির্ণয় করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহারা নিন্দ্য গুরুর লক্ষণও বিবৃত করিয়াছেন:—

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে।—খিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ। কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গকঃ। হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ। এতৈর্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ।

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে লিখিত আছে, খিত্ররোগযুক্ত, গলিতকুষ্ঠযুক্ত, নেত্ররোগযুক্ত ব্যক্তি ও অতি খর্ব্বাকৃতি, কুনখী, কুদন্তী, স্ত্রীপরায়ণ, বিকলাঙ্গ, কপটাচারী; চিররোগগ্রস্ত; বহুভোক্তা,

বহুভার্যা, ব্যক্তি গুরু হইবার অনুপযুক্ত। এই সমস্ত দোষবিহীন ব্যক্তিই শিষ্যসম্মত গুরু।

এইরূপ যামলে, সন্তানবিহীন ব্যক্তি পর্য্যন্ত গুরুপদের অনুপযুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কারণ সন্তানবিহীন ব্যক্তির হৃদয়ে স্নেহ, মমতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সমূহের স্ফুরণ হয় না। তন্ত্রসারগ্রন্থে অন্যান্য কুলক্ষণের সঙ্গে, "দুর্গন্ধি-শ্বাসবাহকঃ" অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় এরূপ ব্যক্তিকেও গুরু পদের অযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বাস্তবিক কথাও, এরূপ অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি শিষ্যগণের কিছুতেই শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারে না। আপস্তম্ব, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থে গুরুলক্ষণ বিষয়ে যথেষ্ট মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত উদ্ধৃত করা হইল না।

শিক্ষকের গুণ সম্বন্ধে, সুবিখ্যাত অধ্যাপক আরনল্ড সাহেবের কথাগুলি বিশেষ জ্ঞানপ্রদ। তিনি বলেন "ধর্ম্মপরায়ণতা, কার্য্যতৎপরতা, শারীরিক ও মানসিক বল, বালকের ন্যায় সারল্য, তথা গাম্ভীর্য্য, নম্রতা, বিদ্যা এবং দাক্ষিণ্য, এই সকল গুণ না থাকিলে কোন ব্যক্তি সুশিক্ষক হইতে পারেন না। কিন্তু এই সমুদায় সদ্‌গুণালঙ্কৃত পুরুষ প্রায় পাওয়া যায় না। এমত লোক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বটে, তথাপি যাঁহারা শিক্ষকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে আপনারা এই সমুদায় গুণসম্পন্ন হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।"

যে সমস্ত সাধারণ কথা উল্লিখিত হইল তাহা সকল শ্রেণীর শিক্ষকের পক্ষেই প্রযুজ্য। টোলের পণ্ডিত, মাদ্রাসার মৌলবী, শিল্পশিক্ষক, সঙ্গীতাচার্য্য, মন্ত্রদাতা, ধর্ম্ম-উপদেষ্টা, সাধারণ বক্তা, সকলকেই এই সমস্ত গুণে গুণী হইতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাবিভাগের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষকতা করিতে হইলে এই সকল গুণের সঙ্গে আরও ত্রিবিধ গুণ বা শক্তির আবশ্যক:—(১) ব্যবস্থা বিষয়ক (২) শাসন বিষয়ক (৩) শিক্ষা বিষয়ক।

(১) ব্যবস্থা—বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নিরূপণ, প্রচুর পরিমাণে বায়ু ও আলো প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া গৃহ

নিৰ্ম্মাণ, আবশ্যকমত বিদ্যালয়ে আসবাব সংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খলমত শ্রেণী সাজান, সময় নিরূপণ পত্র (রুটীন) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অধ্যাপনার উপযুক্ত সময় নির্দ্দেশ, বিদ্যালয় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, বালকদিগের খেলিবার স্থানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের শোভাবৃদ্ধি ও ছাত্রশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে উদ্যান প্রস্তুত, মলমূত্র ত্যাগের স্থান নিরূপণ, উত্তম পানীয় জলের সংস্থান প্রভৃতি কার্য্যে বিচক্ষণতা প্রকাশ করিতে পারিলে শিক্ষক সুব্যবস্থার পরিচয় দিতে পারেন।

(২) **শাসন**—বালকগণ যাহাতে নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়, যাহাতে তাহারা মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করে, যাহাতে অবাধ্য ও অসভ্য না হয়, শিক্ষক ও ছাত্র যাহাতে সময় নিরূপণ পত্রের নির্দ্দেশমত কার্য্য করে, যাহাতে বালকগণের চরিত্র উন্নত হয়, বিদ্যালয়ের ভৃত্যগণ যাহাতে নিজ নিজ কার্য্য সুসম্পন্ন করে, দিনের কার্য্য যাহাতে দিনেই শেষ হয়, যাহাতে কোনরূপ গোলমাল না হয়, ইত্যাদি কার্য্যের ব্যবস্থার নাম সুশাসন।

(৩) **শিক্ষা**—বালকগণ যাহাতে শিক্ষায় আমোদ উপভোগ করে, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ কিছু কিছু নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, যাহাতে তাহাদের সমুদায় বৃত্তির সম্যক অনুশীলন হয়, যাহাতে তাহারা ক্রমে ক্রমে পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের প্রধান কার্য্য। ইহাই সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

পরবর্ত্তী তিন অধ্যায়ে এই তিনটী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।
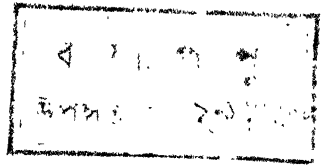
প্রথম অধ্যায়।—সুব্যবস্থাবিষয়ক।

হ ও প্রাঙ্গণ।—বড় বড় বিদ্যালয়ের গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে শিক্ষককে বড় একটা বেগ পাইতে হয় না, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার গণই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু ছোট ছোট বিদ্যালয় গ্রাম্য পাঠশালা প্রভৃতি অনেক সময় শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সুতরাং শিক্ষকের এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয় নির্ম্মাণের স্থান গ্রামের সংলগ্ন অথচ বাহিরে হইলেই ভাল হয়। নদী কি বড় পুষ্করিণীর ধার, ছোট টিলা কি পাহাড়ের ধার বা বিস্তীর্ণ মাঠই এ কার্য্যের জন্য প্রশস্ত। যেখানে সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হয়, চতুর্দ্দিকের দৃশ্য যেখানে মনোহর, অথচ গ্রাম হইতে বহুদূর নয়, এইরূপ স্থান দেখিয়াই গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গৃহের চারিদিকে যেন অনেক গাছ বা জঙ্গল না থাকে। একখানি গৃহ, একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ও বালকদিগের খেলিবার স্থানের যাহাতে সংকুলান হয়, বিদ্যালয়ের জন্য অন্ততঃ এপরিমাণ জমি আবশ্যক। দুই বিঘা জমির কমে এ সমস্তের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। অর্দ্ধবিঘা জমিতে বিদ্যালয়ের গৃহ, অর্দ্ধবিঘায় উদ্যান ও এক বিঘায় খেলিবার স্থান, ইহাই

অতি সংক্ষেপ। সহরে এ পরিমাণ স্থানের যথেষ্ট মূল্য বটে কিন্তু পল্লিগ্রামে এখনও এ পরিমাণ জমি বিনা ব্যয়ে পাওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় গৃহ ছোট বড় করিতে হইবে।

প্রত্যেক বালকের জন্য ভূপরিমাণ ১০ বর্গফিট আবশ্যক। আমেরিকায় ১৬ বর্গফিট ভূমি ও ২৫০ ঘনফিট বায়ুর ব্যবস্থা আছে। শ্রেণীকক্ষের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ ১৮´×১৫´। ৩০´ দূর পর্য্যন্ত সাধারণ লেখা পড়া যাইতে পারে, সুতরাং ব্লাকবোর্ড বা ম্যাপ ইহার অপেক্ষা দূরে রাখিলে চলিবে না। জানালা ২৪´এর দূরে হইলে কোনরূপ ফলোদয় হয় না। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়াও কক্ষের দীর্ঘ প্রস্থ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দরজা জানালাগুলি বাহিরের দিকে খুলিবার ব্যবস্থা থাকাই আবশ্যক। অগ্নিভয় ও ভূমিকম্পের সময় সহজে বাহির হইতে পারা যায়।

গৃহের সম্মুখে একটা ছোট বারান্দা থাকা আবশ্যক। বাহিরের কোন লোক, শিক্ষক কি কোন ছাত্রের সহিত দেখা করিতে আসিলে তাহাকে এইখানে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে, আর যে সকল বালক নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়(বিদ্যালয়ের গৃহ বন্ধ থাকিলে) তাহারা রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে নিজকে রক্ষা করিবার জন্য এই বারান্দায় আশ্রয় লইতে পারে। বাসগৃহ হইতে বিদ্যালয়ের গৃহ অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়া আবশ্যক, কারণ এখানে এক সঙ্গে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। প্রশ্বাসের সহিত যে অঙ্গারাম্ল বায়ু নির্গত হয়, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি অনিষ্টজনক। সাধারণতঃ শতভাগ বায়ুতে ·৪ ভাগ অঙ্গারাম্ল বায়ু থাকে। যদি বদ্ধগৃহে প্রশ্বাস নির্গমের পথের অভাবে ১ ভাগ অঙ্গারাম্ল বায়ু সঞ্চিত হয়, তবে বালকদিগের মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিবে, ২ ভাগ হইলে তাহারা বমি করিতে আরম্ভ করিবে, ৩ ভাগ হইলে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে, আর ৪ ভাগ মারাত্মক। সুতরাং যাহাতে গৃহাভ্যন্তরে

নির্ম্মল বায়ু চলাচল করিতে পারে তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণে দরাজা জানালা রাখা আবশ্যক। পাঠশালা যখন প্রায়ই একটী বা দুইটী শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন এইরূপ পাঠশালা গৃহের মধ্যে কক্ষ বিভাগ করিয়া কোনরূপ বেড়া বা দেওয়াল দেওয়া সুবিধাজনক নহে। যে বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষকের ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত। ছোট বালকেরা প্রায়ই মেজেতে বসিয়া কাজ করিতে ভালবাসে; এজন্য গৃহের মেজে পাকা হইলে ভাল হয়। যদি গৃহের ভিটা উচ্চ করিয়া আটাল মাটীতে বাঁধান হয়, তবে মাটীর হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু মাসে মাসে অন্ততঃ ২ বার গোবর মাটীর দ্বারা উত্তম করিয়া লেপাইতে হইবে। উচ্চ ভিটা প্রায়ই স্যাঁৎসেতে হয় না। আর যদি মেজের উপর গোবরমাটীর একটা পুরু স্তর পড়িয়া যায়, তবে নীচের জল, গোবর ভেদ করিয়া উঠিতে পারিবে না। স্যাঁৎসেতে গৃহে বাস করিলে জ্বর, কাশি, সর্দ্দি, বাত প্রভৃতি নানারূপ পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এজন্য ঘরের মেজে যাহাতে শুষ্ক হয়, শিক্ষককে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মধ্য প্রদেশের প্রাথমিক পাঠশালার নক্‌সা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইহাই গ্রাম্য পাঠশালার উত্তম আদর্শ :—

প্রত্যেক বালকের জন্য অন্ততঃ ৬ বর্গ ফুট ও ৬০ ঘন ফুট স্থান আবশ্যক, ইহাই মধ্যপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগীয় আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা অপেক্ষা বেশী স্থানেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ৫০ জন ছাত্রের উপযোগী একটী বিদ্যালয়ের মাপ সাধারণতঃ এইরূপ :—মধ্যের কামরাটী ২০ ফুট × ১২ ফুট, দেওয়াল ১০ ফুট উচ্চ। ঘন ফুট হিসাবে গৃহের অভ্যন্তর ৩৩৬০ (ছাদ ঢালু ধরিয়া)। আইন অনুসারে এই গৃহে ৪০ জনের বেশ স্থান হয়। কিন্তু কামরায় ২০।৩০ জনের বেশী ছাত্র বসে না। অন্যান্য সকলে সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কাজ করে। বারান্দা
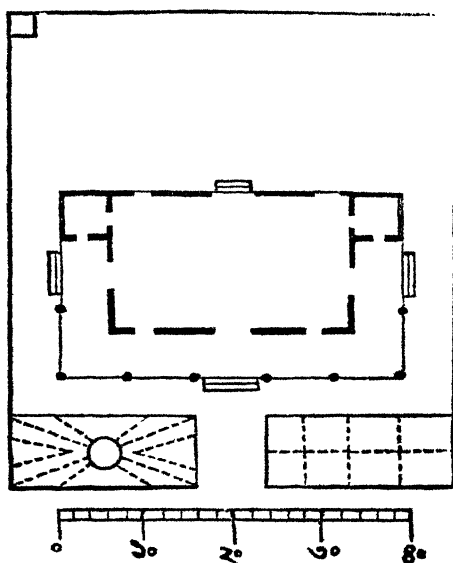
১ম চিত্র।—মধ্যপ্রদেশস্থ পাঠশালার নক্সা।
(সার্প সাহেব কৃত মধ্যপ্রদেশের রিপোর্ট হইতে)

৩২ ফুট × ৬ ফুট। ঘরের মেজে ও দেয়াল পাকা, ছাদ টালীর। ছোট ছোট বালকেরা চটের উপর বসে, বড় ছেলেরা বেঞ্চে বসে। কোন কোন পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীতে ডেস্কের ব্যবস্থাও আছে। বাগানের চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে। বিদ্যালয়ের চারিপার্শ্বে প্রায়ই বেড়া থাকে না। প্রায় শিক্ষককেই ডাকের কাজ করিতে হয়; এই জন্য প্রায় বিদ্যালয়ের সঙ্গেই একটা ডাকঘরের কক্ষ থাকে। দুই পার্শ্বে যে ছোট দুইটা কামরার নক্সা আছে, তাহার একটা ডাকঘর, অপরটাতে লাইব্রেরী, আফিস, ভাণ্ডার ইত্যাদি। বিদ্যালয়ের কাজ, ডাকঘরের কাজ ও পাউণ্ড অর্থাৎ পশু খোঁয়াড়ের কাজ করিয়া শিক্ষকেরা মাসে বেশ ২০।২৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ছোট ছোট বিদ্যালয়ে প্রায়ই একজন শিক্ষক ও একজন মণিটার (শিক্ষানবিশ শিক্ষক) থাকে।

যাহারা বড় স্কুল করিতে ইচ্ছা করেন, নিম্নে তাঁহাদের জন্যও একটা উৎকৃষ্ট নক্সা প্রদত্ত হইল। ক চিহ্নিত ঘর বৃহৎ কক্ষ বা হল। ইহাতে সভা সমিতি ও পরীক্ষার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। খ গ চিহ্নিত গৃহ দুইটী, দুই দিকের দরজা ঘর। এই ঘর দিয়া হলে প্রবেশ করিলেই সকল শ্রেণীতে যাওয়া যাইবে। আর ১, ২ প্রভৃতি চিহ্নিত ঘরগুলি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি শ্রেণী।

সাহেবদিগের স্কুলে ছাত্রেরা সর্ব্বপ্রথমে হলে একত্রিত হয় এবং শিক্ষকের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিয়া নিজ নিজ কক্ষে প্রবেশ করে। এইরূপ গৃহের আর একটী বিশেষ সুবিধা এই যে প্রধান শিক্ষক ইচ্ছা করিলেই অতি অল্প সময়ে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমস্ত ছাত্রকে হলে একত্র করিতে পারেন। আর এই হলে বসিয়া সমস্ত শ্রেণীর কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। লাইব্রেরী ও লেবরেটারী (বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রাগার) এই হলে। এখানে বসিয়া বালকেরা খবরের কাগজ ও পুস্তকাদি পাঠ করে। বিজ্ঞানের কোন পরীক্ষা দেখিতে হইলে এই হলে একত্র হয়। কেরাণীও এই হলের এক কোণে বসিয়া কাজ করেন। বালকেরা কলের পুতুলের মত গৃহে প্রবেশ করে, আবার ছুটীর সময় কলের পুতুলের মত বাহির হইয়া যায়—একটুও গোলমাল হয় না। তবে গৃহের বাহিরে গিয়া তাহারা স্বাধীনভাবে লাফালাফি বা গোলমাল করিয়া থাকে। বালকেরা শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, শিক্ষক হলের দিকের দরজা বন্ধ করিয়া দেন। অপর দিকের জানালাগুলি খোলা থাকে। কাজেই নানা শ্রেণীর গোলমাল হলে প্রবিশ করে না। দরজা জানালা কাচের।
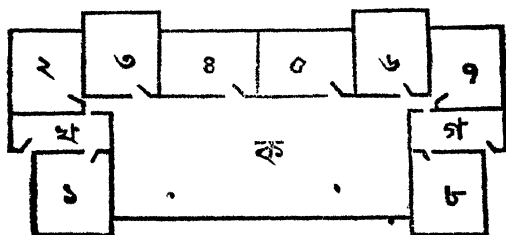
২য় চিত্র—হাইস্কুলের নক্সা।

(কাউহ্যাম কৃত শিক্ষাপদ্ধতি হইতে)

নিম্নে আসাম প্রদেশস্থ পাঠশালা গৃহের চিত্র প্রদত্ত হইল। সকল গৃহের বড় বারান্দা নাই। সম্মুখে একখানি পর'চালা বা পোর্টিকো

বারান্দা আছে। এই পোর্টিকোর সম্মুখের দরজা খোলা। বালকগণ সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে আসিলে, রৌদ্র বৃষ্টিতে এই চালায় আশ্রয় লইয়া থাকে। একটা লম্বা বারান্দার অপেক্ষা ইহাতে খরচ কম আর দেখায়ও সুন্দর।
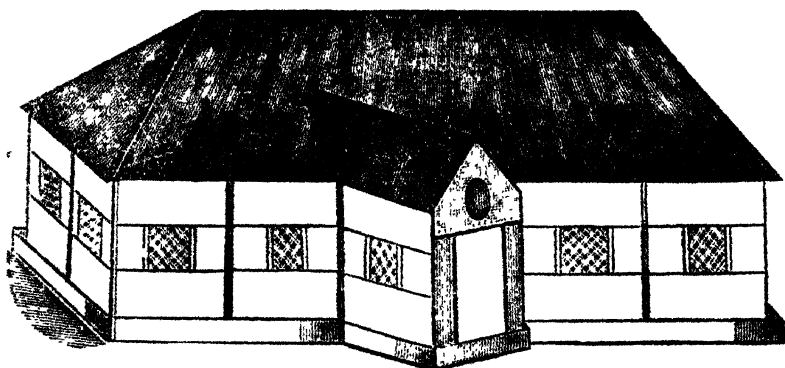
৩য় চিত্র।—আসাম প্রদেশস্থ পাঠশালাগৃহ।

আসবাব ও সরঞ্জাম।—ছোট্ ছোট ছেলেদের বসিবার জন্য বেঞ্চ অপেক্ষা চট, চাটাই, মাদুর প্রভৃতি অধিক সুবিধাজনক। ছোট ছোট চাটাই কি মাদুর হইলে, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন আসন হইতে পারে। তাহা না জুটিলে একটা লম্বা চট কিম্বা মাদুরে, অনেক ছেলে একত্রে বসিতে পারে। এরূপ চট কি মাদুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। মধ্য প্রদেশের পাঠশালা সমূহে চট ব্যবহার করে। একখানা বড় চট কিনিয়া (২০ ইঞ্চ প্রস্থ রাখিয়া) লম্বালম্বি কাটিয়া লয় ও চটের পাশ শক্ত জিন কাপড় মুড়িয়া সেলাই করিয়া দেয়। নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের জন্য এই চটের দ্বারাই শ্রেণী বিন্যাস করে। সহরের বিদ্যালয় সমূহে নিম্ন শ্রেণীতেও বেঞ্চ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রায়ই সকল শ্রেণীর বেঞ্চ সমানরূপ উচ্চ হওয়াতে, নিম্নশ্রেণীর বালকগণের বসিবার অসুবিধা হয়।

বেঞ্চে বসিলে পা ঝুলিয়া থাকে। অধিকক্ষণ এরূপে পা ঝুলাইয়া রাখিলে পায় ব্যথা জন্মে। এই নিমিত্ত ছোট ছোট ছেলেদের পা রাখিবার জন্য, উচ্চ বেঞ্চের সঙ্গে তক্তা আঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নিম্ন শ্রেণীর বেঞ্চগুলি নীচু করিয়া প্রস্তুত করাইলে আর এরূপ তক্তা আঁটিবার প্রয়োজন হয় না। অবস্থা ভাল হইলে ডেস্কের ব্যবস্থা করা উচিত। নিম্ন শ্রেণীর ডেস্কগুলি ছোট ছোট টেবিলের মত হইবে অর্থাৎ ডেস্কের উপরিভাগ ঢালু না হইয়া সমতল হইবে। কারণ নিম্ন শ্রেণীতে বালকগণকে কিণ্ডারগার্টেণ প্রথানুযায়ী অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। টেবিল ঢালু হইলে তাহাদের গঠিত দ্রব্যাদি গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। এক একটা লম্বা লম্বা ডেস্ক অপেক্ষা, ছোট ছোট ডেস্ক (ছোট ছেলের জন্য ১৮ ইঞ্চ প্রশস্ত ও বড় ছেলের জন্য ২০।২২।২৪ ইঞ্চ) উত্তম। বেঞ্চগুলির পিঠ থাকা আবশ্যক। অনেকক্ষণ নিরবলম্বভাবে বসিয়া থাকিলে মেরুদণ্ডে বেদনা উপস্থিত হয়। মধ্য প্রদেশের কোন কোন স্কুলে বালকদিগের হাতাবিহীন ছোট ছোট চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া স্কুলে, বালকদিগের জন্য সকল শ্রেণীতেই পৃথক্ পৃথক্ চেয়ার ও ডেস্কের বন্দোবস্ত। এ ডেস্কগুলিতে বালকদিগের পুস্তক, খাতা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি থাকে। ডেস্কগুলি বালকের বয়সানুসারে (সম্মুখের দিকে) ২০ ইঞ্চ হইতে ৩৫ ইঞ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে। ও বেঞ্চ কি চেয়ারগুলি ১০ হইতে ১৫ ইঞ্চ উচ্চ হইবে। বেঞ্চে সোজা হইয়া বসিলে যদি ডেস্কের সম্মুখ ভাগ হাতের কণুইয়ের ঠিক নীচে থাকে, তবেই ডেস্কের মাপ ঠিক হইল; আর বেঞ্চ কি চেয়ারে বসিলে যদি পা মাটিতে বেশ আরামের সহিত রাখা যায়, বেঞ্চের মাপও ঠিক হইল। নিম্নে উত্তম আসনের চিত্র প্রদত্ত হইল—বেঞ্চ ও ডেস্ক একসঙ্গে যুক্ত, ও একজনের (বা দুইজনের একসঙ্গে) বসিবার উপযোগী।
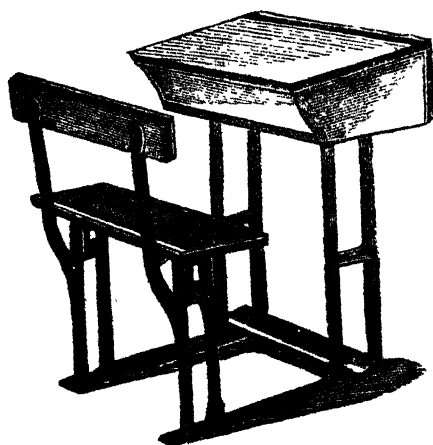
৪র্থ চিত্র।—যুক্ত আসন।

নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণের নিমিত্ত একখানা টেবিল, এক-খানা হাতাযুক্ত চেয়ার ও একখানি হাতাবিহীন চেয়ার নিতান্ত পক্ষেই আবশ্যক। হাতাযুক্ত চেয়ার প্রধান শিক্ষকের জন্য ও হাতাবিহীন চেয়ার মনিটারের জন্য। পুস্তক, খাতাপত্র, কাগজ, দোয়াত, কলম প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটা বাক্স বা আলমারী। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও অন্ততঃ ২ খানা ব্ল্যাকবোর্ড রাখা আবশ্যক। একখানি কাষ্ঠফলকে লোহার কড়া লাগাইয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলেও কাজ চলিতে পারে। আর ফ্রেমের উপর লাগাইয়া লইলেও হইতে পারে। ব্ল্যাক-বোর্ডের ধার দিয়া বিট বা কার্ণিস তুলিয়া উচ্চ করিবে না। তাহাতে টিস্কোয়ার চালাইবার অসুবিধা হয়। নিম্নে ব্ল্যাকবোর্ডের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—
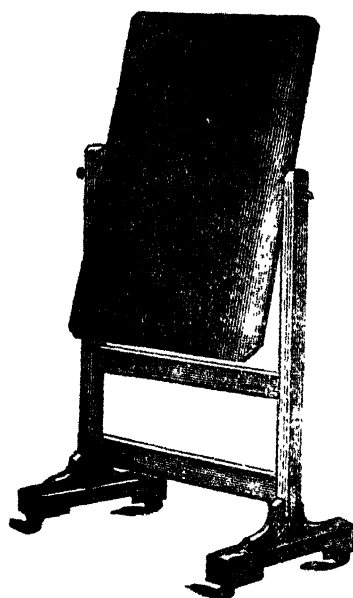
৫ম চিত্র।—ব্ল্যাকবোর্ডের আদর্শ।

এ সকল গরীব পাঠশালার ব্যবস্থার কথা বলিতেছি। অবস্থা ভাল হইলে এই সকল আসবাব আবশ্যক মত বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশী মিস্ত্রিরা ব্ল্যাকবোর্ড প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু অনেকেই উপযুক্তরূপে রঙ করিতে জানে না। কেহ আলকাতরা, কেহ বা ব্ল্যাকজাপান নামক রঙ দিয়া কাল করিয়া দেয়। ইহাতে চক্ দিয়া লিখিলে রঙের সঙ্গে চক্ লাগিয়া যায়। বোর্ড পুঁছিয়া ফেলিলেও চকের দাগ ভাল করিয়া যায় না। ব্ল্যাকবোর্ড রঙ করিবার প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইল। ম্যাপ রাখিবার জন্য আল্‌নার মত র‍্যাক প্রস্তুত না করিয়া, নিম্নের চিত্রানুযায়ী আসন প্রস্তুত করিয়া লওয়াই সুবিধা।—

ইহাতে কম স্থান লাগে আর ইহাতে র‍্যাকের মত এক সঙ্গে অনেক-গুলি মানচিত্র একত্র রাখিতে হয় না। সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রাখা যায়।
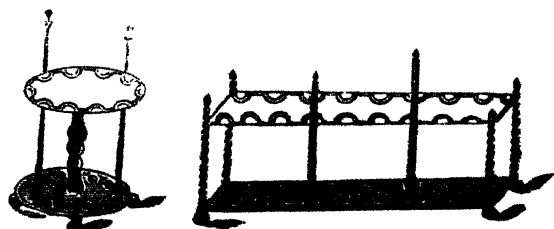
৬ষ্ঠ চিত্র।—মানচিত্রাদি রাখিবার আসন।

১ম চিত্রের উপরের কাষ্ঠফলকে যে সকল ছিদ্র আছে, তাহা কাষ্ঠে কতক কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। আর কাষ্ঠের চতুর্দ্দিকে একগাছি শক্ত দড়ি প্রেক্ মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দড়ি ও কাষ্ঠের ছিদ্র মিলিয়া একটা অর্দ্ধ বৃত্তাকার ছিদ্র হইয়াছে। ইহার মধ্যেই ম্যাপ থাকে।

প্রথম চিত্রের অনুরূপ আসন করিতে হইলে মিস্ত্রীর সাহায্য আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু ২য় চিত্রের মত আসন শিক্ষকেরা নিজেই করিয়া লইতে পারেন। বাঁশ ও বেতের দ্বারা কি কেবল বাঁশের দ্বারাও ঐরূপ আসন করিতে পারা যায়। শিক্ষক একটু পরিশ্রম স্বীকার ও একটু বুদ্ধি খরচ করিলেই অতি সহজে কৃতকার্য্য হইবেন।

বিদ্যালয় ও তাহার প্রাঙ্গনের নক্সা, গ্রামের নক্সা, জেলার নক্সা, প্রদেশের ম্যাপ, দেশের (ভারতবর্ষের) ম্যাপ ও সেই মহাদেশের (এশিয়ার ম্যাপ) ম্যাপ ও পৃথিবীর ম্যাপ রাখা আবশ্যক। বড় বড় স্কুলে ইহা ছাড়া অন্যান্য মহাদেশ ও বৃটন দ্বীপের মানচিত্রও রাখা আবশ্যক। ইহার সঙ্গে তিন চারিখানি নামবিহীন মানচিত্র রাখা কর্ত্তব্য। এ সকল মানচিত্রে নগরাদির নাম লেখা থাকে না। ইহার

দ্বারা বালকদিগের উত্তমরূপ ভুগোল পরিচয় হইয়া থাকে। ইংরাজী সংসৃষ্ট বিদ্যালয় হইলে, প্রাকৃতিক ভুগোল পরিচায়ক ও জীবজন্তু এবং উদ্ভিজ্জ্য সংস্থান পরিচায়ক মানচিত্র রাখাও আবশ্যক।

প্রদেশের ও জেলার বন্ধুর-মানচিত্র (Raise map) এবং একটী গোলকও আবশ্যক। পয়সা খরচ করিয়া এ সমস্ত কিনিতে পারিলে ভাল, আর না পারিলে প্রস্তুত করিয়া লইলেও চলিতে পারে।

গোলকের দামও আজকাল বড় বেশী নহে। বাঙ্গালা গোলক একটা দুই টাকা ও ইংরেজী গোলক একটা ৫।৬ টাকা হইলেই পাওয়া যায়। তবে এগুলি বড়ই ছোট। বন্ধুর-মানচিত্রও ৪।৫ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। পরিশিষ্টে বন্ধুর-মানচিত্র ও গোলক প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইল।

কতকগুলি ছবির দরকার। যে সকল জীবজন্তু বা অন্যান্য পদার্থ আমাদিগের সংগ্রহ করা অসাধ্য বা কষ্টকর নয়, সে সমস্ত পদার্থের প্রতিকৃতির আবশ্যক করে না। যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না বা সংগ্রহ করিতে পারি না, সেই গুলির ছবি বা পুত্তলিকা সংগ্রহই বিশেষ আবশ্যক। যথা, পুস্তকে বালকেরা ঈগল পাখীর বিষয় পাঠ করে কিন্তু কোন দিন দেখে নাই বা সহজে দেখিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। ঈগলের একখানা ছবি এই জন্য বিশেষ আবশ্যক। নিম্নে এইরূপ আবশ্যকীয় অল্প কয়েক খানি ছবির নাম লেখা গেল :—

বনমানুষ, সেণ্টবার্ডনার্ড কুকুর, জিরাফ, ব্যাঘ্র, উষ্ট্র, সিন্ধুঘোটক, ক্যাঙ্গারু, সিংহ, শ্বেত ভল্লুক, হস্তি, তিমি, বল্গাহরিণ, জেব্রা, ঈগলপাখী, উটপাখী, ময়ুর, পিরামিড, তাজমহল, বেলুন (ব্যোমযান), বাতিঘর।

বিদ্যালয়ের জন্য এ সকল ব্যতীত ক্লকঘড়ি বা টাইমপিস্, পেটাঘড়ি, পিতলের ঘটি, গেলাস, দোয়াত, কলম প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জিনিষের আবশ্যক হইয়া থাকে।

মিউজিয়ম।—পদার্থ পরিচয় বা তদ্রূপ কোন বিষয় শিক্ষাদিবার জন্য বিদ্যালয়ে কতকগুলি দ্রব্যের সংগ্রহ রাখা আবশ্যক। ছাত্র ও শিক্ষকেরাই এ সমস্ত জিনিষ বিনাব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে বস্তুগুলি রক্ষার নিমিত্ত একটী আলমারী আর মুখ বড় সাদাবর্ণের (কুইনাইন শিশির মত) কতকগুলি শিশি আবশ্যক। কি কি জিনিষ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, নিম্নে তাহার নাম প্রদত্ত হইল। ধান, চাল, কলাই প্রভৃতি শিশিতে রাখিয়া তাহার গায়ে দ্রব্যের নাম, প্রাপ্তির স্থান ও তাহার অন্য কোন বিশেষ গুণ থাকিলে তাহা, একখানা কাগজে লিখিয়া, আঁটিয়া দিতে হইবে।

কৃষিজাত।—সকল প্রকারের ধান, চাল, কলাই, দাইল, সর্ষপ, তিল, তিষি, সোরগোঁজা, যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি; তুলা, পাট, শন, রেশম, পশুলোম, সূত্রপ্রদ দ্রব্য ইত্যাদি।

শিল্পজাত।—সূত', দড়ি, কাপড়, সতরঞ্চ, কম্বল, মাদুর, পাটী, কুশাসন, কাগজ, মাটীর বাসন পিতল কাঁসার বাসন, বোতাম, চিরুণী, সাবান, আতর, গোলাপ, ফ্লাণেল, নিব, পেন্সিল, ইত্যাদি।

বনজাত—নানাপ্রকারের কাঠ, বাঁশ, বেত, লতা।

খনিজাত।—নানাপ্রকারের প্রস্তর, প্রস্তরীভূত হাড়, গাছ, পাথুরে কয়লা, ও নানা রকমের মাটী, টিন, সিসা, লোহা, তাম।

সমুদ্রজাত।—ঝিনুক, শম্বুক, শঙ্খ, কড়ি, প্রবাল।

এই প্রকারের নানাদ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। যে গ্রামের বিদ্যালয়, সেই গ্রামে, তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ও সেই জেলায় যে সমস্ত জিনিষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রথমে সেই গুলিই সংগ্রহ করিতে হইবে। পরে অন্যান্য দ্রব্য সুবিধা মত সংগ্রহ হইলে ভাল, না হইলে ক্ষতি নাই। এ সকল দ্রব্য সংগ্রহের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। দেশে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায় ও উৎপন্ন হয় তাহার জ্ঞান লাভ হয়।

বস্তুগুলি বালকেরা নিজে সংগ্রহ করিলে, সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান আরও উত্তম হয়। শিক্ষকেরাও অনেক সময় এই সকল বস্তুর সাহায্যে

পাঠ সরলীকৃত করিতে পারেন। মনে করুন আপনি পাথুরিয়া কয়লা বিষয়ে পাঠ দিতেছেন। কাঠ কয়লা, কোককয়লা, ও পাথুরিয়া কয়লায়, প্রভেদ কি তাহা বুঝিতে হইলে, দ্রব্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কি বুঝান সম্ভব? তিন রকমের কয়লা বালকদিগের সম্মুখে রাখিয়া দিলে, তাহারা চক্ষু ও হস্তের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কয়লা বিষয়ে এত জ্ঞান লাভ করিবে, যাহা শিক্ষক পাঁচদিনে বক্তৃতা করিয়াও দিতে পারিবেন না। সকল জিনিষ সংগ্রহ করা অবশ্য সম্ভবপর নহে, কিন্তু তাই বলিয়া কোন জিনিষই সংগ্রহ করিবার আবশ্যকতা নাই, একথাও যুক্তিযুক্ত নয়।

পুস্তকালয় বা লাইব্রেরী।—বিদ্যালয় দরিদ্র হইলেও অতি আবশ্যকীয় দশ বার খানি পুস্তক ক্রয় করা আবশ্যক। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রাখা নিতান্তই আবশ্যক (১) অভিধান (সুবল) (২) শুভঙ্করী (৩) শিশুরঞ্জন পাটীগণিত (কালীপদ) (৪) পাটীগণিত (যাদব) ভূগোল (শশীভূষণ) ভারতবর্ষের ইতিহাস (ম্যাকমিলান) উচ্চ-প্রাইমারী বিজ্ঞান রীডার (গিরীশ) বাঙ্গালা বা আসামের ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ) ভূচিত্রাবলী (শশীভূষণ) ব্যাকরণ (তারিণী) এবং শিক্ষা-পদ্ধতি, পদার্থ পরিচয় কিণ্ডারগার্টেণ বিষয়ক পুস্তক। অবস্থা ভাল হইলে, যোগীন্দ্র সরকার, আশুতোষ কৃত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলিও রাখা আবশ্যক। বালকদিগকে বিদ্যালয় পাঠ্য ব্যতীত অন্যান্য পুস্তক পড়িতে দিলে তাহারা যথেষ্ট উৎসাহ পাইবে ও আনন্দ উপভোগ করিবে। বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল হইলে যে সকল পুস্তক রাখা আবশ্যক তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পুস্তকগুলি আলমারীতে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পুস্তকে বিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিতে হইবে। একখানি বাঁধা খাতায় পুস্তকের তালিকা রাখা আবশ্যক। পুস্তকগুলি (অনেক পুস্তক হইলে) বিষয় অনুসারে ভাগ করিয়া খাতার ভিন্ন

ভিন্ন স্থানে লিখিতে হইবে। সাধারণতঃ এইরূপ বিভাগ করিলেই চলিবে :—

অভিধান—সাধারণ অভিধান, বিশ্বকোষ, বাঙ্গালা ভাষার লেখক, জীবনীকোষ প্রভৃতি এই শ্রেণ ভুক্ত।

সাহিত্য—প্রবন্ধ, উপাখ্যান, নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি।

গণিত—পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, জমিদারী মহাজনী, জরিপ ইত্যাদি।

ভূগোল ইতিহাস—এ শ্রেণীর মধ্যে ইচ্ছা করিলে জীবনচরিত ও ভ্রমণবৃত্তান্ত দিতে পারা যায় (বা এ সকল সাহিত্যশ্রেণীভুক্তও করা যাইতে পারে)।

বিজ্ঞান—পদার্থ বিজ্ঞান, রাসায়ন, ভুবিদ্যা, চিত্রশিল্প, ব্যায়াম, দর্শন ইত্যাদি।

শিক্ষা পদ্ধতি—শিক্ষক সহচর, শিক্ষাপ্রণালী, কিণ্ডারগার্টেণ, পদার্থ পরিচয় ইত্যাদি।

বিদ্যালয় পাঠ্য—শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক বা তদ্রূপ ছোট ছোট পুস্তক।

বিবিধ—খাজানা আইন, পঞ্জিকা, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদি।

শ্রেণীর পাঠ্য গ্রন্থের পৃথক তালিকা না করিলে অসুবিধা হইয়া থাকে। এক অসুবিধা এই হয় যে আলমারীতে সাহিত্যের বিভাগে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' পার্শ্বেই হয়ত "শিশুশিক্ষা"কে স্থান দিতে হয়, কারণ "শিশুশিক্ষা"ও সাহিত্যগ্রন্থ। আর এক অসুবিধা এই হয় যে নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য প্রত্যহই হয়তঃ অন্যান্য পুস্তক বিশৃঙ্খল করিতে হয়। এই জন্য বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-পুস্তক-তালিকায় 'বিদ্যালয় পাঠ্যের' একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী থাকাই আবশ্যক।

একটা সিকি আকারের কতকগুলি সাদা কাগজের গোল টিকিট কাটিয়া তাহার উপর $\frac{\text{সা}}{৫}$, $\frac{\text{ভূ}}{১০}$, $\frac{\text{বি}}{৩}$ ইত্যাদি রূপ নম্বর লিখিয়া পুস্তকের পার্শ্বে, নিম্ন হইতে এক ইঞ্চ স্থান বাদ দিয়া উত্তম আটার দ্বারা আঁটিয়া দিতে হইবে। পুস্তক আলমারীতে সাজাইলে টিকিট গুলি যেন এক লাইনে পড়ে। ইহাতে যদি কোন পুস্তকের পার্শ্বদেশ লিখিত লেখা ঢাকিয়া যায় তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই। টিকিটগুলি এক লাইনে না

হইলে বিশ্রী দেখায়। পুস্তক কে কবে পড়িতে লয় ও কবে ফেরত দেয় তাহার হিসাব রাখিবার জন্য পৃথক খাতা রাখা আবশ্যক। বালকগণকে পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্যান্য ভাল ভাল পুস্তক ও পত্রিকা পড়িতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতে হইবে।

খাতাপত্র—বালকগণের ভর্ত্তির রেজিষ্ট্রী ও দৈনিক উপস্থিতের রেজিষ্ট্রী, এই দুই খানিই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। ভর্ত্তি রেজিষ্ট্রীতে এইরূপ ঘর করিয়া রুল কাটিয়া লইবে। (১) ক্রমিক নম্বর (২) প্রথম ভর্ত্তির তারিখ (৩) পুনর্ব্বার ভর্ত্তির তারিখ (Re-admission যাহাদেরনাম কাটা যায় তাহাদের জন্য) (৪) বালকের পূর্ণ নাম (৫) জাতি (হিন্দু-ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, পাটনী; মুসলমান-সিয়া, সুন্নি ইত্যাদি) (৫) বাসস্থান (গ্রাম ও জেলা) (৬) পিতার নাম (৭) অভিভাবকের নাম (৮) অভিভাবকের ঠিকানা (গ্রাম ডাক-ঘর, জেলা) (৯) বালকের বর্ত্তমান বাসস্থান (হোটেল, মেস, আত্মীয়ের বাসা বা নিজ বাড়ী) (১০) বালকের জন্মের তারিখ (সন ও মাস) (১১) বালকের জন্ম তারিখ কি প্রকারে নিশ্চিত জানা গেল (কুষ্ঠী, অভিভাবকের এফিডেবিট্, গ্রামের লোকের সাক্ষ্য বা পিতা মাতার বর্ণনা) (১২) পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িয়াছে কিনা (সেই বিদালয়ের নাম) (১৩) পূর্ব্ব বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে পড়িয়াছে তাহার নাম। (১৪) পূর্ব্ব বিদ্যালয়ের প্রদত্ত সার্টিফিকেটের নম্বর ও তারিখ (১৫) বিদ্যালয় পরিত্যাগের তারিখ (১৬) বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ। (১৭) মন্তব্য। (বালক যখন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে সেই সময়েই ১৫।১৬ সংখ্যক ঘর পূরণ করিতে হইবে)

ডবল ফুলস্ক্যাপ আড়ার কাগজে একটা বড় খাতা করিয়া, উভয় পৃষ্ঠায় না লিখিলে এতগুলি ঘর ধরিবেনা। ভর্ত্তিপুস্তকের কাগজ ও বাইণ্ডিং উত্তম হওয়া আবশ্যক। কারণ এ পুস্তক অতি যত্নে রক্ষা করিতে হইবে। পর পৃষ্ঠায় দৈনিক-উপস্থিতি-রেজিষ্ট্রীর একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল।

শিবরামপুর নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা, জানুয়ারি মাস, ১৮৮০ ।

নম্বর	বেতন	ভর্তির ফি	জরিমানা	বকেয়া	মোট	আদায়	আদায়ের তারিখ	আদায় কারীর দস্তখত	ভর্তি রেজিষ্টারের নম্বর	নাম	বয়স	১	২	তারিখ
১	৵০				৵০				৮	শ্রীবিজয় গোবিন্দ শিকাদর	১ ।৩	/	/	
২	৵০		৴০		৶০				১৩	শ্রীইয়াসিন খাঁ	৯।১	○	/	
৩	৵০			৵০	৷০	৵০	৪।৯	ক,স	৩৯	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১২।৪	○	X	
৪	৵০		৴০		৶০				১	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন রায়	৯।৩	বি	/	
৫	৵০				৵০				২০	শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস	১০।২	○	/	
৬	ফ্রি				০				২২	শ্রীপরেশনাথ লাহিড়ী	১১।	X	দী	
৭	৵০	৵০			৷০				১৮	শ্রীরাখালদাস রায়	৯।২	/	○	
মোট	৸০	৵০	৵০	৵০	১৵							৪	৫	

দৈনিক উপস্থিত একটী কর্ণ রেখার দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে। অনুপস্থিত একটা বড় আকারের শূন্য। হাজিরা ডাকিবার পরে কেহ দেরীতে আসিলে ঐ বড় শূন্যের মধ্য দিয়া উপস্থিতের রেখা টানিয়া শূন্যের পেট কাটিয়া দিবে। কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদায় লইলে শূন্যের মধ্যে 'বি,' পীড়িত হইলে শূন্যের মধ্যে 'পী' লিখিবে। 'খাইয়া আসি নাই, নিমন্ত্রণ আছে, বাড়ীতে কার্য্য আছে, পেট ব্যথা করিতেছে' ইত্যাদি আপত্তিতে যাহারা সময়ের পূর্ব্বেই চলিযা যায়, তাহাদিগের উপস্থিত চিহ্নের উপর বিপরীত দিকে আর এক দাগ কাটিয়া দিবে। কোন ছেলে কতদিন এইরূপ আপত্তি দেখাইয়া বাড়ী চলিয়া যায়, ইহাতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মধ্য বা শেষ ঘণ্টায় রেজিষ্টারী করিতে যদি দুই এক জনকে না পাওয়া যায় তাহা হইলে কর্ণ রেখার দুই দিকে পেনসিল দিয়া দুইটী বিন্দু দিয়া রাখিবে। পরে অনুসন্ধান করিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিবে।

আবশ্যক হইলে বেতন আদায়ের অংশে আরও ২।৪টী ঘর বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। জরিমানার এক ঘর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন (অনুপস্থিত, বেতন দানে বিলম্ব, অন্যায় আচরণ) ঘর করা যাইতে পারে। যে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম সেখানে 'ভর্ত্তিরেজিষ্টার নম্বর' না লিখিলেও চলে। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা অধিক হইলে এই ঘর নিতান্ত আবশ্যক। সার্টিফিকেট দিবার সময়, পরীক্ষায় পাঠাইবার সময়, ভর্ত্তি রেজিষ্টারের সহিত মিল করিয়া ছাত্রগণের বয়স লিখিতে হয়। এরূপ নম্বর থাকিলে ভর্ত্তি রেজিষ্টার হইতে নাম বাহির করিতে বিলম্ব হয় না। ভর্ত্তি রেজিষ্টারে ক্রমিক নম্বর বৎসর বৎসর বদলান নিষেধ। বিদ্যালয়ের আরম্ভ হইতেই একাদিক্রমে নম্বর ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বিদ্যালয়ে কত ছাত্র পড়িল, ইহাতে তাহার সংখ্যা হইবে। যে ছাত্রের নাম কাটা যায়, যে পুনঃ ভর্ত্তি হইলে, তাহারি নামে তাহার সেই সাবেক নম্বরই লিখিয়া রাখিতে হইবে।

এই দুই পুস্তক ব্যতীত, শিক্ষকদিগের হাজিরা পুস্তক, আয় ব্যয়ের হিসাব, বিলের নকল বহি, চিঠির নকল বহি, চিঠি পত্রাদি আঁটিয়া রাখিবার ফাইল, বিজ্ঞাপন পুস্তক, পরীক্ষার নম্বরের খাতা, বাজে খরচের খাতা, পরিদর্শন পুস্তক প্রভৃতি আরও কতকগুলি খাতার প্রয়োজন। এ সকল খাতা প্রস্তুত প্রণালী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সময় সময় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভর্ত্তির রেজিষ্টার বা তদ্রূপ অন্য কোন খাতা ব্যতীত সমস্ত খাতাই যেন এক আকারের হয়। ফুলস্ক্যাপের আকারই সর্ব্বত্র প্রচলিত।

এ সকল ছাড়া বিলাতি স্কুলে "লগ্‌বুক্" (বিবরণী) নামক একখানা অতিরিক্ত পুস্তক ব্যবহৃত হয়। এই লগ্‌বুকে প্রতি শনিবারে বিদ্যালয় সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়। কিন্তু ইহাতে কোন বিষয় সম্বন্ধে ভাল মন্দ মন্তব্য প্রকাশ করিবার রীতি নাই। নিম্নে এই লগ্‌বুক্ লিখিত বিবরণের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

১২।৭।০৮ শুক্রবার—রথযাত্রা উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিল।

১৩।৭।০৮ শনিবার—তৃতীয় শ্রেণীর প্রতাপ চন্দ্র চক্রবর্ত্তি কলেরায় মারাগেল।

১৫।৭।০৮ সোমবার বাবু চন্দ্র নাথ ঘোষ ৪র্থ শিক্ষক মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১ মাসের বিদায় লইলেন। বাবু রামনাথ রায় তাঁহার স্থানে ৩০৲ টাকা বেতনে ১ একমাসের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

১৮।৭।০৮ বৃহস্পতিবার—অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য দৈনিক উপস্থিত সংখ্যা যথেষ্ট কম হইয়াছে।

১৯।৭।০৮ শুক্রবার ইন্‌স্পেক্টার সাহেব অদ্য হিসাবের খাতাপত্র পরীক্ষা করিলেন।

২০।৭।০৮ শনিবার—ইন্‌স্পেক্টার সাহেব প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক পরীক্ষা করিলেন ও ভূগোল শিক্ষা দিবার প্রণালী দেখাইয়া দিলেন।

২৩।৭।০৮ মঙ্গলবার—বাজারে আগুন লাগার দরুণ ১টার সময় বিদ্যালয় বন্ধ হইল। প্রথম শ্রেণীর শ্রীনাথ ঘোষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর লাল মোহন মুখার্জ্জি আগুন নিবাইবার জন্য খুব পরিশ্রম করিয়াছিল।

১।৮।০৭ বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যার সময় পুরস্কার বিতরণের সভা হয়। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত উড্ সাহেব সভাপতি। রাধাচরণ রায় (উকিল) যদুনাথ দে (ডেঃ মাঃ) ও নগেন্দ্র নাথ (শিক্ষক) বক্তৃতা করেন। মাজিষ্ট্রেট 'সুন্দর আবৃত্তির' জন্য ৩য় শ্রেণীর বিপিনচন্দ্র দাসকে ১০৲ টাকা দিলেন। খাঁ বাহাদুর দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্ব্বোত্তম মুসলমান বালককে প্রতি বৎসর ৮৲ টাকা দামের পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

৭।৮।০৭ বুধবার—লাট সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন করিলেন। ড্রিল দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম শ্রেণীতে শ্যামা চরণ দত্ত ও রাজচন্দ্র বসুর পড়া শুনিলেন।

৯।৮।০৭ শুক্রবার—৭ম শ্রেণীতে ব্যাকরণের পুস্তক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষককে মৌখিক শিক্ষা দিতে উপদেশ দেওয়া গেল।

১০।৮।০৭ শনিবার—ব্যায়ামের পরীক্ষা গৃহীত হইল। প্রথম মুন্সেফ বাবু কিশোরী মোহন সেন, উকীল বাবু গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

১২।৮।০৭ সোমবার—ষান্মাসিক পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

১৩।৮।০৮ মঙ্গলবার—পুস্তক দেখিয়া নকল করার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর নবদ্বীপ চন্দ্র দাসকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ইত্যাদি।

ভর্ত্তি রেজিষ্টার, দৈনিক রেজিষ্টার, শিক্ষকদিগের হাজিরা পুস্তক, বিলের নকল বহি, হিসাব পুস্তক প্রভৃতি খাতা লিখিবার সময় খুব সাবধানে লিখিত হইবে। কোনরূপ ভুল হইলে তাহা একটা লাইনের দ্বারা কাটিয়া দিয়া পুনরায় লিখিবে; কিন্তু কখন ছুরি কিম্বা ইরেজারের দ্বারা চাঁছিবে না। কোন খাতার কোন পাতা নষ্ট হইয়া গেলে তাহাও লম্বালম্বি টান দিয়া কাটিয়া রাখিবে, কিন্তু কখন খাতা ছিঁড়িবে না, কি খাতায় নূতন পাতা লাগাইবে না। বালকদের দৈনিক উপস্থিতির রেজেষ্ট্রী অন্ততঃ পনর বৎসর রক্ষা করিতে হইবে। ভর্ত্তির রেজিষ্টার, শিক্ষকের হাজিরা বহি, চিঠির নকল বহি, লগবুক, চিঠিপত্রাদির ফাইল, যাহাতে কখনই নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে।

এ সমস্ত বিষয় বিলাতের শিক্ষা বিভাগের প্রকাশিত আইন হইতে গৃহীত হইল। তবে আমাদিগের অবস্থা বিবেচনায় দুই একস্থানে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রেণী বিন্যাস।—ছাত্র সংখ্যা, শ্রেণী সংখ্যা, শিক্ষক সংখ্যা ও বিদ্যালয় স্থানের পরিমাণ দৃষ্টে শ্রেণী বিন্যাস করিতে হয়। যে বিদ্যালয়ে শ্রেণী সংখ্যা পরিমাণমত শিক্ষকসংখ্যা আছে সেখানে বড় বিশেষ বুদ্ধি খরচ করিতে হয় না। কেবল নিম্নলিখিত নিয়মানুসরণ করিলেই চলিতে পারে :—

(১) যে দেওয়ালে জানালা কি দরজা নাই সেই দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া বালকেরা বসিবে। মানচিত্র, বোর্ড, ছবি প্রভৃতি সেই দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

(২) যে দিক হইতে কক্ষে আলোক প্রবেশ করে, সে দিক বালকের বামে থাকিবে। কিন্তু যদি মকতব কি মাদ্রাসা বিদ্যালয় হয়, তবে আলোক বালকের দক্ষিণে থাকিবে। ইংরাজী, বাংলা বাম হইতে দক্ষিণে লেখা হয় সুতরাং আলোক বাম হইতে আসিলে কাগজে হাতের ছায়া পড়েনা; কিন্তু আরবী, পারশী দক্ষিণ হইতে বামে লেখা হয়, সেই জন্য এক্ষেত্রে আলোক দক্ষিণ হইতে আসিলেই হাতের ছায়া কাগজে পড়িবে না। পশ্চাৎ হইতে আলোক আসিলে নিজের শরীরের ছায়ায় পুস্তকাদি ছায়াযুক্ত হয়। তবে গৃহের দোষে যদি এরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সুবিধা মত যে কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু আলো প্রবেশের পথ কিছুতেই যেন সম্মুখে না পড়ে। ইহাতে চক্ষুর যন্ত্রনা উপস্থিত হইতে পারে।

(৩) বেঞ্চ ও ডেস্কগুলি পর পর—অর্থাৎ একখানের পশ্চাতে আর একখান সাজাইতে পারিলে ভাল হয়। যদি শ্রেণীর বালক ৩০ এর অধিক হয়, তবে শিক্ষকের বসিবার আসন ও টেবিল, একখানা তক্ত-

পোষের উপর রাখিয়া উচ্চ করিয়া দিতে হইবে। তাহা না হইলে পশ্চা-তের ছাত্রগণ শিক্ষকের সহজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িবে। এক লাইনে দুইখান বেঞ্চ ও ডেস্ক দিলেই ভাল হয়। যথা—
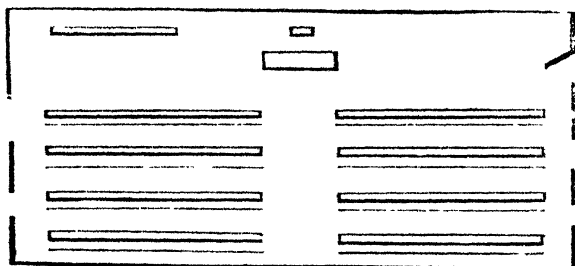
৭ম চিত্র।—শ্রেণী বিন্যাস (উত্তম ব্যবস্থা)।

ঘর ছোট হইলে কি এরূপ ভাবে বেঞ্চ সাজান অসুবিধা হইলে বালকেরা শিক্ষকের তিন দিকেও বসিতে পারে যথা :—
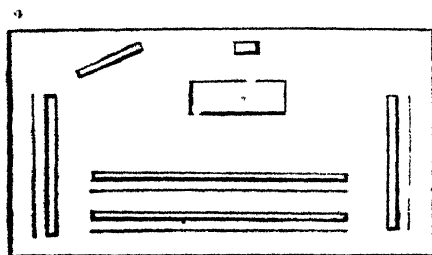
৮ম চিত্র।—শ্রেণী বিন্যাস (মধ্যম ব্যবস্থা)।

(৪) বালকেরা এরূপ ফাঁকে ফাঁকে বসিবে যে তাহারা যেন বেশ স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া করিতে পারে। লিখিবার সময় যেন তাহাদের হাত নাড়িতে অসুবিধা না হয়। দাঁড়াইলে যেন ডেক্‌সে বাধা না পায়।

(৫) দুই খানি বেঞ্চের মধ্যে এরূপ স্থান থাকা আবশ্যক যে শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল বালকের কার্য্য দেখিতে পারেন।

(৬) ব্ল্যাক বোর্ড শিক্ষকের পশ্চাতের দেওয়ালের, দক্ষিণে কি বামে, একধারে (ঠিক মধ্য ভাগে নয়) ঝুলান থাকিবে। শিক্ষকের দক্ষিণ হইলেই উত্তম। বোর্ডগুলি ফ্রেমে বাঁধা বা ইজলে রক্ষিত হইলে, সেগুলিও এইরূপ স্থানেই রাখিতে হইবে। ঘর ছোট হইলে ঠিক পশ্চাতের দেওয়ালের সহিত সমান্তর না রাখিয়া একটু কাণাচ ভাবে রাখিলে সুবিধা হইবে (৮ চিত্রের বোর্ডের অনুরূপ)। শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়াই তাহার বাম পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইবেন ও সেই স্থান হইতে হাত কিংবা দর্শনী কাঠীর দ্বারা বোর্ড লিখিত বিষয় ছাত্রগণকে বুঝাইবেন। শিক্ষাদানে বোর্ডের মত আবশ্যকীয় আসবাব খুব কমই আছে। সুতরাং এই বোর্ড অন্ততঃ বৎসরে একবার রঙ করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য (পরিশিষ্টে রঙ করিবার প্রণালী লিখিত হইল)।

(৭) যে স্থান হইতে শ্রেণীর সকল ছাত্র সহজে শাসন করা যাইতে পারে শিক্ষক এরূপ স্থানে বসিবেন।

এইরূপ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করিলেই শ্রেণী বিন্যাস সুবিধা জনক হইতে পারে। কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণীর সংখ্যানুযায়ী শিক্ষক নাই সে সকল বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিন্যাসে বিশেষ বুদ্ধি খরচ করা আবশ্যক। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এ বিষয়ের কিছু তত্ত্ব বুঝান যাইবে। এ কেবল দৃষ্টান্ত মাত্র, অবস্থা ভেদে ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে :—

মনে কর একটী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, অবস্থা মধ্যম, দুইজন শিক্ষক—একজন প্রধান ও একজন সহকারী বা একজন মনিটর, পাঁচটী শ্রেণী—১ম শ্রেণী (নিম্ন প্রাথমিক পাঠ্য), ২য় শ্রেণী (বোধোদয়), ৩য় শ্রেণী (শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ), ৪র্থ শ্রেণী (২য় ভাগ), ৫ম শ্রেণী (১ম ভাগ), এক ঘর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসে, অন্য তিন শ্রেণী মাটীতে চটে বা মাদুরে বসে। এক শিক্ষককে এক

সময়ে অন্ততঃ দুইটী শ্রেণীর ভার লইতে হয়। এরূপ স্থলে নিম্নের চিত্রানু-যায়ী শ্রেণী বিন্যাস সম্ভবতঃ অনেক স্থলেই সুবিধা জনক হইবে :—
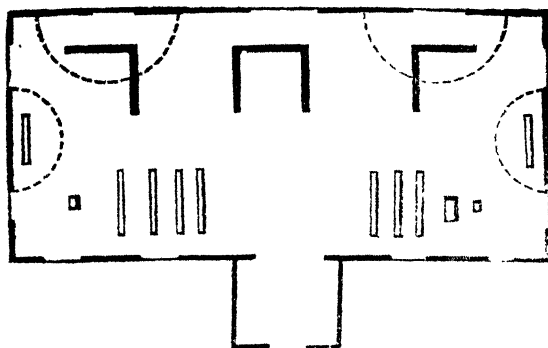
১ম চিত্র।—নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালার শ্রেণী বিন্যাস।

(স্থূল-কালরেখা-চিহ্নিত তিন শ্রেণীতে চট বা মাদুরের আসন; এই তিন শ্রেণীতে, তৃতীয় শ্রেণী এবং চতুর্থের ক খ শাখা বসে। অপর দুইটী শ্রেণীতে বেঞ্চ—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য)।

এইরূপ শ্রেণী বিন্যাস হইলে শিক্ষক এক স্থানে বসিয়াই ২ কি ৩ শ্রেণীর বালকগণকে সহজে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন।

যখন উপরের শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন লেখার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তখন শিক্ষক নিম্নশ্রেণীতে সাহিত্যাদি পড়াইবেন আবার নিম্ন শ্রেণী যখন লিখিবে কিম্বা কিণ্ডারগার্টেণ খেলায় ব্যাপৃত থাকিবে, তখন শিক্ষক উপরের শ্রেণী পড়াইবেন। (এ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা পর অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) বালকদিগকে কেবল সকল সময় বসাইয়া না রাখিয়া কোন কোন পাঠের সময় দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিলে ভাল হয়। অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিলে বালকেরা বিরক্তি বোধ করে।

কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সময় কি নিম্ন কি উচ্চ, সকল শ্রেণীর বালককেই বিন্দু দ্বারা (৯নং চিত্রে) চিহ্নিত স্থানে বৃত্তার্দ্ধের মত লাইনে দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। অঙ্ক, জ্যামিতি, ভূগোল, সহজ ড্রইং, পদার্থ পরিচয় প্রভৃতি বিষয়গুলি দেওয়ালে ম্যাপ কি ছবি ঝুলাইয়া বা বোর্ডের নিকট দাঁড়া করাইয়া শিক্ষা দেওয়া যায়। ডাক নামতা, শতকিয়া, কড়াকিয়া প্রভৃতি গৃহের বাহিরে, বা বৃষ্টির সময় ভিতরে, এক লাইনে দাঁড়াইয়া পড়িবে। উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা এইরূপ দাঁড়াইয়া কোন কার্য্য করিবার সময় নিম্ন শ্রেণীর বালকেরা বেঞ্চে বসিয়াও কোন কোন কার্য্য করিতে পারে। এরূপ স্থান পরিবর্ত্তনে বালকগণের বেশ স্ফূর্ত্তি হয়।

সময় নির্দ্দেশক পত্র বা রুটীন। শিক্ষকের সুব্যবস্থা বিষয়ক কৃতিত্ব তাঁহার রুটীনে প্রকাশ। রুটীন প্রস্তুত করিতে বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়। শিক্ষকের সংখ্যা, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষে পারদর্শিতা, শ্রেণীর সংখ্যা, শ্রেণীস্থ বালকদিগের চরিত্র, পাঠ দানের সময়, পাঠ্য বিষয়ের আধিক্য ও কাঠিন্য, দৈনিক কার্য্যের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয় উত্তমরূপ বিচার করিয়া রুটীন প্রস্তুত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ফলাফল এই রুটীনের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। রুটীন প্রস্তুত বিষয়ে বিশেষ কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই, সমস্তই অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারিলে ভাল হয়ঃ—

(১) রুটীন সাধারণতঃ তিন প্রকারে লিখিত হইয়া থাকেঃ—প্রথম শিক্ষকগণের জন্য রুটীন অর্থাৎ কোন্ শিক্ষককে, কোন্ ঘণ্টায়, কোন্ শ্রেণীতে কি বিষয় পড়াইতে হইবে। (এই রুটীনের মন্তব্যের ঘরে প্রত্যেক শিক্ষক সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করেন তাহাও লিখিত থাকিবে) ২য়, কোন্ শ্রেণীতে কোন্ ঘণ্টায় কোন্ শিক্ষক কি পড়াইবেন। (এই

রুটীনের মন্তব্যের ঘরে প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয় সপ্তাহে কত ঘণ্টা করিয়া পড়ান হয় তাহাই লিখিত হইবে) ৩য়, ছাত্রদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর রুটীন। এই রুটীনে সোম মঙ্গল প্রভৃতি বারক্রমে কোন ঘণ্টায় কোন শিক্ষক কি বিষয় পড়াইবেন তাহাই লিখিত থাকিবে। ১ম ও ২য় প্রকারের রুটীন আফিস ঘরে থাকিবে, ৩য় প্রকারের রুটীন শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

(২) প্রথমেই একটা স্থায়ী রুটীন না করিয়া একটা অস্থায়ী (খসড়া) রকমের রুটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে। সেই রুটীন অনুসারে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কার্য্য করিয়া যদি বুঝিতে পার যে রুটীন উপযোগী হইয়াছে তখন স্থায়ী রুটীন প্রস্তুত করিয়া লইবে, ও সেই রুটীন দৃষ্টে ২য়, ৩য় প্রকারের রুটীন প্রস্তুত করিবে। রুটীন এরূপ সরল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে লিখিতে হইবে যে পারদর্শকগণ রুটীন দেখিলেই যেন বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্য বুঝিতে পারেন।

(৩) বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত রুটীনের নিয়মের অন্যথা করিতে নাই। বৎসরের প্রথমে যে শিক্ষক যে শ্রেণীতে যে বিষয় শিক্ষাদান আরম্ভ করেন, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যই করিবেন। বৎসরের মধ্যভাগে কোন শিক্ষকের পরিবর্ত্তন হইলে তাঁহার স্থানীয় নূতন শিক্ষককে পূর্ব্ব শিক্ষকের কার্য্যই করিতে দিতে হইবে। ইহাতে এক আধটুকু অসুবিধা হইলেও তত ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যাঁহারা বৎসরের প্রথম হইতে এক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদিগের বিষয় বা কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইলে, শ্রেণীর ক্ষতি হইবে, ও তাঁহাদের দায়িত্ব কমিয়া যাইবে।

(৪) যে শিক্ষক যে বিষয় ভাল পড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে সেই বিষয়ই পড়াইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্‌মাষ্টার পর্য্যন্ত এরূপ ব্যক্তি হওয়া উচিত যাঁহারা নিজ নিজ শ্রেণীর সমস্ত বিষয়ই পড়াইতে ক্ষম—ড্রিল ড্রইং সমেত। কারসিয়াং (দারজিলিঙ্গের

নিকট) অবস্থিতি কালে দেখিয়াছি অধিকাংশ শ্রেণীর সম্পূর্ণ ভার এক একজন শিক্ষকের হাতে। আমাদিগের স্কুলেও পূর্ব্বে এরূপ নিয়ম ছিল এবং এই নিয়ম হইতেই হেডমাষ্টার, সেকেণ্ডমাষ্টার, থার্ডমাষ্টার ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছিল। এখন অধ্যাপকী রীতি প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে কার্য্যের সুবিধা হইতেছে বলিয়া আমাদিগের বোধ হয় না। আমরা সেই সাবেকী প্রথাকেই এখনও ভাল বলিয়া থাকি। উপরের শ্রেণীতে তত অনিষ্টকর না হইলেও, এই অধ্যাপকী রীতি নিম্নশ্রেণীর পক্ষে যে অনিষ্টকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(৫) যে সকল বিষয় পাঠে অত্যধিক মানসিক ক্লান্তি জন্মে সে সমুদয় প্রথম ও তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে হইবে। শেষ ঘণ্টায় বালকেরা ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে, সেই জন্য শেষের দিকে সহজ ও সুখকর বিষয় দিতে হইবে। কোন্ বিষয় কি পরিমাণ ক্লান্তিজনক তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে মোটামুটি বুঝিতে পারা যাইবে। গণিত (পাটীগণিত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়) শাস্ত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বিষয় ধরিয়া, যদি তাহার কাঠিন্যকে এক শতের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, তবে অন্যান্য বিষয়ের কাঠিন্য নিম্নলিখিতরূপে কমিয়া আসিবে ঃ—

গণিত	১০০	পাটীগণিত	৮২
সংস্কৃত / আরবী	৯২	উর্দ্দু বা হিন্দি	৮২
		মাতৃভাষা	৮০
ইংরেজী	৯০	পদার্থপরিচয়	৮০
ইতিহাস	৮৫	চিত্রাঙ্কণ	৭৭
ভূগোল	৮৫	নীতি	৭৭

(জর্ম্মণ পণ্ডিত লাডুইগ ওয়াগনারের মতাবলম্বনে)

কিন্তু এ মত সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। সংসারে কোন মতই বা সর্ব্ববাদী-সম্মত হয়। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা নিম্নশ্রেণীতে প্রথমে পাটীগণিত পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন, তৎপরে ভূগোল ও তৎপরে সাহিত্য।

অন্যান্য বিষয় সর্ব্বশেষে। যাহা হউক এ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা অনেকটা শিক্ষকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।

(৬) প্রথম ঘণ্টায় বা অবকাশের অব্যবহিত পরঘণ্টায়, লেখা কি চিত্রাঙ্কণের কার্য্য করাইবে না। অনেক দূর হইতে হাঁটিয়া আসিলে বা কিছুক্ষণ কোন পরিশ্রমের কাজ করিলে, শরীরে যে চাঞ্চল্য জন্মে তাহা শীঘ্র নিবারিত হয় না। সুতরাং এইরূপ পরিশ্রমের পর কলম কি পেনসিল ধরিলে, হাতের চাঞ্চল্য বশতঃ লেখা বা রেখা মনোমত হইবে না। বিদ্যালয়ের প্রথম ঘণ্টাতেও ব্যায়ামাদি করান বাঞ্ছনীয় নহে। বালকেরা আহার করিয়াই বিদ্যালয়ে আইসে, এমত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া ড্রিল করিলে পেটে ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা।

(৭) ছোট ছোট বালকেরা কোন বিষয়ে এক সঙ্গে অধিকক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে না। এই নিমিত্ত নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে কোন বিষয় এক সঙ্গে ২০মিনিটের অধিককাল শিক্ষা দেওয় যুক্তিযুক্ত নহে; উচ্চশ্রেণীতে ৩০ মিনিট। উচ্চপ্রাইমারীতে ৪০ মিনিট ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৪৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত এক বিষয় চলিতে পারে। তবে বিষয়ের কাঠিন্য ভেদে সময়ের তারতম্যও হইয়া থাকে।

যদি শ্রেণীর সংখ্যার অনুযায়ী শিক্ষকসংখ্যা না থাকে বা যদি এক শ্রেণীর সমস্ত ভার এক জনের উপর না থাকে বা যদি শিক্ষককে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শ্রেণী বদলাইতে হয়, তাহা হইলে এক বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সময়বিভাগ অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। যে নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ২ জন মাত্র শিক্ষক কিন্তু শ্রেণী ৫টী, সে স্কুলের কিরূপ রুটীন করিলে চলিতে পারে অপর পৃষ্ঠায় তাহার একখানা আদর্শ দেওয়া গেল। কিন্তু যে বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক সে বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনায় উচ্চ শ্রেণীর বালকগণের অনেকটা সাহায্য লওয়া দরকার হয়। এ কার্য্যের রুটীন করা সক্ত। শিক্ষকের শক্তি সামর্থ্য

ও বুদ্ধি বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। যাহাকে "পড়ান" বলে একজন শিক্ষকের দ্বারা পাঁচশ্রেণীর সে কার্য্য চলে না। তবে বাড়ী হইতে বালকেরা যাহা শিখিয়া আইসে, তাহার পরীক্ষা লওয়ার কার্য্য চলিতে পারে। অতিনিম্ন সংখ্যায়, ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ৩ জন শিক্ষক, এক জন মনিটার; উচ্চপ্রাথমিক স্কুলে ২ জন শিক্ষক, একজন মনিটার; ও নিম্ন-প্রাথমিক স্কুলে একজন শিক্ষক ও একজন মনিটার থাকা আবশ্যক।

(৮) কোন্ পুস্তকের কতদূর এক বৎসরে পড়াইতে হইবে, প্রথমে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রত্যহ কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ আলোচনা আবশ্যক তাহা বিবেচনা করিয়া রুটীন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৯) একটা নির্দ্ধারিত সময়ের অন্তরে, প্রত্যেক বিষয়ই যাহাতে রুটীন নিবিষ্ট হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে অর্থাৎ ক্রমাগত সাহিত্যই পড়ান হইতেছে বা অঙ্কই কষাণ হইতেছে সেরূপ ব্যবস্থা করা সুবিধা-জনক নয়। বিষয়ের পরিবর্ত্তনে কার্য্যে আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। এইজন্য রুটীনে এক বিষয়ই প্রত্যহ বা সমস্ত ঘণ্টায় না পড়াইয়া একটা নির্দ্ধারিত সময়ের অন্তর, প্রতি সপ্তাহে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

রাধানগর নিম্নপ্রাথমিক পাঠশালা।

১৯০৭ সনের সময় নির্দ্দেশ পত্র।

সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী (খ)
১১—১১½	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	দলিল বা চিঠি দেখিয়া লেখা	সাহিত্য (দ্বিতীয় শিক্ষক)	পুস্তক দেখিয়া লেখা	বীজ সাজান
১১½—১২	পূর্ব্বঘণ্টার সাহিত্য পাঠের সারাংশ লেখা বা দলিল ও চিঠি লেখা	সাহিত্য (প্রথম শিক্ষক)	পুস্তক দেখিয়া লেখা	বর্ণপরিচয় (২য় শিক্ষক)	কাঠী সাজান।

সময়	প্রথম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী (ক)	৪র্থ শ্রেণী ( )
১২—১২½	পাটীগণিত (১ম)	শ্রুতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	বীজ বা কাঠী সাজান।	বীজ বা কাঠী সাজান।	বর্ণপরিচয় (২য়)
১২½—১	অঙ্কন।	অঙ্কন।	পাটীগণিত (১ম)	পাটীগণিত (১ম)	লেখা (২য়)
১—১½	শ্রুতলিপি (ছাত্রের সাহায্যে)	পাটীগণিত। (২য়)	অঙ্কন।	অঙ্কন। (১ম)	অঙ্কন। (১ম)
১½—২	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (১ম)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১৫ মিনিট (২য়)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)	পদ্য আবৃত্তি ১৫ মিনিট ড্রিল ১০ মিনিট (২য়)
২—২½	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা	বিশ্রাম বা খেলা
২½—৩	ডাকনামতা সওয়াইয়া দেড়িয়া ম. ও বু. মানসাঙ্ক সো. বু শু (১ম)	ডাকনামতা সওয়াইয়া দেড়িয়া ম. ও বৃ. মানসাঙ্ক সো. বু. শু.	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া বুড়ি পন চৌক সের কাঠা ইত্যাদি (২য়)	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গণ্ডা বুড়ি পণ চৌক ইত্যাদি	ডাকনামতা বা কড়াকিয়া গণ্ডা বুড়ি পণ ইত্যাদি।
৩—৩½	পরিমিতি ম. বৃ. জমিদারী মহাজনী সো. বু শু.(১ম)	পরিমিতি ম. বু. জমিদারী মহাজনী সো. বৃ. শু.	শ্রুতলিপি (২য়)	০	০
৩½—৪	ভূগোল (সো.বু শু পদার্থপরিচয় ম. বু (১ম)	ভূগোল ম বৃ. পদার্থপরিচয় সো বু. শু. (২য়)	০	০	০
৪—৪½	কৃষি সো. বু. শু. ঐতিহাসিক গল্প ম. বৃ. (১ম শিক্ষক)	০	০	০	০

* প্রত্যেক শিক্ষককেই অন্ততঃ নিরূপিত সময়ের ১০ মিনিট পূর্ব্বে বিদ্যালয়ে আসিতে হইবে। ৫ মিনিট পূর্ব্বে শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া রেজেষ্ট্রী

করিতে হইবে ও হাজিরী লইতে হইবে। বালকেরাও ১ম ঘণ্টা বাজিবার ৫ মিনিট পূর্ব্বেই (ওয়ার্নিং বা সতর্ক করিবার জন্য যে ঘণ্টা দেওয়া হয় সেই সঙ্গে) শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিবে। ঠিক ১১টার সময় হইতে কার্য্য আরম্ভ হইবে। (উপরের রুটীনে যে স্থানে শিক্ষকের নাম লেখা হইলনা সে স্থানে বুঝিতে হইবে যে শ্রেণীর নিকটস্থ শিক্ষকই তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন)
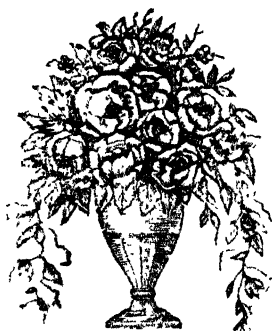
দ্বিতীয় অধ্যায়—সুশাসনবিষয়ক।

সুশাসন বলিলে প্রধানতঃ ছাত্র শাসনই বুঝিতে হইবে। তবে বিদ্যালয়ের চাকর চাকরাণী ও সময়ে সময়ে কোন কোন সহকারী শিক্ষককেও শাসন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু সকল শাসন অপেক্ষা বড় শাসন 'আত্মশাসন'। যিনি নিজকে শাসন করিতে জানেন না তিনি অন্যকে শাসন করিবেন কিরূপে? অন্যকে যাহা করিতে উপদেশ দিবে বলিয়া মনে কর, সর্ব্বাগ্রে তাহা নিজে প্রাণপণ যত্নে সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। কার্য্যে ও মুখে এক না হইলে তোমার শিক্ষায় বা শাসনে কোন ফলোদয় হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান গুণ 'সময়-নিষ্ঠা'। সময়নিষ্ঠ শিক্ষক অতি মূর্খ হইলেও বালকদিগের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারেন, সময়াপহারী বিদ্বান শিক্ষক তাহার শতাংশের এক অংশ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। "নিরূপিত সময়ে নিরূপিত কাজ করিতেই হইবে" বিদ্যালয়ের কার্য্যে সুফল লাভ করিবার ইহাই মূলমন্ত্র। যে শিক্ষক প্রত্যহ নিরূপিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া থাকেন, 'শিক্ষকের হাজিরা'

পুস্তকে যাঁহার নাম কোন দিন বিলম্বে আসিবার অপরাধে 'ক্রস্' * চিহ্ন দ্বারা কলঙ্কিত হয় না, যিনি ঘণ্টা বাজিবামাত্রই শ্রেণীতে গিয়া উপস্থিত হন—বিশ্রামগৃহে বসিয়া ধূমপানে বা লাইব্রেরীতে বসিয়া বৃথা গল্পে কালহরণ করেন না, যিনি শ্রেণীতে গিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন—বালকদিগের সঙ্গে বাজে গল্প বা কৌতুক করিয়া সময়াপহরণ করেন না—তিনিই, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম হইলেও—'উত্তম শিক্ষক' পদবাচ্য। যদি বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষকের সমস্ত গুণ একসঙ্গে প্রকাশের উপযোগী কোন কথা থাকে, তবে সে কথা "সময়নিষ্ঠ"।

(১) সময়নিষ্ঠা।—সুশাসনের দ্বারা সুফল লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে নিজে সময়নিষ্ঠ হইবে ও বালকদিগকে, সহকারী শিক্ষকগণকে এবং ভৃত্যবর্গকে সময়নিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিবে। সহরের বালকগণ আজকাল কিছু পরিমাণ সময়নিষ্ঠ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয় পল্লীগ্রামের অবস্থা এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। গ্রামের হাই স্কুলে যদিও কিছু উন্নতি বুঝিতে পারা যায় কিন্তু মধ্যবাঙ্গলা, উচ্চ প্রাইমারী ও নিম্ন প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা শোচনীয়। বেলা ১০টা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ২টা পর্য্যন্ত ছাত্র আসিতেই থাকে। শিক্ষকগণের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রধান আপত্য "রান্না হইয়াছিল না"। এ অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে শিক্ষকগণকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, আর ছাত্রের জন্য অপেক্ষা না করিয়া যথাসময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। যদি বালকগণের বিশ্বাস থাকে যে শিক্ষকগণও দেরী করিয়া স্কুলে যাইয়া থাকেন, আর তাহাদিগের স্কুলে উপস্থিত না হওয়া

* শিক্ষক যে সময় বিদ্যালয়ে আসিয়া থাকেন তাহা 'শিক্ষকগণের হাজিরা' পুস্তকে লিখিতে হয়। যদি কেহ বিলম্বে আসেন তবে তাঁহার আগমনের সময় প্রধান শিক্ষক লাল কালির দ্বারা (×) চিহ্নিত করিয়া রাখেন। পরিদর্শকগণের সহজেই সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে।

পর্য্যন্ত অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করেন না, তখন তাহারা কেন দেরী করিবেনা? যদি দুই তিন দিন এরূপ বুঝিতে পারে যে শিক্ষক তাহাদের জন্য অপেক্ষা করেন না, তখন তাহারাও যথাসময়ে উপস্থিত হইতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইহার সঙ্গে আরও একটী কথা আছে, বালকেরা যে বিদ্যালয়ে আসিবে তাহার একটা বিশেষ আকর্ষণ চাই। অধ্যাপনায় যদি বালকেরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, যদি তাহারা বুঝিয়া থাকে যে বিদ্যালয়ে গেলেই নূতন নূতন আনন্দদায়ক জ্ঞানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কত নূতন জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, কত রকমের নূতন খেলা খেলিতে পারা যায়, শিক্ষকদিগের নিকট কত আমোদের গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, কত আদর, কত যত্ন, ভালবাসা পাওয়া যায়, তবে তাহারা সমস্ত ফেলিয়া, এমন কি না খাইয়া পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে চলিয়া আসিবে। বালকের আগ্রহ ও সময়নিষ্ঠা দেখিলে পিতামাতাও তাহার জন্য উপযুক্ত সময়ে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। অনেক সময় অভিভাবকেরা শিক্ষকদিগের বিশৃঙ্খল কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তাঁহাদিগের বালকগণের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হন না। শিক্ষক গ্রামের আদর্শ—জ্ঞান রাজ্যের রাজা। যদি শিক্ষক নিজের গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবে তাঁহার দ্বারা কেবল যে ছাত্রগণের কল্যাণ হইবে এমন নহে, ছাত্রগণের পিতামাতার, এমন কি সমস্ত গ্রামেরই প্রভূত উপকার হইবে।

বালক দেরী করিয়া বিদ্যালয়ে আসিলে তাহার বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করিবে, সে কারণ প্রকৃত কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করিবে; ৩ দিনের অধিক এই অপরাধ করিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেনা। সময় নাই, অসময় নাই, যখন ইচ্ছা তখন যদি বালকেরা শ্রেণীতে প্রবেশ করে, তবে অন্য বালকগণেরও মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া বালকগণের এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে হইবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা।—শিক্ষক নিজে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে বিদ্যালয়ে আসিবেন। বিদ্যালয়ের জন্য এক প্রস্থ পোষাক পৃথক রাখা উচিত। গরীবও ইহা পারেন—একখানা পরিষ্কার ধুতি, একটা পরিষ্কার জামা ও একখানা পরিষ্কার চাদর! বিদ্যালয়ের দ্রব্য-গুলি যথাস্থানে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান করিবেন। ঘরের দরজা, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, ঘরের মেজে উপযুক্ত রূপ পরিষ্কার করা হইয়াছে কি না তাহা দেখিয়া লইবেন। রেজেষ্টরী পুস্তক, দোয়াত, কলম, চক, ঝাড়ন, প্রভৃতি শ্রেণীতে শ্রেণীতে দেওয়া হইতেছে কি না তাহাও দেখিবেন। তারপর বালকেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কিনা তাহার তত্ত্ব লইবেন। ছেলেদের দাঁত, হাত, হাতের নখ, পা পরিষ্কার কি না; ধুতি, জামা, চাদর, প্রভৃতি পরিষ্কার কি না; পুস্তক, খাতাপত্র, শ্লেট পরিষ্কার কি না, এই সকল পরীক্ষা করিবেন ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া দিবেন। বালকেরা এসমস্ত বিষয়ে অন্যের বিনা সাহায্যে, সামান্য বা বিনা ব্যয়ে, নিজেরাই মনোযোগী হইতে পারে ও এ সমস্ত মলিনত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে। বালকদিগের মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা উচিত। যে সকল বালকের মাথায় বড় বড় চুল, তাহারা চুলগুলি হাত দিয়াই হউক কি চিরুণী দিয়াই হউক, পরিপাটী করিয়া রাখে কিনা; তাহাদের জামার বোতাম আছে কি না, আর সেগুলি আঁটে কিনা তাহাও দেখিবেন।

কারসিয়ং ভিক্টোরিয়া স্কুলে সাহেবের ছেলেরা পড়ে। স্কুলের সঙ্গে ছাত্রনিবাস আছে, বালকেরা সেইখানে থাকে। তাহাদের মাথার চুল খুব ছোট করিয়া কাটা; পোষাক পরিচ্ছদ এক রকমের সামান্য খাকী কাপড়ের; ইহাই ব্রহ্মচর্য্য, আমাদিগেরও সেকালে ইহাই ছিল। আর এখন আমাদিগের কি হইয়াছে? আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ সিঁথির উপর এলবার্ট কাটিয়া, ডবল প্লেট সার্টের উপর হাই কলার আটিয়া, চাদরখানি নানা রকমের চুনট করিয়া, বাঁশবেড়ের কার্ত্তিক সাজিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত। আবার কেহ হয়ত দুই পায়ে দুই রকমের জুতা পরিয়া, লজ্জা নিবারণ হওয়া সুকঠিন—এরূপ ছিন্ন

বস্ত্র পরিধান করিয়া, ধোয়া জামার উপর ময়লা চাদর গায় দিয়া, বড় বড় চুল গুলি পাগলের মত এলো মেলো করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। দুইই দোষের, কিন্তু বিলাসিতায় বালকগণ যত অধঃপাতে যায়, নোংরামীতে তত নয়। বিলাসিতার অন্তরালে কত যে কুৎসিত ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিলাসিতার ভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। ছাত্রগণের জন্য একটা বিশেষ পোষাকের ব্যবস্থা করিলে কেমন হয়?

তার পর বিদ্যালয়ে আসিয়া পুস্তকগুলি গুছাইয়া রাখে কি না; ছাতা গুলি ঠিক স্থানে রাখে কি না; গায়ে চাদর দিয়া বেশ ফাঁকে ফাঁকে বেঞ্চে বসিয়া থাকে কি না; পা নাচান, মাথা চুলকান, পান কি কাপড় চিবান; পেনসিল কামড়ান, প্রভৃতি কুঅভ্যাসে আসক্ত কি না ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। ছুরি দিয়া বেঞ্চ, ডেস্ক কাটা, দেয়ালে পেনসিল দিয়া লেখা, ঘরে থুথু ফেলা, কলম ঝাড়িয়া কালি ফেলা প্রভৃতি আরও অনেক রোগ আছে। শিক্ষক খুব সতর্ক না থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতে পারিবেন না। যখন যে কোন ত্রুটী চোখে পড়িবে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে হইবে। যদি ছাত্রেরা একবার বুঝিতে পারে যে শিক্ষকের চক্ষু খুব তীক্ষ্ণ, তাহা হইলে তাহারা আর নিজ নিজ বদ অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিতে সাহস করিবে না।

(৪) **নকল করা**।—রোগের প্রতিকার অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। নকল করিলে বালককে শাস্তি দিতে হইবে ইহার ব্যবস্থা না করিয়া যাহাতে নকল করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। পরীক্ষার সময় বালকগণকে যতদূর ফাঁকে ফাঁকে বসান যাইতে পারে তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। সম্মুখে পুস্তক, খাতা বা কোনরূপ কাগজ থাকিলে, তাহা অন্য স্থানে সরাইয়া রাখিতে হইবে। আর যাঁহারা তত্ত্বাবধান করিবেন, তাঁহারা খবরের কাগজ না পড়িয়া, যাহাতে বালকগণের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখেন সেরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে নকল করিতে পারিবে না বলিয়া বোধ হয়। নীচের শ্রেণীর অর্থাৎ ১০।১২ বৎসর বয়সের বালকের পকেট পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ ইহাতে একটু অপমানিত মনে করে। পরীক্ষায় তত্ত্বাবধান ভাল হইলে, পকেটে কাগজ থাকিলেও বাহির করিতে সাহস পাইবে না। বালক-দিগের শয়তানী নানা রকমের দেখিতে পাওয়া যায়, পায়ের নীচে জুতার মধ্যে কাগজ রাখে, কাছার সঙ্গে পুস্তকের পাতা বাঁধিয়া রাখে, কোটের আস্তিন বা শার্টের কাফের নীচের পিঠে ইতিহাসের তারিখ লিখিয়া আনে, হাতে অতি সূক্ষ্মভাবে পেনসিল দিয়া কত কথা লিখিয়া রাখে। যদি চোরের মত সমস্ত বালকের সমস্ত কাপড়চোপড় ও হাত পা পরীক্ষা করিতে হয়, তবে সে এক বিরাটব্যাপার হইয়া পড়ে। আবার ততদূর করিলেও অনেক সময় ধরিতে পারা যায় না। আর ভদ্র সন্তানদিগকে একটা সাধারণ পরীক্ষা গৃহে এরূপ ভাবে থানাতল্লাসীর অধীন করা ভদ্রোচিতও নহে। একটু সতর্ক দৃষ্টি থাকিলেই পরীক্ষা স্থলে কেহ কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সাহস করিবে না। নিতান্তই যে বালক এইরূপ অন্যায় উপায়ে পরীক্ষা পাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাকে পরীক্ষা দানে বঞ্চিত করিবে। অন্য শ্রেণীতে উঠিবার জন্য সে যে অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহার ফল, সে এইরূপে হাতে হাতেই ভোগ করিবে।

শ্রেণীতেও একজনের অঙ্ক দেখিয়া অন্যে নকল করিতে চেষ্টা করে। ইহা নিবারণের জন্য কেহ কেহ, একটি অঙ্ক না দিয়া এক সময়ে এক রকমের দুইটী অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যক বালকেরা একটী অঙ্ক কসে; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি জোড়সংখ্যক বালকেরা অন্য অঙ্ক কসে। কাজেই কেহ কাহারও নকল করিতে সুবিধা পায় না। কেহ কেহ আবার বেঞ্চের এদিক ওদিক

করাইয়া অর্থাৎ প্রথম বালক উত্তর মুখে, দ্বিতীয় বালক দক্ষিণ, তৃতীয় উত্তর, এরূপ ভাবে বসাইয়া দেন। ইহাতেও নকল করার অসুবিধা হয়।

আবার শ্রেণীতেও পরীক্ষা স্থলে এক বালক অন্যকে ফুস্ ফুস্ করিয়া নানা কথা বলিয়া সাহায্য করিতে বা পাইতে চেষ্টা করে। শ্রেণীতে দুই এক দিন খুব কড়া শাসন করিলে ও পরীক্ষা স্থান হইতে একবার ২।১ জনকে বাহির করিয়া দিলে আর কেহ এরূপ করিতে সাহস করিবে না। ফল কথা শিক্ষককে সর্ব্বদাই চক্ষু কর্ণ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

এ সমস্ত ত প্রতিকারের কথা। কিন্তু এ রোগের মূল কোথায়? প্রায়ই দেখা যায় যে বালক নিজের অজ্ঞতা লুকাইবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকে। এরূপ অজ্ঞতা লুকাইবারই বা কারণ কি? শিক্ষকের কঠোর শাসন বা পিতামাতার ভর্ৎসনার ভয় বা অন্যের জ্ঞানের সহিত নিজের জ্ঞান যোগ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুরী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। এই সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিকার করা সুশিক্ষকের কর্ত্তব্য। সে না জানে তাহাকে শিখাইয়া দিতে হইবে। শাসনের আধিক্যে বালককে ভীত করিয়া না তুলিলেই, সে সরল ভাবে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিবে। বালক যদি বুঝিতে পারে যে শিক্ষক তাহাকে সস্নেহে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তবে সে নিজের অজ্ঞতা গোপন করিবে না।

বালকদের মনে এই সকল অন্যায় কার্য্যের প্রতি একটী বীতশ্রদ্ধা উৎপন্ন করাইয়া দিতে পারিলে, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়। উচ্চশ্রেণীতে এইরূপে অনেক সময় বালকদিগের সাধুতার উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া গিয়া দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিক কেহ নকল করে নাই। যদি প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্ততঃ একটী ছাত্র এরূপ ভাবে গঠিত করা যায় যে, সে এ সকল কার্য্য সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে, তবে তাহার সম্মুখে কোন বালক কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সাহস করিবে না।

(৫) সাধারণ দুষ্টামী :—বালকেরা মিথ্যা কথাও অনেক সময় ভয় বশতঃ বলিয়া থাকে। কোন একটী অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পাছে স্বীকার করিলে শাস্তি পাইতে হয়, এই ভয়ে মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলে। আমরা অবশ্য বালককে ভাল করিবার জন্যই কঠোর শাসন করিয়া থাকি; কিন্তু কঠোর শাসনে সকল সময়ে সুফল পাওয়া যায় না। যদি কঠোর শাস্তির ভয় না থাকিত তবে বালক তাহার অন্যায় কার্য্য গোপন করিতে চেষ্টা করিত না। আবার অন্য পক্ষে কঠোর শাসনের ভয় না থাকিলেও বালক অন্যায় কার্য্য করিতে ভয় করিবে না। কি প্রণালী অবলম্বন করিলে যে দুকুল রক্ষা হয় তাহা নির্দ্দেশ করা শক্ত। সত্যানুরাগ অনেক পরিমাণে পিতা মাতার দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে। যদি বালক আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও শিক্ষককে সত্যনিষ্ঠ দেখে তবে সেও সত্যনিষ্ঠ হইতে যত্ন করিবে।

কোন কোন বিষয়ে শিক্ষক একটু সাবধান হইলে, মিথ্যা কথনের প্রবৃত্তি কিছু কমাইতে পারেন। বালক পড়া অভ্যাস করে নাই, কি বাড়ী হইতে অঙ্ক কসিয়া আনে নাই, কি বিদ্যালয়ে বৃথা কারণে অনুপস্থিত হইয়াছে, এ সমস্ত বিষয় কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া, প্রথম প্রথম কার্য্যে অবহেলার কারণ অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। শাস্তির ভয় না থাকিলে বালক সরল মনে কারণ বলিয়া ফেলিবে। সত্যকথনের অভ্যাস হইয়া গেলে আর মিথ্যা বলার দিকে সহসা তাহাদের প্রবৃত্তি যাইবে না। সত্য বলায় যে পরকালে সদগতি হইয়া থাকে বা মিথ্যা বলায় যে নরকগামী হইতে হয়, ইহা বালকেরা বুঝিবে না। যাহাতে তাহাদের সত্য কথনের অভ্যাস হয় তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। অভ্যাসেই মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়।

বালকদিগের মধ্যে কখন কখন একে অন্যের জিনিষ চুরি করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দণ্ডবিধি আইনের যে "চুরি" বুঝিয়া

থাকি এ 'চুরি' সেরূপ চুরি নহে। অন্যের কোন জিনিষ নিজের পছন্দ হইল, সে সেটি সরাইয়া ফেলিল। এইরূপ সরল ভাবেই অনেক চুরি হইয়া থাকে। ইহাতে যে একটা ভীষণ স্বার্থের ভাব আছে কি অপরের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা আছে তাহা তত নহে। বাল্যকালে সামান্য সামান্য চুরি বোধ হয় আমাদিগের মধ্যে ৯৯ জনে করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাতে কি তাঁহারা জীবনে অধঃপাতে গিয়াছেন? আম চুরি, কুল চুরি, পেয়ারা চুরি, ফুল চুরি—অর্থাৎ না বলিয়া লইলেই যদি চুরি করা হয় তবে ৯৯ কেন ১০০ জন এই অপরাধে অপরাধী। অবশ্য আমি এই কথা বলিতেছি না যে এই সমস্ত উপেক্ষা করিতে হইবে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে এইরূপ 'না বলিয়া পরের দ্রব্য নেওয়াকে' ভীষণ 'চুরি' নামে অভিহিত করিয়া ও সেই বালককে 'চোর' নামে অভিহিত করিয়া তাহাকে যে পরিমাণ নির্য্যাতন করা হইয়া থাকে, তাহা সকল সময়ে সঙ্গত হয় না। অপরাধকে ঘৃণা করা কর্ত্তব্য কিন্তু অপরাধীকে ঘৃণা করিলে তাহার অপরাধের সংশোধন হয় না। "তুমি চোর, তুমি কাহারও সহিত মিশিও না, তোমার সহিত কেহ কথা কহিবে না, তোমাকে জেলে দিব" ইত্যাদি তিরস্কারে বালক মানসিক কষ্ট পায়, আর শিক্ষকের প্রতি বিরক্ত হয়। সস্নেহে তাহার দোষ বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর যাহাতে সে সেরূপ না করে সে বিষয়েও সাবধান করিয়া দিতে হইবে। বালক যে কার্য্যই করুক না কেন মিথ্যা কথাই হউক, চুরিই হউক বা অন্য কোন অপরাধই হউক, তাহার মনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বিচার করিতে হইবে। তবে যেখানে এরূপ দেখা যায় যে, বালক নিষেধসত্ত্বেও আবার চুরি করিতেছে, অপরের দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চুরুট কিনিয়া খাইতেছে বা অন্য কোন অপকর্ম্ম করিতেছে, সেখানে বেতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহাতে না সারিলে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে। তবে কথা এই যে বালক—বালক, এই

বিবেচনায় তাহার সকল অপরাধই তত গুরুতর বলিয়া মনে করা উচিত নহে।

বালকেরা মারামারি করিতে ভালবাসে। অন্যের উপর আধিপত্য করিবার একটা ইচ্ছা যেন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। একে অন্যের সহিত মারামারি করিয়া তাহাদের মধ্যে কে বড়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতেছে—এরূপ ব্যাপারে বাধা না দেওয়াই যুক্তি। ইহাতে বালকেরা নিজের শক্তির পরিমাণ করিতে শিক্ষা করে, অন্যকে দমন করিয়া নিজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা করে। এরূপ শিক্ষা ও চেষ্টা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে দেখিতে হইবে যে একটা বড় ছেলে একটী ছোট ছেলের উপর অত্যাচার না করে; আর এরূপ মারামারিতে একে অন্যের বিশেষরূপ শারীরিক অনিষ্ট করিতে চেষ্টা না করে। প্রতিযোগিতা লইয়াই সংসার। সুতরাং বাল্যে মানসিকজ্ঞানে ও শারীরিক বলে যাহাতে বালকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে সে বিষয়ে বরং উৎসাহই দিতে হইবে। অন্যায় আচরণ দেখিলে অবশ্য তাহা তৎক্ষণাৎ নিবারণ করা উচিত। পিছন হইতে আসিয়া ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওয়া, পশ্চাৎ হইতে লাঠি মারিয়া পলায়ন করা, অন্ধকারে ঢিল মারা প্রভৃতি কাপুরুষের কাজ;—এরূপ ব্যবহার কঠোর শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে।

চিমটী কাটা, চুল ধরিয়া টানা, এক জনের কাপড়ের সহিত অপরের কাপড় অজ্ঞাতসারে বাঁধিয়া দেওয়া, বসিবার আসনের উপর কাদা বা কালি দিয়া রাখা, দেওয়ালে নাম বা কুকথা লেখা প্রভৃতি দুষ্ট বালকের লক্ষণ। এ সকল প্রথমে মিষ্ট বাক্য দ্বারা ছাড়াইতে চেষ্টা করিবে। না পারিলে বেত। অনেক বালক অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিয়া থাকে। প্রায়ই নীচ পরিবারের ছেলে অথবা 'সঙ্গ-দোষে-নষ্ট' ভাল পরিবারের ছেলেকে এই দোষে দোষী হইতে দেখা যায়। নীচ-

পরিবারের ছেলেদের এই অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা বাল্যকাল হইতেই স্বভাবগত হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদিগের এই অভ্যাস অল্প চেষ্টায় ছাড়াইতে পারা যাইবে না। তবে প্রথম হইতেই শাসন করিতে হইবে। সে সকল যে ভদ্রোচিত ভাষা নয় তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। এ সকল দোষে বেত মারা অন্যায় ; কিন্তু যদি অনেক দিনের চেষ্টাতেও না সারে তবে অন্যান্য বালকের কল্যাণের জন্য এইরূপ বালকের নাম কাটিয়া দিতে হইবে। অশিক্ষিত বা অভদ্র পরিবারের ছেলেদিগকে লইয়া নানারূপ বিপদে পড়িতে হয়। একটা কুকুরের লেজ কাটিয়া দিল, না হয়ত, একটা কাক ধরিয়া তাহার ডানা ছিঁড়িয়া ফেলিল, না হয়ত, একটা গরুর লেজে খেজুরের ডাল বাঁধিয়া দিল, কি একটা বিড়াল জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিল। এই সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া অন্যান্য বালকদিগেরও মতিগতি মন্দ হইয়া উঠে। নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবিধানে, বালকের প্রতিও কিঞ্চিৎ তদ্রূপ আচরণ না করিলে, সে বুঝিতে পারিবে না। গায় কাটা ফুটিলে কেমন ব্যথা লাগে, তাহা প্রকৃত কার্য্যের দ্বারা কিঞ্চিৎ বুঝাইয়া দিয়া, তাহাকে গরুর লেজে কাঁটা বাধার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে।

যদি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া কোন প্রকারে একটী বালককে সর্ব্ব বিষয়ে সচ্চরিত্র করিয়া তুলিতে পারা যায় তবে তাহার দৃষ্টান্তে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র, সম্পূর্ণ না হউক, অনেক পরিমাণে যে সংশোধিত হইয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সৎ দৃষ্টান্তের নিস্তব্ধ শাসন সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বর যুক্ত শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ।

(৬) মানসিক বা দৈহিক অপূর্ণতা।—যে বালক স্বভাবতঃ একটু নির্ব্বুদ্ধি, তাহাকে একটু বেশী যত্ন করিতে হইবে, তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে। যে বালকের চক্ষুর দৃষ্টি দূরে যায় না, তাহাকে বোর্ডের নিকটে বসাইতে হইবে। যাহার শ্রবণশক্তি কিছু

কম, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইতে হইবে। এইরূপ যাহাকে যেরূপ সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহাকে সেইরূপ সাহায্যই করিতে হইবে। শিক্ষক এক বৃহৎ পরিবারের পিতা স্বরূপ। পিতা মাতা যেমন তাঁহাদিগের বিকলাঙ্গ সন্তানের প্রতি অধিকতর স্নেহশীল হইয়া থাকেন, শিক্ষককেও সেইরূপ বিকলাঙ্গ ছাত্রদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৭) শাস্তির ব্যবস্থা।—বিদ্যালয়ের দণ্ড বিধিতে এখন শাস্তি দানেরনিম্নলিখিত ধারা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—(১) চক্ষু চালনা বা ভ্রূকুটী (২) তিরস্কার (৩) ঠাট্টা বা বিদ্রূপ (৪) ভিন্ন স্থানে বসান (৫) মাটীতে বসান (৬) বিদ্যালয়ের ছুটীর পর আবদ্ধ করা (৭) পরিমাণের অধিক কার্য্য করিতে দেওয়া (৮) খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া (৯) অন্য বালকের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া (১০) চুল ধরিয়া টানা (১১) কাণ মলিয়া দেওয়া (১২) কিল মারা (১৩) ঘুঁসি মারা (১৪) চপেটাঘাত করা (১৫) মাটীতে বা বেঞ্চে দাঁড়া করান (১৬) হাঁটু গাড়িয়া (নীল ডাউন) বসান (১৭) চেয়ারে বসার মত করিয়া বসান (১৮) বেঞ্চ বা টেবিলের নীচে মাথা রাখিয়া দাঁড়া করিয়া রাখা (১৯) এক ঠেঙ্গে হয়ে দাঁড়ান (২০) গাধার টুপি মাথায় দেওয়ান (২১) চৌদ্দ পোয়া (দুই পা সম্পূর্ণরূপ ফাঁক করিয়া) হইয়া দাঁড়ান (২২) দুই হাতে দুই কাণ ধরিয়া দাঁড়ান (২৩) ডন করার মত অবস্থায় মাটীতে পড়িয়া থাকা (২৪) বেত মারা (২৫) জরিমানা করা (২৬) কিছু দিনের জন্য বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়া (২৭) বিদ্যালয় হইতে একেবারে বিতাড়িত করা। কোন দেশের দণ্ডবিধি আইনেও বোধ হয় শাস্তির এত ধারা নাই। গল্প শুনিয়াছি যে পূর্ব্বে নাকি এ সকল অপেক্ষা আরও অনেক ভয়ানক ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। গায় বিছুটী (ছুতরা) নামক লতার পাতা ঘসিয়া দেওয়া হইত, কাণে

তোতা (চিমটে) লাগান হইত।—চৌদ্দ পোয়া, হইয়া দুই হাতে দুই ইঁট ধরিয়া, সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইত। পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঘরের আড়ার সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইত! মাথা নীচের দিকে ঝুলিত, এই অবস্থায়, পাছার কাপড় তুলিয়া বেত মারা হইত!! পাঠশালায় তামাক খাইবার জন্য আগুনের হাঁড়ি থাকিত; তাহাতে চিমটা পোড়াইয়া, বা উত্তপ্ত কলিকা দ্বারা, পাছায় পিঠে বা গালে দাগ দিয়া দেওয়া হইত!!!

এরূপ একদল লোক আছেন যাঁহারা প্রত্যেক নূতন বিধির বিপক্ষ। তাঁহারা সমস্ত পুরাতন বিধিকেই সর্ব্বকালে উত্তম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে সেই পুরাতন বিধিও এক সময় নূতন ছিল, আবার এই নূতন বিধিও সময়ে পুরাতন হইবে। নূতন পুরাতনের কথা নহে, কার্য্য দেখিয়া ফলাফল বিচার করিতে হইবে। বেত মারা প্রথার যাঁহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে, বেত বন্ধ করিলেই ছেলের লেখাপড়াও বন্ধ হইবে। কিন্তু ফলে কি হইয়াছে, তাহাই দেখা যাউক। দিন দিন ত শাস্তি দানের ধারা কমিয়াই যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে না কমিতেছে? অবশ্য কেবল যে শাস্তিদানের ধারা কমিয়া গিয়াছে বলিয়াই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহা আমি বলি না। তবে শাস্তির প্রথা অনেক পরিমাণে উঠাইয়া দিয়াও যে কোন ক্ষতি হয় নাই, ইহাই আমার বলার উদ্দেশ্য।

ভাল ভাল স্কুল হইতে শাস্তি দানের প্রথা ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। যে সমস্ত শাস্তির প্রথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল কতকগুলি গোমুর্খ পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরিচালিত পল্লী গ্রামের পাঠশালাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 'চক্ষু পরিচালনার' দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বালকের দিকে এক বার তেজ প্রকাশক দৃষ্টিতে চাহিলেই সে মাটী

হইয়া যাইবে। কিন্তু শিক্ষকের নিজের এরূপ তেজ চাই। এ তেজ লাভ করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যক—বিদ্যা আর চরিত্র।

সময় সময় তিরস্কার করার আবশ্যক হয় বটে কিন্তু যে শিক্ষক সকল সময় ও সকল বিষয়েই তিরস্কার করেন, তাঁহার তিরস্কারে কোন ফল হয় না। একটু কথা বলিলেই তিরস্কার, একটু নড়িলেই তিরস্কার, হাই তুলিলেই তিরস্কার, পুস্তক লইতে দেরি হইলেই তিরস্কার, এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে তিরস্কার করিলে ইহাই বালকগণের বিশ্বাস জন্মে যে শিক্ষকের স্বভাবই চীৎকার করা। তিরস্কার কেন, সকল শাস্তিদানেরই এই নিয়ম, খুব হিসাব করিয়া কৃপণের মত ব্যয় করিতে হইবে। যে সকল রোগ স্বভাবের উপর নির্ভর করিলে আপনিই সারিয়া যায়, তাহার জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই। কেবল একটু সাবধান থাকিতে হয়। কঠিন রোগে ঔষধের ব্যবস্থা আবশ্যক বটে।

ঠাট্টা বিদ্রূপের দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সাধিত হয় না। বালকের মনে এরূপ আঘাত লাগে, আর সে এরূপ অপমানিত মনে করে যে শিক্ষকের প্রতি তাহার একটা ঘৃণা জন্মিয়া যায়। ভিন্ন স্থানে বা নাটীতে বসানও অপমানজনক। তবে ঠাট্টা বিদ্রূপের মত তত অনিষ্টজনক নহে। আর এক কথা, ছোট ছোট বালকদিগকে এরূপ শাস্তি দেওয়ায় কোন ফল নাই; কারণ তাহাদের মান অপমানের কোনরূপ জ্ঞান নাই। বড় বড় বালকেরা অপমান বুঝিতে পারে। এ শাস্তি তাহাদের জন্যই প্রশস্ত। কিন্তু খুব সাবধান—অপমানে বালকেরা সময় সময় এতদূর মানসিক কষ্ট পায় যে, তাহাতে তাহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে। অন্যের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ও খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে, ছোট ছোট বালকগণের উপকার হয়। যখন খুব দুষ্টামী করে বা অন্যায় রূপে মারামারি করে বা কাহার কোন অনিষ্ট করে তখন এই শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। গাধার টুপী মাথায় পরান

সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। ছোট ছেলেদের ইহাতে বড় অপমান বোধ হয় না, কিন্তু বড় ছেলেরা বড়ই অপমানিত মনে করে।

পাঠে অবহেলা করিলে বা বাড়ী হইতে নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিয়া না আসিলে বিদ্যালয়ে ছুটীর পর কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার দ্বারা সেই কাজ করাইয়া লওয়া উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু একজন শিক্ষককে সেই বালকের সঙ্গে আবদ্ধ হইয়া থাকা দরকার। স্কুলের দ্বারবানের উপর ভার দিয়া চলিয়া গেলে কোনই ফল হয় না। বাড়ী হইতে অতিরিক্ত পাঠাভ্যাস করিয়া আনিতে দেওয়ার প্রথাও উত্তম। কিন্তু সেই অতিরিক্তের পরিমাণ যেন আবার অতিরিক্ত না হয় অর্থাৎ বালক যাহা সম্ভবতঃ পারিবে সেই পরিমাণ পাঠই দিতে হইবে। "কাল বাড়ী হইতে ৪৯টী অঙ্ক কসিয়া আনিবে" এইরূপ আদেশের কোন ফল নাই। বালক ৩টী অঙ্ক কসিতেও চেষ্টা করিবে না, কারণ সে জানে যে সে ৪৯ অঙ্ক কিছুতেই কসিতে পারিবেনা। সকল বিষয়েই খুব হিসাবী হওয়া কর্ত্তব্য।

অনেকক্ষণ দাড়া করিয়া রাখা, হাঁটু গাড়িয়া বসান, চৌদ্দ পোয়া করান প্রভৃতি শাস্তি, স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। বিচক্ষণ শিক্ষকেরা এ সকল প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। চুল ধরিয়া টানা, কাণ মলিয়া দেওয়া, চপেটাঘাত প্রভৃতি শাস্তিও উঠিয়া গিয়াছে। কারণ ইহাতে তেমন বিশেষ শাস্তি হয় না। একটু চুল ধরিয়া টানিলে কি একটা ছোট করিয়া চড় মারিলে বালকদের কিছুই হইল না। যদি অপমান করার উদ্দেশ্যে এই সকলের ব্যবস্থা হয়, তবে সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট ছোট বালকদের মান অপমান বোধ নাই। আর বড় বড় বালকদিগকেও কিছু কাণ মলা, চপেটাঘাত করা সঙ্গত হয় না। শারীরিক শাস্তি দিবার উদ্দেশ্য বেদনা দেওয়া বটে, কিন্তু একটু চুল ধরিয়া টানিলে বা ছোট করিয়া কিল মারিলে কিছুই ব্যথা পায় না। আবার যদি জোরে চপেটাঘাত কি কিল মারা যায় তবে বালকের মৃত্যু পর্য্যন্তও

ঘটিতে পারে। আর এরূপ ঘটিতেও শুনা গিয়াছে। সুতরাং এরূপ শাস্তি বর্জ্জনীয়। শারীরিক দণ্ড বিধানের উত্তম প্রথা বেত মারা। হাতে ভিন্ন অন্য স্থানে বেত মারিতে নাই।

যখন বেত মারিবে, তখন বেশ জোরে দুখা লাগাইয়া দিবে। যাহাকে মারিবে সে বালক যেন বুঝিতে পারে যে ইহার নাম শাস্তি, আর অন্য বালকেরাও যেন বুঝিতে পারে যে এই কার্য্যের এই ফল। কিন্তু এইরূপ বেত মারিবার আবশ্যকতা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। লেখা পড়ায় অমনোযোগিতা বা অপারগতার জন্য বেত মারা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষরূপ চরিত্র সংশোধনের নিমিত্তই বেতের ব্যবহার আবশ্যক। এইরূপ বেতমারা প্রকাশ্যে কি গোপনে হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মত-ভেদ আছে। আমাদিগের মতে প্রকাশ্যে ও গোপনে দুইই আবশ্যক। দৃষ্টান্ত—শিক্ষককে বা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপমান করিলে তাহাকে প্রকাশ্যে বেত মারা উচিত, কিন্তু অশ্লীল ব্যবহার করিলে তাহাকে গোপনে বেত মারা উচিত, কারণ সে অশ্লীল ব্যাপার প্রচার হইলে এই কুফল হয় যে, যে সকল বালক সেই সমস্ত অশ্লীল ব্যবহার জানিত না তাহারাও কৌতূহল পরবশ হইয়া গোপনে সে সকল শিখিতে চেষ্টা করিবে।

জরিমানা করার উদ্দেশ্য অভিভাবককে শাস্তি দেওয়া বা বিষয় বিশেষে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করা। বালক দেরিতে আসিলে, অনুপস্থিত হইলে, বেতন দিতে দেরি করিলে বা সময় মত পাঠ্য পুস্তকাদি সংগ্রহ না করিলে জরিমানা করা যাইতে পারে। কারণ এ সকল বালকের অভিভাবকের ত্রুটী। কোন বালক কুসঙ্গে মিশিয়াছে, কি কুকাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এরূপ অবস্থায়, আবশ্যক হইলে জরিমানা করিয়া অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে অভিভাবকের সহিত শিক্ষকের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হয়

সেখানে জরিমানা করিবার আবশ্যক নাই বরং সমস্ত কথা অভিভাবকের গোচর করিতে পারিলেই অধিকতর উপকার হইবে।

মদ খাওয়া, গাঁজা খাওয়া, বেশ্যাসক্ত হওয়া, পরস্ত্রীকে অপমান করা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তি। তবে যদি বুঝা যায় যে কুসঙ্গ পরিত্যাগ করাইলে ভাল হইতে পারে, তবে দুই একবার চেষ্টা করা উচিত। কথা এই যে বালককে ভাল করিবার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াও যখন কোন ফল হইবে না তখন অন্যান্য বালকের উপকারার্থে, দুই একটী বালকের মমতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শাস্তি বিধানে শিক্ষককে নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ হইতে হইবে। সম্পাদকের পুত্র কি নিজের শ্যালকের জন্য যেন শাস্তির ভিন্ন বিধান না হয়। তবে এক রকমের অপরাধের জন্য, সকল সময়ে এক রকম শাস্তির বিধান যুক্তিসঙ্গত নয়। বালকের বয়স ও শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহারা সাধারণতঃ ভাল ছেলে, তাহারা কোন অপরাধ করিলে, অল্প শাস্তিতেই কাজ হইবে। কিন্তু সেই অপরাধে, অতি দুষ্ট বালককে একটু বেশী শাস্তি দিতে হইবে। বালকের নৈতিক অবস্থা, মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্দেশ্য, আর যে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া সে সেই কার্য্য করিয়াছে সেই প্রলোভনের বিষয়ও, শাস্তি বিধানে বিশেষ রূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল হইলে বালকেরা নিজকে সংযত করিতে পারে না। শাস্তি বিধানে বালকের এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার কথা মনে করিতে হইবে। মন্দ কার্য্যের প্রলোভন হইতে বালকগণকে যতই দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল।

মন্দ কার্য্য না করিবার জন্যই শাস্তি দিতে হইবে, কিন্তু 'ভাল কার্য্য কেন করে না' বলিয়া শাস্তি দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। শাস্তির ভয়ে ভাল কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু যেই শাস্তির ভয় যাইবে, সেও ভাল

কার্য্য হইতে বিরত হইবে। মন্দকার্য্য করিয়া বালক যদি প্রকৃতই অনুতপ্ত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি না দিলে বা অবস্থানুসারে কিঞ্চিৎ কম দিলেও চলিবে। যে বালক কোন সত্য গোপন না করিয়া সমস্ত অপরাধ সরল মনে স্বীকার করে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিলেই ভাল হয়। হাসিয়া হাসিয়া কি খুব রাগ করিয়া শাস্তি দিলে কোন ফল হয় না। শাস্তি বিধানে, শাস্তিদাতাকে খুব ধীর, স্থির ও গম্ভীর হইতে হইবে। শাস্তি দানের যে মুখ্য ছুইটী উদ্দেশ্য—অপরাধীকে সংশোধন করা ও এই দৃষ্টান্তে অন্য বালককে সেই অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা—তাহাই যাহাতে সাধিত হয়, শাস্তি দানে সেই কথাই মনে রাখিতে হইবে। বেশী শাস্তি দিলে বালকেরা ধাড়ী হইয়া যায়, আর শাস্তিকে বড় ভয় করে না। সুতরাং যত কম শাস্তি দেওয়া যায় ততই ভাল। এক সঙ্গে শ্রেণীর সমস্ত বালককে শাস্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহাতে তাহারা আমোদ মনে করে। খুব রাগের সময় শাস্তি দিতে নাই, আর বালক যে মুহূর্ত্তে কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, ঠিক সেই দণ্ডেই তাহাকে শাস্তি দিতে নাই। শিক্ষকের নিজের মন খুব শান্ত হওয়া আবশ্যক আর বালকের মনও খুব শান্ত হওয়া আবশ্যক। মন শান্ত না হইলে কিরূপ অপরাধে কিরূপ শাস্তি বিধান আবশ্যক শিক্ষক তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন না। আর বালকের মন শান্ত না হইলে সেও তাহার অপরাধ বুঝিতে পারিবে না। শাস্তি বিধানের কিছু পরে বালককে ডাকিয়া স্নেহের সহিত তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিতে হইবে ও তাহাকে শাস্তি দিতে হইয়াছে বলিয়া যে শিক্ষকও দুঃখিত, এ ভাব প্রকাশ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ভাল ভাল কতকগুলি বালককে সমস্ত বালকের চরিত্র সংশোধনের ভার দিলে, অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

বালকদিগের সঙ্গে যদি বেশ আত্মীয়তা হইয়া যায়, যদি তাহারা

শিক্ষককে নিজের পিতা মাতার মত ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, তবে শিক্ষকের অতি সামান্য অভিমানেই তাহারা মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে। অন্য কোনই শাস্তির আবশ্যক হইবে না।

শাস্তি বিধান বিষয়ে আদালতের নজীর:—আজ কাল বালকগণের শাস্তি বিধান লইয়া সময় সময় ঘটনা আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া থাকে। কাজেই সে বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বিবেচনায় কয়েকটী মোকদ্দমার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পিতা মাতার ও শিক্ষকের অধিকার—সন্তানের শাসনার্থ, তাহাদিগকে শাস্তি-দানে পিতা মাতার অধিকার আছে। পুরাতন রোমক শাসনে, এই অধিকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল না। পিতা মাতা পুত্রকন্যার জীবন বিনাশ পর্য্যন্ত করিতে অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজের আইনে, এই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিলাতের জজ ফিলড্ সাহেব এক মোকদ্দমায় (হাট্ সাহেব বঃ হেইলীবার্গ কলেজ অধ্যক্ষগণ) এইরূপ রায় দিয়াছেন "পিতা মাতা সন্তানের দোষ সংশোধনের নিমিত্ত যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত রূপে প্রহার করিতে পারেন ও আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়াও রাখিতে পারেন।" শিক্ষকের অধিকার সম্বন্ধে অন্য আর এক মোকদ্দমায় (ফ্লিয়ারী বঃ বুথ) এইরূপ রায় প্রকাশিত হয় "পিতা মাতার যে সন্তানকে শাস্তি অধিকার আছে, সে বিষয়ে আইনে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে আর বহুকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ বিষয়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, পিতা মাতা সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় স্পষ্টত ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, শিক্ষকের হস্তে শাস্তি দানের ভারও প্রদান করিয়া থাকেন।" তবে যদি শিক্ষকের সহিত লিখিত কোনরূপ চুক্তি থাকে (অর্থাৎ শাস্তি দিতে পারিবে কি পারিবে না) তবে সে কথা ভিন্ন।

১৮৯৯ সনে "বালকগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ বিষয়ক আইন" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার একটী ধারায় এইরূপ লিখিত আছে "পিতা মাতা শিক্ষক বা অভিভাবকের শাস্তিদানের যে ন্যায্য অধিকার আছে, এই আইন সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতেছে না।" শাস্তি সঙ্গত ও পরিমিত হওয়া আবশ্যক। পরিমিত শাস্তির একটা সূত্র নির্দ্ধারণ করা কঠিন। অবস্থা বিশেষে পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। এক মোকদ্দমায় (রাণী বঃ হপ্লী) জজ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"ইংলণ্ডের আইন অনুসারে

পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক, সঙ্গত ও পরিমিত শাস্তি দান করিতে পারেন। কিন্তু যদি কোনরূপ ক্রোধের তৃপ্তি সাধনার্থ শাস্তি দান করা হয়, অথবা শাস্তি বালকের সহন শক্তির বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে সেরূপ শাস্তি আইন বিরুদ্ধ। আর যদি এই শাস্তি দ্বারা বালকের কোন অঙ্গের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সেই শাস্তিদাতা আইন অনুসারে দোষী। আর যদি বালকের মৃত্যু ঘটে, তবে শাস্তি দাতা নরহত্যার জন্য অভিযুক্ত হইবেন।" আমেরিকার ষ্টেট্ রিপোর্টে, শাস্তি বিধান বিষয়ক প্রস্তাবের এক অংশে এইরূপ লিখিত আছে:—"শাস্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত ও পরিমিত কি অপরিমিত তাহা বিশেষ বিশেষ ঘটনা দৃষ্টে বিচার করিতে হইবে। শাস্তিদান যে অসঙ্গত হইয়াছে তাহা বাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে, কারণ শিক্ষক তাঁহার কর্ত্তব্য বোধে উপযুক্ত শাস্তিই দিয়াছেন, ইহাই বিশ্বাস করা বিচারকের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত। বালক বেদনা বোধ করিয়াছে বা তাহার চর্ম্মে প্রহারের দাগ বসিয়াছে বলিয়াই যে সেই শাস্তিকে নিষ্ঠুর মনে করা হইবে, তাহা ঠিক নয়।"

শাস্তি দানের স্থান ও কাল।—এক বালক ছুটীর পর বিদ্যালয়ের বাহিরে পথের উপর সেই স্কুলেরই অন্য বালককে ধরিয়া প্রহার করে। শেষোক্ত বালক পরদিন শিক্ষকের নিকট নালিশ করায়, শিক্ষক প্রথমোক্ত বালককে শাস্তি প্রদান করেন। এই শাস্তিপ্রাপ্ত বালকের মাতা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাউথহ্যাম-টনের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করেন। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ রায় দেন—"বিদ্যালয়ের বহির্ভাগে পথের উপরে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, আর যে ঘটনার সহিত বিদ্যালয়ের কার্য্যের কোন সংশ্রব নাই, এরূপ ঘটনার বিচার ও তাহা উপলক্ষ করিয়া শাস্তিদান করিবার অধিকার শিক্ষকের নাই।" শিক্ষক এই বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করেন। জজ লরেন্স্ শিক্ষকের সাপক্ষে নিষ্পত্তি করিয়া এইরূপ রায় দেন:—"শিক্ষকের অধিকারের একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে আমার মতে বিদ্যালয়ের বহির্ভাগেও শিক্ষকের অধিকার আছে; অন্ততঃ পক্ষে বিদ্যালয় হইতে বাড়ী যাইবার সময় বা বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে আসিবার সময় যে তাঁহার অধিকার আছে তাহা নিশ্চয় বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ যখন এই ক্ষেত্রে এক বিদ্যালয়েরই দুই বালক সংসৃষ্ট তখন শিক্ষককে দোষী সাব্যস্ত করা নিম্ন আদালতের ঠিক হয় নাই।" এই মোকদ্দমায় অপর জজ কলিন্স্ সাহেব আবার এইরূপ মত প্রকাশ করেন:—"আমারও সেইমত......। একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না যে বালক বিদ্যালয়ের সীমা পার হইলেই সে শিক্ষকের শাসন হইতে মুক্ত হইল। যতক্ষণ বালক

বিদ্যালয়ে থাকে, ততক্ষণ সে পড়া শুনায় ব্যাপৃত থাকে। তাহার নৈতিক চরিত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। চরিত্রের ক্রিয়া খেলার মাঠে বা পথে ঘাটেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি শিক্ষকের অধিকার কেবল বিদ্যালয় গৃহের চার প্রাচীরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তবে শিক্ষকের উপর বালকের চরিত্র সংগঠনের কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যখন শিক্ষাবিভাগের আইনে, শিক্ষককে বালকের চরিত্র বিষয়েও দায়ী করা হইয়াছে তখন শিক্ষকের অধিকার, প্রাচীরের বহির্ভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্বীকার করিতে হইবে। তবে এই দেখিতে হইবে যে শিক্ষক যেন শিক্ষাবিভাগ নির্দ্দিষ্ট শাস্তি বিধানের নিয়মাদির উল্লঙ্ঘন না করেন।" এই সমস্ত বিচার দৃষ্টে ইহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, বালক যে সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত, সে সকল সময়েই শিক্ষকের শাসনাধীন।

কে শাস্তিদান করিতে পারে?—বাসিংষ্টোক নগরে "কুইনস্ গ্রামার স্কুল" নামক বিদ্যালয়ের এক বালক খেলার মাঠে অবাধ্যতা (বিদ্যালয়ের নিয়ম বিরুদ্ধ) প্রকাশ করে। বিদ্যালয়ের মনিটার (সর্দ্দার ছাত্র) তাহাকে শাস্তি প্রদান করে। শাস্তি প্রাপ্ত বালকের পিতা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। তখন উক্ত ব্যক্তি হাইকোর্টে মোসন করে। হাইকোর্টের জজেরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ত তলব করায় ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত কৈফিয়ত দেন :—"কুইন্‌স্ গ্রামার স্কুলে "সর্দ্দার ছাত্র" নিযুক্ত করা ও তাহাকে শাসন বিষয়ে ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়ম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্কুলের হেড্ মাষ্টার যে প্রতিবাদীকে সর্দ্দার ছাত্র নিযুক্ত করিয়া তাহার হস্তে শাসনের কিছু কিছু ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হেড্ মাষ্টারের সাক্ষ্যে প্রকাশ। এই মোকদ্দমার ঘটনা হেড্-মাষ্টার অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাঁহার ধারণা এই যে, সর্দ্দার ছাত্র ন্যায়সঙ্গতরূপেই বাদীকে শাস্তি দিয়াছে। তারপর প্রহারের পরিমাণ বিষয়ে ডাক্তার যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে প্রহার যদিও খুব কঠিন রকমের হইয়াছিল, কিন্তু মাত্রায় অধিক হয় নাই। উভয় পক্ষের সাক্ষীর বিবরণ শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি (১) বাদী বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষী (২) বাদীকে যে উক্ত নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদীও সেই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিল (৩) প্রতিবাদী যে হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক নিযুক্ত সর্দ্দার ছাত্ররূপে ও বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে শাস্তি প্রদান করিয়াছে তাহাও বাদী অবগত ছিল (৪) বাদীর ও ডাক্তারের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে শাস্তি পরিমাণের অতিরিক্ত হয় নাই। সুতরাং আমরা দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছি।

হাই কোর্টের জজেরা ম্যাজিষ্ট্রের কৈফিয়ত শুনিয়া মোসন অগ্রাহ্য করেন ও লাশ নামক একজন জজ উক্ত বিচারে এইরূপমন্তব্য প্রকাশ করেন :—"আবহমান কাল হইতে সর্ব্বত্রই শিক্ষকগণ বালকদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। তবে এস্থলে সেই শাস্তি এক জন সর্দ্দার ছাত্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই কি ইহাকে বেআইনী মনে করিতে হইবে?" অপর জজ মেলর সাহেবের মন্তব্য এইরূপ :—"তাহা হইলে এরূপ এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, গৃহে পিতা মাতা ভিন্ন বালককে শাস্তি দিবার অধিকার আর কাহারও নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শাস্তি দিতে পারেন না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিতে পারে না, বা নিজ হস্তেও তাঁহার সমস্ত কার্য্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং এস্থলে সর্দ্দার ছাত্র কর্ত্তৃক পরিমিত শাস্তি প্রদান অবৈধ হয় নাই।"

শাস্তি দানের ধারা—রাসেল কৃত "ক্রাইমস্" (অপরাধ) নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে :—"যদি পিতা মাতা বা শিক্ষক, দোষ শোধনার্থ বালককে শাস্তি দান করেন, তবে এরূপ পদার্থের দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন যে, যেন তাহার দ্বারা দোষ সংশোধন সম্ভব পর হয়। অস্ত্রাদির আঘাতে বালককে বিকলাঙ্গ করা না হয়। আর শাস্তি দিবার সময় বালকের বয়স ও শক্তিও যেন বিশেষ রূপ বিবেচনা করা হয়।" বিদ্যালয়ের শাস্তি দানে যত প্রকার অস্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে বেতই উত্তম। শরীরের সকল স্থান অপেক্ষা হস্ত তলই বেত্রাঘাতের নিরাপদ স্থান। মস্তক, কর্ণ, বক্ষ, উদর প্রভৃতি স্থানে বেত্র প্রহার কখন কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে। এক মোকদ্দমায় হস্তে বেত্রাঘাতের নিমিত্ত, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এক স্কুলের হেড মাষ্টারকে দোষী সাব্যস্ত করেন (গার্ডেনার বঃ বাইগ্রেভ)। ঐ মোকদ্দমার আপিল হয়। আপিলে জজ ম্যাথু সাহেব এইরূপ রায় দেন :—"হেডমাষ্টার দোষী নহেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিতেছেন যে "হস্তে বেত্রাঘাত করিলেও বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই।' হস্তে বেত্রাঘাত করাতে বিপদ ঘটিতে পারিত ইহাই মনে করিয়া হেডমাষ্টারকে দোষী সাব্যস্ত করা সঙ্গত হয় নাই।" তবে এই সমস্ত বিচারে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে আবশ্যক হইলে বালকের বয়স ও শক্তি বুঝিয়া তাহার হস্ততলে পরিমিত রূপ বেত্রাঘাত করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেও যদি কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটে, তবে সে জন্য শিক্ষক দায়ী।

বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা—এই শাস্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। বালকের ভবিষ্যৎ একবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং এই শাস্তি বিধানের সময় বিশেষ বিবেচনার

আবশ্যক। যদি বিভাগের কর্তৃপক্ষ কোন ছাত্রকে বহিষ্কৃত করিয়াই দেন, তবে বালকের অভিভাবক আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। উক্ত বালককে বহিষ্কৃত না করিলে যে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল, তাহা প্রতিবাদীকে প্রমাণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে (হাটি বঃ হেইলাবারী কলেজের অধ্যক্ষগণ) মোকদ্দমার উল্লেখ করা গিয়াছে তাহাতে হাটি নামক এক বালককে, কলেজের অধ্যক্ষগণ বহিষ্কৃত করিয়া দেন। হাটের পিতা অধ্যক্ষগণের নামে, হাটের প্রতি অত্যাচার, অবমাননা ও কলঙ্কারোপণ প্রভৃতির অভিযোগ করিয়া ড্যামেজের দাবীতে নালিশ করেন। আর ঐ নালিশের আর একটা হেতু এই লেখা হইয়াছিল যে, হাটের পিতার সঙ্গে (হাটের শিক্ষাবাবত) বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের যে ধর্ম্মতঃ চুক্তি ছিল, সে চুক্তিও ভঙ্গ হইয়াছে। কারণ অধ্যক্ষগণ বালকের শিক্ষার ভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। জজ ফিল্ড সাহেব সে মোকদ্দমায় যে রায় দেন তাহাতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে, নিম্ন লিখিত রূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন:—"অধ্যক্ষগণ যে মর্ম্মে জবাব দিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে এইরূপ বুঝিতে পারা যায় যে এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের নিজ বিবেচনা পরিচালনা সঙ্গত হয় নাই। একজন শিক্ষক—তিনি যত বিদ্বান্ বা বহুদর্শী হউন না কেন—কোন বালককে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক মনে করিয়াই যদি তদ্রূপ কার্য্য করিতে অধিকারী হয়েন—তবে সেরূপ ক্ষমতা বিশেষ বিপদজনক সন্দেহ নাই। একটী বালকের ভবিষ্যৎ একবারে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ভয়ানক কথা। এরূপ ক্ষমতা পরিচালনের অনুমতি কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। অবশ্য সময় সময় সাধারণের মঙ্গল কল্পে এরূপ কার্য্যের আবশ্যক হইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার কোনই আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।" 'ফিটস জর্জ বার্ণড বঃ নর্থ কোট' মোকদ্দমায় এই বিষয় লইয়া তর্ক হয়। জজ সাহেব তাহাতে এই রূপ মত প্রকাশ করেন:— "যদি কোন বালকের চরিত্র এরূপ মন্দ হইয়া পড়ে যে তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখিলে অন্যান্য বালকের অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে, তবে হেড্ মাষ্টার বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন।—এক্ষমতা তাঁহার একরূপ আছে। কিন্তু এই ক্ষমতা পরিচালনায় কেবল নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। এই ক্ষমতার অপব্যবহার প্রমাণিত হইলে, প্রতিবাদীর পক্ষ দুর্ব্বল স্বীকার করিতে হইবে।"

আবদ্ধ করিয়া রাখা।—এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোন বালককে বাটীতে পাঠ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করেন। কিন্তু উক্ত বালকের মাতা বালককে গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করায় সে পড়িতে সময় পায় না। বালক উক্ত পাঠ দিতে না পারায়, শিক্ষক

তাহাকে বিদ্যালয়ের ছুটীর পর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। মাতা শিক্ষকের বিরুদ্ধে বে-আইনী কয়েদের অভিযোগ করিয়া নালিশ করেন। এই মোকদ্দমায় (হানটার বঃ জনসন) নিম্ন আদালত প্রতিবাদীর সাপক্ষে বিচার করেন। মাতা উক্ত বিচারের বিরুদ্ধে আপিল করায় জজ ম্যাথু এইরূপ রায় দেন ঃ—"আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে এই মোকদ্দমা বিদ্যালয়ের সাধারণ শাসন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বিচার করা চলিবে। আর বিশেষ বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করাও বিদ্যালয়ের বালকগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরূপ হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষাবিভাগের নিয়মাবলীতে আছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বালকেরা বাড়ীতে কোনরূপ পাঠাভ্যাস করিবে না। এরূপ অবস্থায় বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়াই শিক্ষকের পক্ষে অবৈধ হইয়াছে সুতরাং মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পুনর্বিচারের জন্য পাঠান হইল।"

ছুটীর পর আবদ্ধ করিয়া রাখা যে আইন বিরুদ্ধ, তাহা কিন্তু এ মোকদ্দমায় স্থিরীকৃত হইল না। কেবল মাত্র ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া অবৈধ।

গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা।—শিক্ষক নিজে কখনও চীৎকার করিবেন না বা খুব বড় করিয়া কথা কহিবেন না। বিনা আবশ্যকেও বেশী কথা বলিবেন না। অতি শান্ত ভাবে সাধারণ কথনের স্বরে মিষ্ট করিয়া কথা বলিতে অভ্যাস করিবেন। তাঁহা হইলে বালকদিগের গোলযোগ নিবারণে কৃতকার্য্য হইবেন। বালকেরা স্বভাবতই গোল করিতে ভালবাসে। অবসর পাইলেই গোল করিবে। তাহারা যাহাতে এই অবসর না পায় সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকেরা যদি কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তবে আর তাহারা গোল করিতে পারিবে না। গোল নিবারণ করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। বালকদিগের চঞ্চল প্রকৃতি—সর্ব্বদা কোন না কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকাই তাহাদের স্বভাব। শিক্ষক কোন কার্য্যে নিযুক্ত না রাখিলে, কাজেই তাহারা গোলমালরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবে। "যাহারা গোল করিবে তাহাদের নাম শ্লেটে লিখিয়া রাখিবে" এই শাসনে গোল থামান যায় না; বরং সময় সময় বৃদ্ধি পায়।

নিজ শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া অন্য শ্রেণীতে যাওয়া, ঘন ঘন বাহিরে যাওয়া, শ্রেণীর মধ্যেও ঘন ঘন স্থান পরিবর্ত্তন করা প্রভৃতি কার্য্যেও গোলমাল উপস্থিত হয়। এ সমস্ত অভ্যাস শাসনের দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। অনেকে এক সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর করাতে বা যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে ব্যতীত অন্য কেহ অনাহূত উত্তর দিতে গিয়াও অনেক সময় গোলমালের সৃষ্টি করে। এইরূপ গোল নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে :—

(ক) শিক্ষক যখন পড়াইবেন, তখন বালকেরা মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিবে। নিজেরা কোন কথা বলিবেনা।

(খ) শিক্ষক সাধারণতঃ কোন বিশেষ বালককে উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না। প্রশ্ন সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবেন; কে তাহার উত্তর দিবে, প্রথমে তাহার নির্দ্দেশ করিবার আবশ্যকতা নাই। যে সকল বালক সেই প্রশ্নের উত্তর জানে তাহারা হাত বাড়াইয়া দিবে। (চিত্রের অনুরূপ) যাহারা জানেনা তাহারা হাত উঠাইবে না।
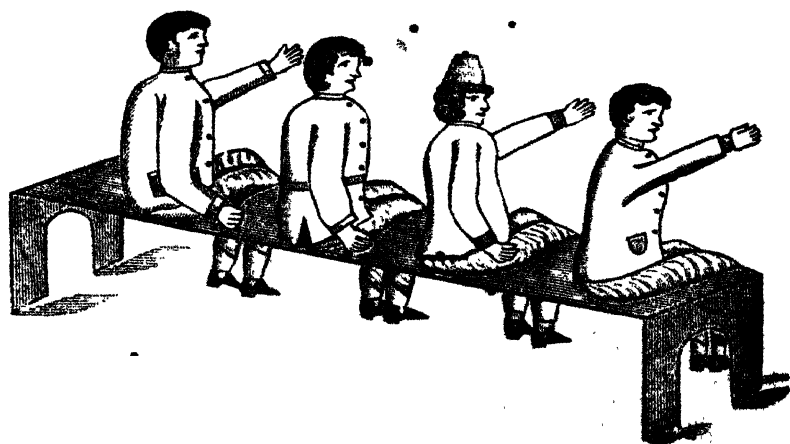
১০ম চিত্র—প্রশ্নের উত্তরে হাত বাড়ান।

শিক্ষক এই সকল ছাত্রের মধ্য হইতে, যাহাকে ইচ্ছা, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিবেন। এই শেষোক্ত বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে দাঁড়াইলেই অন্য সকল বালক হাত সরাইয়া লইবে। কিন্তু যদি সে বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুল করে, তবে অন্যান্য বালকেরা পুনরায় হাত বাহির করিবে। শিক্ষক আবার তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিবেন। এরূপ করাতে আর এক উপকার এই হইবে যে, কত বালক উক্ত প্রশ্নের উত্তর জানে, তাহার একটা পরিচয় হইবে। তবে কোন কোন দুষ্ট বালক না জানিয়াও হাত বাহির করিতে পারে, আর কোন কোন নির্ব্বোধ বালক একটা ভুল উত্তরকে শুদ্ধ মনে করিয়াও হাত বাহির করিতে পারে। কিন্তু বিচক্ষণ শিক্ষক এরূপ দুষ্ট ও নির্ব্বোধ বালকগণকে সহজেই চিনিতে পারিবেন।

(গ) আর এক কথা—প্রায় সমস্ত কার্য্যই ড্রিলের মত করিয়া করাইতে পারিলে উত্তম হয়। গোলমালের সম্ভাবনা খুবই কম হয়। পড়াইবার সময় বিলাতী স্কুল সমূহে এইরূপ আদেশ হইয়া থাকে:— "পুস্তক লও, (বালকেরা পুস্তক হাতে করিল) অমুক পৃষ্ঠা খোল (বালকেরা সেই পৃষ্ঠা খুলিল), অমুকে দাঁড়াইয়া পড় (সে পড়িতে আরম্ভ করিল), পুস্তক বন্ধ কর (সকলে এক সঙ্গে বন্ধ করিল), পুস্তক যথাস্থানে রাখিয়া দাও (তাহারা রাখিয়া দিল)" এইরূপ শ্লেট লও, লেখ, খাতা লও, একে একে বাড়ী যাও প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ড্রিলের প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নিজের ইচ্ছামত, গোলমাল করিয়া পুস্তক কি শ্লেট লইয়া টানাটানি করেনা ও এইরূপ একটা গোলমালে বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি করিতে পারেনা।

বাঙ্গালা দেশের যে সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষকেরা এই প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই ইহার সাপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। কাহারও কাহারও বিরুদ্ধ মত আছে বটে, কিন্তু

তাঁহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। আমাদিগের বিশ্বাস, ইহাতে বালকগণের আজ্ঞা-প্রতিপালন-বৃত্তির অনুশীলন হইবে, তাহারা শৃঙ্খলা শিখিতে পারিবে, আর গোলমালও যথেষ্ট কমিয়া যাইবে। অনেক শিক্ষক গোল থামাইতে গিয়া নিজেই অধিকতর গোল করিয়া বসেন। টেবিলের উপর ঘন ঘন বেতের আঘাত বা কিল, চাপড় প্রভৃতির দ্বারা গোলমালের একটু আশু নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হয় না। চোখের শাসনই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শাসন। যে দিকে একটু গোল হইতেছে, শিক্ষক কেবল মাত্র একবার সেই দিকে চাহিবেন, অমনি সব গোল থামিয়া যাইবে। কিন্তু সকল শিক্ষকের দ্বারা এ কার্য্য চলিবে না। যাহারা নিজে গম্ভীর প্রকৃতি, বেশী বাজে কথা বলেন না, শ্রেণীতে বসিয়াই কার্য্য আরম্ভ করেন, বাজে গল্প করেন না সেইরূপ শিক্ষকই চোখের শাসনের উপযুক্ত।

আলস্য ও অমনোযোগিতা।—উপদেশের দ্বারা বালকগণের কর্ত্তব্য প্রতিপালনের ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কার্য্য আদায় করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরাত অনেক উপদেশ বাক্য শুনিয়াছি, আর অনেক উপদেশ দিয়াও থাকি, কিন্তু আমরা কয়জনে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ? এইরূপ ভবিষ্যতের ছবি দেখাইয়াও তাহাদিগকে কার্য্য বিশেষে অনুরক্ত বা কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। "তোমার পিতা মরিয়া গেলে কি করিয়া খাইবে? অতএব লেখা পড়া কর। উপর শ্রেণীতে উঠিতে পারিবেনা, অতএব মনোযোগ দিয়া পড়; লেখা পড়া না শিখিলে ঘোঁড়ার ঘাস কাটিতে হইবে" ইত্যাদি বাক্যেরও কোন ফল নাই। আমাদিগের কয়জনের এরূপ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে? আমরা ভবিষ্যতের ফলাফল জানিয়া শুনিয়া কত সময়ই না বৃথা কালক্ষেপণ করিয়া থাকি। সরলমতি বালক, সে ভবিষ্যতের বুঝে কি? সে উপস্থিত সুখ লইয়া ব্যস্ত। তাহার জন্য

তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধ্যাপনাকে তাহার মনোমত করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। অধ্যাপনায় যাহাতে সে সুখ পায় তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলে সে আপনা আপনিই সেই সুখের দিকে ধাবিত হইবে। সময় সময় একটু কড়া শাসন আবশ্যক হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মিষ্টি কথা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা যে পরিমাণে ফলোদয় হয়, কড়া শাসনে তাহা হয় না।

আলস্য, অমনোযোগিতা ও অবাধ্যতা পরিত্যাগ করাইতে পারিলে বালকদিগকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করা যাইতে পারে। আলস্য দুই রকমে উৎপন্ন হইয়া থাকে—এক শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ, আর এক অভ্যাস বশতঃ। শারীরিক দুর্ব্বলতার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার চিকিৎসা করা কি উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের কার্য্য। কিন্তু যদি অভ্যাস বশতঃ আলস্য জন্মিয়া থাকে তবে তাহার প্রতিকারের ভার অনেক পরিমাণে শিক্ষকের হাতে। অলস বালককে একদিনে অন্য বালকের মত পরিশ্রমী করিতে চেষ্টা করিতে নাই। অন্য বালককে যখন চারিটী অঙ্ক কষিয়া আনিতে বলিবে, অলস বালককে তখন একটী অঙ্ক কষিতে দিবে। এইরূপ একটু একটু করিয়া মাত্রা বাড়াইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হইলে একটু কঠোর শাসন করাও মন্দ নহে। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক সে বালকের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর ধীরে ধীরে তাহাকে পরিশ্রমী করিয়া তুলিতে হইবে। অমনোযোগিতার প্রধান কারণ পাঠ্য বিষয়ে সুখানুভব করিতে না পারা। জ্যামিতির ৩।৪টী প্রতিজ্ঞা পড়া হইয়া গিয়াছে এমন সময় এক বালক ভর্ত্তি হইল। সে জ্যামিতির সামান্য সংজ্ঞা মাত্র শিখিয়া আসিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পঞ্চম প্রতিজ্ঞা পড়াইতে গেলে, অন্যান্য বালকেরা যেরূপ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিবে, নূতন বালকটী তাহা করিবে না। এক বিষয়ে এরূপ অমনোযোগী হইলে, সে ধীরে

ধীরে অন্যান্য বিষয়েও তদ্রূপ হইয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় হয় নূতন ছেলে ভর্ত্তি করা উচিত নয়, না হয় তাহার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা উচিত। শিক্ষক নিজের বিশ্রাম ঘণ্টায় বা বিদ্যালয়ের পরে ১৫।২০ মিনিট তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া তাহাকে শ্রেণীর সমান করিয়া লইতে পারেন। শরীর দুর্ব্বল হইলেও অমনোযোগী হইয়া থাকে—তাহার প্রতিকার অভিভাবকের হাতে। যে বালক খেলায় কি অন্য কোন কাজে অনুরক্ত, তাহাকেও আমরা অমনোযোগী বলিয়া থাকি। কিন্তু সেটী ভুল। যে অমনোযোগী সে সব কার্য্যেই অমনোযোগী। যে খেলায় খুব মনোযোগ দেয়, তাহার যে মনোযোগের শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয়। খেলায় সে সুখ পায়—পড়ায় পায় না। পড়ার কার্য্য খেলার মত সুখকর করিতে পারিলে সে আপনিই সে দিকে মনোনিবেশ করিবে। অবাধ্যতা নানাকারণে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার প্রধান। একটু স্নেহ কি সহানুভূতির ভাব না দেখাইয়া, যদি দিন রাত কেবল কঠোর শাসনের অধীন রাখিতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকেরা অবাধ্য হইয়া পড়ে। বালকদিগকে পরিমিত স্বাধীনতা দিতে হইবে—আর সেই স্বাধীনতা বিপথে না যায় ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মুখভঙ্গী করিয়া ঠাট্টা করা, কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা, সামান্য ত্রুটীতেই শাস্তি দেওয়া, অপরিমিত পাঠাভ্যাস করিতে দেওয়া প্রভৃতি কারণে বালকেরা অবাধ্য হইয়া উঠে। এ সমস্তের প্রতিকার শিক্ষকের হাতে। তবে এক রকমের বালক আছে, যাহারা স্বভাবতই বদমেজাজের। যে বালক ইতর-সমাজে বাস করে বা যে নীচ পরিবারে পালিত সে বালক সেই সমাজ বা পরিবারের দোষে বিরূপ চরিত্র হইয়া থাকে। এ সকল বালক শিক্ষককে উপেক্ষা করিতেই ভালবাসে ও তাহাতে গৌরব মনে করে। ইহাদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালকেরাও শিক্ষকের আজ্ঞা অমান্য

করিতে শিক্ষা করে। ইহাদের শাসনে, অগ্রে বেত পরে অর্দ্ধচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। প্রথমে অবশ্য অন্যান্য উপায়ে ইহাদিগের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বেত ও অর্দ্ধচন্দ্র শেষ উপায়। অনেক বালক বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া রওনা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে না আসিয়া কোন খেলার আড্ডায় প্রবেশ করে ও চারিটা বাজিলে বাড়ী ফিরিয়া যায়। কেহ কেহ বিদ্যালয় হইতে পলায়নও করিয়া থাকে। এরূপ উপস্থিত হইবার বা পলায়ণ করিবার কারণ দুইটী (১) পাঠ অভ্যাস না করা (২) কোনরূপ খেলায় বা খেয়ালে অনুরক্ত হওয়া। বালকের অনুপস্থিতের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অভিভাবককে জানাইতে হইবে। তারপর প্রতি বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনুপস্থিতের জরিমানা করিয়াও এ বিষয়ে অভি-ভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে। যদি পাঠাভ্যাস না করাই কারণ হয়, তবে পাঠাভ্যাস করিতে তাহার কি কি অভাব বা অভিযোগ আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। পাঠ অধিক হইলে কমাইয়া দিতে হইবে, পুস্তকের অভাব থাকিলে পূরণ করিতে হইবে, পাঠ কঠিন হইলে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। যদি কোন খেলায় মত্ত হইয়া থাকে তবে সে খেলা (উত্তম হইলে) বিদ্যালয়ে প্রচলন করিতে হইবে। কিন্তু যদি কোন বদ্ খেলা বা খেয়ালে আসক্ত হইয়া থাকে তবে অভিভাবকের সাহায্যে তাহা ছাড়াইতে হইবে। অনেক বালক তাসের আড্ডায়, তামাকের আড্ডায়, এমন কি ইহা অপেক্ষা বড় বড় বদ্ খেয়ালের আড্ডায় মিশিয়া মাটী হইয়া যায়। অভিভাবকের অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। তবে শিক্ষকেরও যে কিছু দোষ নাই তাহা বলি না। শিক্ষককেও সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে, কে কি করে না করে। বদ্ খেয়ালে মিশিলে, তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা সময় সময় বড়ই

কঠিন হইয়া পড়ে। এ সকল ক্ষেত্রে উত্তমরূপ বেতের ব্যবস্থা (অভিভাবকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া) করাই সঙ্গত। বাচনিক উপদেশে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না।

কর্ম্মচারী শাসন।—সহকারী শিক্ষক ও চাকর চাকরাণীদিগকেও সময় সময় শাসন করিতে হয়। সহকারী শিক্ষকদিগের সহিত কখনও অভদ্র ব্যবহার করিবেনা। তুমি তাঁহাদের মান রক্ষা নাকরিলে তাঁহারা তোমার সম্মান রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন না। বাহিরে কোন শিক্ষকের নিন্দা কি অপারগতার বিষয় গল্প করিবে না। বিশেষ, তুমি তাঁহাদিগের যতই সন্মান করিবে, তাঁহাদের প্রতি ততই বালকদের ভক্তি বৃদ্ধিপাইবে। যদি তুমি নিজে সময় নিষ্ঠ হও, পরিশ্রমী হও, তাঁহারাও সময় নিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করিবেন। যে সকল শিক্ষকের বিদ্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসা অথবা শ্রেণীতে বসিয়া নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, প্রধান শিক্ষক তাঁহাদের বিশেষ তত্ত্বাবধান করিবেন। যে শিক্ষক সাধারণতঃ বিলম্বে আসিয়া থাকেন ঘণ্টা বাজিবা মাত্র তাহার শ্রেণীর সম্মুখেগিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে আর তিনি আসিলেই গম্ভীরভাবে এই কথা বলিলেই চলিবে যে, আজ আপনার "এত মিনিট বিলম্ব হইয়াছে।" এইরূপ শ্রেণীর বালকদিগের সম্মুখে ২।৩ দিন তাঁহাকে একটু লজ্জা দিলেই সম্ভবতঃ তাঁহার দোষ সংশোধিত হইবে। যিনি শ্রেণীতে নিদ্রা যান, তাঁহার শ্রেণীতে ঘন ঘন যাওয়া উচিত। যদি তাঁহার মনে থাকে যে প্রধান শিক্ষক যে কোন সময় আসিয়া পড়িতে পারেন, তবে বোধ হয় তিনি আর ঘুমাইতে সাহস করিবেন না। কিন্তু যে সকল শিক্ষক নিতান্তই নির্লজ্জ ও কর্ত্তব্য জ্ঞান রহিত, তাঁহাদিগকে গোপনে ডাকিয়া একটু সাবধান করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষকেরা প্রত্যহ নোট লিখিয়া আনেন কি না, পড়াইবার জন্য সকল প্রকারে প্রস্তুত হইয়া আসেন কিনা, বালকদিগের লিখিত উত্তর সমূহ উত্তমরূপ শুদ্ধ করিয়া সময় মত ফিরাইয়া দেন কিনা, শিক্ষার জন্য উপযুক্ত

রূপ পরিশ্রম করেন কি না, প্রধান শিক্ষক প্রতিনিয়তই এ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাঁহার নিকট হইতে সে সমস্ত পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিতে হইবে। ইহাতে যদি কেহ অসন্তুষ্ট হন, তবে তাহার আর উপায় নাই। চাকর চাকরাণী তাহাদিগের কর্ত্তব্য রীতিমত করে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে। প্রত্যহ প্রত্যেক কার্য্যের সন্ধান করা সম্ভব পর নয় কিন্তু যদি প্রতিদিন একটা করিয়া কার্য্যেরও তত্ত্বাবধান করা যায় তবে সকলেই তাহাদিগের নিজ নিজ কার্য্য সম্বন্ধে সাবধান হইবে।

সভ্যব্যবহার।—শিক্ষক শ্রেণীতে আসিলে সকল বালক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। যত বার তিনি শ্রেণীতে আসিবেন তত বারই এরূপ করিতে হইবে না। কেবল সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাতেই এরূপ করা নিয়ম। পাঠের সময় বালকদিগকে বাহিরে যাইতে দিবেনা; প্রত্যেক পাঠের শেষে ছোট ছোট বালকদিগকে ৫।৬ মিনিটের জন্য ছুটী দেওয়া মন্দ নহে। বড় ছেলেদিগের সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক বিদ্যালয়েই অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। এই বিশ্রাম ঘণ্টার সময় প্রথম তিন ঘণ্টা ও শেষ দুই ঘণ্টার মধ্য সময়। ত্রিভঙ্গি হইয়া বসা, বেঞ্চের উপর পা তুলিয়া বসা, ডেস্কের উপর মাথা নোয়াইয়া থাকা, এক জনের গায়ের উপরে আর এক জন হেলিয়া থাকা প্রভৃতি অসভ্য আচরণ নিবারণ করিতে যত্ন করিবে। যে সমস্ত আজ্ঞা প্রতিপালন বালকের পক্ষে অসাধ্য, এরূপ আজ্ঞা দিবে না। বালকদিগকে খুব বিশ্বাস করিবে; অবিশ্বাস করিলে অধিকতর অবিশ্বাসী হইতে চেষ্টা করিবে। বালকদিগের নিকট আমোদপ্রদ গল্প করিতে পার কিন্তু তাহাদের সহিত কোনরূপ রহস্য করিবেনা বা অশ্লীল বাক্যালাপ করিবেনা। কাহারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব বা অপরিমিত অনুরাগ দেখাইবেনা। সকলকে সমানভাবে স্নেহ করিবে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যদি

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হয় তবে তাহার ভাষা সরল, ভাব বিশদ ও সংখ্যা স্বল্প হওয়া উচিত। নিয়মগুলি উত্তমরূপ প্রতিপালিত হয় কি না সে বিষয় অনুসন্ধান করিবে। কেহ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম করিলে তখনই তাহার প্রতিবিধান করিবে। অনেক শিক্ষকের অভ্যাস আছে প্রত্যহই নুতম নিয়ম প্রচার করা বা নূতন আদেশ প্রচার করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া। আদেশের সংখ্যা অধিক হইয়া গেলে বালকদিগেরও সমস্ত পালন করিতে মনে থাকেনা, আর শিক্ষকও তাঁহার সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয় কি না দেখিতে অবসর পাননা। এরূপ আদেশে সুফল না হইয়া বরং কুফলই হয়। বালকেরা মনে করে যে প্রত্যহ নূতন আদেশ শ্রবণই করিতে হয়, কিন্তু তাহা পালন না করিলেও চলে। কারণ পালন না করার দরুণ যে শাস্তি, তাহাত তাহাদিগের ভোগ করিতে হয় না।

পুরস্কার।—শিক্ষকের মুখ নিঃসৃত সামান্য দুই একটী উৎসাহ সূচক বাক্য বালকের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারে, শত ভর্ৎসনায় তাহা করিতে পারে না। নিরুৎসাহের কথা কখনই বলা উচিত নয়। "তুমি মূর্খ, তোমার কিছুই হবেনা তোমার মাথা নাই, তুমি ঘাস কাট গিয়া, কেন মিছে চেষ্টা কর" ইত্যাদি বাক্যে অনেক বালকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বালককে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিতে হইবে। অঙ্ক কষিতে পারিতেছেনা—শিখাইয়া দাও; তার পর এমন সহজ অঙ্ক দাও যে সে বেশ কষিতে পারে। সমস্ত শুদ্ধ না হইলেও যে সামান্য অংশ শুদ্ধ হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া বল "এ পর্য্যন্ত বেশ হইয়াছে, এই খানে অল্প ভুল হইয়াছে; তা আর একবার চেষ্টা করিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।" ছবি আঁকিতে দিয়াছ, হয়তঃ কিছুই হইতেছেনা, কিন্তু নিরুৎসাহ করিও না, "হাঁ এই রকম করিয়াই করিতে হয়, তোমার বুদ্ধি আছে, আর ২।৩ বার চেষ্টা করিলেই চমৎকার হইবে" এইরূপে উৎসাহিত করিবে। তবে 'এইটা এইরকমে করিতে হয়, এইটা এই

রকমে করিতে হয়’ এই কথা বলিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে। রচনা করিতে দিয়াছ, অনেক ভুল করিয়াছে, গালি দিওনা। যে সমস্ত অংশ উত্তম হইয়াছে, তাহার সুখ্যাতি করিয়া অন্য অংশের ভুল দেখাইয়া দাও। কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেছে (প্রায়ই দুর্ব্বল বালক দিগকেই অধিক উৎসাহিত করিতে হয়) যে টুকু ঠিক হইতেছে, তাহাতেই “বা বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে,” এই সকল বাক্যে, তাহাকে উৎসাহিত করিয়া ভুল অংশ সংশোধন করিয়া দিবে. প্রত্যাহিক পাঠের সময় উপর নীচ করাইবার প্রথা আছে। এ প্রথার দোষ গুণ উভয়ই আছে। ইহাতে বালকগণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দোষ এই যে, বালকগণ প্রকৃত বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া কেবল উপরে যাইবার কৌশলই চিন্তা করে। যাহা হউক নিম্নশ্রেণীতে এ প্রথার দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। উপরের শ্রেণীতে অন্য প্রথার আচরণ করা যাইতে পারে। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু গৌর মোহন বসাক যখন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তখন তিনি এনট্রেন্স ক্লাসে প্রত্যহ তাহার খাতায় নিম্ন লিখিতরূপে বালকদিগের গুণাগুণের (সাঙ্কেতিক) চিহ্ন দিয়া রাখিতেন ;—

নম্বর	নাম	৩।৪।৮২ সাহিত্য	৩।৪।৮২ জ্যামিতি	৪।৪।৮২ পাটীগণিত	৪।৪।৮২ ব্যাকরণ
১	উপেন্দ্রলাল মজুমদার	উ		ম	ম
২	অতুলচন্দ্র দত্ত	উ	অ	ম	
৩	অন্নদাচরণ চৌধুরী		ম	উ	

উ = উত্তম, ম = মধ্যম, অ = অধম।

শ্রেণীতে অনেক বালক হইলে প্রত্যহ সকল বিষয়ে সকলকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভবপর নহে। কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বলিয়া, কাহারও ঘর মধ্যে মধ্যে খালি আছে। মাসের শেষে কে কয়টী উ অ ম পাইয়াছে ইহার হিসাব হইত। সকল বালকেই যাহাতে অধিক সংখ্যক উ পায় সে জন্য চেষ্টা করিত। গৌরমোহন বাবু এই প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার হাতে অনেক রত্ন ছাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কার দিয়াও অনেক সময়ে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা যায়। প্রতিযোগিতায় একটী পেন্‌সিল কি একখানা খাতা পাইলেই বালকেরা তাহাকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে। পরীক্ষার ফল দৃষ্টেও পুরস্কার দিবার রীতি আছে। কিন্তু প্রায় স্কুলেই ছাত্রসংখ্যা অনুসারে পুরস্কারের সংখ্যা অতি কম হইয়া থাকে। পুস্তকের দামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, তাহার সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য। পুরস্কারের সংখ্যা অতি অল্প হইলে, অনেক বালকেরই তাহার জন্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু সংখ্যা বেশী হইলে অনেকেই আশান্বিত হইয়া চেষ্টা করিতে থাকে। কোন স্বাভাবিক গুণের জন্য কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া উচিত নহে। একজনের গলার স্বর স্বভাবতই মিষ্ট। সে সেইজন্য গানের পুরস্কার পাইতে পারে না। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া বালকেরা যাহা শিক্ষা করে তাহার জন্যই তাহারা পুরস্কার পাইবে। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা ও যত্ন করিয়া গান অভ্যাস করিয়াছে, তাহার গলার স্বর অপেক্ষাকৃত মন্দ হইলেও সেই পুরস্কারের পাত্র। পাবনা জিলা স্কুলের একজন শিক্ষক (এখন তিনি মোক্তার) ২।৪টী গোলাপ ফুল, আম্র, কদলী কি কমলা লেবু দিয়া বালকগণকে এত উৎসাহিত করিতেন যে তাঁহার শিক্ষা কৌশল দেখিয়া সকলেই মোহিত হইতেন।

এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরস্কারের দ্বারা অভিভাবকেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তিরস্কার অপেক্ষা পুরস্কার অধিকতর ফলপ্রদ।

তিরস্কারে কষ্ট, পুরস্কারে আনন্দ। আমরা যে কার্য্যই করি না কেন তাহার মুখ্য উদ্দেশ্যই আনন্দ লাভ। সুতরাং সেই আনন্দ সম্মুখে ধারণ করিলে বালকগণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে যতদুর উৎসাহিত ও প্রলোভিত হইবে, শাস্তির ভয়ে তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণও হইবে কিনা সন্দেহ। একথাও আবার মনে রাখা কর্ত্তব্য যে অধিক সুখ্যাতি বা পুরস্কারে অনেক বালক আহ্লাদে ও গর্ব্বিত হইয়া অধঃপাতে যায়।

যেরূপ শাসনে বালকগণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, কার্য্যকুশল, মনোযোগী ও সচ্চরিত্র হয় সেইরূপ শাসনকেই সুশাসন বলে। শিক্ষাকার্য্য পরিচালনার পক্ষে এরূপ সুশাসন অত্যাবশ্যকীয়। শিক্ষকের শক্তির উপর সুশাসনের ফলাফল নির্ভর করে। শিক্ষক নিজে সুপণ্ডিত ও সচ্চরিত্র না হইলে শাসনে কোনরূপ ফলোদয় হইবে না। বিশেষতঃ সৎদৃষ্টান্তের নির্ব্বাক শাসন যেরূপ কার্য্যকরী, শত সহস্র গগণ ভেদী বক্তৃতা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। আর একটা কথা বলিয়াই আমরা এ পরিচ্ছেদ শেষ করিব। বিলাতের রগবী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক স্বনামধন্য আরনল্ড সাহেব একবার তাঁহার বিদ্যালয় হইতে বহু সংখ্যক ছাত্রকে বহিস্কৃত করিয়া দেন। ছাত্রেরা তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়াছিল ও সত্যের অপলাপ করিয়াছিল। বিদায় কালে তিনি ছাত্রগণকে ইহাই বলিয়া দিলেন যে "আমি ছাত্রগণের সংখ্যা চাইনা, চরিত্র চাই। ইহাতে আমার স্কুল শূন্য হইলেও আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও একবার তাঁহার মেট্রোপলিটান কালেজ হইতে অনেক বালককে অবাধ্যতার অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। উচ্চ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। ছাত্রসংখ্যা সংসৃষ্ট অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, সুশাসন চলা অসম্ভব। সুশাসনে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় বলিয়া কোন কোন শিক্ষকের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

তৃতীয় অধ্যায়।—সুশিক্ষাবিষয়ক।

সুশিক্ষা কাহাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। যে শিক্ষায় সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়, সেইরূপ শিক্ষাই যে সুশিক্ষা, তাহা স্বীকার করিতে আমাদের আর আপত্তি থাকিবেনা।

যেরূপ শিক্ষা লাভে আমরা সর্ব্বতোভাবে সুখসম্ভোগে সমর্থ হই তাহাই সুশিক্ষা। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক শান্তি সম্ভোগ করিতে পারি, কি উপায়ে সাংসারিক দুঃখ কষ্টাদি ও অভাবের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, কি উপায়ে পরিবার পরিজন বর্গ পালন করিতে পারি ইত্যাদি বিষয়ক কার্য্যকরী প্রণালী শিক্ষা করাই সুশিক্ষা।

তবে শিক্ষা দ্বারা ঐ সকল সুখ সম্ভোগের বিধান কত দূর সুসাধিত হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগের অবশ্যকরণীয় সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি

নির্ণয় করা আবশ্যক। এই কার্য্যনিচয়কে স্বাভাবিক পর্য্যায় ক্রমে এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে (১) আত্ম-সংরক্ষণ (২) জীবিকা-অর্জ্জন (৩) সন্তান প্রতিপালন (৪) রাজ্যশাসন ও সমাজের শক্তিবর্দ্ধন (৫) চিত্তরঞ্জন।

১। আত্মরক্ষার সদুপায় সকল স্বতঃই মানব মনে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। বালক ভূমিষ্ট হওয়ার পর প্রকৃতিই তাহার মনে আত্মরক্ষার জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব কি বস্তু দেখিলে, বিপদের আশঙ্কায় শিশু মাতৃ-কোলে লুকায়িত হইয়া থাকে। কিছু বড় হইলে, তাহারা বস্তুর গুণাগুণ জানিবার জন্য প্রত্যেক বস্তুই মুখে দিয়া থাকে। অথবা বস্তুটী কঠিন কি কোমল তাহা হাতের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকে। দ্রব্যাদির গুণাগুণ বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান বর্দ্ধন করিয়া আত্ম রক্ষার উপায় শিক্ষা করে।

যখন দাঁড়াইতে বা একটু হাঁটিতে শিখে তখন ছুটাছুটি করিয়া পেশী সমূহের দৃঢ়তা সম্পাদন করে। কিন্তু কেবল প্রকৃতির এইরূপ শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের বাঞ্ছিত ফললাভ হয়না। রোগ হইতে শরীরকে দূরে রাখা অথবা রোগ হইলে তাহার প্রতীকার করা, শরীরকে ব্যায়ামাদির দ্বারা দৃঢ়তর করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদির প্রতিপালন ও ব্যায়ামাদির অনুশীলন আবশ্যক। স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক নিয়মাদি ও কিরূপ ব্যায়ামের দ্বারা কোন পেশী কি পরিমাণ সবল হইয়া থাকে তাহার বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে আমরা নিজের শরীর রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। আর নিজের শরীর রক্ষা না হইলে কেহ বা অর্থোপার্জ্জন করিবে, কেহ বা সন্তান পালন করিবে, কেহবা আমোদ প্রমোদ ভোগ করিবে? এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রকারেরা "শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" বলিয়াছেন। আজকাল বিদ্যালয়ে নানাবিধ ব্যায়ামের বিধান হওয়াতে শারীরিক উন্নতির কথঞ্চিৎ সুব্যবস্থা হইয়াছে।

২। আত্মরক্ষার পরেই, জীবন রক্ষার্থ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় শিক্ষা করা আবশ্যক। কেবল লিখিতে পড়িতে বা দুই চারিটী অঙ্ক কসিতে শিখিলেই জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। কৃষি, শিল্প বিজ্ঞানের চর্চ্চাই অর্থোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। সেই জন্য বাল্যকালেই বালকগণকে নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কার্য্যে উৎসাহিত করা হইয়া থাকে। কাগজ কাটা, মাটীর পুতুল প্রস্তুত করা, কাঠি সাজান, বীজ সাজান প্রভৃতির দ্বারা কোনও বিশেষ শিল্পের অনুশীলন হয় না বটে কিন্তু শিল্পের অনুশীলন, যে লঘুহস্ততা ও সহজ অঙ্গুলী-সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে, কাগজ কাটা প্রভৃতির শিক্ষার দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে।

বিদ্যালয় সংলগ্ন উদ্যানে কার্য্য করাতে কৃষি বিষয়ে অনুরাগ জন্মে। স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষটী বড় হইয়া, ফলপুষ্পে শোভিত হইতে দেখিলে বালকের মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। আর বিদ্যালয়ে ধনী দরিদ্র সকলকেই এই সমস্ত কাজ করিতে দেখিলে, শারীরিক পরিশ্রম যে লজ্জা বা অপমান জনক কার্য্য নহে ইহাও তাহারা বুঝিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে আজকাল বিজ্ঞানাদির অনুশীলন হইয়া থাকে। কৃষি শিল্পের উন্নতি বিজ্ঞান শাস্ত্রালোচনা সাপেক্ষ।

চাকরীর দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে তাহা সত্য। বড় বড় চাকরী ভিন্ন সামান্য চাকরী দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন হইয়া থাকে, তাহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন। আর মানুষ সংখ্যা তুলনায়, চাকরীর সংখ্যাইবা কয়টী? তারপর সে চাকরীর অবস্থাও দিন দিন যেরূপ হইয়া পড়িতেছে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা পূর্ণিমায় রায় যদু নাথ রায় বাহাদুরের "শিক্ষা বিচার" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল:—এতদ্দেশীয় ধনবান ব্যক্তিগণ স্ব স্ব সন্তান দিগকে স্কুলে, কালেজে দিয়া থাকেন, তদ্দর্শনে সেই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া মধ্যবিত্ত ও সামান্য লোকেও স্বীয় তনয়গণকে ঐ সকল বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করেন। এই সকল স্কুল কালেজে যাদৃশ বিদ্যাউপার্জ্জন হয় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ওকালতী কর্ম্মের আয় যৎসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। হাইকোর্টের অধুনাতন যুবক উকীলদিগের কুকর্ম্ম সাফল্য ক

চিরব্যবহৃত লোমবর্জ্জিত চাপকান তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের যেরূপ পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমাবাজ বাঙ্গালা দেশ "ব্যবহারজীবি মহাশয়দিগের আর আহার দিতে পারিবে না বলিয়া" যে শয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, বিবেচনা করিলে ইহা কে না বুঝিতে পারিবে। দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর ও ওলাউঠার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব সত্বেও ডাক্তার বাবুদিগের যে দুর্দ্দশা, তাহাতে তাঁহাদিগের বিদ্যার অর্থোপার্জ্জনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। কেবল ইঞ্জিনিয়ার বাবুদের উদর এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অবাধে পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনেকে এক বিষয়ের প্রত্যাশী হইলে, যেরূপ দুরবস্থা হয়, অচিরাৎ এ ব্যবসায়ে সেই দশা ঘটিবে। এতদ্ভিন্ন স্কুল মাষ্টার ও কেরাণীদিগেরত দুর্দ্দশার কথাই নাই। তাঁহারা উপায়ান্তর রহিত বলিয়াই, মৃত্যুশয্যাশায়ী রোগীর ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া আছেন। ঈদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়াও যে আমরা ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি ও প্রচলিত প্রথা ছাড়িতে চাহিনা, ইহা অপেক্ষা অবিবেচনার কর্ম্ম কি হইতে পারে। যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সুখসেব্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, যদ্দারা সুখে কালাতিপাত হয় এবং যাহার অভাবে দেশের কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা নাই, এরূপ হিতকরী শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নব্যসম্প্রদায়ীয়া অবিবেচকের ন্যায়, একটু ইংরেজী শিখিয়া একুল ওকুল দুকুল হারাইয়া বসেন।

৩। পরিবার পরিজন প্রতিপালন করিতে হইবে ও সন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে। সাংসারিক সুখের ইহা প্রধান উপকরণ। কিন্তু যে সন্তান সন্ততির সুশিক্ষার উপর আমাদের পারিবারিক মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, যে সন্তানগণ ভবিষ্যৎ আশার স্থল, তাহাদের শিক্ষার নিমিত্ত আমরা কি ব্যবস্থা করিয়া থাকি। যেরূপ আহার দিলে বালকের শরীর সুস্থ ও সবল হইতে পারে, যেরূপ নীতিশিক্ষায় তাহাদিগের মানসিক বৃত্তিগুলি বিকশিত হইতে পারে, তাহা আমরা কয়জনে জানি? শারীরবিধান ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে অধিকার না জন্মাইলে, বালকের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। কি পিতা, কি মাতা, কি শিক্ষক সকলেই, এ বিষয়ে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। বাঙ্গালা দেশে বালিকা বয়স শেষ না হইতেই রমণিগণ মাতা হইয়া বসেন। যিনি নিজেই বয়সে ও জ্ঞানে বালিকা মাত্র,

যিনি সংসারে ভালমন্দ বিষয়ক জ্ঞানশূন্য, তিনি অপরকে শিখাইবেন কি? এই জন্য যে মাতৃশিক্ষার গুণে অন্যান্য দেশে মহৎলোকের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এদেশে হইবার নয়। কেবল বঙ্গ জননীর এক গুণ আছে—প্রতিনিয়ত ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পুত্র কন্যাগুলিকে সহজেই জড়ভরত করিয়া রাখিতে পারেন।

বালকেরা প্রকৃতি হইতে যে জ্ঞান ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার প্রতিবন্ধকতা না করাই উচিত। ভয়প্রদর্শন, উৎকোচ বা প্রশংসা দ্বারা সন্তানকে বশীভূত করিয়া মাতা স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ছেলের মনে যাহা হউক আর না হউক, কোন মতে কার্য্য উদ্ধার হইলেই হইল। কিন্তু ইহা চিন্তা করেন না যে, এ ব্যবহারে অকারণ শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং জুয়াচুরি ও স্বার্থ-পরতা অভ্যাস পাইয়া যায়। "সর্ব্বদা সত্য কহিবে, মিথ্যা কহিবে না, কহিলে মার খাইবে" এই বলিয়া শিক্ষা দেন। কিন্তু শিক্ষানন্তর মিথ্যা কথা কহিতে দেখিয়াও দণ্ড না করিলে প্রকারান্তরে যে মিথ্যাকথনের উপদেশ দেওয়া হয়, বোধ হয় ইহা তাঁহাদের মনে উদিত হয় না। মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক যে জ্ঞান তৃষ্ণা আছে তাহা উত্তেজিত করিতে পারি-লেই, শিশুরা অনায়াসে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে থাকে। পুরোবর্ত্তী জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞান না জন্মিতেই, দূরস্থ বস্তু জানাইবার চেষ্টা বৃথা। বালকেরা ইতস্ততঃ দেখিয়া শুনিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহা সমাপ্ত না হইতেই পুস্তক হাতে দেওয়া বিফল। পঞ্চমবর্ষ গত না হইতেই, পিতা ছেলেকে কাপড় পরাইয়া, একখানি বর্ণপরিচয় হাতে দিয়া, স্কুলে প্রেরণ করেন। এ দিকে ছেলে অবশ্যজ্ঞেয় বিষয় সকল কিছুই শিখে নাই, সে পথে যাইয়া যাহা কিছু দেখে তাহাই নূতন ভাবিয়া তাহার পিছু পিছু দৌড়িতে থাকে, অথবা তাহার অনুসন্ধিৎসায় একাগ্রচিত্তে হাঁকরিয়া থাকে। কেহ বা পাঠশালায় গমনপূর্ব্বক বহি

খানি খুলিয়া রাখিয়া, এদিকে ওদিকে চাহিতে থাকে। ওদিকে বিজ্ঞতম গুরু মহাশয়, "পড় পড়" বলিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। ছেলেও ভয়ে ভয়ে, রাস্তায় মন ও পুস্তকে দৃষ্টি রাখিয়া চমৎকার চাতুরী শিখিতে থাকে। ক্রমে এইরূপ কৌশল অভ্যস্ত হওয়াতে, অবশ্যজ্ঞেয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইয়া উঠে। সুতরাং বয়োবৃদ্ধ হইয়াও, নিতান্ত অজ্ঞ থাকিয়া যায় এবং স্বাভাবিক জ্ঞানোপার্জ্জনে পথ-ভ্রান্ত হইয়া চিরকালের মত অমনোযোগী হইয়া পড়ে। উর্ব্বরতা সম্পাদন না করিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যেমন অভিলষিত শস্যোৎপত্তি হয় না, তেমনি অসময়ে বিদ্যারম্ভ করিলেও ফলোদয় হয়না। "কিলিয়া কাঁটাল পাকান আর বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী উভয়ই তুল্য" (শিক্ষাবিচার)।

তবে এখন পূর্ব্ব পদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আর যাহাতে বালকগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে সেরূপ বিধান করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। আর এই উৎকৃষ্ট প্রণালীতে যাহাতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য সর্ব্বত্রই শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

৪। রাজ্য শাসন ও সমাজ সংস্কার, আমাদিগের অবশ্য করণীয় বিষয়। যে রাজ্যে বা সমাজে আমরা বসবাস করি, সে রাজ্য বা সমাজ উন্নত না হইলে আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যে সকল বিষয় আমাদের সাংসারিক সুখের অন্তরায়, তাহার উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক।

রাজ্যশাসন ও সমাজ সংস্করণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান ইতিহাস পাঠের দ্বারা লাভ করা যায়। পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে ইতিহাস লিখিত হইত তাহাতে কেবল রাজার নাম, যুদ্ধের বিবরণ, কতকগুলি সন তারিখ মাত্র থাকিত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালীতে রচিত গ্রন্থে "কিরূপে একজাতি অন্য

জাতি অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, কীদৃশগুণ প্রভাবে সেই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা মান্যগণ্য ও ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন, তদ্দেশ-বাসীদিগের তৎকালীন আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, প্রধান ও নিকৃষ্টদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, পণ্যদ্রব্য সমূহ একদেশ হইতে অন্যদেশে কি প্রকারে প্রেরিত হইত, কৃষি কার্য্যের প্রথা কিরূপ ছিল, দেশের শাসন কার্য্য কি প্রণালীতে সম্পন্ন হইত, কি কি উপায়ে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইত ও প্রচলিত হইয়াছিল, মনুষ্য কি অবস্থায় উপস্থিত হইলে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম্ম নিবারণের জন্য কি কি রাজ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই নিয়ম গুলিইবা কি পরিমাণে ফলপ্রদ হইয়াছিল," ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে প্রণালী অবলম্বন করিলে আমাদিগের সমাজ ও রাজ্য শাসন বিষয়ক সম্যক জ্ঞান জন্মিতে পারে শিক্ষাপ্রণালীতে এখনও তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। তবে পণ্ডিতগণ যখন আমাদিগের অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন সে অভাব দুর করিবার যে উপায় আবিষ্কার করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৫। আমোদে স্পৃহা মানব মনের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। তবে সাংসারিক নানাপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা না থাকিলে আমোদে মন ধাবিত হয় না। সেই জন্য প্রথমে শারীরিক, আর্থিক প্রভৃতি বিষয়ক সুখের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সঙ্গীত বিদ্যা, চিত্রবিদ্যা ও ভাস্করীয় বিদ্যা চিত্তরঞ্জনের প্রধান উপকরণ।

নিজের চিত্ত বিনোদনের জন্য গুণ গুণ করিয়া গান না করিয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি বোধ হয় খুব কমই আছেন। কিন্তু আমরা এত দিন পর্য্যন্ত এই প্রকৃতিগত একটা স্পৃহাকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। বিলাতী স্কুলে সঙ্গীতের আলোচনা, পাঠ্য তালিকাভুক্ত। কিন্তু আমরা অনেকেই সঙ্গীতকে দূষণীয়

বিদ্যা মনে করিয়া থাকি। পুত্র পিতার সাক্ষাতে, কি ছাত্র শিক্ষকের সাক্ষাতে, গান করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকে। বাড়ীতেও সঙ্গীতের চর্চ্চা অনেকে নীতি বিগর্হিত মনে করেন। এই সকল কারণে সঙ্গীত শাস্ত্র গণিকা গৃহে আশ্রয় লইয়াছে। স্বাভাবিক বৃত্তির বশীভূত হইয়া যে সকল সঙ্গীতাভিলাষী ব্যক্তিগণ এ বিদ্যার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া বারাঙ্গনালয়ে গমন করিয়া জীবনের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। চিত্র বিদ্যাকেও আমরা এতদিন যথেষ্ট হতাদর করিয়া আসিয়াছি। চিত্রাঙ্কনও একটা স্বাভাবিক স্পৃহা। ছোট ছোট ছেলেরা বিনা শিক্ষায় নানারূপ অঙ্কন ও গঠন করিতে পারে। চিত্তরঞ্জন ছাড়া, অঙ্কন বিদ্যা বিজ্ঞান আলোচনার প্রধান সহায়। সুতরাং এরূপ আবশ্যকীয় বিদ্যাকে অনাদর করিয়া বিশেষ অন্যায় করিয়াছি। আজ কাল পাঠশালার নিম্নশ্রেণী হইতে মেট্রিকিউলেশন শ্রেণী পর্য্যন্ত এই বিদ্যার আলোচনা হইতেছে।

সুশিক্ষা কাহাকে বলে, এখন আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। যে শিক্ষা দ্বারা উক্ত পঞ্চ বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতঃ সেই জ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা আমাদিগের পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনকে প্রচুর পরিমাণে সুখী করিতে পার তাহাকেই সুশিক্ষা কহে। কিন্তু এই পঞ্চ বিষয়ের অনুশীলন, প্রকারান্তরে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ফলমাত্র। সুতরাং সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সমবায় ও সম্যক অনুশীলনই সুশিক্ষা। এখন এই বৃত্তি সমূহের কিরূপে উন্মেষ হইতে পারে নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইতেছে :—

১। **শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন**।—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য—ইহা হিন্দু শাস্ত্রকার গণের উপদেশ। গৃহ ধর্ম্ম, সন্তান পালন ধর্ম্ম, অহিংসা ধর্ম্ম,

অর্থোপার্জ্জন ধর্ম্ম, ইত্যাদি হইতে মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত মনুষ্যের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমুদায়ই তাহার 'ধর্ম্ম'। যদি শরীর সুস্থ ও সবল না হইল, তবে সংসারের এই নানারূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কে সম্পন্ন করিবে? এইজন্য সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষা করিতে হইবে। শরীর কেবল রোগমুক্ত করিলে হইবে না, ভবিষ্যতে যাহাতেরোগ স্পর্শ করিতে না পারে তাহারও বিধান করিতে হইবে। ঋণ মুক্ত হইলে চলিবে না, ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় ঋণজালে জড়িত না হইতে হয়, তাহার প্রতি বিধানার্থ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ব্যায়ামাদির আবশ্যকতা। ব্যায়ামে শরীরের অস্থি, শিরা ও মাংসপেশী সমূহকে দৃঢ় ও উন্নত করিয়া, দেহ সবল করে। যেমন মূর্খের চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেও সে জ্ঞানের সুখ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সুস্থব্যক্তির দেহ রোগশূন্য হইলেও, সে শক্তি সঞ্চয়ের সুখ উপলব্ধি করিতে পারে না। যেমন মনের পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন, সেইরূপ দেহের পক্ষে শক্তি সঞ্চয়। দুইই আবশ্যক।

মনুষ্য দেহে ছোট বড় প্রায় ৪০০।৫০০ শত ভিন্ন ভিন্ন মাংসপেশী আছে। এই সমস্তগুলি পেশীরই বিশেষ অনুশীলন আবশ্যক হয় না। প্রধান প্রধান কতকগুলি পেশীর অনুশীলন হইলেই অপর গুলি তাহাদের সাহায্যে উন্নত হইয়া থাকে। পেশীগুলি সূত্রাকার মাংসের গুচ্ছ মাত্র। এক অস্থির সহিত অন্য অস্থি সংযুক্ত করিয়া রাখে। অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে পেশী গুলি আবশ্যক মত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। হাত মুখের নিকট আনিলে বাহুর উপরিভাগের (প্রগণ্ডের) এক অংশ ফুলিয়া উঠে। এই অংশের পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে এইরূপ ঘটে। এই পেশীকে দ্বিশির পেশী কহে, কারণ ইহা দুইটী শিরে বিভক্ত। এই পেশী দ্বিশির প্রান্ত ঊর্দ্ধে স্কন্ধ দেশের অস্থির সহিত ও অপর প্রান্ত বাহুর নিম্নার্দ্ধের (প্রকোষ্ঠের) অস্থির সহিত (কনুই এর নিকট) সংযুক্ত। স্কন্ধ ঝুলিয়া থাকিলে এই পেশী যার ইহা মত লম্বা

হয় ও সঙ্কুচিত হইলে ৪ ইঞ্চ হইয়া ফুলিয়া উঠে। সাধারণতঃ এইগুলি কূপের দড়ির মত মোটা। কার্য্যতঃও ইহারা দড়ির মত কার্য্য করে। বাহুর উর্দ্ধার্দ্ধের সহিত নিম্নার্দ্ধের সংযোগ করিয়া রাখাই দ্বিশির পেশীর কার্য্য। বাহুর উর্দ্ধার্দ্ধের নীচে, ঠিক দ্বিগুচ্ছের বিপরীত দিকে ত্রিশির পেশীর দ্বারাও বাহুর দুই অংশ আবদ্ধ আছে। দ্বিশির সঙ্কুচিত হইলে ত্রিশির প্রসারিত হয়, আর দ্বিশির প্রসারিত হইলে, ত্রিশির সঙ্কুচিত হইয়া কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠে। এইরূপ পাদ দ্বয়ের অংশ সমূহও নানারূপ পেশী দ্বারা আবদ্ধ। তন্মধ্যে যে পেশী গুলফ ও জঙ্ঘাকে আবদ্ধ করিয়া, জানুর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত, সেই পেশীই শরীরস্থ সমস্ত পেশীর মধ্যে বৃহৎ ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী ও বলশালী। এই পেশীর নাম বৃহৎ যবোদর পেশী। বুকেপীঠেও নানারূপ পেশী আছে। এই সমস্ত পেশীর বিধিমত সঞ্চালন দ্বারা আমরা তাহাদিগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারি। যখন পেশীর বলের উপরেই আমাদের অঙ্গ সঞ্চালনের বল নির্ভর করে, তখন সেই পেশীগুলির উন্নতি সাধনে সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীরে পেশীগুলি যেরূপ ভাবে বিন্যস্ত আছে, তাহা দৃষ্টেই আমরা পেশীর উন্নতি সম্বন্ধে, আমাদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি :—

(ক) প্রত্যেক পেশীর রীতিমত সঞ্চালন আবশ্যক। যে পেশীর কোনরূপ সঞ্চালন হয় না, সে পেশী শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনেক স্থূলকায় অলস ব্যক্তিকে দেখিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা বদন সন্নিধানে গ্রাসোত্তোলন ভিন্ন বাহুর অন্য ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের পেশী এত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় যে হস্ত সঙ্কুচিত করিলে, দ্বিশির আর ফুলিয়া উঠে না। ইহারা হাতের দ্বারা কোনরূপ ভারি পদার্থ তুলিতে সক্ষম হয় না। বাহুর রীতিমত সঞ্চালনে পেশী ফুলিয়া উঠে ও সবল হয়; যথা কর্ম্মকারের বাহুস্থ পেশী। যে সকল ব্যক্তি পাহাড়

পর্ব্বতে যাতায়াত করে তাহাদিগের বৃহৎ যবোদর পেশী সমধিক স্থূল ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। পেশী সঙ্কুচিত হইলে তথায় অনেক পরিমাণে রক্ত সঞ্চারিত হয়, আর পেশীর সঞ্চালনে ও প্রসারণে ইহার যে শক্তি ব্যয়িত হয়, বিশ্রামকালে ইহাতে তদপেক্ষা অধিক শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

(খ) বয়স, স্বাস্থ্য ও অভ্যাস বিবেচনায় অঙ্গ সঞ্চালনাদি করিতে হইবে। অতিরিক্ত সঞ্চালন হইলে পেশী সমূহ অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে ও তাহাদের স্বাভাবিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের শক্তি পর্য্যন্ত ক্ষণিকের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এরূপ সঞ্চালন বাঞ্ছনীয় নহে।

(গ পেশী সঙ্কোচনে আমরা রক্তস্থিত অম্লজান বায়ু গ্রহণ করিয়া তাহাতে অঙ্গার-অম্ল-বায়ু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ পরিত্যাগ করি। এই জন্য সঙ্কুচিত পেশী হইতে যে রক্ত নির্গত হয়, তাহা অপেক্ষা নিষ্ক্রিয় পেশী সমূহের রক্ত অনেক পরিমাণে নির্ম্মল। এইরূপ পেশী সঞ্চালনে অঙ্গারাম্ল বায়ুর বৃদ্ধি পায়। এই বায়ু আমরা সুঞ্চালন কালে, ও তৎপরে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া বহির্গত করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে—পেশী সমূহের ক্রিয়া কলাপের সহিত সঞ্জীবনী-রক্ত সঞ্চালনাদি ক্রিয়ার ও জীবন-বায়ু-প্রবাহী শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্রাদির বিশেষ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। ব্যায়ামের দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যকরী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। স্থির ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় একজন সুস্থকায় যুবক প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে, দ্রুত ভ্রমণে ২৫ বার আর দৌড়াইলে ৩৬।৩৭ বার পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ শ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। শয়ন অবস্থায় একজন সুস্থকায় ব্যক্তি নিশ্বাসের দ্বারা যে পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করেন, তাঁহাকে যদি আমরা ১ দ্বারা নির্দ্দেশ করি, তবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যে বায়ু

গৃহীত হয় তাহার পরিমাণ ১'৩, আর ঘণ্টায় ৪ মাইল করিয়া হাটিবার সময় যে বায়ু শ্বাসের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহার পরিমাণ ৫ কি ৬ দ্বারা সূচিত হইতে পারে। এইরূপ শ্বাসের সহিত অধিক বায়ু গ্রহণের সঙ্গে, আমরা অধিক পরিমাণ অম্লজান গ্রহণ করিয়া থাকি আর প্রশ্বাসের সহিতও অধিক পরিমাণ অঙ্গারাম্ল পরিত্যাগ করিয়া থাকি। সুতরাং শরীরে দহন কার্য্য বৃদ্ধি পায়। পেশীসমুহের কার্য্য শক্তিও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। রক্তাধার হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়—হৃৎপিণ্ডের বিট (ধুক্‌ধুকি) ১০ হইতে ৩০ বার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং রক্ত সঞ্চালন কার্য্যও অধিকতর দ্রুত সম্পাদিত হইতে থাকে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত অধিকতর দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয় ও অশুদ্ধ রক্ত অধিতকর বেগে হৃৎপিণ্ডে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়।

(ঘ) বৃহৎ পেশী সমুহ দেহে তুলাদণ্ডের কার্য্য করিয়া থাকে ; দ্রব্য উত্তোলন, ভার-বহন-শক্তির প্রতিরোধ প্রভৃতি কার্য্য এই সকল পেশীর সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই সকল তুলাদণ্ড, বিজ্ঞান বিভক্ত তুলাদণ্ডের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত—অর্থাৎ "বলমধ্য"। এইরূপ 'বলমধ্য' হওয়াতে আমাদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। হস্ত পদাদি পেশীর অনুশীলনে আমরা কোনও লঘুদ্রব্য (ভার) হাতে রাখিয়া বা পায়ের দ্বারা আঘাত করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ভারের সৃষ্টি করিতে পারি। সেই জন্য সামান্য এক খানা কাঠ বা লাঠি বা পাতলা ডাম্বেলের সাহায্যে আমরা যে সকল ব্যায়ামাদি সম্পাদন করি, তাহার অনুশীলন প্রযুক্ত আমাদিগের গুরুতর ভারবস্তু বহন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বড় বড় লৌহ বা প্রস্তর খণ্ড বা ভারি ডাম্বেল কি মুদ্গরের সাহায্যে ব্যায়াম করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। পাতলা ফুটবল

লইয়া খেলা করায় পায়ের বৃহৎ যবোদর পেশী বিশেষ শক্ত হইয়া উঠে।

(ঙ) নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় বক্ষঃস্থলের পেশী সঞ্চালিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পার্শ্বের দুই দুই খানি পঞ্জরাস্থির মধ্যে দুই প্রস্ত করিয়া পেশী আছে। এই পেশীকে পঞ্জরপেশী কহে। যখন ইহার এক প্রস্ত পেশী প্রসারিত হয়, তখন বক্ষঃস্থল ফুলিয়া উঠে, আবার অন্য প্রস্তের প্রসারণে বক্ষঃস্থল নামিয়া পড়ে। উপযুক্তরূপ পরিচালনা দ্বারা এই সকল পেশী স্থূল ও সবল হইয়া থাকে। বলবান ব্যক্তির বক্ষঃস্থল, কেমন সুন্দর ও উন্নত, আর দুর্ব্বল ব্যক্তির বক্ষঃস্থল কেমন বিশ্রী ও অনুন্নত।

(চ) কেবল একটী বা এক শ্রেণীর পেশী সঞ্চালন করিলে অন্য যে সকল পেশী কার্য্যতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যায়ামের চর্চ্চা করা আবশ্যক।

(ছ) মাংস পেশীর সঞ্চালনে স্নায়ু, শিরা, ধমনি, অস্থি সকল ক্রমে সবল হইয়া উঠে।

(জ) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির উপযুক্ত রূপ ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক উভয় বৃত্তিরই অনুশীলন হইয়া থাকে।

২। **মানসিক বৃত্তির অনুশীলন।**—বালকগণের কতকগুলি মানসিক বৃত্তি বিকাশের সহায়তা না করিতে পারিলে শিক্ষাদানের চেষ্টা বৃথা। বিষয়াদির ধারণা করিতে হইলে, স্মৃতি, কল্পনা, মনোনিবেশ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং কিরূপে এই সমস্ত বৃত্তির উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিঞ্চিৎ জানা উচিত।

মানব মনের তিনটী প্রধান বৃত্তি। (১) বুদ্ধি—যাহার সাহায্যে আমাদিগের পদার্থের জ্ঞান জন্মে। (২) অনুভব—যাহার শক্তিতে

আমাদিগের দয়া, মমতা, ভালবাসা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির বোধ জন্মে। (৩) ইচ্ছা—যাহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। বালকের মনে এই সমস্ত এবং ইহাদের আনুষঙ্গিক বৃত্তিসমূহ অপরিণত অবস্থায় থাকে। এই সমস্ত বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ করাই শিক্ষাদানের প্রধান কার্য্য। এই সমস্ত বৃত্তির কার্য্যের সঙ্গে অন্য বৃত্তির কার্য্য প্রায়ই সংসৃষ্ট। যথা—বালক পাখী ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে—এইটী তাহার 'বুদ্ধিবৃত্তির' কার্য্য; কিন্তু এই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার ঐ কাজ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, সুতরাং 'ইচ্ছাই' তাহাকে একার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে। আবার পাখী ধরিতে পারিয়া বা না পারিয়া তাহার যে সুখ বা দুঃখানুভব হয়, তাহা 'অনুভব' বৃত্তির কার্য্য। কিন্তু যেমন কোন একটী দ্রব্যনিহিত কৃষ্ণত্ব, লঘুত্ব, কঠিনত্ব প্রভৃতি গুণ আমরা ভিন্ন ভিন্ন করিয়াও বিচার করিতে পারি, তেমনি মানব মনের বৃত্তিগুলির কার্য্য অনেক সময় পরস্পর সাপেক্ষ হইলেও আমরা পৃথকরূপে তাহাদিগের আলোচনা করিতে পারি। অনুশীলনের দ্বারা যেমন মাংসপেশীসমূহকে যথেষ্টরূপ সবল করিতে পারা যায়, অনুশীলনের দ্বারা সেইরূপ মনের বৃত্তি সমূহকেও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা যায়। কিন্তু এই উভয় অনুশীলনেই এক কথা মনে রাখিতে হইবে, বালকের বয়স ও সামর্থ বুঝিয়া তাহার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের পরিমাণ নির্ণয় করিবে। যে ব্যক্তি আধ মণ বোঝা বহিতে পারে না, তাহার ঘাড়ে দুই মণ বোঝা চাপাইয়া দিলে, যেমন তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে; সেইরূপ যে বালক বালচাপল্য প্রযুক্ত কোন বিষয়ে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক মনোনিবেশ করিতে পারে না, তাহাকে কোন বিষয়ে দুই ঘণ্টা মনোনিবেশ করিতে হইলে, তাহার অভিনিবেশের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটু একটু করিয়া সব কার্য্য সহ্য করাইয়া লইতে হইবে। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে সব নষ্ট হইবে।

মনের দুইটী গুণ প্রধান—একটী গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, অপরটী প্রদান করিবার ক্ষমতা। মন প্রথম ক্ষমতা দ্বারা বাহিরের জ্ঞান, সুখদুঃখ প্রভৃতি গ্রহণ করে, দ্বিতীয় ক্ষমতা দ্বারা সেই উপার্জ্জিত জ্ঞান অন্যকে প্রদান করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই বাহিরের জ্ঞান লাভ করি, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অন্যকে প্রদান করি। যথা—শিক্ষক চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া যে জ্ঞানলাভ করেন, তাহা তিনি মুখ বা হস্তের দ্বারা অন্যকে দান করিয়া থাকেন। এখন কি কি পর্য্যায় অনুসারে আমরা এই বাহিরের জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। প্রথম 'ইন্দ্রিয়বোধ'—শিশু তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাদি দ্বারা প্রথমে দ্রব্যের পরীক্ষা আরম্ভ করে। দ্বিতীয় 'বস্তুজ্ঞান'—নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুর নানাবিধ গুণ বুঝিতে চেষ্টা করে। কোন ছেলের হাতে একটা সন্দেশ দিলে, সে সেই সন্দেশটিকে হাতের দ্বারা, চক্ষু দ্বারা, জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করিতে থাকে। এইরূপে যখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি একত্রিত হইয়া ঐ বস্তুতে নিহিত হয়, তখন তাহার 'বস্তুজ্ঞান' জন্মে। এইরূপে সে একটি একটি করিয়া সকল জিনিস চিনিতে আরম্ভ করে। তারপর 'স্মৃতি'—ছোট শিশু যতই বড় হইতে থাকে ততই সে নানা কথা মনে রাখিয়া তাহার শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। চতুর্থ 'কল্পনা'—বালক যাহা দেখে নাই, সেরূপ বস্তুর বিষয়ও সে পরিচিত পদার্থের সাহায্যে কল্পনা করিতে শিক্ষা করে। পঞ্চম 'চিন্তা' অর্থাৎ কল্পনা বৃত্তির সাহায্যে সে যে সকল বিষয় ভাবিয়াছে সে সমস্ত প্রকৃত কি অপ্রকৃত ইহাই চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে শেখে। প্রধানতঃ এই পাঁচটী উপায়ের দ্বারাই আমাদের স্বভাবদত্ত জ্ঞানের উন্নতি হইয়া থাকে। আবার ঐ সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নতি অন্য কয়েকটী মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। (১) মনোযোগ বা অভিনিবেশ (২) বিচারশক্তি (৩) কার্য্যকারণানুসরণী বুদ্ধি। বালক-মননিহিত এই

সকল অস্ফুটবৃত্তির বিকাশসাধন কিরূপে করা যাইতে পারে, একে একে তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে:—

ইন্দ্রিয়বোধ ও বস্তুজ্ঞান (প্রত্যক্ষ-জ্ঞান)। আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের জ্ঞানলাভ করি, সেই জন্যই ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। চক্ষু ইন্দ্রিয়গণের রাজা। চক্ষুর সাহায্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করি। চক্ষুর পরে কর্ণ, তারপর ত্বক, তারপর নাসিকা ও জিহ্বা। চক্ষু কর্ণাদির সহিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্ক সংযুক্ত। মস্তিষ্কই জ্ঞান উৎপত্তির কেন্দ্র স্থান। আমরা যখন কোন দ্রব্য দেখি তখন আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখস্থ পদার্থ হইতে আলোক তরঙ্গ উত্থিত হইয়া আমাদিগের চক্ষুর পশ্চাৎভাগের অবস্থিত ও মস্তিষ্কের সহিত সংলগ্ন স্নায়ু সমূহকে সঞ্চালিত করে। এই সঞ্চালনেই আমাদের ইন্দ্রিয় বোধ হয় অর্থাৎ সেই বস্তু কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারি। মস্তিষ্কের বিকার হইলে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সত্ত্বেও, দর্শনে কোনই জ্ঞানলাভ হয় না। এইরূপ কর্ণের মধ্যস্থিত পটহে যখন বাহিরের শব্দতরঙ্গ প্রতিঘাত করে, তখন সেই আঘাতে কর্ণ ও মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্নায়ুসমূহ সঞ্চালিত হইয়া, কিরূপ বা কোন বস্তু হইতে উত্থিত শব্দ তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু যদি আমরা তৎতৎ পদার্থের প্রতি মনোনিবেশ না করি, তবে চক্ষুর সম্মুখে বস্তু ধরিলেও আমাদিগের তাহার জ্ঞান জন্মে না বা কর্ণের নিকট শব্দ করিলেও আমরা তাহার উপলব্ধি করিতে পারিনা। বালকের চক্ষুর সম্মুখে ঘরের দেওয়াল, দেয়াল সংলগ্ন চিত্রাদি ও বোর্ড রহিয়াছে। কিন্তু যখন বালক বোর্ডস্থিত কোন জ্যামিতিক চিত্রের প্রতি অভিনিবেশ করে, তখন বোর্ডেরও সমস্ত অংশ তাহার জ্ঞানের সীমায় আইসে না, দেয়াল ও চিত্রাদির কথা দূরে থাকুক। এইরূপ নানা পাখীর গান, মনুষ্য কলরব, বৃক্ষাদির স্বনন প্রতিনিয়ত কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়া কর্ণের পটহে আঘাত

করিতেছে, কিন্তু বালকেরা যখন অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষকের কথা শ্রবণ করিতে থাকে, তখন অন্য শব্দ তাহাদিগের কাণে প্রবেশ করিলেও কোন জ্ঞানের উদয় করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানলাভ অভিনিবেশ সাপেক্ষ। যখন আমরা মনকে পদার্থবিশেষে অভিনিবেশ করি তখনই আমরা চক্ষুর সাহায্যে দেখিতে পাই; ইহাই ইন্দ্রিয় বোধ। আবার যখন, সেই পদার্থ কোন্ বস্তু ইহা বুঝিতে পারি, তখনই আমাদিগের সেই পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। কোন কোন জন্মান্ধ ব্যক্তি অস্ত্র চিকিৎসায় দর্শন শক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারে না। কোনটী তাহার পিতা, কোনটী বা হাতি, ও কোনটী বা বৃক্ষ—দর্শন শক্তি দ্বারা ইহার কিছুই ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, যদিও সে সব জিনিষই দেখিতে পায়। তাহার ইন্দ্রিয়বোধ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না। শিশুদিগের ঠিক এই অবস্থা। তাহারা সকলই দেখিতে পায় কিন্তু তাহাতে বস্তুর জ্ঞান হয় না। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে একটু একটু করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়।

বাল্যকালে প্রাকৃতিক প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রিয় বোধ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। বালকগণ নিজের বালজনসুলভ ঔৎসুক্য ও চেষ্টায় অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু যখন সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন শিক্ষকের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞান উপার্জ্জনে তাহাকে যথাবিধি সাহায্য করা। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর ইহাই উদ্দেশ্য—এই প্রণালীমত কার্য্য করিলে ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক্ বিকাশ হইয়া থাকে। আর ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই যখন আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তখন ইহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পুষ্টি সাধন।—বিদ্যালয়ে লিখন, অঙ্কন, বীজ বা কাটি সাজান, ব্যবহারিক জ্যামিতি প্রভৃতির সাহায্যে দর্শনেন্দ্রিয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তারপর নিম্নলিখিত প্রথা অবলম্বন করিয়াও এই সর্ব্ব প্রধান ইন্দ্রিয়ের শক্তিবৃদ্ধি করা যাইতে পারে ঃ—

(ক) ভিন্ন ভিন্ন রঙ শিক্ষা দিলে চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(খ) কোন বৃক্ষ পত্র দেখিয়া একটী পত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে দাও, পরে না দেখিয়া তদ্রূপ পত্র অঙ্কিত করিতে পারে কিনা, পরীক্ষা কর। সূক্ষ্মদৃষ্টি ও স্মৃতির পরিচালনা না করিলে অঙ্কন করিতে পারিবে না।

(গ) মানচিত্রের বিশেষ কোন অংশ লক্ষ্য করিতে বল। মানচিত্রের সেই অংশস্থিত যে যে বিষয় বালককে না দেখিয়াই নিজ মানচিত্রে চিহ্নিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ কর। পরে মানচিত্র জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখ ও বালককে চিত্র অঙ্কিত করিতে বল ও সেই সকল বিষয় চিহ্নিত করিতে বল।

(ঘ) বোর্ডের উপর ১২০,৫৭৬৩৯ এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা বড় কি ছোট সংখ্যা লিখিয়া দেও। বালকগণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করুক। পুঁছিয়া দেও। বালকগণকে আবার লিখিতে বল।

(ঙ) ৩৫,৪৮,১৭,২৯,৮৭ এইরূপ কতকগুলি সংখ্যা পরপর লিখিয়া দাও। পরে পুঁছিয়া দিয়া বালকগণকে ঐগুলি লিখিতে বল। এইরূপ ১৮,২৯,৩৭ কে মনে মনে যোগ করিতেও বলিতে পার।

এ সমস্ত অভ্যাসে কেবল যে দর্শন শক্তিরই অনুশীলন হইবে তাহা নহে, ইহাতে স্মৃতি ও অভিনিবেশের ও যথেষ্ট অনুশীলন হইবে। কারণ বালককে এই সমস্ত চিত্র বা সংখ্যা চক্ষুদ্বারা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়া মনে করিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমে শব্দাদির উচ্চারণ শিক্ষা করিতেই কর্ণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকে। কথাবার্ত্তা বা উত্তম আবৃত্তি শিক্ষা করিতে অন্যের অনুকরণ

আবশ্যক। এই কার্য্য কর্ণের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। সঙ্গীত শিক্ষায় শ্রবণশক্তির যে পরিমাণ অনুশীলন হয়, এত আর কিছুতে হয় না। আমাদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার পদ্ধতি নাই, কিন্তু বিলাতী বিদ্যালয়ে সঙ্গীতও একটা বিদ্যালয় পাঠ্য বিষয়। তবে সুখের বিষয় এই যে আজকাল আমাদিগের বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ক্রমশঃ প্রচলন হইতেছে।

লিখনে, চিত্রাঙ্কনে, মৃত্তিকার দ্বারা দ্রব্যাদি গঠনে, স্পর্শশক্তির অনুশীলন হয়। কোন বস্তু উপলক্ষে শিক্ষা দিতে হইলে, সেই বস্তু (যতদূর সম্ভব) সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রত্যেক বালকের হাতে দেওয়া উচিত। স্পর্শ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের যথেষ্ট সহায়তা করে। কঠিন, কোমল, মসৃণ, বন্ধুর প্রভৃতি দ্রব্যগুণ শিক্ষায় স্পর্শশক্তির শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দ্বারা নাসিকার, ও কটু তিক্তাদির দ্বারা জিহ্বার বোধ শক্তির বৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে। (কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী বর্ণনায় এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে)। কিন্তু যখন মনোযোগ ব্যতীত কোন জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নহে, তখন মনোযোগ বৃদ্ধি করাও বিশেষ আবশ্যক।

মনোযোগ বা অভিনিবেশ।—কোন বস্তু বা ভাবের প্রতি একাগ্রচিত্তে মন নিবিষ্ট করাকে মনোযোগ বা অভিনিবেশ বলে। শিক্ষায় মনোযোগ অতি আবশ্যকীয়। বালকগণকে অভিনিবিষ্ট হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। অভিনিবেশই কার্য্য সম্পাদনের বিশেষ সহায়। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করিলে, সেই জ্ঞান স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যায়।

মনোযোগ দ্বিবিধ—স্বতঃ উৎপন্ন ও পরতঃ উৎপন্ন। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্যে বিশেষ মনোনিবেশ করি তাহা স্বতঃ উৎপন্ন

মনোযোগ। বালকেরা খেলাতে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করে, কিন্তু পড়াতে সে নিজ ইচ্ছায় মনোনিবেশ করিতে চাহে না। তাহাকে পড়াতে মনোনিবেশ করাইবার জন্য আমরা নানা উপায় অবলম্বন করি—যথা পুস্তকে নানারূপ মনোহর ছবির ব্যবস্থা করি, বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রদর্শন করি, মানচিত্র বা উত্তম পুত্তলিকা প্রদর্শন করি ইত্যাদি। খেলাতে তাহার মনোযোগ স্বতঃ প্রবর্ত্তিত, কিন্তু পাঠে পরতঃ প্রবর্ত্তিত—অর্থাৎ পাঠে অন্য বস্তুর সাহায্যে তাহার মন আকর্ষণ করিতে হইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ স্বতঃ উৎপন্ন মনোযোগ সহকারেই পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট বালকগণের পাঠে স্বতঃ উৎপন্ন প্রবৃত্তি জন্মে না বলিয়া নানারূপ বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

যুবকই হউক বা শিশুই হউক, বালককে তাহার কার্য্যে মনোনিবেশ করাইতেই হইবে। মনোযোগ ভিন্ন কোন কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা যায় না। বালকগণের মনোযোগ বৃত্তির অনুশীলনে নিম্নলিখিত রূপ প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে ঃ—

(ক) চিত্র, পুত্তলিকা বা দ্রব্য প্রদর্শন।

(খ) বোর্ডে মানচিত্র বা অন্যবিধ চিত্রাঙ্কন।

(গ) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রদর্শন।

এই সমস্ত পরতঃ উপায়ের দ্বারা বালকের মন আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পাঠের অন্তর্গত বিষয় চিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে হইবে। বোর্ডে উত্তম চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। অনেক শিক্ষক বোর্ডের চিত্রাদি (সাধারণ কি জ্যামিতিক) বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহেন। তাঁহারা যেমন তেমন একটা ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করেন। কিন্তু এরূপ করা সঙ্গত নহে। বেশ সুস্পষ্ট ও সুন্দর চিত্রের দ্বারা মন যেরূপ আকৃষ্ট হয়, নিকৃষ্ট চিত্রাদিতে তাহা হয় না—বরং বিপরীত ফল হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

(ঘ) এমন অনেক শুষ্ক বিষয় আছে, যাহাতে এইরূপ চিত্রাদি বা অন্য কোন বাহ্যিক উপায়ে মন আকর্ষণ করা যায় না। উপসর্গের ফর্দ্দ, ণ ষ ব্যবহারের নিয়ম, উপক্রমণিকার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, ইংরাজী ব্যাকরণের লিঙ্গ প্রকরণের তালিকা প্রভৃতি মনোনিবেশ সহকারে মুখস্থ করিতে হইবে—এ সমস্ত সুখপ্রদ করা দুঃসাধ্য। এইরূপ বিষয়ে বালকগণকে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। সময় সময় একটু শাসনেরও আবশ্যক। শাস্তির ভয়ে মনোনিবেশ করিতে করিতে, শেষে অভ্যাস হইয়া পড়িবে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণের স্বতোৎপন্ন অভিনিবেশ বৃত্তি প্রবল করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাদানে যে সকল পরতোৎপন্ন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা কখনই পরিত্যাজ্য নহে।

(ঙ) কোন প্রশ্ন একবারের অধিক জিজ্ঞাসা করিবে না। শ্রুত-লিপির বাক্যাংশ একবারের অধিক আবৃত্তি করিবেনা। বাধ্য হইয়া বালকগণ মনোযোগী হইতে চেষ্টা করিবে। (শ্রুতলিপির অধ্যায় দেখ)।

(চ) কোন বিষয় বুঝাইয়া দিবার সময় সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিবে ও হাত মুখের ভঙ্গী দ্বারা বিষয় বিশদ করিতে যত্ন করিবে। বালকগণ নিস্তব্ধ হইয়া তোমার কথা শ্রবণ করিবে ও ভঙ্গী দর্শন করিবে। দর্শন, অভিনিবেশের বিশেষ সহায়। বালকেরা থিয়েটার বা যাত্রা শুনিতে গিয়া বিষয়টী উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসে। কেন? অভিনেতৃবর্গের উত্তম বক্তৃতা ও সঙ্গত ভঙ্গীর দ্বারা তাহাদিগের মন আকৃষ্ট হয় বলিয়া।

(ছ) যাহাতে বালকেরা শিক্ষায় আমোদ পায় সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকই হউক আর যুবকই হউক যে কার্য্যে আনন্দ পাইবে না বা যে কার্য্যে কোন লাভের প্রত্যাশা দেখিবে না, সে কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করিবেনা।

(জ) এক বিষয়ে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ অসম্ভব। এক বিষয়ে

অনেকক্ষণ পাঠ দিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য চ্যুতি হইবে। ইহাই বিবেচনা করিয়া বিষয় পরিবর্ত্তন ও সময় নিরূপণ করিতে হইবে। কোন কোন শিক্ষক "এক বিষয়ের কথা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বালকদিগের সমক্ষে কহিতে থাকেন এবং শিশুরা তচ্ছ্রবণে অমনোযোগী হইলেই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে এককথা একশত বার শুনিতে শিশুগণেরও বিরক্তি জন্মে। * * * যেমন মধুমক্ষিকাগণ একবারে একটী পুষ্পের সমুদায় মধু শোষণ করিয়া লয় না, কখন এ ফুলে, কখন ও ফুলে বসিয়া মধুপান করে, সুকুমার মতি শিশুগণও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ বিদ্যার রসাস্বাদন করিতে চায়। অতি বৃহদাকার মৎস্যেরাই অগাধজলে নিবাস করে, সফরী অগভীর অম্বুপরি আনন্দ সহকারে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়।" (ভূদেব)

"বিষয় বিশেষে ও স্থান বিশেষে অভিনিবেশের নাম ভেদ হয়। এক সময়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও অভিনিবেশের কার্য্য হইলে সেই অভিনিবেশকে 'পর্য্যবেক্ষণ' কহে। কোন বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ একৈকক্রমে সকল অংশের প্রতি যে মনঃ সংযোগ তাহাকে 'গবেষণা' কহে। বাহ্য পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনোগত ভাব সকলের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে 'অনুধ্যান' কহে। একাধিক বিষয়ের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয়ার্থ ক্রমশঃ এক এক বিষয়ের প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাকে 'উপমিতি' কহে।" (গোপাল বাবু))

স্মৃতি।—কোন এক বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় যদি অন্য বিষয়ের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় তবে প্রথম চিন্তার বিষয় অন্তর্হিত করিয়া দ্বিতীয় চিন্তার স্থান করিয়া দেয়। কিন্তু প্রথম চিন্তা লুক্কায়িত অবস্থাতে মনোমধ্যেই অবস্থিতি করে। আমরা যখন ইচ্ছা করি তখন আবার সেই পূর্ব্ববিষয় আমাদিগের মনে জাগরিত করিয়া তুলিতে পারি। এইরূপ গুপ্ত চিন্তাকে ইচ্ছামত জাগরিত করার নামই স্মৃতি। ঘটনা বিশেষের সংঘটনেও সময় সময় পূর্ব্ববিষয় স্মৃতিপটে জাগরূক হয়। ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্মৃতিশক্তির কার্য্য অত্যন্ত প্রখর থাকে।

ইহার পর যতই তর্ক ও বিচার শক্তির উন্নতি হইতে থাকে, ততই স্মৃতির শক্তি কমিয়া আসিতে থাকে।

বাল্যকালে তর্ক ও বিচারের শক্তি খুব কম থাকে বলিয়াই স্মৃতি এত প্রবল। সুতরাং বাল্য বয়সেই মুখস্থ করিবার বিষয়গুলি আরম্ভ করিতে হইবে। কড়া, গণ্ডা, নামতা প্রভৃতির ধারা, ব্যাকরণ ও ভূগোলের সূত্র ও নামাবলী বাল্যকালে শিক্ষা না করিলে, আর অধিক বয়সে শিক্ষা হয় না। যে সকল বালক শিশুকাল হইতেই ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে ওকালতী প্রভৃতি ব্যবসায়ের অনুরোধে অধিক বয়সে কড়া, গণ্ডা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বিষয়ে তেমন ক্ষিপ্রকারিতা দেখা যায় না। ইঁহারা ৪, ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যতক্ষণে কত কড়া বা কত গণ্ডা ঠিক করিয়া থাকেন, তাহার বহু পূর্ব্বেই, পাঠশালার বালকেরা উত্তর করিয়া বসে। কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যকালেও এই স্মৃতি শক্তির অপরিমিত পরিচালনা সঙ্গত নয়। কারণ তাহা হইলে তর্ক ও বিচারের শক্তি একেবারে চাপা পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। স্মৃতির পাশে পাশে তর্ক ও বিচার শক্তির বৃদ্ধি করার জন্য স্থান রাখিতে হইবে। যে শক্তি বশতঃ পরিজ্ঞাত বিষয় বহুদিবস পর্য্যন্ত মনে থাকে, তাহাকে 'ধারণা' শক্তি বলে। কাহারও ধারণাশক্তি কম, কাহারও বেশী। স্মৃতির প্রখরতা এই ধারণা শক্তির উপর নির্ভর করে। স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি নিম্নলিখিত বিষয় সাপেক্ষ (ক) অভ্যাস বা অনুশীলন (খ) মনোযোগ (গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি (ঘ) সময় ও পরিমাণ (ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম (চ) ভাবপ্রসঙ্গ (ছ) শৃঙ্খলা।

(ক) অভ্যাস বা অনুশীলন।—কোন বিষয়ের অনুশীলন করিলে যে সে বিষয় প্রকৃতিগত হইয়া যায় তাহা পরীক্ষিত সত্য। অনুশীলনের দ্বারা স্মৃতি, মনোযোগ, ইন্দ্রিয় বোধ প্রভৃতি বৃত্তির শক্তি বৃদ্ধি পায়। বালকেরা অনেক সময় তাহাদের স্মৃতি শক্তির দুর্ব্বলতাকে প্রকৃতিগত

অসম্পূর্ণতা বলিয়া পাঠাভ্যাসে বিরত থাকে। কিন্তু এরূপ ধারণা অনেক স্থলেই ভুল। অনভ্যাস হেতু স্মৃতি শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; একটু চর্চ্চা করিলেই আবার তাহা শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে।

যে বালকের স্মৃতি শক্তি এইরূপ দুর্ব্বল, তাহাকে সকল বালকের সমান পাঠ দিতে নাই। এক লাইন কি দুই লাইন মুখস্থ করিতে বা তাহার ভাব মনে করিয়া রাখিতে দিবে। তার পর ক্রমে ক্রমে মাত্রা বাড়াইবে। যাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্মৃতি শক্তিকে বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে, তাহারা সময় ও পরিমাণ এই দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। প্রথম কিছু দিন হয়তঃ অর্দ্ধ ঘণ্টায় ৫ লাইন মুখস্থ করিতে চেষ্টা করে ; তারপর অর্দ্ধ ঘণ্টায় ৭ লাইন ; তার পর ১০ লাইন, এইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। যে বালক অতি কষ্টে ২ ঘণ্টায় ৩।৪ লাইনের অধিক মুখস্থ করিতে পারিত না, তাহাকে অর্দ্ধ ঘণ্টায় এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করিতে দেখিয়াছি। বেশী দিনের চেষ্টায় নহে, ৮।৯ মাসের মাত্র। তবে এই চেষ্টা নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। একবার যদি গ্রীষ্মের কি পূজার ছুটীর সময়, অনুশীলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তবে অবকাশের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতেই অনেক সময় লাগে। ১০।১২ বৎসরের বালকের পক্ষে প্রতিদিন অর্দ্ধঘণ্টা মনোনিবেশ পূর্ব্বক স্মৃতি শক্তির অনুশীলনই যথেষ্ট।

(খ) মনোযোগ।—স্মৃতিশক্তির অনুশীলনে মনোযোগ বিশেষ আবশ্যক, তবে বিনা মনোযোগেও ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে করিতে অনেক বিষয় মুখস্থ হইয়া যায়। কিন্তু মনঃসংযোগপূর্ব্বক মুখস্থ করিতে চেষ্টা করিলে অল্প সময়ে অধিক কার্য্য হয়। অনেক বালক প্রাতে ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পড়িয়া পাঠাভ্যাস করিতে পারে না। মনোযোগের অভাবই তাহার কারণ। মুখে তাহারা পাঠের আবৃত্তি করে বটে, কিন্তু মনে মনে নানা বিষয় চিন্তা করে। অবশ্য এরূপ এক পাঠ লইয়া যদি বহুদিন

৪।৫ ঘণ্টা অভ্যাস করা যায়, তবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিবশতঃ, মুখস্থ হইতে পারে। কিন্তু অল্পসময়ে মুখস্থ করিতে হইলে, বিনা মনঃসংযোগে সেরূপ হওয়া অসম্ভব। যেখানে গোলমাল হইতেছে বা যেখানে তামসা হইতেছে এরূপ স্থানে, বালকের পক্ষে মনঃসংযোগ করা সুকঠিন। রাস্তার ধারে কি কোন কারখানার নিকট পাঠের গৃহ হওয়া উচিত নহে। যেখানে বালকেরা বসিয়া পড়া শুনা করে সেখানে গল্প করা উচিত নহে। তারপর পাঠের সময় "ওরে বাজারে গেলি না, ওরে গরুটা বাঁধত, ওরে রাস্তায় ফেরিওয়ালা কি ডাকে শোনত, ওরে মেয়েটা কাঁদে কেন দেখত" ইত্যাদি রূপ আদেশ করিয়াও বাপমা বালকদিগের মনঃসংযোগের বাধা দিয়া থাকেন। বরং 'অর্দ্ধ ঘণ্টায় তোমাকে এই পরিমাণ মুখস্থ করিতে হইবে,'—এইরূপ কড়াকড়ি আদেশ করিলে বালকেরা অনেক সময় ভয় ভক্তিতে পাঠাভ্যাস করিয়া দেয়। এইরূপ ভয়ে ভয়ে কাজ করিতে করিতে মনঃসংযোগের অভ্যাস হইয়া যায়।

(গ) পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।—কড়া, গণ্ডা, নামতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, সঙ্গীত, সন্ধ্যা বন্দনা প্রভৃতি বালকেরা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে। যাহা একবার মুখস্থ করা যায়, যদি তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা না যায়, তবে তাহা কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না। এই জন্য পাঠের শেষে পুনরালোচনা করা আবশ্যক (পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি দেখ)। যাহা একবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর পুনরালোচনার আবশ্যক নাই, যে শিক্ষক এইরূপ মনে করেন তিনি সুফল লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যতই আলোচনা করিবে, ততই বিষয়টী স্মৃতিতে গাঢ় ভাবে আবদ্ধ হইয়া যাইবে। এই আলোচনা আবার খুব ঘন ঘন হওয়া, কি বহুদিন অন্তর অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। বালকদিগের বয়স ও বিষয় দৃষ্টে ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বালকগণ বাড়ীতে সন্ধ্যা কি প্রাতে তাহাদিগের দৈনিক মুখস্থের পাঠ, যদি পুস্তক বন্ধ

করিয়া দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর, তিনবার আবৃত্তি করে তাহা হইলেই হইল। বিদ্যালয়েতেও নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত নামতা প্রভৃতি সপ্তাহে চারিবার, ভূগোল ব্যাকরণ তিন বার ও সাহিত্যের একবার পুনরালোচনা হওয়া আবশ্যক।

অধীত বিষয় পুস্তক দেখিয়া লিখিতে দিলেও পুনরালোচনার কার্য্য হয়। আর যদি পাঠের সারাংশ নিজের ভাষায় বালকগণকে লিখিতে দেওয়া হয়, তবে পুনরালোচনার সঙ্গে রচনার কার্য্যও হইয়া যায়।

(ঘ) সময় ও পরিমাণ।—অনেক বালক প্রায় সমস্ত বৎসর আলস্যে নষ্ট করিয়া পরীক্ষার সময় পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করে। অল্প সময়ে অনেকগুলি বিষয় অতি কষ্টে মনে রাখিয়া শেষে পরীক্ষার কাগজে সেগুলি ঢালিয়া দিয়া আসে। এরূপ অনেক বালক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয় বটে,কিন্তু পরীক্ষার ২।৪ দিন পরে, তাহাদিগকে সে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর পাওয়া যায় না। যে বিষয় অভ্যাসে অল্প সময় নিয়োজিত হয়, তাহা অল্প সময়ের মধ্যেই মন হইতে সরিয়া পড়ে। এ বিষয়ের একটা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। কোন বালককে একটা সামান্য অংশ মুখস্থ করিতে দেও; মুখস্থের পরেই তাহাকে সেই অংশ পুস্তক বন্ধ করিয়া ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল। তারপর অন্য আর একটী বিষয় মুখস্থ করিতে দাও। এবারে তাহাকে ঐ বিষয়টী পুস্তক বন্ধ করিয়া ১ ঘণ্টা পর পর ৪ বার আবৃত্তি করিতে বল। পরদিন বালককে দুইটী বিষয়েই পরীক্ষা কর। বালকের মনে যে দ্বিতীয় অংশটী প্রথমাংশ অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া আছে, তাহার বেশ প্রমাণ পাইবে। এই জন্য বৎসরের প্রথম হইতে যাহাতে বালকেরা সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া মনে করিয়া রাখিতে যত্ন করে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিক্ষকেরও উচিত নয় যে তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টায় ঝুড়ি ঝুড়ি বিষয় বাল-

কের গলাধঃকরণ করাইয়া দেন। তাঁহার শাসনে বা ভয়ে বালকেরা হয়ত সমস্ত বিষয় আল্‌গা আল্‌গা ভাবে মনে করিয়া রাখিতে পারে ; কিন্তু বেশী দিন মনে থাকিবে না।

(ঙ) স্বাস্থ্য ও আরাম।—স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে মনোযোগের শক্তি নষ্ট হইয়া যায় ও স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বালকের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টায় বালকেরা সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ সময় কোন আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদের মনে না থাকিবারই কথা। বসিবার অসুবিধা হইলে, কাণের কাছে গোলমাল হইলে, শীত বা গ্রীষ্মাধিক্য হইলে, বালকগণের মনোনিবেশের ব্যাঘাত জন্মে বলিয়া স্মরণশক্তির অনুশীলনের যথেষ্ট অসুবিধা হইয়া থাকে।

(চ) ভাবপ্রসঙ্গ।—ভাবপ্রসঙ্গে স্মৃতিশক্তির সহায়তা হয়। একটি পদার্থ দেখিয়া, একটী কথা শুনিয়া বা একটি বিষয় চিন্তা করিয়া, আমাদের মনে যে তাহাদের প্রসঙ্গে আরও অনেক ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই ভাবপ্রসঙ্গ বলে। ঘোড়দৌড়ের মাঠ দেখিলেই, ঘোড়ার কথা মনে আসে ; পাঠশালা দেখিলেই, নিজের বাল্যজীবনের কথা মনে আসে। একটা পদার্থ আর একটা পদার্থের স্মৃতিকে টানিয়া আনে। একটা ভাবের সহিত যদি অন্য ভাব যুক্ত না হয়, তবে কোন ভাবই আমাদের স্মৃতিতে থাকিতে পারে না। একটা ভাবকে যতই অন্যান্য ভাবের সহিত সংযোগ করা যায়, ততই তাহা মনে রাখিবার সুবিধা হয়। ইতিহাস শিক্ষায় মানচিত্রের সাহায্য লওয়া হয়—পাণিপথ দেখিলেই সেই স্থানের সমস্ত কথা মনে আসে। চিত্র দেখান হয়—তাজমহল দেখিলেই সাজাহানের কথা মনে পড়ে, বৃদ্ধবয়সে তাঁহার দুর্দ্দশার কথাও মনে পড়ে। এই জন্য চিত্র, পুতুল, মানচিত্র প্রভৃতির দ্বারা বালকগণের স্মৃতিশক্তির যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে।

শিক্ষা দানে জ্ঞাত ঘটনার সহিত যুক্ত করিয়া অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দিলে ভাবপ্রসঙ্গের স্বাভাবিক গতিতে, জ্ঞাত বিষয় স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত বিষয়াদিও মনে আসিয়া পড়িবে। গ্রামে হয়ত কোন ধনী পরিবারে সম্পত্তির অধিকার লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে ও গ্রামের সকলেই এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। শিক্ষক এই জ্ঞাত বিষয়ের সহিত যোগ করিয়া 'রাজ্যলোভে আওরঙ্গজেব ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে বিবাদ হইয়াছিল' তাহা বর্ণনা করিতে পারেন। গ্রামের এই বৃহৎ ঘটনা (ছোট ছোট ঘটনা হইলে বালকদের মনে থাকিবে না) মনে হইলেই, আওরঙ্গজেবের রাজ্যপ্রাপ্তির বিবরণ মনে আসিবে; 'সেই সঙ্গে মোগল রাজত্বের অধঃপতনের কথাও মনে আসিবে।

(ছ) শৃঙ্খলা।—বিধিবদ্ধ একটা শৃঙ্খলা অবলম্বন করা উচিত। কাহার জীবনী বর্ণনাতে তাহার শৈশব, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এই সাধারণ প্রকৃতিসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিলে বালকগণের অনুধাবন করিতে সুবিধা হইবে। আর যে প্রণালী এক দিন অবলম্বন করা হইবে, সে বিষয়ের পুনরালোচনা ঠিক সেই প্রণালী অনুসারেই করিতে হইবে। তবে উত্তমরূপ অভ্যাস হইয়া গেলে কোন পরিবর্ত্তনে ক্ষতি হইবে না। ভূগোল ও ব্যাকরণের নাম বা শব্দের তালিকা অভ্যাস করিতেও একটী ধারা অবলম্বন করিতে হইবে।

রাজসাহী বিভাগের জেলাগুলির নাম অভ্যাস করাইবার সময়, একদিন "রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা" অন্যদিন আবার "পাবনা, দিনাজপুর, রাজসাহী, রংপুর" ইত্যাদিরূপ বিশৃঙ্খল প্রণালী অবলম্বন করা উচিত নহে। একদিন প্র পরা অপ সম অন্যদিন আবার পরা সম অপ প্র ইত্যাদি ক্রম অবলম্বন করিলে সহজ শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটিবে। পদ্য মুখস্থ করিতে হইলে, ঠিক যাহার পর যে লাইন, প্রত্যহ সেইরূপ

আবৃত্তি না করাইয়া, লাইনগুলি বিশৃঙ্খল করিয়া দিলে, পদ্য মুখস্থ করা কঠিন হইবে। এক প্রণালী অবলম্বন করিলে, ভাবপ্রসঙ্গে একের পর অন্য বিষয় বা শব্দ সহজেই মনোমধ্যে উপস্থিত হইবে।

দ্রব্য, প্রতিরূপ ও ক্রিয়া দর্শন করিয়া মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা বহুকাল স্মরণ থাকে। "একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান"—কথা যথার্থ।

কল্পনা।—শিক্ষায় এই বৃত্তির অনুশীলন বিশেষ আবশ্যক। জ্ঞাত বিষয়াদির সাহায্যে মনোমধ্যে যে একটা অজ্ঞাত বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করা হয়, তাহাকেই কল্পনা বলে। ইতিহাস, ভূগোলের বিষয়গুলি, বালকগণকে কল্পনার সাহায্যেই উপলব্ধি করাইতে হয়। বাল্যকাল হইতেই এ বৃত্তির স্ফূরণ হইয়া থাকে। "মা আমি একখান আঙা কাপল নব" ইহার মধ্যেও, সেই ক্ষুদ্র শিশুর কল্পনা শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। "পুজার সময় আমার মখমলের জামা হইবে"—পাঁচ বৎসরের বালকের এই বাক্যে যথেষ্ট কল্পনা লুক্কায়িত আছে। তারপর একটু বড় হইলে, বালকেরা যখন বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন শিক্ষকের নিকট কত অদ্ভুত জন্তু, বৃক্ষ, জনপদ, মনুষ্য প্রভৃতির গল্প শুনিয়া কল্পনা দ্বারা হৃদয় পটে তাহার চিত্র অঙ্কিত করে।

"একটা নদীর বা পর্ব্বতের বর্ণনা কর, এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার পথের বর্ণনা কর, কোন বাজারের বর্ণনা কর" ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষকগণ বালকের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন।

"স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও শিল্প সম্পন্ন অদ্ভুত পদার্থের আলোচনা দ্বারা এবং মহৎ ব্যক্তিগণের অপরিসীম দয়া ও মহত্বসূচক কার্য্যের বর্ণনা, সুবিখ্যাত মহানুভবদিগের জীবন চরিত, ইতিহাস কাব্য ও কাল্পনিক

উপন্যাসাদির পাঠ দ্বারা, কল্পনা শক্তির আলোচনা হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার তেজস্বিতার বৃদ্ধি হয়" (গোপাল বাবু)

চিন্তা ও বিচার।—দুই বা বহু বিষয়ের তুলনা করিয়া তাহাদিগের গুণাগুণ প্রভৃতি নির্ণয় করাকে বিচার বলে। আর সেই বিচার করিয়া যে সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সিদ্ধান্ত। ভালমন্দ বিচারের শক্তি অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বিকশিত হয়। "এ সন্দেশটা ছোট—এটা চাইনা ঐটা চাই; এ খেলনা চাইনা, ঐ ভালটা"—ইত্যাদি বিচারের শক্তি, বাক্য স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গেই ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বাল্যে এই শক্তির তেমন বৃদ্ধি হয় না। যৌবন কাল হইতেই ইহার প্রকৃত শক্তি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এইজন্য তর্ক বিচার পরিপূর্ণ শাস্ত্রাদি (জ্যামিতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি) অপরিণত বয়স্ক বালককে পড়াইলে কোন ফল পাওয়া যায় না।

বিচারের যে সমস্ত প্রণালী আছে, তাহার মধ্যে **আরোহী ও অবরোহী প্রণালী** শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় (১) বৃক্ষ হইতে আপেল ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, ঊর্দ্ধদিকে চলিয়া গেল না; আকাশে ঢিল ছুড়িলে তাহা ক্রমাগত আকাশে চলিয়া গেল না, মাটীতেই ফিরিয়া আসিল; যে পাখী ক্রমাগত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিলে, সে মাটীতে পড়িল। আর এই সমস্ত ঘটনা রাত্রে, দিনে, শীতে, গ্রীষ্মে, সর্ব্বকালে; মরুভূমিতে, সাগরে, ইউরোপে, আফ্রিকায় সর্ব্বদেশে একরূপ ভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে যে সমস্ত দ্রব্যই পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত (মাধ্যাকর্ষণ) নির্দ্ধারণ করাকে, অর্থাৎ ছোট ছোট তত্ত্ব হইতে ধীরে ধীরে বৃহৎ তত্ত্বে আরোহণ করাকে "আরোহী প্রণালী" বলে। বিজ্ঞানের প্রায় তত্ত্বই এই প্রণালী অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

(২) "যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান তাহারা পরস্পর সমান"—এটী সাধারণ সত্য সিদ্ধান্ত। আমরা ইহার সাহায্যে প্রথম প্রতিজ্ঞান্তর্গত 'ত্রিভুজের তিন বাহু যে পরস্পর সমান' ইহা প্রমাণ করিয়া থাকি। সমবাহু ত্রিভুজের 'তিন কোণ যে পরস্পর সমান' (৫ম প্রতিজ্ঞার অনুমান) ইহাও এই সত্য সিদ্ধান্তের দ্বারা আমরা সপ্রমাণ করি, এইরূপ একটা সাধারণ সত্য সিদ্ধান্তের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রমাণ করাকে অর্থাৎ একটা বৃহৎ সাধারণ তত্ত্ব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বে নামিয়া আসাকে "অবরোহী প্রণালী" বলে। গণিতের তত্ত্বগুলি প্রায়ই এই প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়া থাকে। ব্যাকরণেরও ঐ প্রণালী।

বালকদিগের বিচারশক্তির বৃদ্ধি সাধনে প্রথম হইতেই যত্ন করিতে হইবে। কাহার মানচিত্র ভাল হইয়াছে কাহার মন্দ হইয়াছে; কাহার হস্তলিপি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ইত্যাদি বিষয়ের বিচারের ভার মধ্যে মধ্যে বালকদের হাতে দিয়া বিচার কার্য্য শিক্ষা দিতে হইবে। এইরূপে অঙ্কন, আবৃত্তি, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাহারা 'উত্তম, মধ্যম, অধম' নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলে যে, তাহাদিগের কেবল বিচার শক্তি বৃদ্ধি হইবে এমন নহে, নিজেরাও 'উত্তম' অবস্থা কাহাকে বলে তাহা বুঝিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে।

অনুভব বৃত্তি।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অনুভব বৃত্তিতে স্বার্থভাব প্রবল। আর দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিতে পরার্থভাব প্রবল। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি বৃত্তিরও আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ইহাদের মাত্রাধিক্য না হয়, বা ইহারা বিপথগামী না হয় ইহাই দেখিতে হইবে। আর দয়া, মায়া প্রভৃতি বৃত্তি যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বক্তৃতাদি শ্রবণ বা উত্তম পুস্তকাদি পাঠ এ কার্য্যের কতক সহায়তা করে বটে, কিন্তু সৎ দৃষ্টান্তের অনুকরণ দ্বারাই সৎ বৃত্তির সম্যক পরিপুষ্টি সাধিত হয়।

কতকগুলি অনুভব বৃত্তির অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষককে একটু সতর্ক হইতে হইবে। যেমন—

(ক) লজ্জা ও ভয়।—পড়া দিতে না পারিলে লজ্জিত হইতে হইবে বা শিক্ষক তিরস্কার করিবেন, এরূপ কিছু লজ্জা বা ভয় থাকা আবশ্যক। যদি বালকের মনে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, সামান্য ত্রুটি হইলেই শিক্ষক বেত্র প্রহারে রক্তনদী প্রবাহিত করিবেন, তবে সে পাঠে মনোনিবেশ না করিয়া, বিদ্যালয় হইতে পলায়ন করিবার পন্থা চিন্তা করিবে। ভক্তি সংযুক্ত ভয় বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিভীষিকা সংযুক্ত ভয় পরিত্যজ্য।

(খ) আত্ম ক্ষমতা বোধ —কোন কঠিন অঙ্ক কষিতে পারিলে, বা কোন্ একটা কঠিন কাজ সম্পাদন করিলে, বালকের মনে একটা আত্ম প্রসাদ জন্মে। এ বৃত্তির অনুশীলন নিতান্তই আবশ্যক। দুর্ব্বল বালককে ভাল করিতে হইলে, তাহাকে সহজ সহজ অঙ্ক কসিতে দিয়া তাহার আপন শক্তির বোধ জন্মাইয়া দিতে হইবে। সে যখন দেখিবে যে সে বোকা নহে, সেও অন্যের মত সব কসিতে পারে, তখন সে নিজের ক্ষমতা দৃষ্টে আনন্দিত হইবে ও কার্য্যে উৎসাহিত হইবে।

(গ) কার্য্যানুরাগ।—বালকগণ সর্ব্বদাই কার্য্যপ্রিয়। অলসের মত উপবেশন বা শয়ন করিয়া বৃথা চিন্তায় সময়াতিপাত করিতে জানেনা। শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে তাহাদিগকে সকল সময়ই ভিন্ন ভিন্ন সৎকার্য্য দিয়া ব্যাপৃত রাখেন। শিক্ষক বা অভিভাবক, তাহার কোন ব্যবস্থা না করিলে, সে নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিয়া লইবে। কিন্তু বালকেরা ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে না বলিয়া, তাহাদিগের নিজের ব্যবস্থার কার্য্য অনেক সময় অসৎ হইয়া পড়ে।

(ঘ) প্রতিযোগিতা।—যেখানে এক সঙ্গে অনেক ব্যক্তি, এক বিষয় এক রকমে শিক্ষা করে, সেখানে প্রতিযোগিতায় সুফল হইয়া

থাকে। অন্যের অপেক্ষা আমি অধিক পরিমাণ উন্নতি করিব, এইরূপ ভাব উত্তম। কিন্তু ইহার সঙ্গে যেন, অন্যকে অন্যায়রূপে পরাস্ত করিবার ভাব না জন্মে। অন্যের পতনে যেন আনন্দানুভব করিতে না শিখে। শ্রেণীতে এই প্রতিযোগিতার ফলে যদি কেবল দুই একটি ছাত্র উত্তম হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগের অহঙ্কার বৃত্তি বৃদ্ধি হইতে পারে। সেই জন্য প্রতিযোগিতার ইচ্ছা সকল বালকের প্রাণেই বলবতী করিয়া করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। অন্যের চেয়ে বেশী নম্বর রাখিবার জন্য বালকেরা চেষ্টা করে—এও প্রতিযোগিতা। কিন্তু অন্য বালকের নম্বরের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া, যদি 'পূর্ণ নম্বরের সংখ্যার' সহিত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় তবে যথেষ্ট সুফল লাভ হয় (পরীক্ষা প্রণালীর অধ্যায় দেখ)।

(ঙ) যশো-লিপ্সা।—সুখ্যাতি দ্বারা বালকেরা উৎসাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক সুখ্যাতি লাভে আবার সময় সময় গর্ব্বিত হইয়া পড়ে। সুতরাং সুখ্যাতির পরিমাণ ঠিক রাখা আবশ্যক। কোন কোন শিক্ষক আবার এরূপ ক্ষুদ্রচেতা যে তাঁহারা সুখ্যাতি দানে বিশেষ কৃপণতা করিয়া থাকেন। বালক সাধ্যমত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছে, শিক্ষক সে দিকে দৃষ্টি করিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনোমত কার্য্য না হওয়াতেই, তিনি চটিয়া উঠিলেন। ইহাতে বালকেরা উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে। সুখ্যাতি লাভের ইচ্ছা স্বাভাবিক—অতি বাল্যকাল হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু যখন হাঁটিতে আরম্ভ করে তখন দুই এক পা হাঁটিয়া "বা, বেশ" শুনিবার জন্য, বা উৎসাহসূচক হাসি দেখিবার জন্য, মার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। শিক্ষক এইরূপ দুই একটি 'বা, বেশ' বলিয়া অনেক বালককে কর্ম্মক্ষেত্রে হাঁটিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন।

বিবিধ।—এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে যাহা সকল সময়

আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না। মনেকর বালক গালাগালি কি মার খাইয়া কাঁদিতেছে। ক্রন্দন স্বাভাবিক ; ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সে ইহাকে নিবারণ করিতে পারে না। "কাঁদবিত আবার মার খাবি, চেঁচাবিত গলা কাটিয়া ফেল্‌ব" ইত্যাদি প্রকার ভয় দেখাইলে সে থামিল না বা নিজকে থামাইতে পারিল না। এখন এইরূপ অবাধ্যতার জন্য তাহাকে পুনঃ প্রহার করা নিষ্ঠুর ও নির্ব্বোধের কার্য্য। বালকেরা কোন হাস্যজনক কার্য্য বা কোন হাস্যজনক ঘটনা দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। এটী স্বাভাবিক বৃত্তি ; নিবারণের কোন আবশ্যকতা নাই, (অবশ্য অন্যায় কারণে না হইলে) বরং এইরূপ হাসিলে বালকগণের হৃদয়ের আবেগ থামিয়া যায়।

মানসিক বৃত্তি সমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে না শিখিলে বালকগণকে সুশিক্ষিত করিতে পারা যায় না। এই জন্য শিক্ষা-কার্য্য পরিচালনায় কিঞ্চিৎ মনোবিজ্ঞানের আলোচনা আবশ্যক।

ইচ্ছাশক্তি।—মনের যে শক্তি আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে তাহাকে ইচ্ছা বলে। নানা উদ্দেশ্যে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ; কতক উদ্দেশ্য সৎ আর কতক অসৎ। বালকেরা যাহাতে সৎ উদ্দেশ্যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আবার কোন উদ্দেশ্যে 'সাক্ষাৎ,' আর কোনটী 'সুদূর'। 'খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠিলেই মার নিকট একটা পয়সা পাওয়া যাইবে' এটা সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ; আর 'এখন থেকে পরিশ্রম করিলে, বৎসরের শেষে পরীক্ষায় পুরস্কার পাওয়া যাইবে।'—এটা সুদূর উদ্দেশ্য। বালকেরা এই সুদুর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না ; কিন্তু ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে। বালক কেন, অনেক পরিণত বয়সের লোকও দূর উদ্দেশ্য ধরিয়া কাজ করিতে পারেন না। এমন কি জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিদের মধ্যেও, এরূপ ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি অনেক

দেখিতে পাওয়া যায়। একজনের সংস্কৃত পড়া দেখিয়া, আর একজন 'মুগ্ধ-বোধ' ক্রয় করিলেন। চারি পাঁচ দিন পণ্ডিতের বাড়ীতে গিয়া পাঠও করিলেন কিন্তু আয়াসসাধ্য দেখিয়া পরিত্যাগ করিলেন। একজন বেশ চিত্রাঙ্কন করিতে পারে দেখিয়া আর একজন পেনসিল্, রবার, কাগজ সংগ্রহ করিলেন, ২ দিনের পর আর উৎসাহ থাকিল না। একজন বেশ বেহালা বাজায় দেখিয়া আর একজন বেহালা আনাইল। কিন্তু ৫।৭ দিন পর আর বাজাইতে ইচ্ছা হইল না। এরূপ যখন আমাদিগের দশা, তখন বালকেরা কি করিবে?

ইচ্ছার সঙ্গে অধ্যবসায়ের সংযোগ না থাকিলে, মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না। অধ্যবসায়ও অভ্যাসের ফল। বালকদিগকে ধৈর্য্যসম্পন্ন করিতে হইবে। কোন কার্য্য অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখা অধৈর্য্যের লক্ষণ।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাঠকের মনে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রদ্দীপিত করিয়া দেওয়াই উদ্দেশ্য।

মনোবৃত্তি বিকাশে লক্ষ্য।—বৃত্তিসকলের বিকাশ সম্বন্ধে যে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক তাহা এ স্থলে বিবৃত হইতেছে—

(১) বৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়।

(২) অনুকূল বিষয়ে, রীতি অনুসারে পরিচালিত হইলে তাহাদিগের তেজ বৃদ্ধি পায়।

(৩) প্রতিকূল বিষয়ে চালিত কিম্বা এককালে অত্যন্ত চালিত অথবা একেবারে চালনা বিরহিত হইলে বৃত্তি সকলের তেজ হ্রাস হয়।

(৪) বৃত্তি সকল অনায়াসেই কুপথগামী হয়।

(৫) ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ। জড় পদার্থ ও জড় পদার্থের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া বৃত্তি সকলের প্রথম চালনা আরম্ভ হয়।

(৬) বৃত্তি সকলের নিয়মিত চালনা হইলে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমোদ রাখিলে বালকেরা সহজেই পাঠে মনোযোগী হয়।

(৭) যে কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করা যায় তাহাই অভ্যাস হয়।

(৮) যদি বালকেরা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া বৃত্তি সকলকে স্বস্ব বিষয়ে চালনা করে তবে শীঘ্রই বৃত্তি সকল তেজস্বী হয়।

(৯) বিকাশ বিষয়ে বৃত্তি সকলের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে।

(১০) বৃত্তি সকলের বিকাশার্থ মনুষ্যের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে। যে সময় বৃত্তি বিকশিত হইতে আরম্ভ করে সেই সময় হইতেই তাহার চালনা বিষয়ে সহায়তা আবশ্যক। (গোপাল বাবু)

শিশুশিক্ষার স্বাভাবিক প্রণালী।—পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামতি হারবার্ট স্পেনসার শিশুশিক্ষার যে স্বাভাবিক প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে:—

১। বস্তু মাত্রেরই বৃদ্ধির যে নিয়ম আছে সেই অনুসারে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত। বৃদ্ধির সাধারণ নিয়ম এই যে বস্তু মাত্রেই ক্রমে সরল অবস্থা হইতে জটিল অবস্থায় পরিণত হয়।

শরীরবৃদ্ধিতে ইহা আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়াদি-বিহীন ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গযুক্ত বৃহৎ জটিল দেহে পরিণত হয়। বুদ্ধিবৃদ্ধিরও রীতি এই প্রকার। এক সামান্য বুদ্ধি হইতে ক্রমে ক্রমে নানা বিষয়িণী বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধির এই ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। যেরূপ অল্প অগ্নিতে মাত্রাধিক্য কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ উদয়োন্মুখী ধী-শক্তির প্রথম উদ্যমেই যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয় চাপাইয়া দিলে সহজেই তাহা প্রতিভা-শূন্য হইয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা সাবধান থাকা আবশ্যক যে, শিশুরা

যাহা গ্রহণ করিতে পারে তদপেক্ষা যেন অধিক শিক্ষা দেওয়া না হয়।

২। ধী-শক্তি উদয়ের দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, কতিপয় বৃত্তি প্রথমতঃ অন্তঃগূঢ় ভাবে থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উদিত ও লক্ষিত হয়। বিদ্যা-চর্চ্চা ও জ্ঞানোপদেশ তদনুসারে হওয়াই বিধেয়। মস্তিষ্কের প্রকৃতি এই যে, উহা জাত মাত্র পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয়। অতএব সর্ব্বতোমুখী বৃদ্ধি একদাই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং কোন বিষয়ে বোধ জন্মিবার সময় এক উদ্যমেই তাহার নিগূঢ়তত্ত্বগ্রহ হওয়া অসম্ভাবিত। প্রথমে সামান্যাকারে জ্ঞান জন্মে, অনন্তর সবিশেষ মর্ম্ম উপলব্ধি হইতে থাকে। যে শিশুর দৃষ্টি আলোক ও অন্ধকারের ভেদ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে কিনা সন্দেহ, সেই আবার পরে দৃষ্টিমাত্র নানাবিধ বর্ণের তারতম্য জ্ঞানে সক্ষম হয়। অত-এব শিক্ষার সময় প্রথমতঃ দুরবগাহসূক্ষ্ম বিষয় সকল মনোনীত না করিয়া স্থূল স্থূল বিষয় শিখিতে দেওয়া উচিত।

৩। নানা পদার্থের কি নানা বিষয়ের একবিধ ভাব বা গুণানু-সারে তাহারা যে এক শ্রেণী নিবিষ্ট হইতে পারে, তাহা বয়সের পরিণতি না হইলে বুঝিতে পারা দুর্ঘট। কৌমার কালে বালকগণ গুণ অবগত হইয়া দ্রব্যাদির শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অল্পবয়সে সূত্রাদি শিক্ষা দেওয়া অবৈধ। প্রথমে নানা পদার্থ পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ অবগত করান আবশ্যক। অনন্তর বয়োবৃদ্ধি হইলে, তাহারা যে যে সূত্রানুসারে শ্রেণী বিশেষের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে, তৎসমুদায় উপদেশ দেওয়া উচিত। অল্প বয়সে সূত্রশিক্ষার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি না করিলে, অনেক স্থলে সূত্রোপদেশের আবশ্যকতাই হয় না। শিশুরা স্বয়ংই শ্রেণী বিভাগের চেষ্টা করিতে করিতে, বিনা উপদেশে শ্রেণী নির্দ্দেশ করিতে পারে।

৪। মনুষ্য জাতি আদিম অসভ্যাবস্থা হইতে বর্ত্তমান সভ্যাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত যে যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইয়া তদনুসারে শিক্ষা প্রণালী স্থির করা কর্ত্তব্য। যখন পূর্ব্বতন পুরুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক গুণসমূহ অধস্তন পুরুষে বর্ত্তে, তখন যে যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মানব জাতি কৌমার কাল অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বালকেরাও তত্তৎ পথের পথিক হইলেই অবশ্যই জ্ঞানসম্পন্ন হইবে। আদিম অবস্থায় মনুষ্য জাতি সকল বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতির দ্বারা এই বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিয়াছেন। বালকেরাও যে সেই প্রণালী অনুসারে প্রত্যক্ষ, উপমিতি ও গবেষণা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানসঞ্চয় করিবে সন্দেহ কি ? সুতরাং মানবজাতির উন্নতি বিষয়ক ইতিবৃত্ত জানিয়া, শিশুদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রণালী নির্দ্ধারিত করা উচিত।

৫। উক্তরূপে ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইয়া প্রণালী স্থির করিতে হইলে অবধারিত হইবে যে, অগ্রে কোন ব্যবস্থাপন্ন শৃঙ্খলানুসারে উপদেশ না দিয়া অব্যবস্থিত ভাবে সামান্যাকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মনুষ্যজাতি কোন বিষয়ক বিজ্ঞান শাস্ত্র জানিবার পূর্ব্বে, তত্তদ্বিষয়ক শিল্প অবগত হন। ক্রমে সেই শিল্পের চর্চ্চা হইতে হইতে বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। তুলামান বিজ্ঞান প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে ঢেঁকি ও দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার হইত। রসায়ন শাস্ত্র প্রচারের পূর্ব্বেই লোকে বস্ত্ররঞ্জন ও রন্ধন করিতে পারিত। ফলতঃ কিছু কাল বিশৃঙ্খল ভাবে ও অব্যবস্থিত রূপে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, তত্তদ্বিষয়ের প্রকৃত নিয়ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত কোন বিষয় শিখাইতে হইলে অগ্রে তদ্বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা জন্মাইতে এবং স্থূল স্থূল বৃত্তান্তের উপদেশ দিতে হইবে।

৬। শিশুগণ যাহাতে স্বয়ং শিখিতে চেষ্টা করে তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। উপদেশ যত অল্প হয় ততই ভাল। যাহাতে শিশু স্বীয় যত্নে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান করে, কি জিজ্ঞাসা করিয়া লয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উপদেশ ব্যতীত শিশুরা কিছুই শিখিতে পারে না, এই ধারণা ভুল। পাঠশালার শিক্ষিত বিষয় ব্যতিরিক্ত সহস্র সহস্র ব্যাপার বাহিরে স্বয়ং শিখিয়া থাকে এবং স্বীয় যত্নে সুশিক্ষিত বালকেরা অন্যযত্নোপদিষ্টদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট হয়। বারম্বার 'পড় পড়' বলিয়া যে তাড়না করিতে হয়, তাহা শিশুদিগের দোষ নহে, আমাদিগের অদুরদর্শিতার ফল। তাহাদিগের বাসনার বিরোধী হইলে ও কেবল আমাদের মনোনীত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করাইতে গেলেই ঐরূপ অমনোযোগিতা জন্মিবে। স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করিলে এই অযত্ন ও অমনোযোগিতা কখনই প্রাদুর্ভূত হয় না।

৭। শিক্ষাপ্রণালী উত্তম হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষাদান কালে যে প্রণালী অনুসরণ করা হইয়াছে, বা যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিশুর মনে আনন্দ জন্মিয়াছে কিনা তাহাই লক্ষ্য করিতে হইবে। যদি তাহাতে তাহার আনন্দ না হইয়া থাকে, তবে সে বিষয় বা প্রণালী অপকারী। ইহা পরিত্যাগ করিয়া শিশুর হৃদয়গ্রাহিনী অন্য কোন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা যতই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হই না কেন, স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অনৈসর্গিক মার্গে ধাবিত হইলে কদাচ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবনা। বালকেরা বস্তুতঃ অলস নহে। প্রকৃতিগত কোন দোষ না থাকিলে, কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না এবং নূতন নূতন বিষয় অবগত না হইয়া ক্ষান্ত থাকেনা। অতএব এই স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞানোপদেশ দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বালকগণের শক্তিসাধ্য বিষয় শিক্ষা দিলে

আহ্লাদ ভিন্ন কখনও ক্লেশ হয় না। (যদু বাবুর "শিক্ষা বিচার" হইতে গৃহীত)।

মৌখিক শিক্ষাদানের বিশেষ ধারা।—মৌখিক শিক্ষাদানের নিমিত্ত সাধারণতঃ চারিটী ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে যথা :—

(১) আদানের ধারা (প্রশ্নাত্মক) এই ধারা প্রকাশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ?
(২) প্রদানের ধারা (বর্ণনাত্মক) ,, ,, ।
(৩) পূরণের ধারা (সম্পূরণ) ,, ,, [ ]
(৪) তুলনের ধারা (উপমিতি) ,, ,, =

(১) শিক্ষার যে ধারানুসারে আমরা বালকগণের নিকট হইতে তাহাদিগের স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানের ফলাফল আদায় করিয়া তাহাদিগকে অধিকতর জ্ঞান লাভে উন্মুখী করিয়া থাকি, তাহাকে 'আদানের ধারা' বলে।

(২) শিক্ষার যে ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা জ্ঞাতব্য সে সমুদায় বিষয়ই আমরা বালকগণকে বলিয়া দিয়া (প্রদান করিয়া) শিক্ষাদান করি তাহাকেই "প্রদানের ধারা" বলে।

শিক্ষাকার্য্যে এই দুইটী ধারাই যথেষ্ট পরিমাণে অনুসৃত হইয়া থাকে। কেবল বালকগণের বয়স অনুসারে মাত্রার কম বেশী করিতে হয়। নিম্ন শ্রেণীতে খুব কম বলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আদায় করিতে হইবে। বালক যতই উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবে আদানের ভাগ কমাইয়া প্রদানের ভাগ বাড়াইতে হইবে। অনেক শিক্ষক কেবল বক্তৃতা করিয়াই শিক্ষার কার্য্য শেষ করেন। কিন্তু কেবল বলিয়া দেওয়া বা বক্তৃতা করাকেই প্রকৃত পাঠনা বলেনা। বালকগণকে সঙ্গে করিয়া জ্ঞানোদ্যানে লইয়া যাও, কোন্ ফলগুলি ভাল আর কোন্ গুলি মন্দ বলিয়া দাও, কিন্তু সেই ফলগুলি তুমি নিজে

পাড়িয়া দিওনা আর বালকগণের উপকারার্থে সেইগুলি তুমি নিজে খাইয়া ও জীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কেবল জীর্ণাবশিষ্ট খাইতে দিওনা। 'আদান' অপেক্ষা 'প্রদান' অপেক্ষাকৃত সহজ। 'প্রদানে' বালকের বয়স ও পূর্ব্ব জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে যাহা ধারণা করিতে পারে ও মনে রাখিতে পারে তাহাকে সেইরূপ ও সেই পরিমাণ বিষয় বলিয়া দিতে হইবে। আদানের প্রণালী অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু ইহাতে যেরূপ শিক্ষাদান হইয়া থাকে অন্য কোন প্রণালীতে তাহা হয় না। এ বিষয় বিশদীকরণার্থ দুইটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

(ক) মনে কর, কোন বালক "বেণী বড় দুষ্ট বালক" এই লাইন পড়িতে যাইয়া "বেণী বড়" পর্য্যন্ত পড়িয়াই থামিয়া গেল। 'দুষ্ট' কথা পড়িতে পারিল না। যে শিক্ষক বলিয়া দেওয়ার প্রথানুসরণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ 'দুষ্ট' শব্দটী বলিয়া দিলেন। বালক তাঁহার অনুকরণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষক আদায় করিবার প্রথানুযায়ী শিক্ষা দেন, তিনি প্রথমে বালককে দু পড়িতে বলিলেন। 'দ' এ হ্রস্ব উকার দিলে যে তাহার আকৃতির সামান্য পরিবর্ত্তন হয়, তাহা সে জানে কিনা তাহা এইরূপে পরীক্ষা করিলেন। তারপর 'ষ্ট' কি কি অক্ষরযুক্ত, তাহাও তাহার নিকট হইতে আদায় করিলেন। হয়ত বোর্ডে 'কষ্ট, নষ্ট' প্রভৃতি দুই একটী কথা লিখিয়া দিয়া তাহাকে পড়িতে বলিলেন। এরূপ করিয়া যিনি শিখাইলেন, তাঁহার বালক 'দুষ্ট' কি তদ্রূপ অন্য কোন শব্দ পড়িতে আর কষ্ট বোধ করিবেনা।

(খ) কেমন করিয়া মেঘ হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে। আগুনের উপরে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া শিক্ষক বুঝাইতেছেন যে, আগুনের তাপে জল ক্রমাগত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে ও পাত্রের জল কমিয়া যাইতেছে। এখন যিনি প্রথম প্রথার সেবক, তিনি ইহার পরেই বলিয়া দিলেন যে এইরূপে সূর্য্যের তাপে নদী, হ্রদ, সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে

আকাশে উঠিয়া মেঘ হয়। কিন্তু যিনি দ্বিতীয় প্রথার সেবক তিনি বালকের নিকট হইতে আদায় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আগুনের যেরূপ তাপ আছে সেরূপ তাপ আর কোন জিনিষের আছে? একখানি থালায় জল রাখিয়া অনেক ক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে থালার জল সমান থাকে কি কম বেশী হয়? কম হইবার কারণ কি? তবে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের উপর সূর্য্যতাপ কিরূপ কাজ করে? ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন করিয়া করিয়া, সূর্য্যতাপে যে সমুদ্রাদির জল বাষ্পে পরিণত হয় ইহা আদায় করিয়া লইবেন। 'আদান' বলিলে কতকগুলি উদ্দেশ্য-বিহীন অসংলগ্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মাত্র, একথা যেন কেহ না বুঝেন। সুসংলগ্ন ও উদ্দেশ্য প্রতিপাদক প্রশ্ন করিতে বিশেষরূপ চিন্তা করিতে হয়। কাজ তত সহজ সাধ্য নয়। তবে অভ্যাসের নিকট সকলই সহজ-সাধ্য বোধ হইয়া থাকে।

প্রশ্নের লক্ষণ।—প্রশ্ন করিবার কৌশল শিক্ষা করিতে হয়। উত্তম প্রশ্নই মৌখিক শিক্ষা দানের প্রাণ। পণ্ডিতগণ উত্তম প্রশ্নের নিম্নলিখিত নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

১। প্রশ্ন সরল (সহজবোধগম্য) হওয়া আবশ্যক।

(ক) সহজভাষায় ও অল্প কথায় প্রশ্ন গঠন করিবে। "কে বলিতে পারে? কেমন বুদ্ধি জানা যাবে" ইত্যাদি বাজে কথায় প্রশ্ন দীর্ঘ করিবেনা।

(খ) পুস্তকের কথা ব্যবহার না করিয়া, নিজের কথায় প্রশ্ন রচনা করিবে। পুস্তকের কথা ব্যবহার করিলে বালকেরাও পুস্তকের ভাষায় উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের নিজের চিন্তা ও রচনাশক্তির আলোচনা হইবেনা।

(গ) এরূপ বিশদভাবে প্রশ্ন করিবে যে, তাহার যেন একটী মাত্র উত্তরই সম্ভবপর হয়। "ভারতবর্ষের উত্তরে কি?" শিক্ষকের মনের ভাব, বালক "হিমালয়" বলে; কিন্তু তিব্বত বা গঙ্গা বলিলে দোষ কি?

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে কি হইয়াছিল? এ প্রশ্নের বহুপ্রকার উত্তর হইতে পারে।

(ঘ) বালক যেরূপ প্রশ্নের উত্তর করিতে সমর্থ সেইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবে। "গঙ্গার দৈর্ঘ্য কত?"—এরূপ প্রশ্নের উত্তর (পূর্ব্বে জানা থাকিলে পৃথক কথা) বালকেরা আন্দাজেও ঠিক করিতে পারেনা।

২। প্রশ্নের উত্তরে যেন চিন্তাশক্তির অনুশীলন আবশ্যক হয়।

(ক) আন্দাজে একটা যা তা উত্তর দেওয়া অনেক বালকের অভ্যাস আছে। এরূপ অভ্যাসের কখনই প্রশ্রয় দিবেনা।

(খ) "হাঁ, না"—এরূপ এক কথায় যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, সেরূপ প্রশ্নের সংখ্যা খুব কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সময় সময় এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আবশ্যকতা হইয়া থাকে, যাহার উত্তর এক কথাতেই দিতে হয়, যথা ইতিহাসের তারিখ, ভূগোলের কোন নাম, ব্যাকরণের কোন শব্দরূপ।

৩। প্রশ্নের গঠনপ্রণালী এক রকম না হওয়াই উচিত। "কারসিয়ং কোথায়, জব্বলপুর কোথায়, শিলচর কোথায়" এরূপ এক ঘেয়ে 'কোথায়, কোথায়', প্রশ্নে বালকের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যায়।

৪। প্রশ্নগুলি বিষয়ের অংশানুসারে শৃঙ্খলের গ্রন্থির মত পর পর সজ্জিত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ যেন প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সহিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরযুক্ত হইতে পারে, দ্বিতীয়ের সহিত তৃতীয় ইত্যাদি। আর প্রশ্নের উত্তর গুলি একত্র করিলে যেন বিষয়টীর প্রধান প্রধান অংশ গুলি শৃঙ্খলা ক্রমে পাওয়া যায়।

৫। পাদপূরনার্থ যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহাতে শিক্ষক প্রশ্নের বাক্য আরম্ভ করিয়া, তাহার অংশ মাত্র উল্লেখ করেন অবশিষ্টাংশ বালক পূর্ণ করে। যথা, "রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য—?" তারপর বালকেরা পূরণ করিল "বনে গেলেন"। এরূপ প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নশ্রেণীর পক্ষে

বিশেষ উপযোগী কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে নয়। উচ্চ শ্রেণীতে এরূপ প্রশ্নের ব্যবহার সঙ্গত নহে। (এরূপ প্রশ্নোত্তরকেই পূরণের ধারা বলে।)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ?—(ক) পুনরালোচনা (খ) পরীক্ষা (গ) শিক্ষাদান।

(ক) পুনরালোচনা দ্বারা বালকের স্মৃতিশক্তির সাহায্য করা হয়। যত আলোচনা করা যায়, ততই সে বিষয়টী মনোমধ্যে দৃঢ়তর ভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইজন্য কোন বিষয় বালকের মনে থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। আলোচনা না থাকিলে ভুলিয়া যাইবে। প্রতিদিন পাঠের শেষে পুনরালোচনার রীতি আছে। (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ)।

(খ) পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য, বালকের উপার্জ্জিত জ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অর্থাৎ কতদূর শিখিয়াছে তাহাই জানা। অধীত বিষয় সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা জন্মিয়াছে কি না তাহা জানা, অধীত বিষয়েরও কোন অংশ তাহার অজ্ঞাত আছে কি না তাহা জানা।

(গ) শিক্ষা দানের নিমিত্ত যে প্রশ্ন করা হয়, তাহা দ্বারা বালকের চিন্তাশক্তির পরিচালনা হয়, আর প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যাস করিলে, মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, পরে উত্তরটী গুছাইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে।

সুবিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস কেবল প্রশ্নের দ্বারা শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন বলিয়া ইহার নাম কেহ কেহ সক্রেটীক প্রথাও বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এই প্রণালীকে 'সক্রেটিক প্রথা' বলা সঙ্গত নহে। কারণ সক্রেটিস প্রথমতঃ পরিণতবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন। আর দ্বিতীয়তঃ শিষ্যগণের মনের

ভ্রান্তি প্রদর্শন করাই তাঁহার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু শিশুশিক্ষায় সেরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে। শিক্ষক যে বিষয় বালককে বুঝাইয়া দিবেন মনে করিয়াছেন সুকৌশলসম্পন্ন ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া বালকের নিকট হইতে তাহাই আদায় করিবেন, এই মাত্র কথা। এ প্রথাকে 'কথোপকথনের প্রথা' বলাই যুক্তিযুক্ত। মনে কর বালক "বলিল ৪ আর ৭ এ ১২"। বালককে একবার ৪টা গুঁটী গণিয়া যাইতে বল; তারপর ৭টা। শেষে ৪টা আর ৭টা গুঁটী একত্র করিয়া গণিতে বল। নিজের ভুল নিজেই বুঝিবে। এখানে ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সক্রেটিসের সেই দার্শনিক প্রথানুযায়ী প্রশ্নাদির সঙ্গে এই শিশুশিক্ষার সামান্য ব্যাপার যুক্ত করা সঙ্গত নয়। নিম্নে কথোপকথন প্রণালী সম্মত শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

শিক্ষক। তোমরা কল্পতরুর কথা শুনেছ?

ছাত্র। শুনেছি, একরকম গাছ, সে গাছে যে ফল চাওয়া যায় তাই নাকি পাওয়া যায়।

শি। আচ্ছা, এমন গাছের একটা চারা পেতে ইচ্ছা করে না?

ছা। ইচ্ছাত করে।

শি। তা চেষ্টা করলেইত পাওয়া যায়।

ছা। তাও কি পাওয়া যায়? ও একটা বাজে কথা।

শি। তবে কি তুমি ও গাছের কথা বিশ্বাস করনা?

ছা। এ কথাও কি কেউ বিশ্বাস করে? ও একটা মনগড়া কথা।

শি। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। কল্প তরু কোথায় জন্মে জান?

ছা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) উঁহু!

শি। নন্দনকাননে জন্মে; আমার একটা এই গাছ আছে!

ছা। (অবিশ্বাসের ভাবে) আপনি বলেন কি?

শি। বাস্তবিক কথা। (পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া) এই টাকাটা সেই গাছের ফল।

ছা। (খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আপনি কি ঠিক কথা বলছেন?

শি। ঠিক কথা বই কি, তা না হলে এ টাকাটা পেলাম কোথায়?

ছা। ও ত আপনার টাকা।

শি। ঠিক কথা। আমি ত চুরি করে আনি নাই—তবে আমি পেলাম কোথায়?

ছা। আপনিত স্কুলে কাজ করার জন্য টাকা পান—সেই টাকা।

শি। তুমি স্কুলে কাজ করনা কেন—তা হইলে তুমিও ত টাকা পাবে।

ছা। আমি যে পারিনা।

শি। কেন পারনা?

ছা। আমি আপনার মত অত লেখা পড়া জানিনা।

শি। তাতে কি?

ছা। আপনি অনেক জানেন বলিয়াইত আপনাকে টাকা দেয়।

শি। ঠিক কি তাই? তা হলে আমার বিদ্যাই কি টাকা জন্মায়?

ছা। এক রকম তাই বই কি?

শি। কি?—তাহলে কি 'ভগ্নাংশ' ও 'সর্ব্বনাম' টাকার মা।

ছা। (হাসিয়া) সেই রকমই বটে।

শি। আচ্ছা, তোমরা এখানে কি কাজে এসেছ?

ছা। আমরা শিখ্‌তে এসেছি।

শি। বিদ্যা লাভের জন্য এস নাই?

ছা। অবশ্য, বিদ্যা লাভ বই কি?

শি। আচ্ছা, যখন আমরা আম পাড়্‌তে হলে আম গাছে উঠি, তখন কি বিদ্যা পেতে হলে বিদ্যাগাছে উঠ্‌তে হবে?

ছা। (একটু চিন্তা করিয়া) এক রকম তাই বই কি?

শি। আমাদের আদত কথা ভুলে গেছি,—কল্পতরু কোথায় জন্মে?

ছা। আপনি বলেছেন, নন্দনকাননে।

শি। আর আমি যে সে গাছে চড়েছিলাম, তাওত বলেছি।

ছা। উঁহু! তবে কি সেটা বিদ্যার গাছ?

শি। তা না হলে, আমার টাকা এল কেমন করে?

ছা। আপনার বিদ্যা আছে বলে।

শি। আচ্ছা, কল্পতরুতে যা চাওয়া যায় তাই যদি পাওয়া যায়, তবে ত টাকাও পাওয়া যায়?

ছা। যদি তেমন গাছ থাকে তবে তাতে টাকা পাওয়া যায় বই কি?

শি। আমি সেই গাছ থেকেই এই টাকা পেয়েছি।

ছা। আপনি বিদ্যার গাছে পেয়েছেন।

শি। তবে বিদ্যার গাছও যা কল্পতরুর গাছও তাই, কেমন?

ছা। যখন দুই গাছেই টাকা ফলে, তখন দুইই এক গাছ বটে।

শি। আর কল্পতরু কোথায় জন্মে মনে আছে?

ছা। (হাসিয়া) নন্দনকাননে।

শি। সে নন্দনকানন কই?

ছা। (প্রফুল্ল চিত্তে) এই স্কুল। (থ্রিং সাহেবের অনুকরণে)

বুদ্ধিমান যুবকের শিক্ষার্থে সক্রেটিক প্রথা অবলম্বন করা যাইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর "অনুশীলন তত্ত্ব" কতকটা সক্রেটিক প্রথাতে রচিত। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য কেবল সক্রেটিক প্রণালীই প্রদর্শন করা নহে। ইহাতে "প্রাকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে," এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর পাওয়া যাইবে। আর দরিদ্র শিক্ষকগণ দারিদ্রতার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া মনকে একটু প্রবোধ দিতে পারিবেন।

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সংবাদ কি? তাঁহার পীড়া সারিয়াছে?

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গু। কবে আসিবেন?

শি। আর আসিবেন না, দেশত্যাগী হইলেন।

গু। কেন?

শি। কি সুখে আর থাকিবেন?

গু। দুঃখ কি?

শি। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকী কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আর তাঁহার মত দুঃখীও কে কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদী সম্মত।

গু। হয় তাঁহার দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শি। তাহার কোন দুঃখ নাই? সেকি কথা? তিনি চির দরিদ্র; অন্ন চলেনা। তার পর কঠিন রোগে ক্লিষ্ট। আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে?

গু। তবে তিনি ধার্ম্মিক নন।

শি। সে কি? আপনি কি বলেন যে এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ সকলই কি অধর্ম্মের ফল?

গু। তাই বলি।

শি। পূর্ব্ব জন্মের?

গু। পূর্ব্ব জন্মের কথায় কাজ কি? এই জন্মেরই অধর্ম্মের ফল।

শি। আপনি কি মানেন যে এ জন্মে আমি অধর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াই আমার রোগ হয়। *

গু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি জান না যে হিম লাগাইলে সর্দ্দি হয়, কি গুরু ভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?

শি। হিম লাগান কি অধর্ম্ম?

গু। অন্য ধর্ম্মের মত শারীরিক একটা ধর্ম্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী, এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম।" * * *

শি। তাহা না হয় হইল, বাচস্পতির এই দারিদ্র্য ও রোগ কোন অধর্ম্মের ফল?

গু। দারিদ্র্য দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি?

শি। খাইতে পায়না।

গু। বাচস্পতির সে কষ্ট হয় নাই ইহা নিশ্চিত, কারণ বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিনে মরিয়া যাইত।

শি। মনে করুন সপরিবারে মোটা চালের ভাত আর কাঁচা কলা ভাতে খায়।

গু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে; কিন্তু উহা যদি শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির পক্ষে যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না খাইলে দুঃখ বোধ করা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক।

শি। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীত কালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি?

শি। জুটিতে পারে কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই, অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্নবান সে অধার্ম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, সে অধার্ম্মিক। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্য পীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা ও কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম্মে সংস্কার, তাহাদের কষ্টের কারণ।

শি। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই যাহার পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গু। অনেক—কোটী কোটী। যাহারা শরীর রক্ষার জন্য অন্ন বস্ত্র পায়না—আশ্রয় পায়না তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শি। এ দারিদ্র্য কি তাহাদের এই জন্ম কৃত অধর্ম্মের ভোগ?

গু। অবশ্য।

শি। কোন অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য?

গু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী, অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির উপযোগী যাহা, তাহা সংগ্রহের উপযোগী আমাদিগের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক অনুশীলন করে নাই বা সম্যকরূপে পরিচালনা করে না তাহারাই দরিদ্র।

শি। তবে বুঝিতেছি আপনার মতে আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম। তাহার অভাব অধর্ম্ম। (বসুমতীর সংস্করণ বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থাবলী পৃঃ ৪৫৫)।

বাচস্পতি যে অধার্ম্মিক ইহাই প্রতিপন্ন করা গুরুর উদ্দেশ্য ছিল এবং প্রকারান্তরে শিষ্যের দ্বারাই তাহা সিদ্ধান্ত করাইয়া লইলেন।

উত্তরের লক্ষণ।—কেবল উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ জানিলেই চলিবে না, উত্তম উত্তরের লক্ষণও জানা চাই। বালক নিজের চিন্তাশক্তির পরিচালনা করিয়া যে উত্তর দেয়, তাহাই উত্তম উত্তর। কিন্তু প্রশ্ন উত্তম না হইলে উত্তম উত্তর আশা করা বৃথা। উত্তর গ্রহণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক:—

(ক) নিরুত্তর।—তুমি প্রশ্ন করিলে, কিন্তু কোন উত্তর নাই। কেন উত্তর দিলে না? হয় সে শ্রেণীর অনুপযুক্ত নয়, বা সে প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, নয় যে দিন সে বিষয় শিখান হইয়াছিল সে দিন সে বিদ্যালয়ে আসে নাই, বা সে অমনোযোগী। এই সকল কিন্তু শিক্ষকের দোষে ঘটে। নিরুত্তরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে শিখাইবার ব্যবস্থা করিবে।

(খ) ভুল উত্তর।—এক বিষয়গত ভুল, আর ভাষাগত ভুল—যেরূপই হউক শুদ্ধ করিয়া দিবে। অজ্ঞতা প্রযুক্ত অশুদ্ধ উত্তর দিলে ছেলেকে তিরস্কার করিবে না। বালকের ভুল বুঝাইয়া দিবে। যদি বালকের ঐরূপ বিশ্বাস হয়, যে উত্তর ভুল হইলে শিক্ষক ঠাট্টা বা তিরস্কার করিবেন, তবে ভুল কেন সে শুদ্ধ উত্তর দিতেও ইতস্ততঃ করিবে।

(গ) আংশিক উত্তর।—যখন উত্তর আংশিক শুদ্ধ হইয়াছে দেখিবে, অথবা যখন ভাষা অভাবে উত্তর সরল করিতে পারিতেছে না দেখিবে, তখন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য প্রশ্ন দ্বারা তাহার অশুদ্ধ অংশ সংশোধনের চেষ্টা করিবে। পরে আবার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর উত্থাপন করিবে। উত্তর ভুল হইলেই "তোমার হল না, আর এক জন বল" এরূপ করায় শিক্ষকের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। বালক যে টুকু শুদ্ধ করিয়া বলিয়াছে, তাহাতেই তাহাকে উৎসাহান্বিত করিয়া অশুদ্ধ অংশের ভুল সংশোধন করিয়া দাও।

(ঘ) শুদ্ধ উত্তর।—ঠিক উত্তর দিলে বালককে উৎসাহিত করিবার জন্য 'বেশ, ঠিক কথা, হাঁ' ইত্যাদি উৎসাহসূচক বাক্য ব্যবহার করায় বেশ উপকার হইয়া থাকে। তবে সকল সময় এইরূপ 'বাঃ বেশ' না বলিয়াও কেবল চক্ষুর দ্বারাও উৎসাহিত করা যায়। শ্রেণীর সকল বালকই সেই প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিতে সক্ষম ইহা বুঝিতে পারিলে, সেই প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

(ঙ) নির্ব্বোধের মত উত্তর।—'চিন্তা' কি পদ? উত্তর, বিশেষণ পণ্ডিত মহাশয়। দ্বিতীয় বালক (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) ক্রিয়াপদ পণ্ডিত মহাশয়! তৃতীয় বালক, গোষ্পদ ইত্যাদি। 'কোন খৃষ্টাব্দে আকবরের জন্ম হয়?' উত্তর, ১৫৪৩ সনে, তখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র'। এরূপ উত্তর দিবার কারণ কি? যদি বালক আন্দাজী উত্তর দিয়া থাকে, অথবা শয়তানী করিয়াই বলিয়া থাকে, তবে সেই অনাবিষ্ট বালককে বিশেষ করিয়া শাসন করিবে। আর যদি খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি কথার অর্থ না জানার দরুণ এরূপ উত্তর দিয়া থাকে, কি কোন ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করিতে গিয়া গোলমাল করিয়া থাকে, তবে তাহার বিধান করিবে।

(চ) পূর্ণ বাক্যে উত্তর।—ইহাই সাধারণ রীতি। দ্বীপ কাহাকে বলে? "চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থল ভাগকে"—এরূপ উত্তর উত্তম নহে। "চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত স্থল ভাগকে দ্বীপ বলে"—ইহাই পূর্ণ উত্তর। নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হয় কেন? "কারণ অন্যান্য নদী ইহার সহিত গমনপথে মিলিত হয়"—এরূপ উত্তর ঠিক নহে। "নদী ক্রমশঃ মুখের দিকে প্রশস্ত হইয়া থাকে, কারণ ইহার গমন পথে অন্যান্য নদী আসিয়া মিলিত হয়"—এইরূপ উত্তরই উত্তম।

তবে শিবাজীর জন্মের তারিখ বল, ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম কর, একটা বিশেষ্য পদের উল্লেখ কর, সাধু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় বল, ইত্যাদি রূপ প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণ বাক্যের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

(ছ) উত্তর সুসঙ্গত হওয়া আবশ্যক।—'কেরাণী বাবু তাড়াতাড়ি লিখিতেছেন' তাড়াতাড়ি কি পদ? বিশেষণ পদ। এখানে 'ক্রিয়ার বিশেষণ' বলাই অধিকতর সঙ্গত উত্তর। আকবরের ধর্ম্মমত উল্লেখ কর? ইহার উত্তরে বালক আরম্ভ করিল "আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার "বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র" ইত্যাদি—শেষে

ধর্ম্মমতেরও উল্লেখ করিল। এরূপ উত্তরে কি অসঙ্গত দোষ হইল তাহা বালককে বুঝাইয়া দিয়া, উত্তরের কোন্ অংশ বলিতে হইবে শিখাইয়া দিবে।

তুলনের ধারা (বা সাদৃশ্য পদ্ধতি বা উপমিতি)।—জ্ঞাত পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া আমরা অজ্ঞাত পদার্থের বিষয় অবগত হই। বিড়ালের গুণাগুণ জানিয়া আমরা ব্যাঘ্রের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করি। ছবি দেখিয়াও আমরা অনেক দ্রব্যের আকার অবগত হই—কারণ ছবি বস্তুর সাদৃশ্য। অনেক জিনিষ মনে রাখিবার জন্য আমরা এই প্রথা অবলম্বন করি; যথা ভারতবর্ষ ত্রিভুজের সদৃশ, ইটালি বুটজুতা সদৃশ, পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের মানচিত্র বেঙের সদৃশ। ঌ কার যেন ডিগবাজী খায়। এইরূপে অনেক কথার প্রথম অক্ষর মনে রাখিবার কৌশল করিয়া আমরা এই সাদৃশ্য প্রথা অবলম্বন করি। রামধনুর রঙ গুলি পর পর কিরূপ ভাবে সাজান থাকে তাহা মনে রাখিবার জন্য "বেণী আসহ কলা" (অর্থ, বেণী আসিয়া কলা খাও) এই বাক্য আমরা মনে রাখি। ইহাতে 'বেণী' প্রভৃতি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সদৃশ স্বরযুক্ত শব্দগুলি আমাদিগের মনে আসিয়া পড়ে। যথা!—

বে=বেগুণে Violet. নী=নীল Indigo. আ=আসমানী Blue. স=সবুজ Green. হ=হলুদ Yellow. ক=কমলা Orange. লা=লাল Red.

বোর্ডে যে আমরা চিত্রাদি অঙ্কিত করি তাহা এই সাদৃশ্য প্রথার দৃষ্টান্ত। "একটা চোখ দুইটা কাণের সমান" ইহা পরীক্ষিত সত্য। চোখের দ্বারাই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য জ্ঞান লাভ করি। আমগাছ কলাগাছ, দূরশব্দ নিকটশব্দ, কোমল কঠিন, সুগন্ধ দুর্গন্ধ, কটু কষায় প্রভৃতি সাদৃশ্য জ্ঞান সাপেক্ষ। বিসদৃশ করিয়া দেখাইতেও এই প্রথানুযায়ী কার্য্য হয়। হিমালয় পর্ব্বত ৫ মাইল উচ্চ;

বঙ্গোপসাগরের গভীরতা ২॥ মাইল। হিমালয়কে বঙ্গোপসাগরে ডুবাইয়া দিলেও হিমালয়ের মাথা জলের উপরে থাকিবে। কিণ্ডারগার্টেন ও পদার্থপরিচয় শিক্ষায় এই প্রথা যথেষ্ট পরিমাণ অনুসৃত হইয়া থাকে। এও প্রকারান্তরে "জ্ঞাত পদার্থের সহিত অজ্ঞাতের তুলনা।"

ইহারই আবার প্রকার ভেদে 'বিশ্লেষণ' ও 'সংশ্লেষণ' নামে দুই প্রথা আছে। কাপড়ের বিষয় বুঝাইতে গিয়া যখন আমরা তাঁতি, মাকু, নলী, তাঁত, সূতা, তুলা প্রভৃতির উল্লেখ করি তখন বিশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ কাপড় ছিন্ন করিয়া তাহার পরীক্ষা) অবলম্বনকারি। কিন্তু যখন কাপড়ের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া,—তুলা হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া, তাঁত দ্বারা কাপড় বয়ন হয়—এইরূপ বুঝাই, তখন সংশ্লেষণ প্রথা (অর্থাৎ সংযোগ করা) অবলম্বন করি। ইহাও প্রকারান্তরে আরোহী ও অবরোহী প্রথা (১০৮ পৃঃ দেখ)।

জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্রম।—(১) আমাদিগের চিত্ত সর্ব্বদাই নবনব জ্ঞান লাভের জন্য উন্মুখ। (২) এই উন্মুখীবৃত্তি লইয়া আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। (৩) পরে এই সমস্ত নূতন জ্ঞান তুলনা করিয়া বিচার করি। (৪) এইরূপ বিচার করিয়া একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। (৫) শেষে এই সিদ্ধান্তের সত্য কার্য্য বিশেষে প্রয়োগ করিয়া জ্ঞান লাভের উপকারিতা উপলব্ধি করি। জ্ঞানোপার্জ্জনের এই ক্রম দৃষ্টে পণ্ডিতগণ শিক্ষাদানের যে "অষ্ট বিধান" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইল :—

১। বিচার।—কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে হইলেই বিচার আবশ্যক। পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা বিচার কার্য্যে সহায়তা হয়। আরোহী অবরোহী প্রণালী ও সংশ্লেষণ বিশ্লেষণের প্রথা বিচারের অঙ্গস্বরূপ।

সুপ্রসিদ্ধ হক্‌সলী সাহেব বিচারের নিম্নলিখিত প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন :—

(১) কার্য্যকারণ পর্য্যবেক্ষণ করা। (পরীক্ষণও এক প্রকার পর্য্যবেক্ষণ)।

(২) সমধর্ম্মাক্রান্ত দ্রব্য সমূহকে এক শ্রেণী ভুক্ত করা।

(৩) এক শ্রেণীভুক্ত বস্তুকে সমধর্ম্মাক্রান্ত অনুমান করা।

(৪) আর আমাদিগের এইরূপ অনুমান, সত্য কিনা তাহা প্রমাণ করিয়া নির্দ্ধারণ করা। (Huxley—Lay Sermons.)

২। অন্তর্বোধ।—জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্য ভিন্ন অজ্ঞাত বিষয়ের অন্তর্বোধ জন্মিতে পারে না। এইরূপ বর্ত্তমান ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ, সরল ভিন্ন জটিল, ও সহজের সাহায্য ভিন্ন কঠিন বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বালককে 'ম্যামথ' বুঝাইবার সময় যদি বলা যায় যে 'ম্যামথ' ম্যাস্‌টোডনের মত জীব' তবে বালকের কোনরূপ অন্তর্বোধ হইবে না। কিন্তু যদি পরিচিত হস্তির সহিত তুলনা করিয়া ম্যামথের বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করা যায়, তবে বালকের একটা ধারণা হইতে পারে।

যখন অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানবান করিতে হইলে, অজ্ঞাত বিষয়াদি জ্ঞাত বিষয়াদির সাহায্য ব্যতীত তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, তখন জ্ঞানদান বিষয়ে আমাদিগের দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য :—(১) সেই অজ্ঞাত বিষয় আর (২) যাহাকে সেই বিষয়ক জ্ঞান দান করিতে হইবে, তাহার তৎতুল্য বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিমাণ। যেমন বিদেশী ভাষার অপরিচিত কথাগুলি আমরা আমাদিগের পরিচিত দেশী ভাষায় অনুবাদ করিয়া বুঝিয়া থাকি, সেইরূপ অপরিচিত বিষয়কেও পরিচিত বিষয়ে অনুবাদ করিয়া তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করি। সুতরাং বালকের জ্ঞানের সীমা ও তাহার পরিচিত বিষয়ের পরিমাণ, শিক্ষকের নিতান্তই

জানা আবশ্যক; কারণ তাহা না হইলে শিক্ষক হয়ত এক অজ্ঞাত বিষয় বুঝাইতে গিয়া অন্য অজ্ঞাত বিষয়ের অবতারণা করিয়া বসিবেন। যে প্রথাতে এক শব্দের অর্থ বোধের নিমিত্ত অন্য আর একটা প্রতিশব্দ মাত্র দিয়া শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষানামে অভিহিত করা যায় না—অন্য যে কোন নামে ইচ্ছা অভিহিত করিতে পার। (Dr. W. T. Harris—Philosophy of Education.)

৩। উদ্দেশ্য।—একটা নির্দ্দিষ্ট ও সুখকর উদ্দেশ্য সম্মুখে ধরিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। আর বালকগণকেও সেই উদ্দেশ্যের আভাস প্রদান করিতে হইবে।

শেষে কি হইবে ইহা না জানিলে, বালক তাহার সমস্ত সামর্থ নিয়োগ করিতে পারিবেনা। যদি শেষ ফলের আভাস পায়, তবে সে তদনুরূপ সামর্থ প্রয়োগ করিতে যত্ন করিবে। অপরিচিত স্থানে, অজ্ঞাত রাস্তা দিয়া, বালককে লইয়া যাইতেছ—তাহা হাতে ধরিয়া কোন প্রকৃত স্থানেই হউক বা প্রশ্ন করিয়া কোন কল্পিত বিষয়েই হউক, সেই স্থান বা বিষয়ের কথা তাহাকে না বলিয়া দিলে সে কিছুতেই অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিবে না। তুমি জোর করিয়া গন্তব্য পথে লইয়া যাইতে পার কিন্তু সে সেখানে গিয়াই দিশে হারা হইয়া পড়িবে। কোন্ রাস্তায় আসিয়াছে, তাহা আর সে তখন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবেনা। কার্য্যের ফলের সহিত তাহার পরিশ্রমের যে কি সম্বন্ধ তাহাও সে পরিমাণ করিতে পারিবেনা। কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য উপলক্ষ করিয়া কার্য্য করিলে, সেই লক্ষ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত যে আনন্দ ও উৎসাহ হয়, এই অনির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে তাহার সেরূপ কোন সুখোদয়ও হইবেনা। (Dr. Rein—Theorie und Praxis.)

৪। আত্মনির্ভর।—বালকগণ নিজের চেষ্টায় যত শিক্ষা করিতে

পারে, ততই ভাল। আত্মনির্ভরের শক্তি বৃদ্ধিতেই ইন্দ্রিয়াদির পূর্ণবিকাশ সম্ভব। আর এই ইন্দ্রিয়াদির সম্যক বিকাশেই মনুষ্যত্ব।

শিক্ষাকার্য্যে বালকের মনে আত্মাবলম্বনের ভাব পূর্ণমাত্রায় প্রদ্দীপিত করিয়া দিতে হইবে। বালকগণ যাহাতে স্বয়ং সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাহাদিগকে সম্ভবমত অতি কম বলিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে তাহারা স্বয়ং জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষরূপ উৎসাহিত করিতে হইবে। মনুষ্য সমাজ নিজে নিজের শিক্ষাগুরু হইয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। সুফল লাভ করিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক লোককেই সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। স্বয়ং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা সকল কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। (H. Spencer—Education).

৪। পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণ।—আমরা একটী একটী ভাব পরিগ্রহ বা সংগ্রহ করি, আর সেই সমস্ত ভাব একত্র করিয়া অন্তর মধ্যে পরিবীক্ষণ বা বিশেষ রূপে চিন্তা করি। ইহাতেই আমরা শৃঙ্খলাক্রমে একটা বিষয়ের সমস্ত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই।

পরিগ্রহ ও পরিবীক্ষণ যেন মানসিক নিশ্বাস প্রশ্বাস—বাহিরে যেমন অবিরত নিশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে, মনমধ্যে সেইরূপ পরিগ্রহও পরিবীক্ষণের কার্য্য চালাইতে হইবে। ভাবগুলিকে একটী একটী করিয়া সুস্পষ্টরূপে মনোমধ্যে উপলব্ধি করাকেই পরিগ্রহ কহে, আর সেই সকল ভাব সংগ্রহ করিয়া শৃঙ্খলাক্রমে চিন্তা করাকেই পরিবীক্ষণ কহে। বালকগণের এই দুই বৃত্তির অনুশীলনে যত সাহায্য করিবে, তত সুফল পাইবে। (Herbart—Paedagogische Schriften)

৬। কার্য্যাত্মিকা বৃত্তি।—আমরা যাহা চিন্তা করি কি কল্পনা করি তাহা যদি আমরা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারি, তবে সেই চিন্তা ও

কল্পনার বিষয়ের প্রকৃতত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে কাষ্ঠখণ্ড, কাগজ, মৃত্তিকাদির দ্বারা গঠনের এত ব্যবস্থা এই জন্যে। বালক ঘরের বিষয় চিন্তা করিল, আর তথনই কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ঘর নির্ম্মাণ করিল। চিন্তাতে তাহার যে ভ্রম বা ক্রুটী ছিল, কার্য্যে প্রয়োগ কালে সে ভ্রম ক্রুটী সারিয়া গেল। এই জন্য বালকের কার্য্যাত্মিকা বৃত্তিকে সর্ব্বদা জাগরিত রাখা আবশ্যক।

অনেক শিক্ষক ও পিতা মাতা বালকগণের কার্য্যাত্মিকা বৃত্তিকে বৃথা চাঞ্চল্য মনে করিয়া, বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। যে বৃত্তিকে প্রধান অবলম্বন করিয়া বালককে শিক্ষা দান করিতে হইবে, যে বৃত্তির ক্রমবৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতে হইবে, সেই বৃত্তির উচ্ছেদ সাধনে চেষ্টা, কি ভীষণ ভুল! (**Froebel—The Education of Man.**)

৭। অনুরাগ।—অনুরাগ ভিন্ন কোন বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। আবার স্বার্থের সংশ্রব ভিন্ন অনুরাগ জন্মে না।

বালকদিগকে কোন কিছু শিক্ষা করাইয়া সেই বিষয়টী জানিবার প্রয়োজন বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ বুঝাইয়া দিলে পাঠ গ্রহণে সমধিক অনুরাগ হয় এবং নিস্প্রয়োজনীয় কর্ম্মে সময়াতিপাত করা অনুচিত বোধ হইয়া থাকে। যাহাতে আপনার বা অন্যের উপকার দর্শে, এমত সকল বিষয়েতেই কি শিশু, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, মনুষ্য মাত্রেরই বিশিষ্ট মনোযোগ হইয়া থাকে। (ভূদেব—শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব)।

৮। অনুবন্ধ।—শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ পরস্পর সংসৃষ্ট না হইলে এবং অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত না হইলে বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করে না। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি কিরূপে সংসৃষ্ট ইহা বুঝিতে পারিলে, তবে সেই বিষয়গুলির প্রতি আমাদিগের অনুরাগ

জন্মিতে পারে। অতএব শিক্ষার বিষয়গুলিকে জালের সূত্রের মত একটার সহিত অন্যটীকে গ্রন্থিদ্বারা যুক্ত করিতে হইবে। বিষয়গুলিকে পরস্পর যুক্ত রাখিতে হইবে ও সেই সমস্তকে বালকের প্রকৃতির সহিত একেবারে মিশাইয়া দিতে হইবে। বিষয়ই আমাদিগের লক্ষ্য—বিষয়ই শিখাইতে হইবে, শব্দ নয়। (Pestalozi)

এ সকল ছাড়া শিক্ষার আরও বহু বিধান আছে। তবে এই কয়টী বিধান যে বিশেষ আবশ্যকীয় ও সর্ব্ববাদীসম্মত তাহাতে আর ভুল নাই। এই আট বিধানকে প্রথম পথ প্রদর্শক মনে করিয়া শিক্ষক শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইবেন।

শিক্ষাদানের উপকরণাদির ব্যবহার।—শিক্ষাদানের উপকরণের মধ্যে ব্লাকবোর্ডের মত আবশ্যকীয় আর কিছুই নহে। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যতীত সুশিক্ষা দান অসম্ভব। ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বিষয় বা অঙ্কিত চিত্রাদি বালকদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। চক্ষুতে যাহা দেখে তাহাই মনোমধ্যে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

পাঠনা কালে কঠিন শব্দ, জ্যামিতির চিত্র, মানচিত্র প্রভৃতি ব্লাক বোর্ডে লিখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্লাকবোর্ড ভিন্ন অঙ্ক শিখাইবার উপায় নাই। ব্যাকরণ, রচনা, ভূগোল শিক্ষা দানেও ব্লাকবোর্ডের আবশ্যক। পাঠনার সারাংশ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া না দিলে চলে না। কোন প্রয়োজনীয় নিয়ম, সিদ্ধান্ত বা অনুমানের দিকে বিশেষ ভাবে বালকদিগের চিন্তাকর্ষণ করিতে হইলে, ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। দুইটী দ্রব্য তুলনা করিতে হইলে, ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া বা চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিলে যেমন সুবিধা হয় আর কিছুতেই তেমন হয় না। পদার্থপরিচয় ও বিজ্ঞান পাঠনায় বোর্ডেই অর্দ্ধেক কাজ করিতে হয়। ব্ল্যাকবোর্ডের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ব্লাকবোর্ডের উপর উত্তম অক্ষরে

পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। পাঠনার সঙ্গে সঙ্গেই আবশ্যকীয় বিবরণ (সংক্ষেপে), কঠিন শব্দ, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া যাইবে। পাঠনা শেষ হইলে, বোর্ডে পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বালকগণের দ্বারাও বোর্ডে অনেক সময় লিখাইতে হয়। কোন অঙ্ক কঠিন বোধ হইলে বালকের দ্বারা বোর্ডে সেই অঙ্ক কসাইতে হইবে। তাহা হইলে কোথায় তাহার ক্রটী তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বালকের দ্বারা বোর্ডে মানচিত্র ও চিত্রাদি অঙ্কন করানও বিশেষ আবশ্যক।

যাঁহারা চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পটু নহেন তাঁহারা পূর্ব্বেই (যদি সুবিধা থাকে) বোর্ডে আবশ্যকীয় চিত্র অঙ্কন করিয়া রাখিবেন। কিন্তু শিক্ষক পাঠনার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল চিত্র বা মানচিত্র অঙ্কিত করেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বালকেরা চিত্রের প্রত্যেক অংশ অঙ্কনের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে। পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্রের সমস্ত অংশগুলি এক সঙ্গে সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে অংশগুলি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিবার সুবিধা হয় না। তাহা হইলেও সুরঞ্জিত মুদ্রিত চিত্র অপেক্ষা এরূপ পূর্ব্বাঙ্কিত চিত্র অধিকতর ফলপ্রদ।

চিত্র বা মানচিত্রের দাগগুলি একটু মোটা করিয়া না দিলে দূরের বালকেরা ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে না। আর বোর্ডখানিও এমন স্থানে রাখিতে হইবে যে সকল বালক যেন স্থানে বসিয়াই বোর্ডলিখিত বিবরণ অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। বোর্ডের উপর বাহিরের আলো পড়িলে দেখার অসুবিধা হয়।

ভূগোল ইতিহাসের পাঠ দান কালে মানচিত্র, পদার্থপরিচয় শিক্ষায় বস্তু বা তাহার কোন প্রতিকৃতি এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় যন্ত্রাদির ব্যবহার নিতান্তই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থপরিচয় ও বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদে বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

শ্রেণী পাঠনা।—পূর্ব্বে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথায় বিশেষ কোন শ্রেণী ভাগের ব্যবস্থা ছিল না। এখনও টোলে কোন শ্রেণী নাই। যে, যে পরিমাণ পারে, সে সেই পরিমাণ অভ্যাস করে। যতগুলি শিক্ষার্থী ততগুলি শ্রেণী। এই প্রথাতে বালকগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অল্প কি অধিক সময়ে পাঠ সমাপন করিয়া থাকে। প্রমোশন পাইল না বলিয়া কাহাকেও তাড়াইয়া দিতে হয় না। সকলেই শিক্ষা লাভ করে, তবে কেহ অল্প সময়ে, কেহ অধিক সময়ে। বর্ত্তমান (ইউরোপীয়) প্রণালী অনুসারে এক সঙ্গে অনেক ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে। সুবিধার মধ্যে এই যে, এই প্রথায় অল্প সময়ে অনেক ছাত্রকে পড়ান যায়, আর ছাত্রেরাও প্রতিযোগিতায় উন্নতি করিতে বিশেষ যত্ন করে। এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এতদূর শিক্ষা করিতে হইবে, ইহা মনে থাকে বলিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। আর অসুবিধা এই যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন বালকগণকে একসঙ্গে শিখাইতে গিয়া উভয়েরই কিছু অনিষ্ট করা হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বালক শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি করিতে পারেনা, কারণ তাহাকে সকলের সঙ্গে চলিতে হয়। আর স্থূল বুদ্ধিবালকও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বালককে অনুসরণ করিতে পারেনা; হয়ত তাহাকে শেষে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হয়। এক মাঝারী ছেলেদের কোন অসুবিধা হয় না। আমাদিগের সাবেক প্রথাতেও দোষ আছে, বর্ত্তমান প্রথাতেও দোষ আছে। তবে বর্ত্তমান প্রথাকে উন্নত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন।

এক সঙ্গে অনেক ছাত্র পড়াইতে হইলে বিদ্যা ছাড়া আরও গুণ চাই। ছাত্রগণকে শাসনে রাখিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে, তাহাই করিতে হইবে। শাসনের ভয়েও কার্য্য করে বটে কিন্তু শাসন একটু ঢিল পড়িলেই, বালক আবার নিজমূর্ত্তি

ধারণ করে। আর ক্রমাগত শাসনে শাসনে বালকেরা ঘ্যাচড়াও হইয়া পড়ে।

"কি করিতে হইবে, বলিয়া দাও। কেমন করিয়া করিতে হইবে, বুঝাইয়া দাও। তারপর বালক তাহা করে কিনা, দেখিয়া লও।"—এই তিনটী ক্ষুদ্র বাক্য শিক্ষা দানের সংক্ষিপ্ত সার।

সকল বালকের দিকেই দৃষ্টি রাখিবে। ভাল ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে না। বরং দুর্ব্বল ছেলেটীর দিকেই একটু বেশী দৃষ্টি রাখিবে। পাঠনার সময় সকলেই যেন বুঝিতে পারে যে, সকলের প্রতিই শিক্ষকের সমদৃষ্টি আছে।

যে বালকটী অধিক দুর্ব্বল, তাহার জন্য একটু স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইতে পারে। সকলের সঙ্গে সমান অঙ্ক না দিয়া তাহাকে একটা সহজ অঙ্ক দাও, সকলকে যে পরিমাণ মুখস্থ করিতে দিবে তাহাকে তার চেয়ে একটু কম দাও। এইরূপে তাহাকেও এক বৎসরে না হউক দুই বৎসরে শ্রেণীর উপযোগী করা যাইতে পারে।

অধ্যাপনা বেশ সুখপ্রদ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলেই বালকগণ গোলমাল না করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়া শুনিবে।

পাঠনার সময় বালকগণকে বাহিরে যাইতে না দেওয়াই উচিত। এক শ্রেণীর বালক অন্য শ্রেণীতে স্লেট বা পেন্‌সিল আনিতে গিয়া অনেক সময় উৎপাত করে। এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। অন্য কোন লোককে পাঠনার সময় শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দিবেনা। একে ছেলেদের চঞ্চল মন, তাহাতে এরূপ বাধা পাইলে তাহাদের মনঃসংযমে ব্যাঘাত ঘটিবে।

পড়াইতে পড়াইতে উঠিয়া যাওয়া বড়ই দোষের বিষয়। যে সকল পুস্তক বা উপকরণের আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

গৃহে পাঠাভ্যাস।—সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আধিক্য বশতঃ বালকগণকে সময় সময় বাড়ীতেও পাঠাভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু এরূপ পাঠ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, বালকগণের বয়স ও গৃহপাঠ্য বিষয়ের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের বয়স বিবেচনায় তাহাদিগের গৃহে পাঠের নিমিত্ত কোনরূপ বিষয় নির্দ্ধারণ না করাই উচিত। তাহারা যে সামান্য বিষয় পাঠ করে তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। বাড়ীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহারা খেলা করিবে। অপরিণত মস্তিষ্ক, অপরিমিত সঞ্চালনে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত ডিরেক্টার পণ্ডিত সর এলফ্রেড ক্রফট্ সাহেব বয়স হিসাবে বালকগণের পাঠের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া এক আদেশ প্রচার করেন। আমার যতদূর মনে হইতেছে বালকগণের মানসিক পরিশ্রম বিষয়ে তিনি নিম্নলিখিত রূপ সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন :—

৫ হইতে ৭ বৎসর	...	...	...	২ ঘণ্টার অধিক নয়।	
৭ হইতে ১০ বৎসর	...	...	...	৩ ”	”
১০ হইতে ১২ বৎসর	...	...	...	৫ ”	”
১২ হইতে ১৪ বৎসর	...	...	...	৭ ”	”
১৪ হইতে ১৭ বৎসর	...	...	...	৯ ”	”
১৭ হইতে ২১ বৎসর	...	...	...	১১ ”	”
২১ হইতে ২৫ বৎসর	...	...	...	১২ ”	”

বিদ্যালয়েই সমস্ত বিষয় পড়াইয়া দিতে পারিলে আর বাড়ীতে পাঠের আদেশ করিবার আবশ্যকতা হয় না। কর্সিয়াং ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ে অবস্থান কালে দেখিয়াছি যে অনেক ছাত্র (আমাদিগের মধ্য শ্রেণীর সমান শ্রেণীভুক্ত) বাড়ীতে পাঠাভ্যাস করে না। যত কিছু পড়াশুনার কাজ সমস্তই বিদ্যালয়ের ৫ ঘণ্টায় শেষ হয়। এমন কি বালকগণের সাহিত্য

পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকও থাকে না। ব্যাকরণ, ভূগোল, বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পাটীগণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়, শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দেন। তবে এক কথা এই যে এরূপ বন্দোবস্ত বোর্ডিংস্কুলেই (অর্থাৎ যেখানে বালকেরা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে থাকে) সম্ভবপর। ডেস্কুলের (অর্থাৎ যেখানে বালকেরা নির্দ্দিষ্ট সময় আসে এবং ছুটি হইলেই বাড়ী চলিয়া যায়) কার্য্যে বড়ীতে কিছু কিছু পড়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইতে পারে। শিক্ষক বালকগণকে বিদ্যালয়ে কি পরিমাণ শিখাইয়া দিবেন ও বালকেরা নিজ চেষ্টায় গৃহে কি পরিমাণ পাঠাভ্যাস করিবে তাহা নিম্নের চিত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারা যাইবে।

১১ চিত্র। বিদ্যালয়ে ও গৃহে পাঠের পরিমাণ।

গৃহে পাঠের আদেশ করিবার সময় নিম্ন লিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক :—

(১) প্রত্যেক বালকের অভিভাবক এরূপ উপযুক্ত নহেন যে বালককে সমস্ত বিষয়ে উপযুক্ত রূপ সাহায্য করিতে পারেন। ইহাই মনে রাখিয়া কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বালকের খেলার সময়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে তাহাদিগের স্বাভাবিক বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। খেলার সময় বাদ রাখিয়া কার্য্যের হিসাব করিবে।

(৩) কঠিন বিষয়ে পাঠ দিলে হয়ত বালকেরা অভ্যাস করিবেনা, না হয় অন্যের নকল করিয়া আনিবে। সুতরাং সুফল না হইয়া কুফল হইবে। অতএব কঠিন বিষয়ে পাঠ দেওয়া উচিত নহে।

(৪) বাড়ী হইতে বালকেরা যে সকল কাজ করিয়া আনিবে তাহা শিক্ষক উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবেন, নচেৎ বালকেরা বাড়ীর কাজে উপযুক্ত রূপ মনোযোগ করিবে না।

(৫) বাড়ী হইতে কোন কাজ করিয়া না আসিলে তাহাকে ছুটীর পর বিদ্যালয়ে আবদ্ধ করিয়া সেই কাজ করাইয়া লইবে। মুলতবী পড়িলে বালক আর সারিয়া উঠিতে পারিবে না। যে বালক ছুটির দিনের জন্য কাজ মুলতবী রাখিয়া দেয়, তাহার কাজ কখনও শেষ হয় না। একবার কোন এন্‌ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষকগণের পরিচালনার জন্য গৃহপাঠের নিম্নলিখিত রূপ একটা তালিকা করিয়াছিলাম ঃ—

বিষয়	মধ্য বিভাগ		উচ্চ বিভাগ	
	পরিমাণ	সময়	পরিমাণ	সময়
ইং সাহিত্য	১০ লাইন	¾ ঘণ্টা	২০	১ ঘণ্টা
ইতিহাস	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	½ ঘণ্টা	১ পৃষ্ঠা	¾ ঘণ্টা
ভূগোল	...	½ ঘণ্টা	...	½ ঘণ্টা
ইং বাং বা সংস্কৃত ব্যাকরণ	...	½ ঘণ্টা	...	½ ঘণ্টা
অঙ্ক, পাটীগণিত, বীজগণিত পরিমীতি	২টী	¼ ঘণ্টা	৪টী	½ ঘণ্টা
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা	১টী	½ ঘণ্টা	২টী	¾ ঘণ্টা
জ্যামিতির অনুশীলন	১টী	¼ ঘণ্টা	১টী	¼ ঘণ্টা

বিষয়	মধ্য বিভাগ		উচ্চ বিভাগ	
	পরিমাণ	সময়	পরিমাণ	সময়
রচনা	৮।১০ লাইন	½ ঘণ্টা	১২।১৪ লাইন	¾ ঘণ্টা
অনুবাদ	৪।৫ লাইন	¼ ঘণ্টা	৮।১০ লাইন	¼ ঘণ্টা
মানচিত্র	১ খান	১ ঘণ্টা	১ খান	১ ঘণ্টা
ড্রইং	...	½ ঘণ্টা	...	১ ঘণ্টা
সংস্কৃত	...	...	৮।১০ লাইন	১ ঘণ্টা
অনধীত বিষয়	...	¼ ঘণ্টা	...	½ ঘণ্টা

বাড়ীতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি বিষয়ক অধীতপাঠের পুনরালোচনা করিবে মাত্র। এই তালিকায় সেই পুনরালোচনার সময়ই নির্দ্দিষ্ট হইল। শ্রেণীতে অঙ্ক কিবা জ্যামিতি শিক্ষা দিবার পরে,আলোচনার জন্য ২।৩টী নূতন (কিন্তু সহজ) অঙ্ক বা একটী অনুশীলন বোর্ডে লিখিয়া দিবে। বাড়ী হইতে বালকেরা এই সকল অঙ্ক বা অনুশীলন কসিয়া আনিবে। রচনা বা অনুবাদে আবশ্যক মত নূতন কি পুরাতন বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতে পার।

এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে গৃহপাঠের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে মধ্যবিভাগের ছাত্রগণকে ২।৩ ঘণ্টা ও উচ্চ বিভাগের ছাত্রগণকে যেন ৩।৪ ঘণ্টার অধিক বাড়ীতে পড়িতে না হয়। তবে ড্রইং ও রঙের দ্বারা মানচিত্রাদি অঙ্কনে বালকগণ ক্লান্তি বোধ করেনা। এরূপ কার্য্যের সঙ্গে অন্য কার্য্যের সময় একটু অধিক হইলেও হইতে পারে। বেশী অঙ্ক কসিতে দিলে কি বেশী পড়া মুখস্থ করিতে দিলে কোন কাজ হয় না।

কারণ বালকেরা করে না ও করিতেও পারে না। আর আপাততঃ জোর করিয়া করাইলে ভবিষ্যতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হয় না। নিম্ন বিভাগের ছাত্রের জন্য বাড়ীতে কোন কার্য্যের ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে একটী গোপনীয় কথা।—সকল ব্যবসায়েরই একটা গুমর আছে। শিক্ষকতা কার্য্যেও দুই একটা গুমর আছে। পাকা শিক্ষকগণকে আর সে সকল গুমরের কথা শিখাইতে হয়না। কিন্তু শিক্ষানবিস শিক্ষক ও নূতন শিক্ষকের পক্ষে ব্যবসায়ের গোপন কথা দু একটা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

যে দিন প্রথমে স্কুলে যাইবে সেদিন অনেক বিষয়ে সাবধান হইবে। (১) পোষাক পরিচ্ছদ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি সম্পন্ন হইবে, "আগে দর্শন ধারী পরে গুণ বিচারী" (২) ঠিক ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীতে প্রবেশ করিবে (৩) বেশ গম্ভীর ভাব ধারণ করিবে, বেশী কথা বলিবেনা। (৪) শ্রেণীর পাঠ্যাদির বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইবে ও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিবে। (৫) শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াই কাযা আরম্ভ করিয়া দিবে। (৬) নূতন শিক্ষক দেখিলে দুষ্ট বালকেরা উৎপাত করিতে চেষ্টা করিবে। আবশ্যক হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্ট বালকটীকে দু চার ঘা লাগাইয়াও দিবে। (৭) যদি প্রথম দিন বিশেষ ভাবে প্রস্তুত না হইয়া থাক তবে শ্রেণীতে কখনই উপস্থিত হইবে না। তুমি যে প্রস্তুত হইতে পার নাই, একথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বুঝাইয়া বলিলেই তিনি আর তোমাকে শ্রেণীতে যাইতে বলিবেন না। প্রথম দিনে বালকেরা যদি বুঝিতে পারে যে তুমি সময়নিষ্ঠ, সুপণ্ডিত আর শাসনেও খব কড়া, তবে তাহাদিগের সেই ধারণা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যদি প্রথম দিনেই তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমি ভাল পড়াইতে পারনা ও দুষ্টামী করিলে কিছু বলনা, তবে তুমি শেষে হাজার পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর, কি হাজার শাসন কর, সুফল লাভ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে।
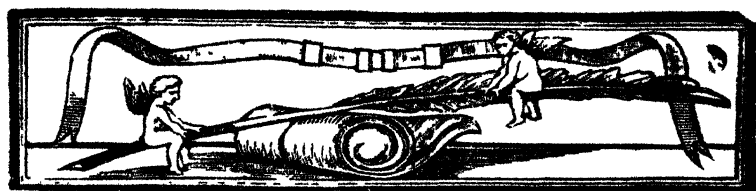
বিবিধ বিধান।

দ্বিতীয় ভাগ—বিশেষ বিধান।

"Teach things, not words."—Pestalozzi.

প্রথম প্রকরণ—শরীরপালন বিষয়ক।

১। ব্যায়াম।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম।"

উপকারিতা।—(১) ব্যায়াম চর্চ্চায় শরীর সবল ও সুঠাম হয়। (২) মানসিক চিন্তায় মস্তিকে যে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ব্যায়ামাদির অনুশীলনে সেই রক্ত মস্তিষ্ক হইতে শরীরের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। (৩) বক্ষঃস্থল প্রসারিত হওয়াতে হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের শক্তি বৃদ্ধি হয়। (৪) রোগ ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (৫) দৈহিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। (৬) মেরুদণ্ড সরল ও সবল হওয়াতে শরীরের শ্রী সুন্দর হয়।

(৭) মনোরম অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা জন্মে। (৮) মানসিক পরিশ্রম করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায় (৯) শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জন্মে (১০) নৈতিক চরিত্র গঠনের বিশেষ সহায়তা হয়।

প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, ক্ষীণ কটিদেশ, স্ফীত পেশী সমূহ কেবল যে দৃঢ়কায় ব্যক্তির লক্ষণ তাহা নহে, এ সমস্ত সুশ্রী স্ত্রী পুরুষের লক্ষণও বটে। স্থূল কটিদেশ, অপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল, অনুন্নত মাংস পেশী ও উন্নত উদর কদাকারের লক্ষণ। আমাদিগের দেশে পুর্ব্বকালে নানারূপ ব্যায়ামাদির অনুশীলন হইত। তন্মধ্যে নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দপ্রদ ব্যায়াম ছিল। স্ত্রী নৃত্য লাশু ও পুং নৃত্যকে তাণ্ডব বলিত। এখন পুরুষের নৃত্য নাই, স্ত্রীলোকের নৃত্য ও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। নৃত্যে বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও পদদ্বয়ের শক্তি বৃদ্ধি হয়। বালকদিগের বিদ্যালয়ে যেরূপ ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা আছে, বালিকা বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কিছু করা আবশ্যক। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে বালিকাদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা আছে। এই কারণে উক্ত দেশ সমূহের স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই সবল ও সুশ্রী। অন্যান্য বিষয়ের সহিত, ব্যায়াম বিষয়ক কিছু জ্ঞানও শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। জর্ম্মণ দেশীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত করিতে হইলে, দরখাস্তকারীকে, অন্যান্য গুণের সহিত, তাঁহার ব্যায়াম বিষয়ক গুণ ও ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি খেলা বিষয়ে পারদর্শিতার উল্লেখ করিতে হয়।

ওজন ও উচ্চতা।—যে সমস্ত বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা আছে, সেখানে সুবিধা হইলে একটা মানুষ ওজনের যন্ত্র (রেলওয়ে ষ্টেশনের ওজন যন্ত্রের মত) ও একটা উচ্চতা মাপের যন্ত্র (ইঞ্চ ও তাহার ভাগ যুক্ত একখানি লম্বা কাষ্ঠখণ্ড—তাহার সহিত লম্ব ভাবে একখানি সরু কাষ্ঠ খণ্ড এরূপ ভাবে সংলগ্ন যে, এই সরু কাষ্ঠখণ্ড ইচ্ছা মত উপর নীচে উঠাইতে নামাইতে পারা যায়। বালককে কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট দাঁড়া করাইয়া, সেই সরু কাষ্ঠ খণ্ড তাহার মাথার উপরে রাখিলে, যে চিহ্নের নিকট এই কাষ্ঠ খণ্ডের গোড়া থাকে, তাহাই বালকের উচ্চতা) রাখা আবশ্যক। প্রত্যেক তিন মাস অন্তর বালকগণের ওজন ও উচ্চতা নির্দ্ধারণ করিয়া পূর্ব্বের ওজন ও উচ্চতার সহিত তুলনা করিতে হইবে।

যদি ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি না পাইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত তালিকাদ্বয়ে সুস্থকায় বালক বালিকাদিগের ক্রম বৃদ্ধির একটা মোটামুটি পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(এই দুই তালিকা কারটার ও বট্‌কৃত ইংরাজী 'ব্যায়ামানুশীলন' হইতে গৃহীত হইল।)

বালকগণের বৃদ্ধির তালিকা।

(একটা পয়সার ব্যাস এক ইঞ্চ; এক পৌণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের)।

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চের হিসাব)	বাৎসরিক উচ্চতা বৃদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাব)	বাৎসরিক ওজনের বৃদ্ধি।
৫	৪১·১৫		৩৭·৭১	
৬	৪৩·১৮	২·০৩	৪০·৬৭	২·৯৬
৭	৪৫·১৫	১·৯৭	৪৪·০	৩·৩৩
৮	৪৬·৯২	১·৭৭	৪৭·১৫	৩·১৫
৯	৪৯ ৫২	২·৬	৫১·২	৪·১৪
১০	৫১ ৫২	২·০	৫৫·৫	৪·২১
১১	৫২·৮৭	১·৩৫	৬০·১৫	৪·৬৫
১২	৫৪ ৪৫	১·৫৮	৬৪·৫২	৪·৩৭
১৩	৫৬·৫৬	২·১১	৭১·০	৫·৪৮
১৪	৫৮·৫৬	২·০	৭৯·৫৭	৮·৫৭
১৫	৬০·৭৭	২· ২১	৯১. ৪৩	১১·৮৬
১৬	৬৩·৪২	২·৬৫	১০৭·১৬	১৬·৪৩
১৭	৬৪·৯৫	১·৫৩	১১৮·০৮	১০·২২
১৮	৬৫·৬৯	১·৭৪	২২৭·২৫	৯·১৭
১৯	৬৬·৩৭	·৬৮	১৩১·৪৮	৪·২৩
২০	৬৬·৮০	·৪৩	১৩৫·২৮	৩·৮
২১	৬৬·৮৭		১৩৬·২৮	

বালিকাদিগের বৃদ্ধির তালিকা।

বয়স	উচ্চতা (ইঞ্চের হিসাবে)	বাৎসরিক উচ্চতার বৃদ্ধি	ওজন (পৌণ্ডের হিসাবে)	বাৎসরিক ওজনের বৃদ্ধি।
৫	৪১·২৯		৩৯·৬৬	
৬	৪৩·৩৫	২·০৬	৪৩·২৮	৩·৬২
৭	৪৫·৫২	২·১৭	৪৭ ৪৬	৪·১৮
৮	৪৭·৫৮	১·৭৯	৫২·০৪	৪·৫৮
৯	৪৯·৩৭	১·৯৭	৫৭·০৭	৫·০৩
১০	৫১·৪২	২·০৮	৬২·৩৫	৫ ২৮
১১	৫৩·৪২	২·৪৬	৬৮ ৮৪	৬·৫৯
১২	৫৫·৮৮	২·২৮	৭৮·৩১	৯·৪৭
১৩	৫৮·১৬	১·৭৮	৮৮·৬৫	১০·৩৪
১৪	৫৯·৯৪	১·১৬	৯৮·৪৩	৯·৭৮
১৫	৬১·১০	·৪৯	১০৬·০৮	৭·৬৫
১৬	৬১·৫৯	·৩৩	১১২·০৩	৫·৯৫
১৭	৬১·৯২	·০৩	১১৫·৫৬	৩·৫০
১৮	৬১·৯৫		১১৫·৫৬	

ব্যায়ামের বয়স।—তালিকা লিখিত সংখ্যাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে বালকেরা একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত একটু একটু করিয়া বাড়ে, একাদশের পর হইতেই তাহাদের বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ভাবে খুব বৃদ্ধি হইয়া, ১৭ হইতে আবার বৃদ্ধির পরিমাণ কমিতে থাকে; ২১ বৎসর পরে আর বড় একটা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না।

বালিকাদিগের সম্বন্ধেও সাধারণ বৃদ্ধির নিয়ম এইরূপ। তবে বয়সের কিছু তারতম্য আছে। ৯ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি কম মাত্রায়; তার পর হইতে বৃদ্ধির মাত্রা বেশী হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত এইরূপ

অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। তার পর আবার অল্প অল্প বৃদ্ধি হইয়া ১৮ বৎসরেই শেষ হয়।

বালক বালিকার স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধির বিষয় শিক্ষা কার্য্যে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। ৫ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিশেষ কোন রূপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে। কারণ এ সময়ে বাল-স্বভাব-সুলভ-চাঞ্চল্য বশতঃ বালকেরা ছুটাছুটি করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকে। ১২ হইতে ১৬ বৎসর (বালিকার পক্ষে ১০ হইতে ১৩) পর্য্যন্ত শারীরিক বৃদ্ধির মাত্রার আধিক্য বশতঃ দেহস্থ স্নায়ু, পেশী প্রভৃতি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে। এ সময়ে বিশেষ সাবধানে ব্যায়ামাদি কার্য্য পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। সামান্য পরিমাণ সহজ ব্যায়ামাদির অনুশীলন করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সময়ে ব্যায়ামের মাত্রা অধিক হইলে, উত্তেজিত স্নায়ুপেশী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সুতরাং বালক বালিকার শরীর বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। যাহারা এইরূপ বয়সে অত্যধিক মাত্রায় অঙ্গ সঞ্চালন করে তাহারা প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা এ বয়সে বালক বালিকার বিবাহ দেওয়াকে স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানি জনক মনে করিয়া থাকেন। তার পর ১৬ হইতে ২১ পর্য্যন্তই ব্যায়াম চর্চ্চার উপযুক্ত কাল। ২১ বৎসরের পর যে ব্যায়াম চর্চ্চার আবশ্যকতা নাই তাহা বলিতেছি না। ২১ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কাল। আমরা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করিতেছি বলিয়া, ২১ বৎসরের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র।

১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকার ব্যায়াম সম্বন্ধে পৃথক্ ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে। এ বয়স পর্য্যন্ত বালক বালিকার শক্তির বিশেষ কোনরূপ তারতম্য দেখা যায় না। তবে ১৩ বৎসরের পর

হইতে বালকের শক্তি বালিকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হয় বলিয়া, ব্যায়ামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বালক বালিকার দৈহিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাঙ্গীন ব্যায়ামের নিতান্ত প্রয়োজন।

১৩ বৎসরের নিম্ন বয়সের বালক বালিকার জন্য (বিশেষ ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত) নানাবিধ খেলাই অঙ্গ সঞ্চালনের উপযুক্ত বিধি। তবে এই বয়সের বালক বালিকাদিগকে সামান্যরূপ ড্রিল করান যাইতে পারে। কিন্তু বার ব্যায়াম (প্যারালেল, হরাইজন্ট্যাল, ট্র্যাপিজ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যায়াম) নিষিদ্ধ। ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত পেশী সমূহের বিশেষ উন্নতি হয় না—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই জন্য এই বয়সে তাহাদিগের হস্তের মাংসপেশী বার ব্যায়ামের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী থাকে। সামান্যরূপ দেশী ব্যায়াম (নিহুর ও বৈঠক) করান যাইতে পারে। কিন্তু কঠিন ব্যায়াম, (ডন, চাল ও কুলাণ্ট) যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাহুর শক্তির আবশ্যক করে, তাহা না করানই যুক্তি। হস্তের পেশীর পূর্ব্বে পায়ের পেশী উন্নত হইয়া থাকে। এনিমিত্ত যে সকল ব্যায়ামে পায়ের সঞ্চালনের আবশ্যক তাহাই পূর্ব্বে আরম্ভ করাইতে হইবে।

ব্যায়ামের সময়।—কেবল বয়স বিবেচনা করিলেও চলিবে না। বালক কোন রোগ গ্রস্ত কিনা, প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত আহার পায় কিনা, তাহাদিগের কোন অঙ্গ বিকল কিনা, রাত্রে তাহাদিগের সুনিদ্রা হয় কিনা, এ সমস্ত বিবেচনা করা আবশ্যক। এক সঙ্গে ড্রিল (বা দেশী কসরৎ) করাইতে হইবে বলিয়া সমস্ত ছাত্রকেই এক দলভুক্ত করা বিধেয় নহে।

এইকথা বিশেষ রূপ মনে রাখা আবশ্যক যে, ক্লান্তি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই বালকগণকে ব্যায়ামাদি হইতে বিরত করিতে হইবে।

তবে অভ্যাসে যখন শক্তি বৃদ্ধি পায়, তখন তত সহজে ক্লান্তি উপস্থিত হয় না। সেই জন্য প্রথমে ৫ মিনিটের অধিক কাল ব্যায়ামাদির অনুশীলন কর্ত্তব্য নহে। শেষে ধীরে ধীরে ১০।১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আবার বিনা বিশ্রামে এক সঙ্গে ১৫ মিনিটকাল ব্যায়াম করানও যুক্তি যুক্ত নহে। ১০ মিনিটই সাধারণতঃ কঠিন ব্যায়ামের পক্ষে দীর্ঘ সময়। আর এক বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে, ক্লান্তি উপস্থিত হইলেই বালকেরা হাঁপাইতে আরম্ভ করে। এই সময় অধিক বায়ুর প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহারা নাকে মুখে বায়ু গ্রহণ করিতে থাকে। কিন্তু মুখের দ্বারা বায়ু গ্রহণ অনিষ্টকর। বালকগণ যাহাতে মুখ বন্ধ রাখিয়া, কেবল নাকের সাহায্যেই শ্বাসের কার্য্য করে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাবধান করিতে হইবে।

বালকেরা অপরাহ্নে ছুটির পর হইতে ক্রিকেট ফুটবল, হকী, হাডুডুডু প্রভৃতি খেলিতে আরম্ভ করে, আর সন্ধ্যার যে কাল পর্য্যন্ত মানুষ দেখা যায় সে পর্য্যন্ত ছাড়ে না। ফলে ইহাই হয় যে, রাত্রে আর তাহারা পাঠাদির কার্য্য করিতে পারে না। অতিশয় ক্লান্তি বশতঃ শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়ে। কেবল ইহাই নহে, প্রাতঃকালে উঠিতেও দেরী করিয়া থাকে। বিশেষ কোন ম্যাচের (প্রতিযোগীতায় খেলা) বন্দোবস্ত থাকিলে পৃথক কথা, কিন্তু সাধারণতঃ ১০।১৫ মিনিটের অধিক কাল খেলিতে দিবে না।

অঙ্গ সঞ্চালন।—ব্যায়ামে যাহাতে সর্ব্বাঙ্গের পরিচালনা হয় এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বার ব্যায়ামে কেবল হস্ত ও বক্ষঃস্থলের পেশীর চালনা হয়। ফুটবলে পায়ের অধিক সঞ্চালন হয়, ক্রিকেটে বাহুদ্বয়ের। কুস্তি, ডন প্রভৃতি ভূব্যায়ামে নানারূপ অঙ্গের সঞ্চালন হইয়া থাকে। এই জন্য ব্যায়ামের রুটিন প্রস্তুত করিবার সময়

পর্য্যায়ক্রমে যাহাতে সকল অঙ্গেরই উপযুক্তরূপ সঞ্চালন হইতে পারে, সেরূপ বিধান করা উচিত। যাহারা কেবল বার ব্যায়াম অভ্যাস করে, তাহাদিগের বাহুর ও বক্ষের পেশী সমূহ বেশ স্ফীত ও সবল হইয়া থাকে, কিন্তু পায়ের পেশীগুলি বড়ই ক্ষীণ দেখায়। আবার যাহারা কেবল সাইকেল অভ্যাস করে, তাহাদিগের পায়ের পেশী সমূহ বেশ শক্ত ও সবল হয় বটে, কিন্তু বাহু ও বক্ষঃস্থল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্যায়ামের বিভাগ।—ব্যায়ামাদি সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত (১) শক্তি সাপেক্ষ (২) সহন সাপেক্ষ (৩) কৌশল সাপেক্ষ (৪) ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ।

(১) যে সকল ব্যায়াম বা কার্য্যে যথেষ্ট পরিমাণ বলের আবশ্যক হয়, তাহাই শক্তি সাপেক্ষ। বড় বড় পাথর উচ্চে উত্তোলন করা, নিজের স্কন্ধের উপর অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে দাড়া করান, বাঁশের দুইদিকে আট দশটা ছেলে ঝুলাইয়া সেই বাঁশ ঘূর্ণন, ভারী লৌহ বল বা মুদগর উর্দ্ধে ক্ষেপণ প্রভৃতি ব্যায়াম বিশেষ শক্তি সাপেক্ষ। ইহাতে পেশী সমূহের উপরে যে পরিমাণ জোর লাগে, তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায়, ও ক্ষণেকের জন্য রক্ত সঞ্চালনও বদ্ধ হইয়া পড়ে। বালকগণের পেশী সমূহ যেরূপ দুর্ব্বল, তাহাতে এরূপ ব্যায়ামের অনুশীলনে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই কারণে শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ব্যায়াম বিধানে বর্জ্জনীয়।

(২) অধিক শ্রমের কার্য্য না হইলেও, যদি অনেক ক্ষণ এক কার্য্য পরিচালনা করা যায়, তবে তাহাতেও অবসাদ আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কার্য্যের কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া ইহাকে সহন সাপেক্ষ বলে। সাধারণতঃ হাঁটিবার সময় আমরা কোনরূপ কষ্ট বোধ করি না, কিন্তু যদি দূরদেশে অধিকক্ষণ হাঁটিয়া যাইতে হয় তবে কষ্ট বোধ

হয়। বালকগণের পক্ষে অনেকক্ষণ এক কার্য্যে শক্তি নিয়োগ অহিত-কর। মধ্যে মধ্যে শক্তির পুনঃ সঞ্চারের জন্য বিশ্রাম আবশ্যক। এই জন্য সহন সাপেক্ষ ব্যায়ামাদিও বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

(৩) যে সকল ব্যায়ামে কৌশলের আবশ্যক হয়, সে সকল ব্যায়ামও বিদ্যালয়ের পক্ষে উপযুক্ত নহে। কৌশল দেখাইতে হইলে মস্তিষ্কের পরিচালনা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাদির অনুশীলন দ্বারা কেবল যে বালকগণের শক্তি বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য তাহা নহে, মানসিক বৃত্তি গুলিকে বিশ্রাম দেওয়াও ইহার অপর উদ্দেশ্য। সর্প গতি, গবাক্ষের মত অল্প স্থানের মধ্য দিয়া লম্ফ প্রদান করিয়া গমন করা, দড়ির উপর ভ্রমণ, বলের উপর নৃত্য, দুইটা বোতলের উপর ময়ূর হওয়া প্রভৃতি অনেক পরিমাণ কৌশল সাপেক্ষ। বিদ্যালয়ে এ সমস্তের চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য নহে।

(৪) যে সকল ব্যায়ামে ঘন ঘন ও অতি দ্রুতবেগে অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয় তাহাকেই ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ ব্যায়াম বলে। শক্তি সাপেক্ষ ও ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ ব্যায়ামের দ্বারা স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ শরীর সঞ্চালন হইয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়ামে এক সঙ্গে ও বিনা বিরামে পেশী সমূহকে অধিকক্ষণ সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে ঘন ঘন বিরাম ও সঞ্চালন হেতু, পেশী সমূহও ঘন ঘন সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। এই হেতু শক্তি সাপেক্ষ ব্যায়ামে দ্রুত শীঘ্র ক্লান্তি উৎপন্ন করে, ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ ব্যায়ামে তাহা করে না। এই কারণে ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ ব্যায়ামই বিদ্যালয়ের পক্ষে উত্তম। দৌড়, লম্ফ প্রভৃতি যাহাতে হস্ত পদাদি দ্রুত সঞ্চালন করিতে হয় এরূপ ভূব্যায়াম ক্ষিপ্রতা সাপেক্ষ। এই সকল ব্যায়ামে যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গের সঞ্চালন হয়, অল্প সময়ে খুব কম ক্লান্তি বোধ হয়, বালকগণের স্বভাব সুলভ

চপলতা এসমস্ত ব্যায়ামের সহায় হয়, এবং সমস্ত অঙ্গের সমবায় সঞ্চালন হয়। আবার এইরূপ ব্যায়ামে বিরামের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যায়।

নিশ্বাস প্রশ্বাস।—আজ কাল চিকিৎসকেরা বক্ষঃস্থলের উন্নতি বিধানের জন্য পূরক (ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিয়া লওয়া) রেচকের (ধীরে ধীরে প্রশ্বাস পরিত্যাগ করার) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও উন্নত হইলে অনেক দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ও দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। ব্যায়ামশিক্ষাদানের কিছু পূর্ব্বে কোন কোন বিদ্যালয়ে ২৩ মিনিট পূরক ও রেচক করান হইয়া থাকে। পূরক ও রেচকের এইরূপ প্রণালী :—

(১ম) মাথা নীচু করিয়া, দুইহাত প্রসারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানিতে আরম্ভ কর ও সঙ্গে সঙ্গে হাত ও মাথা উঁচু করিতে করিতে মাথা পশ্চাৎদিকে যতদূর হেলাইতে পার তাহা কর।
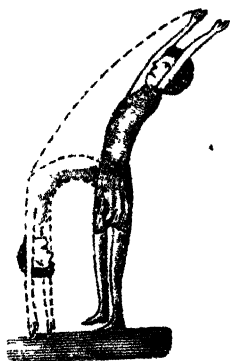
১২ চিত্র। পূরক রেচক।

(২য়) তার পর ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও হাত নামাইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ববৎ মাথা হেট কর। দুই অবস্থাতেই হাত ও মাথা এরূপ ভাবে একসঙ্গে সঞ্চালিত হইবে যে হাতের অগ্র ভাগের উপর যেন সকল সময়েই চক্ষুর দৃষ্টি থাকে।

নিশ্বাস প্রশ্বাসের এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা আর এক উপকার এই হয় যে কোন কার্য্যে সহসা ক্লান্তি বোধ হয় না। যে সমস্ত ব্যায়ামানুশীলনে ক্ষণিকের জন্যও শ্বাসের কার্য্য বন্ধ করিতে হয়, সে সমস্ত ব্যায়ামে বক্ষঃস্থলের উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু বক্ষঃস্থলের উন্নতি বিধানের পক্ষে ধাবন (দৌড়ন) যেরূপ হিতকর সেরূপ আর কোন

ব্যায়াম নহে। আমাদিগের দেশীয় খেলা হাডু-ডুডু এ বিষয়ে ক্রিকেট ফুটবল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উন্নত। হাডু-ডুডু বক্ষঃস্থলের প্রশস্ততা বৃদ্ধির সাহায্য করে।

ড্রিল বা দেশী ব্যায়ামের মধ্যে যে গুলিতে হাত উর্দ্ধে উত্তোলন করিবার রীতি আছে, তাহাতে মস্তকও সঙ্গে সঙ্গে হেলাইয়া হাতের অগ্রভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আসাম সেক্রেটারিয়েট প্রেস হইতে প্রকাশিত ব্যায়ামশিক্ষা পুস্তকের অন্তর্গত, দ্বিহস্ত নিহুর, হস্তপদ প্রসারণ মুখাবর্ত্তন নিহুর ও ও নিশান ডন নামক ব্যায়ামত্রয় এইজন্য কিছু অসম্পূর্ণ। এই সকল ব্যায়ামে "এই অবস্থায় মস্তক সোজা ও দৃষ্টি কোন দূরবর্ত্তী পদার্থের উপর রাখিবে," কেবল এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, হাত উত্তোলনের সঙ্গে মস্তক হেলাইয়া হস্তের অগ্রভাগ দেখিবার ব্যবস্থা করিলে, এইগুলির অনুশীলনে বক্ষঃস্থলের উন্নতির সহায়তা হইতে পারে। এইজন্য ডম্‌বেল ব্যায়ামে হাত উত্তোলনের সঙ্গে, চক্ষু হাতের অগ্রভাগে বিন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্যায়ামের প্রকার—ব্যায়ামের বহু প্রকার আছে, তন্মধ্যে যে গুলি সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যে প্রচলিত, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। খেলা—কানা মাছি, পালানটুটু, হাডুডুডু।

২। ধাবন—দৌড়ন, লম্ফন, উল্লম্ফন, একপায় গমন, নিতম্ব স্পর্শ দৌড়, বৈঠক দৌড়।

৩। ভূব্যায়াম—নিহুর, বৈঠক, ও ডন (হনুমানডন, পার্শ্বডন, একাঙ্গডন্, হিন্দোলডন্, একহস্ত ডন্, শরীর উত্তোলনডন্, ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের জন্য নয়)

৪। ড্রিল ও মার্চ্চ (সার্পকৃও ড্রিল পুস্তক হইতে)

৫। বিলাতি খেলা—ক্রিকেট, ফুটবল, হকি।

৬। বার ব্যায়াম—প্যারেলালবারে—দোলন, বারক্রিয়ার, সিঙ্গলমার্চ্চ, ডবলমার্চ্চ। হরাইজণ্টেলবারে—ওঠা নাবা, লেগ গ্রাইন্‌ডিং, মাসল্‌ গ্রাইনডিং (১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্কের জন্য নয়)।

৭। ডম্বেল—স্যাণ্ডো সাহেব প্রস্তাবিত ৮ রকমের ব্যায়াম (শেষ ৩ রকম ১৪ বৎসরে নিম্ন বয়স্কের জন্য নয়)

ব্যায়ামের রুটীন।—শিক্ষক সংখ্যা বেশী থাকিলে প্রত্যেক ঘণ্টার পরে ৫ মিনিট করিয়া ড্রিল করান মন্দ নহে। কিন্তু যেখানে শিক্ষকের সংখ্যাকম ও যেখানে এক সঙ্গে সকলকে ড্রিল করাইতে হয়, সেখানে সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ড্রিল বা ব্যায়াম করান নিষেধ। বালকেরা খাইয়াই স্কুলে আসে, এ অবস্থায় ভরা পেটে ব্যায়াম করাইলে পেটের ব্যথা ও মাথার ব্যথা হওয়ার খুব সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ের পরেও ব্যায়াম করাইতে নাই—সে সময়ে বালকেরা সমস্ত দিনের মানসিক শ্রম ও ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া পড়ে। প্রথম তিন ঘণ্টা কার্য্যের পর—টিফিন ঘণ্টার অব্যবহিত পূর্ব্ব, ড্রিল ও ব্যায়ামের উপযুক্ত সময়; ব্যায়ামের পরেই বালকেরা টিফিনের বিশ্রাম পাইবে। বড় বড় স্কুলে ড্রিলের জন্য পৃথক গৃহ থাকে। যেখানে এরূপ ব্যবস্থা নাই, সেখানে ড্রিলের স্থানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কতক গুলি গাছ লাগাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে বালকগণের কষ্ট হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এরূপ একটু রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিতে অভ্যাস করান বরং বাঞ্ছনীয়।

ড্রিল ও ব্যায়ামের জন্যও একটা রুটিন করিয়া রাখা আবশ্যক। প্রত্যহ যাহাতে সকল অঙ্গের সঞ্চালন হইতে পারে রুটিনে সে বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কিন্তু আবার প্রত্যহ যাহাতে কেবল এক রকম ব্যায়ামের অনুশীলন না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নিম্নে রুটিনের একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল। ড্রিল ও ব্যায়াম শিক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক ব্যবহৃত হয় সেই সকল পুস্তক দৃষ্টে ব্যায়ামের নম্বর গুলি বসাইয়া লইবে ও নিজ নিজ অবস্থা দৃষ্টে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে :—

নিম্নবিভাগ (১৪ বৎসরের নিম্ন)।

সোমবার—বাহুর নিমিত্ত নিহুর, পদের নিমিত্ত বৈঠক।

মঙ্গলবার—সার্পের পুস্তক হইতে অমুক অমুক নম্বর ড্রিল।

বুধবার—দৌড় (১০০ গজ) হরাইজন্ট্যাল বারে দোলন।

বৃহস্পতিবার—লম্ফন, উল্লম্ফন এবং প্যারালালে দোলন।

শুক্রবার—ডম্বেল (প্রথম তিন প্রকার), একপায় দৌড়।

শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল বা হাডুডুডু।

উচ্চবিভাগ (১৪ বৎসরের উর্দ্ধ)।

সোমবার—প্যারালাল বারে সিঙ্গল বা ডবল মার্চ্চ (একবার),
হরাইজন্ট্যাল বারে লেগ্ গ্রাইনডিং (৩ পাক),
একপ্রকার মার্চ্চ বা চাল।

মঙ্গলবার—ডম্বেল (২ রকমের কঠিন), ডন (একরকমের ৩ বার),
ডিলের টরণিং (২ রকমের),

বুধবার—নিহুর (২ প্রকার), নিতম্বস্পর্শ দৌড় (২৫ গজ),
বৈঠক (২ প্রকার)।

বৃহস্পতিবার—হরাইজান্ট্যাল বারে ওঠা (২ প্রকার), সাধারণ
দৌড় (১০০ গজ), প্যারালাল বারে ডন (১ প্রকার)।

শুক্রবার—চা'ল (বৃশ্চিক চা'ল প্রভৃতি একরকম), ডম্বেল
(সহজ ২ রকম), লম্ফন ও উল্লম্ফন এক পায়ে ও জোড়পায়ে।

শনিবার—ক্রিকেট, ফুটবল, হাক, হাডুডুডু।

গ্রীষ্ম বা পূজা উপলক্ষে বিদ্যালয়ের বন্ধের সময়, এমন কি রবিবারেও ব্যায়াম চর্চ্চা বন্ধ করা স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ। তবে রোগগ্রস্ত হইলে কি অন্য কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক থাকিলে, বন্ধ করা যাইতে পারে। নিহুর, বৈঠক, ডন, ডম্বেল প্রভৃতি ব্যায়াম যখন শয়ন গৃহেও অভ্যাস করা

যাইতে পারে, তখন কোনরূপ অসুবিধার কারণ নাই। লোহার সাধারণ ডম্‌বেল অপেক্ষা কাঠের ডমবেল ভাল; এক জোড়ার দাম ।৵৹ আনা। অভাবে একখানি দেড় ইঞ্চ মোটা, ৬।৭ ইঞ্চ লম্বা গোল কাষ্ঠ বা বাঁশ হইলেও চলিতে পারে। রীতিমত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায়, কি কেবল প্রাতে ৮।১০ মিনিট করিয়া এইরূপ ব্যায়াম করিলে বৃদ্ধও সবল হইয়া থাকে। দুর্ব্বল লোকের পক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দ্রুত ভ্রমণ উত্তম ব্যায়াম।

অন্যান্য কথা।—খেলার মাঠের নিকটে একজন শিক্ষকের থাকা আবশ্যক। তিনি বালকদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না বটে, কিন্তু ইহাতে এই ফল হইবে যে বালকেরা কোনরূপ অসভ্যতা করিতে সাহস করিবে না। বিলাতে খেলার মাঠে বালকেরা ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করে, কিন্তু আমাদিগের হতভাগ্য দেশে এই খেলার মাঠেই অনেক বালকের সর্ব্বনাশ হয়। এই খেলার মাঠেই খেলার উপলক্ষ করিয়া নানারূপ বদকার্য্যের অনুশীলন করে। যদি কোন শিক্ষক উপস্থিত থাকিতে না পারেন, তবে উচ্চ শ্রেণীর কোন সচ্চরিত্র বালকের উপর ভার দেওয়া মন্দ নহে।

বালকেরা যাহাতে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইবার পূর্ব্বেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে, এইরূপ সময়ে খেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাহিরে থাকিতে দিলে নানারূপে চরিত্র কলঙ্কিত হইতে পারে।

বিদ্যালয়ের বালকদিগের সঙ্গে বাহিরের লোককে খেলিতে দেওয়া উচিত নহে। তবে ম্যাচ্ কি টুর্নামেন্টের সময় কোনরূপ আপত্তি না করিলেও চলিতে পারে। শিক্ষকগণ সময় সময় বালকগণের খেলায় যোগদান করিবেন।

সাধারণ পরীক্ষার পরে, ব্যায়ামের পরীক্ষা উপলক্ষ করিয়া

অভিভাবক ও অন্যান্য ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে ব্যায়ামানুশীলনে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

কিন্তু এককথা মনে রাখা উচিত যে শারিরীক বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলনের উৎসাহ দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। ব্যায়ামের উদ্দেশই কেবল শরীর সুস্থ ও সবল রাখা, আর শরীর সুস্থ রাখিবার উদ্দেশ্য মানসিক শক্তির উন্নতিপথ উন্মুক্ত রাখা। বিদ্যালয়ে মানসিক বৃত্তির অনুশীলনকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। এইজন্য যে বালক পড়াশুনায় ভাল নয়, তাহাকে কেবল ব্যায়ামাদির জন্য পুরস্কার বা উৎসাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। আবার যে বালক ব্যায়ামাদির সাধারণ রূপ অনুশীলনেও অপটু, তাহাকে কেবল পড়াশুনার জন্য পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। দুই দিকেই চাই, তবে মাত্রার কম বেশী।

২। স্বাস্থ্যরক্ষা।

বিদ্যালয়ে।—(১) স্কুলের ঘর ও ঘরের চারিদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বিদ্যালয় গৃহে বালকগণের প্রবেশ করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি খুলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। আর বিদ্যালয়ের ছুটী হইবার অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা পরে বিদ্যালয়ের দরজা জানালা বন্ধ করিতে হইবে। তবে সামান্য খড়ের ঘরে এ ব্যবস্থা না করিলেও চলে। ঘরে উত্তমরূপ আলোক ও বায়ু প্রবেশের পথ রাখা আবশ্যক।

(২) বালকেরা বাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আসিয়া কি খেলায় ক্লান্ত হইয়া জল খাইতে দৌড়ায়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না করিলে জল খাইতে দিবেনা। উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা কর্ত্তব্য। অভাব পক্ষে কলসী ফিল্টার করিয়া রাখিলেও অনেক উপকার হইবে।

(৩) একসঙ্গে তিন ঘণ্টার অধিককাল একরূপ ভাবে বসিয়া থাকিলে মেরুদণ্ডে বেদনা উপস্থিত হইতে পারে। এইজন্য ৩ ঘণ্টার পর টিফিন কি শ্রেণী পরিবর্ত্তন কি দণ্ডায়মান করাইয়া কোন কার্য্য করান কর্ত্তব্য। অনেকক্ষণ দাঁড়া করাইয়া রাখা, নীলডাউন করান প্রভৃতি শাস্তি স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ।

(৪) বিদ্যালয় গৃহে থুথুফেলা সম্পূর্ণরূপ নিষেধ করা কর্ত্তব্য। ডাক্তারগণ প্রমাণ পাইয়াছেন, থুথু হইতেই অনেক রোগ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কোন বালককে ময়লা কি দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবেনা।

ছাত্রাবাসে বা হোষ্টেলে।—বালকেরা অনেক সময় দ্রব্যের গুণাগুণের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, মূল্যের স্বল্পতার দিকে দৃষ্টিকরে। এইজন্য কখন কখন তাহারা অতি অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া নিজে রোগগ্রস্ত হয় ও অপরকেও রোগগ্রস্ত করে। হোষ্টেলের অধ্যক্ষকে খাদ্য দ্রব্যাদির উত্তমত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আজকাল বালকগণের ধূমপান রোগ প্রবল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহারও প্রতিবিধান আবশ্যক।

(২) এক বিছানায় একজনের অধিক লোকের শয়ন স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ। বিছানার চাদর, বালিশের খোল প্রভৃতি অন্ততঃ ১৫ দিন পরও একবার উত্তমরূপ ধৌত করা আবশ্যক।

(৩) ঘরে থুথু ফেলা, ঘরের নিকট প্রস্রাব করা, তক্তোপোষের নীচে ছেঁড়া কাগজ ফেলা, স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিজনক। পাকা মেজে হইলে, অন্ততঃ মাসে একবার উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে, কাঁচা হইলে নিকাইতে হইবে। বালকেরা যাহাতে নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও দ্রব্যগুলি বেশ গোছ গাছ করিয়া রাখে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

(৪) বালকেরা যাহাতে সমস্ত কার্য্যই নিয়মিত সময়ে নির্ব্বাহ করে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিবার সময়, স্নানের সময়, আহারের সময়, সন্ধ্যায় পাঠে বসিবার সময় ঠিক থাকা উচিত। কোন কোন হোষ্টেলে এই সমস্ত সময় জ্ঞাপন করিয়া ঘণ্টা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিক রাত্রজাগরণ এবং দিবা নিদ্রা নিষিদ্ধ।

সংক্রামক রোগে।—হোষ্টেলে, রোগীর জন্য একটী পৃথক ঘর রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কোন রূপ সংক্রামক রোগ হইলে, রোগীকে অন্যত্র পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। বিশেষ বসন্ত ও প্লেগে এই রূপ ব্যবস্থা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। খোস, পাচড়া, দাদ প্রভৃতি রোগ-গ্রস্ত বালকের সহিত অন্য বালককে মিশিতে দিবে না। সংক্রামক রোগ-গ্রস্তকে স্কুলেও আসিতে দিবে না। এমন কি যে বালকের বাড়ীতে কোনরূপ সংক্রামক পীড়া হইয়াছে, তাহাকেও স্কুলে আসিতে দিবে না। বালকদিগের সংক্রামক পীড়া হইলে কতদিন পর্য্যন্ত তাহদিগকে ছুটী দিতে হইবে তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—

রোগ	যতদিন পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।	পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পরও যে কয়দিন সে বিদ্যালয়ে আসিবে না।
চোক উঠা	৭ হইতে ১৫ দিন, যে পর্য্যন্ত চোখের জলপড়া বন্ধ না হয়	৭ দিন।
গাল ফুলা	৭ হইতে ১৫ দিন।	ঐ
গলায় ক্ষত—	ঐ	ঐ
হুপিংকাশি—	যে পর্য্যন্ত কাশি না সারে।	১৫ দিন।

হাম (কোদা, লুতি, পেরা)—১৪ হইতে ২১ দিন, যে পর্য্যন্ত গাত্রের শুষ্ক খোলস না পড়িয়া যায় ও কাশি না সারে। এই শুষ্ক খোলসেই রোগ বিস্তার করে।		১৫ দিন।
জলবসন্ত—	৩ হইতে ৫ সপ্তাহ—যে পর্য্যন্ত সমস্ত শুষ্ক খোলস ঝড়িয়া না পড়ে।	ঐ
বসন্ত—	যে পর্য্যন্ত না সারে ও শরীরের গর্ত্তগুলি পুরিয়া উঠিতে আরম্ভ না করে।	২১ দিন।

আকস্মিক বিপদে।—হাত কাটা, পা ভাঙ্গা, জলে ডোবা, আগুনে পোড়া প্রভৃতি নানারূপ আকস্মিক বিপদ ঘটিয়া থাকে। বিপদ কঠিন হইলে ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে। তবে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে নিম্নে তাহাই লিখিত হইল :—

কাটা।—ছুরিতে সামান্য রূপ হাত কাটিয়া গেলে একটা জলপটী দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। গাঁদার পাতা (অভাবে ঘাস) থেৎলাইয়া সেই পাতা কাটার উপর চাপিয়া বাঁধিয়া দিলেও রক্তপড়া বন্ধ হয়। রেড়ি তৈল বা ক্যাষ্টরঅইলে নেকড়া ভিজাইয়া কাটার উপর চাপিয়া দিলেও রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কাটা ঘায়ের ভিতর কোনরূপ ময়লা কি কাচ ভাঙ্গা থাকিলে পূর্ব্বেই বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। তবে শিরা কি ধমনী কাটিয়া গেলে বিপদের কথা। ইহাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইতে আরম্ভ হয়। ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক। ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রের দ্বারা, ক্ষত স্থানের ঊর্দ্ধ দিকে (ধড়ের দিকে) ও একটু উপরে,

খুব কসিয়া একটা বাঁধ দিয়া রাখিবে ও ক্ষত অঙ্গকেও উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ধরিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা জলধারা প্রায় সকল প্রকার কাটাতেই উপকারী।

ভাঙ্গা।—হাত, পা কি আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গেলে (ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে) সেই অঙ্গকে সরল ভাবে ধরিয়া একখানা পাতলা কাঠ কি বাঁশ কি লাঠী, তার পাশে দিয়া, নেকড়া দিয়া জড়াইয়া ফেলিবে ও সেই নেকড়া ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া দিবে। রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। ভাঙ্গা অঙ্গ নাড়িতে দিবে না।

মূর্চ্ছা।—খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গিয়া কি ব্যাট বা বলের আঘাত লাগিয়া অনেক সময় মূর্চ্ছা হয়। রোগীর গায়ের জামা চাদর খুলিয়া ফেলিবে। তাহাকে ছায়াযুক্ত অথচ মুক্ত স্থানে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। একটা বালিশ পাইলে ভাল, নচেৎ তাহার জামা চাদর প্রভৃতি দ্বারা বালিশ করিয়া মাথাটা একটু উঁচু করিয়া রাখিবে। চোখে মুখে ঠাণ্ডা জল দিবে ও আস্তে আস্তে বাতাস করিতে থাকিবে। চারি দিকের লোকজন সরাইয়া দিবে।

জলে ডোবা।—মূর্চ্ছাতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় রোগীকে রাখিবে। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তাহার বাহুদ্বয় একবার মস্তকের দিকে টানিয়া আনিয়া, আবার বক্ষের উপরে ভাঙ্গিয়া ধরিবে। প্রতি চারি সেকেণ্ডে এইরূপ প্রক্রিয়া যাহাতে একবার সম্পন্ন হইতে পারে সেইরূপ ধীরতা এবং ক্ষিপ্রতার সহিত এই কার্য্য করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত রোগীর নিশ্বাস না চলে সে পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে হইবে। এক জনের হাত লাগিলে আর জনের উপর ভার দিবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা এইরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক।

আগুনে পোড়া।—যদি স্কুলে থাকে তবে ভাল, না হইলে নিকটের কোন বাড়ী হইতে চূণেরজল আর নারিকেলের তেল আনাইয়া একত্র

মিলাও। এই তেলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া ঘায়ের উপর জড়াইয়া দিয়া, তার উপর তুলা ও ন্যাকড়া দিয়া, কি কেবল ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া দাও। স্কুলে কি নিকটস্থ কোন বাড়ীতে সোডা (বাই কার্ব) থাকিলে তাহা জলে গুলিয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইয়া, তুলা ও ন্যাকড়ার দ্বারা জড়াইয়া দিলেও হয়। কিছু না জুটিলে কেবল ন্যাকড়ার দ্বারাই জড়াইয়া রাখিবে। কথা এই যে, পোড়া ঘায় কিছুতেই বাতাস লাগিতে দিবে না।

সাপেকাটা।—বিষাক্ত সাপে কাটিলে, তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থানের উপরে খুব কসিয়া দুইটী বাঁধ দিবে। ডাক্তারকে শীঘ্র ডাকিয়া পাঠাইবে।

ক্ষিপ্ত কুকুরে কামড়ান। ক্ষতস্থান উত্তমরূপ ধৌত করিয়া কারবলিক বা নাইট্রিক এসিডের দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। আর নিকটস্থ থানায় বা সবডিভিসনে কি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া রোগীকে কোসলী হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। গরীব হইলে গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রকরণ—শিশুশিক্ষা বিষয়ক।

১। কিণ্ডারগার্টেন।

শব্দের অর্থ।—কিণ্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষার প্রণালী বিশেষ। শিশুশিক্ষায় এই প্রণালী বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া, সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে; কিণ্ডারগার্টেন জর্ম্মণ ভাষার শব্দ। কিণ্ডার অর্থ "শিশুগণ" আর গার্টেন অর্থ "উদ্যান।" সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ "শিশুগণের উদ্যান"। বাঙ্গালা-ভাষায় এই কথার একটা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিবার আবশ্যক হইলে 'বাল্যবাগ' * শব্দের দ্বারা সে ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন এই প্রণালীর জন্মদাতা, ইহাকে 'কিণ্ডারগার্টন' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন আমাদিগের এই নাম ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য।

এই প্রণালী অনুসারে শিশুশিক্ষার জন্য প্রথমে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে উদ্যান সংলগ্ন করা হইয়াছিল। শিশুশিক্ষার পক্ষে এইরূপ উদ্যান অধিকতর আবশ্যকীয় দেখিয়া, সাধারণ লোকে

---

* 'বাল্যবাগ' না বলিয়া 'নন্দনকানন' বলিলে কেমন হয়?—সঃ।

শিশুগণের বিদ্যালয় না বলিয়া এই সমস্ত পাঠশালাকে 'শিশুগণের উদ্যান', এই নামে অভিহিত করিয়াছিল। প্রণালীর সৃষ্টিকর্ত্তাও শেষে এই নামেই নিজ প্রণালীকে অভিহিত করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই কথাটীকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া একটা গূঢ় অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় উদ্যানস্বরূপ, বালকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ, আর শিক্ষক উদ্যানপাল। উদ্যানপাল বৃক্ষে পরিমিত সার প্রয়োগ করিয়া বৃক্ষের বৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করে, শিক্ষক (বোর্ডিং স্কুলে) শিশুকে উপযুক্ত আহারাদি প্রদান করিয়া তাহার দেহের পুরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করেন *। উদ্যানপাল পরিমিত জল সেচন করিয়া বৃক্ষকে সরস করে, শিক্ষক সেইরূপ পরিমিত জ্ঞানবারি সেচন করিয়া বালকের মন সরস করিয়া থাকেন। উদ্যানপাল যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে না অর্থাৎ সে যেমন নিজ ইচ্ছামত বৃক্ষকে শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইতে ইচ্ছা করে না (ও করিলেও পারে না), সুশিক্ষক সেইরূপ শিশুর মন ও দেহকে (পরীক্ষায় পাশ করাইবার নিমিত্ত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে) শীঘ্র শীঘ্র অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন না। উদ্যানপাল যেমন অকালে ফলের প্রত্যাশা করেন না, সুশিক্ষকও সেইরূপ অকাল পক্কতা প্রত্যাশা করেন না। উদ্যানপাল যেমন বেড়া দিয়া বৃক্ষকে পশুর হস্ত হইতে রক্ষা করে, শিক্ষকও সেইরূপ ধর্ম্ম ও নীতির বেড়া দিয়া শিশুকে কু-সঙ্গীর হস্ত হইতে রক্ষা করেন। 'অপরিমিত সার প্রয়োগ বশতঃ বৃক্ষের অপরিমিত বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে যেমন ফুল ফল জন্মে না; অপরিমিত আহারাদি দ্বারা বালকের দেহ অতিরিক্ত পুষ্ট হইলে, তাহার বুদ্ধি বিকশিত হইতে পারে না। অপরিমিত জল সেচনে বৃক্ষের মূল যেমন পচিয়া যায়, অপরিমিত

* সকল দেশেই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাদানের নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান দানেও সেই রূপ বালকের বুদ্ধির মূল (মস্তিস্ক) নষ্ট হইয়া যায়। নানা জাতীয় বৃক্ষ প্রতিপালনের জন্য যেমন নানা রূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বালকের শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থার আবশ্যক। বৃক্ষের সহিত বালকের এতদূর সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, বালক সমন্বিত বিদ্যালয়কে বৃক্ষ-সমন্বিত উদ্যানের সহিত তুলনা করা সঙ্গতই হইয়াছে।

পেষ্টালজী।—যে প্রণালী এখন কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী বলিয়া পরিচিত, সে প্রণালীর প্রবর্ত্তক, সুইট্জরলণ্ড নিবাসী পেষ্টালজী সাহেব। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ সহজ শিল্প শিক্ষাও কর্ত্তব্য, তাহা তিনিই প্রথমে নির্দ্ধারণ করেন। দরিদ্র কৃষক সন্তান-গণের শিক্ষাতেই তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠের সঙ্গে কৃষি কার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছিল। শীতে বালকেরা বিদ্যালয়ের গৃহে পাঠাদির আলোচনা করিত ও গ্রীষ্মে উদ্যানে কি কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিত। তিনি মনে করিতেন যে বালকের পক্ষে নানাজ্ঞান উপার্জ্জনকরা অপেক্ষা, উত্তমরূপ সদাচারী হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিতেন যে "বালককে সুন্দর ও পবিত্র পদার্থের প্রতি অনুরক্ত করিতে চেষ্টা কর,—তাহার জীবন ইহাতেই সমুন্নত হইবে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন করিয়া দিলে, মানসিক প্রবৃত্তিগুলির কুকার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয় মাত্র।" এইজন্য পেষ্টালজী বালকগণকে নানারূপ পবিত্রকার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতেন, পবিত্র বিষয়ে তাহাদিগের চিন্তাস্রোত পরিচালিত করিতেন, এবং প্রত্যহ তাহাদিগকে ভগবানের উপাসনায় নিয়োজিত করিতেন। শিক্ষাদান যাহাতে মানব মনের ক্রমিক বিকাশের সানুকূল হয়, সে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাই পেষ্টালজীয় প্রণালীর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। (পেষ্টালজীর জন্ম ১৭৪৬, মৃত্যু ১৮২৭)

ফ্রবল্।—কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা জর্ম্মণদেশ নিবাসী ফ্রেডারিক ফ্রবল্ সাহেব। তিনি পেষ্টালজীর নিকট শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা করেন এবং গুরু প্রদর্শিত প্রণালীর এরূপ আমূল সংস্কার করেন যে, এখন এই প্রণালী ফ্রবল প্রবর্ত্তিত বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। ১৮৩৭ খৃঃ তিনি এই নূতন প্রণালী মত বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং তাঁহার এই নূতন প্রণালীকে কিণ্ডারগার্টেন নামে অভিহিত করেন। (ফ্রবেলের জন্ম ১৭৮২ খৃঃ. মৃত্যু ১৮৫২ খৃঃ)

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী কি?—বালকগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা পরিচালিত করাই কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। ক্রীড়া ও ক্রীড়ণক পদার্থে, বালকগণের একটা স্বাভাবিক আশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারে সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা খেলার সামগ্রীই বালকের নিকট সর্ব্বাধিক প্রিয়তম পদার্থ। আর সর্ব্বকার্য্য অপেক্ষা খেলাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম কার্য্য। সুতরাং এই ক্রীড়া ও ক্রীড়ণক গুলিকে যদি সুনিয়মিত করিয়া, কোন উদ্দেশ্য-বিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে পারা যায়, তবে বালকগণ জ্ঞানোপার্জ্জনজনিত কষ্ট বোধ না করিয়াই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইবে।

বিষ্ণুশর্ম্মা।—এইরূপ স্বাভাবিক-প্রকৃতি-অনুসৃত শিক্ষাদানের পথ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃকই সর্ব্ব প্রথমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যখন বিদর্ভ রাজপুত্রকে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন) কোন শিক্ষক বর্ণমালাও শিক্ষাদিতে পারিলেন না, তখন রাজা বিষ্ণুশর্ম্মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতপ্রবর রাজপুত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, রাজাকে ইহাই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, "বিষ্ণুশর্ম্মা যে রাজপুত্রের শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা যেন রাজপুত্র জানিতে না পারেন।" পণ্ডিত দেখিলেন যে বালক কপোত পক্ষীর প্রতি অধিক পরিমাণে অনুরক্ত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকগণ বালকের এই কপোতাশক্তি নিবারণের নানারূপ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণু শর্ম্মা বালকের এই কপোতাশক্তি নিবারণ না করিয়া, বরং কপোতের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই যত্ন করিতে লাগিলেন। কপোত ক্রয়, কপোত-গৃহ নির্ম্মাণ, কপোতের আহার সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিষ্ণুশর্ম্মার বিশেষ যত্ন দেখিয়া বালক বিষ্ণুশর্ম্মার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল। এদিকে কপোতের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের নামাকরণ করা আবশ্যক হইল। রাম, হরি, ইত্যাদিরূপ নামাকরণও হইল। কিন্তু এই সমস্ত নামে কপোতকে ডাকিলে, রাজবাড়ীর ঐ নামযুক্ত ভৃত্যেরা আসিয়া উপস্থিত হইত। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য বিষ্ণুশর্ম্মা রাজকুমারকে অন্যরূপ নাম রাখিতে উপদেশ দিলেন। বালক, তাহার বন্ধু (শিক্ষক নয়) বিষ্ণুশর্ম্মার উপর সে কার্য্যের ভার অর্পণ করিল। বিষ্ণুশর্ম্মা তখন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি একাক্ষরী নামে কপোতগুলির নামাকরণ করিলেন। রাজপুত্র

এই সমস্ত নূতন অথচ সহজ নাম যত্ন সহকারে অভ্যাস করিলেন। কিন্তু ইহাতেও কিছু অসু-বিধা হওয়াতে, পায়রাগুলিকে সহজে চিনিবার নিমিত্ত তাহাদের গলায় ঐ সমস্ত নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন (অর্থাৎ অ, আ, ক, খ, অক্ষর) যুক্ত টিকিট বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বালক নিজেই আগ্রহ করিয়া টিকিটগুলি লিখিত, বিষ্ণুশর্ম্মা পরিচালিত করিতেন মাত্র। তার পর কপোতগণের জোড়া মিল করিয়া কর, খল, ইত্যাদি দুই অক্ষর যুক্ত কথা ও তাহার লেখাও শিক্ষা দেওয়া হইল। তার পর কপোতের শাবক হইলে অভয়, মদন ইত্যাদি তিন অক্ষরী, জলধর, পদতল প্রভৃতি চারি অক্ষরী শব্দেরও শিক্ষা হইতে লাগিল। এই প্রণালী ক্রমে নানারূপ অঙ্কও শিক্ষা দেওয়া হইল। বালক কিন্তু এ পর্য্যন্ত মনে ভাবিতেছে যে এরূপ নাম ও সঙ্কেত তাহাদিগেরই অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্নে কপোতের নানারূপ বিবরণ, কপোতের আহার বিহারের প্রণালী প্রভৃতিও লিখিত হইল। শেষে এই কপোতের গল্প উপলক্ষ করিয়া বালককে অতি অল্প সময়ে রাজনীতি পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইল।—(হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র চিরদিন ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে)—তারপর একদিন রাজপুত্রকে রাজ সভায় উপস্থিত করাইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা রাজাকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বালককে তখন বিবিধ ধর্ম্ম ও রাজনীতি গ্রন্থ পাঠ করিতে দেওয়া হইল। বালক অনায়াসে সেই সমস্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।—কিন্তু তাহাদিগের লিখিত সঙ্কেত অন্যে কিরূপে জানিতে পারিল ইহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালকের শিরঃচুম্বন করিলেন, ও বালকের নিকট বিষ্ণু শর্ম্মার পরিচয় প্রদান করিলেন। বালক তখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিষ্ণু শর্ম্মার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ও তাঁহার সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অসীম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বিপথগামিনী প্রবৃত্তিকে ফিরাইয়া এইরূপে অভীষ্ট পথে আনয়ন করা যাইতে পারে।

ঔষধ খাইতে কষ্ট হয় বলিয়া নানারূপ মিষ্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইতেছে। তিক্ত ঔষধ ঠোসের (ক্যাপসিউল) মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। দূরদেশে গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ জন্য দ্রুতগামী রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপ সমস্ত বিষয়ের কষ্ট নিবারণ জন্যই চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বালক যে পুস্তক হাতে করিয়াই নয়নধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিত সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। লেখা পড়াকে সুখকর করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই। মহাত্মা ফ্রবলই এই কার্য্যের অগ্রণী হইয়া শিশুশিক্ষার পথ বহুল পরিমাণে সুখকর করিয়াছেন।

ফ্রবল্ প্রদর্শিত দ্বাদশ বিধান।—কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী

মত কার্য্য করিতে হইলে শিক্ষকগণকে এই দ্বাদশ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

১। যেরূপ ধর্ম্মভাব, ভগবানের সহিত শিশুহৃদয়কে যুক্ত করিতে পারে, শিশুর অন্তরে সেই ভাবের উন্মেষ করিয়া দিবে ও তাহার পোষণে এবং পরিবর্দ্ধনে সহায়তা করিবে।

২। ধর্ম্ম শাস্ত্রের যে সকল সরল শ্লোক বালকগণ মুখস্থ করিয়া উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে মুখস্থ করাইতে হইবে।

৩। জ্ঞানোপার্জ্জন, শরীর সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্যকে মানসিক উন্নতি সাধনের সহায় বলিয়া মনে করিতে হইবে।

৪। প্রকৃতি ও বাহ্য জগতের বিষয়ে শিশুর চিন্তা ও পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে পরিচালিত করিতে হইবে।

৫। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও জীবগণের কার্য্যাকার্য্য বিষয়ক ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কবিতা মুখস্থ করাইতে হইবে, ও মধ্যে মধ্যে সরল সুর সংযোগে সেগুলি গান করাইতে হইবে।

৬। মনের ভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিবার শক্তি লাভের নিমিত্ত শিশুগণকে সাধু ভাষায় বাক্য রচনার অনুশীলন করাইতে হইবে।

৭। বস্তুর আকারাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভার্থ আকার প্রকারের অনুশীলন আবশ্যক। কাদার দ্বারা দ্রব্যাদির প্রতিকৃতি গঠন এইকার্য্যের যথেষ্ট সহায়।

৮। চেক্ কাগজে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে।

৯। নানা রঙের জ্ঞান প্রদান করিতে হইবে ও সে সমস্তের ব্যবহার (কাগজে চিত্র অঙ্কন করিয়া) শিক্ষা দিতে হইবে।

১০। সাধারণ খেলা বা কিণ্ডারগার্টেন প্রথা নির্দ্দিষ্ট খেলায় বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

১১। দিনের বা কালের ঘটনার সহিত যোগ করিয়া গল্প, উপকথা, উপন্যাস প্রভৃতি শুনাইতে হইবে।

১২। শিশুগণকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে।

ক্রীড়ণক ব্যবহারে লক্ষ্য।—কিণ্ডারগার্টেন প্রথা কেবল কতকগুলি ক্রীড়া ও ক্রীড়ণকের সমষ্টি মাত্র। এই ক্রীড়া ও ক্রীড়ণকের যাহাতে সদ্‌ব্যবহার হয় সে দিকে দৃষ্টি না রাখিলে সমস্ত কার্য্যই বিফল। ফ্রবল এই চার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন ঃ—

(১) বালকেরা স্বাধীনতা প্রিয়, সেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তবে যাহাতে বিপথগামিনী না হয় সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে কার্য্য তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহাদিগের দ্বারা এরূপ কার্য্য করান কখনই কর্ত্তব্য নহে।

নীতিবিগর্হিত বা অনিষ্টজনক কার্য্য ব্যতীত বালকের অন্য কোন কার্য্যে বাধা দেওয়া বিধেয় নহে। তাহাদিগের জন্য উত্তম উত্তম খেলার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ক্রীড়ণকগুলি যাহাতে তাহাদিগের মনোমত হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে সমস্ত ক্রীড়ণকগুলি তাহারা অবাধে ব্যবহার করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক পদার্থ যাহাতে বালকেরা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিতে পারে সে ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

(২) বালকেরা ভাঙ্গা গড়া ভালবাসে। ধূলি বালি দিয়া তাহারা ইচ্ছা মত কত কি গড়ে। এইরূপ ভাঙ্গা গড়া করিয়া শিশুগণ বস্তুর আকার, বর্ণ, কঠিনত্ব, কোমলত্ব প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং বালকের ক্রীড়ণকগুলি এরূপ সুকৌশল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যে, তাহা দ্বারা বালকগণ যেন নানারূপ ভাঙ্গা গড়া করিতে পারে। কবি যেমন কবিতার দ্বারা, চিত্রকর যেমন চিত্রের দ্বারা, গায়ক যেমন সঙ্গীতের দ্বারা মানসিক

ভাবের বিকাশ করিয়া থাকেন, নানাবিধ দ্রব্যের অনুকরণে নানারূপ গঠনের দ্বারাও বালকগণ সেইরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হইয়া থাকে।

অনেক অজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস যে বর্ণপরিচয়াদির শিক্ষা ভিন্ন অর্থাৎ লিখিত পুস্তক বা মুদ্রিত পুস্তকাদির পাঠ ভিন্ন জ্ঞানোপার্জ্জন অসম্ভব। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে বাহ্য জগতের যে সমস্ত বিবরণ লিখিত থাকে, তাহা যদি মুদ্রিত পুস্তক পাঠ না করিয়া বাহ্য জগৎরূপ বৃহৎ প্রকৃতি পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, তবে পুস্তক লিখিত বা অন্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত জ্ঞানের আলোচনার আবশ্যকতা কি? বালকেরা যাহাতে এই জ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও তত্তৎ দ্রব্যাদি হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়, আজ কাল সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্যই পণ্ডিতগণ চেষ্টা করিতেছেন। কিণ্ডারগার্টেন, পদার্থপরিচয় প্রভৃতি সেই চেষ্টার কিঞ্চিৎ ফল মাত্র।

(৩) বালকেরা কার্য্য প্রিয়, সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসে। আলস্য তাহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এক প্রকার কার্য্যে অধিকক্ষণ, বা অল্পক্ষণের জন্যও সুখকর কার্য্য ভিন্ন অন্যরূপ কার্য্যে, মনোনিবেশ করিতে পারে না। খেলাই বালকের পক্ষে সুখকর কার্য্য। বালকের স্বাভাবিক কার্য্যকারিণী ইচ্ছাকে সদা ব্যাপৃত রাখিবার জন্য নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর সেই খেলাগুলি দ্বারা যাহাতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উদ্দেশ্যশূন্য ও বিশৃঙ্খল খেলারও আবশ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনরূপ সুফল লাভ হয় না। ফ্রবল সাহেব কর্ত্তৃক রচিত ক্রীড়া ও ক্রীড়ণক গুলি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

(৪) বালকের বৃত্তির ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খেলারও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। জ্ঞানোপার্জ্জনে, চক্ষুই প্রথমে অধিক কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। সেইজন্য প্রথমেই চক্ষুর সাহায্যে আকার, বর্ণ প্রভৃতির শিক্ষাবিষয়ক

খেলার আবশ্যক। তৎপরে স্পর্শ—হস্তের সাহায্যে কঠিন, কোমল, কর্কশ প্রভৃতির শিক্ষা। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার পদদ্বয়ই সর্ব্বপ্রথমে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল ভঙ্গী-সঙ্গীতে বা খেলায় পদ সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে, প্রথমে তাহাই আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির এইরূপ ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষারও ক্রমিক উন্নতি বিধানে সাহায্য করা আবশ্যক। ফ্রবল বলিয়াছেন "ভগবান যাহা (দেহ, মন ও আত্মা) সংযুক্ত করিয়াছেন, মানুষে যেন তাহা বিচ্ছিন্ন না করে।" শিশু শিক্ষায় যাহাতে দেহ, মন ও আত্মার সমবায় উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটীর উন্নতি করিতে গিয়া যেন অন্যটী উপেক্ষিত না হয়।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষার প্রণালী (অর্থাৎ কোন্‌টীর পর কোন্‌টীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বা কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে) বঙ্গদেশের ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত পেডেলার সাহেব প্রদর্শিত (বঙ্গদেশের উপযোগী) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি দৃষ্টে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যাইবে। তাহাও শিশু শ্রেণীর তিন মানের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধৃত হইল :—

(১) চক্ষুর সাহায্যে (রূপ)—

(ক) আকার বিষয়ক শিক্ষা—বেঁকা (বক্র) রেখা, সোজা (সরল) রেখা, একাবেঁকা (কুটিল) রেখা ; গোলাকার পদার্থ।

(খ) রঙ বিষয়ক শিক্ষা,—কাল ও সাদা পদার্থ ; হলুদ ও লাল পদার্থ ; নীল ও সবুজ পদার্থ।

(২) হস্তের সাহায্যে (স্পর্শ)—

শক্ত (কঠিন) ও নরম (কোমল) পদার্থ ; খস্‌খসে (বন্ধুর) ও তেল তেলে (মসৃণ) পদার্থ ; ভারি (গুরু) ও হালকা (লঘু) পদার্থ ; টুন্‌কো (ভঙ্গুর) ও ঠমক্ (খাঁজসহ) পদার্থ।

(৩) জিহ্বার সাহায্যে (রস)—

মিঠা (মিষ্ট) ও টক (অম্ল) পদার্থ; ঝাল (কটু) ও তিতা (তিক্ত) পদার্থ, লোণা (লবণাক্ত) ও কষা কষায়) পদার্থ।

(৪) কর্ণের সাহায্যে (শব্দ)—

নানাবিধ জীব জন্তুর শব্দের পার্থক্য, মধুর ও কর্কশ শব্দ, আনন্দের ও নিরানন্দের শব্দ, দূরস্থ ও নিকটস্থ শব্দ, উচ্চ ও মৃদু শব্দ।

(৫) নাসিকার সাহায্যে (গন্ধ)—

সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের গন্ধ, দূরের গন্ধ ও নিকটের গন্ধ।

আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্যের এইরূপ ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে প্রণালীতেই হউক ইন্দ্রিয়াদির বিকাশের সাহায্য করিতে হইবে। আর চক্ষুর কার্য্যই যে প্রথমে আরম্ভ করিতে হইবে, ইহাতে আর মতদ্বৈধ নাই।

শিক্ষার সরঞ্জাম।—কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সরঞ্জামগুলি অল্পব্যয়ে সংগ্রহ করা কঠিন। সুন্দর গৃহ, সুন্দর উদ্যান, সুন্দর ডেস্ক, চেয়ার, বেঞ্চ এবং বহু সুশিক্ষিত শিক্ষক আবশ্যক। এক বিদ্যালয়ে ২০ জনের অধিক বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী শিক্ষকগণই কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার উপযুক্ত পাত্রী। শিশুশিক্ষায় যে পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা ও ধৈর্য্যের আবশ্যক তাহা পুরুষের নিকট আশা করা যায় না। বিশেষ শিশুগণ শিক্ষককে মাতৃ মূর্ত্তীতে দেখিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য তেমন ভীতি জনক মনে করিবে না। ফ্রবল রচিত ক্রীড়ণক গুলিও সাধারণ বিদ্যালয়ের পক্ষে মূল্যবান। আবার ক্রীড়ণক গুলির ব্যবহারের যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী, একটীর সঙ্গে অন্যটী যেমন সংসৃষ্ট, তাহাতে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে কেবল পুস্তক পড়িয়াই তাহার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। আমাদিগের দেশে কিণ্ডার-গার্টেন বলিয়া যে প্রণালী প্রচলিত তাহা ফ্রবলকৃত প্রণালীর ছায়া মাত্র।

কিণ্ডারগার্টেন ক্রীড়ণক।—ফ্রবল ২০ প্রস্ত খেলনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রীড়ণকগুলির সাধারণ উদ্দেশ্য (১) নানারূপ আকারের

অনুকরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া (২) সংখ্যা, শৃঙ্খলা ও অনুপাত শিক্ষা দেওয়া (৩) সৌন্দর্য্য ও সমতা শিক্ষা দেওয়া। ১০ প্রস্তের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যবহার প্রণালী প্রদত্ত হইল। আমাদিগের বিদ্যালয় সমূহে এই ১০ প্রস্তের কিছু কিছু প্রচলন আছে।

১ম খেলনা।—একটা লম্বা বাক্স, তাহার ভিতর উলে মোড়া ছয় রঙের ৬টি রবারের বল্—লাল, নীল, হলুদ তিনটী মূল রঙ, আর বেগুনে কমলা ও সবুজ তিনটী মিশ্র রঙ। এই ছয় রঙের ৬ গাছি সূতাও বাক্সে থাকে। আর তিনখান কাঠের কাঠী থাকে। দুইখান কাঠী বাক্সের উপর খাড়া করিয়া, আর একখানা তার উপরে আড়ের মত করিয়া আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ কতকগুলি ছিদ্র আছে। সূতার দ্বারা এই আড়ের সঙ্গে বল ছয়টা ঝুলাইতে পারা যায়।
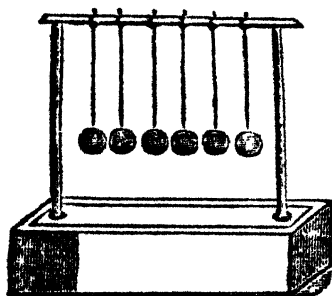
১৩ চিত্র।—নানা রঙের বল্।

এই খেলনা খুব ছোট ছোট ছেলেদের (বয়স ৩।৪ বৎসর) জন্য রচিত। রঙ, আকার ও সংখ্যা শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

এই প্রথম শিক্ষা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই বালকদিগকে শুদ্ধ ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শৃঙ্খলাশিক্ষাও এই সময়েই আরম্ভ করা হয়।

এই বলের সাহায্যে নানারূপ খেলা শিখাইবার বিধান আছে। নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েক প্রকার খেলা বর্ণিত হইল।—প্রথমে এক একটী বল্ লইয়া খেলা আরম্ভ করিতে হইবে। পরে বলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। সূতার সহিত ঝুলাইয়া বা আলগা ভাবেও বল্গুলির ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছোট ছোট বালকদিগের শিক্ষার এক

কথা পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক বিধায়, অনেক কথার পুনরুক্তি হইয়াছে।

প্রথম পাঠ (উদ্দেশ্য :—বলের আকার শিক্ষা, শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা ও নূতন কথা শিক্ষা।)

প্রণালী :—ছেলেদের মেয়েদের প্রত্যেকের হাতে এক একটা করিয়া বল্ দাও। কি এক জনের হাতের নিকট বল্গুলি রাখিয়া তাহাকে সেগুলি এক এক করিয়া চালনা করিতে শিক্ষা দেও। এই শৃঙ্খলাশিক্ষার আরম্ভ। শিশুগণকে বল্গুলি নিজ নিজ সম্মুখে রাখিতে বল। তার পর প্রফুল্ল বদনে সুন্দর প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ কর :—

আমাদের এই খেলার জিনিষ গুলির নাম কি? বল্। আমার কাছেও একটা বল্ আছে, দেখেছ? আমি আমার এই বল্টী হাতে লইলাম, তোমরাও তোমাদিগের সকলের বল্গুলি হাতে লইয়া বলত "আমরা বল্ হাতে করিয়াছি"। (শিশুগণের তদ্রূপ করণ) নিজের নিজের বলটী বেশ করিয়া দেখ, বল্টী কেমন? গোল, ঠিক কথা, বল যে "আমাদের বল্ গোল"। (শিশুগণের তদ্রূপ কথন)।

বল্টী আর কেমন? "নরম"—ঠিক কথা। সকলে বল যে "আমাদের বল্ নরম" (শিশুগণের তদ্রূপ কথন) সকলেই নিজ নিজ বল্ হাতে টিপিয়া দেখ, নরম কিনা। "আমাদিগের বল্ নরম"। আচ্ছা বল্টী আবার দেখ। বল্টী কি দিয়া তৈয়ার করিয়াছে? "বল্ উলে তৈয়ারী"। আচ্ছা বেশ, সরলা তার নিজের বলের আর কি কথা বলিতে পারে দেখা যাউক। "নীল"। "নীল" না বলিয়া "এই বলটা নীল" এইরূপ বল। তারপর সরলার বলের রঙের সঙ্গে আর সকলের বলের বর্ণ মিল করিয়া দেখিতে বল "এক রকম কিনা?" "আমাদের বল্ একরকম রঙের নয়।" পুনরালোচনা—আমাদের বল্ গোল। "আমাদের বল্ নরম" "আমাদের বল্ উল দিয়া তৈয়ারী" "সরলার বল্ নীল"। তারপর বল্গুলি একত্র করিয়া হাতে হাতে ফিরাইয়া দেও।

২য় পাঠ (উদ্দেশ্য—ডান হাত ও বাম হাত শিক্ষা দেওয়া। 'উপর নীচ' কথা শিক্ষা দেওয়া)। প্রণালী—পূর্ব্বপ্রণালীর মত এক একটা বল্ হাতে লইবে। দুচারিটী প্রশ্নের দ্বারা পূর্ব্ব দিনের পাঠের পুনরালোচনা করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে।

আজ বল্ দিয়া আমরা আর এক খেলা খেলিব। আচ্ছা, তোমাদের কয়খানা হাত? হাত তোলত? (শিক্ষকের নিজের ও তদ্রূপ করণ) আবার হাত নামাও। দরজার দিকে যে হাত সেই হাত তোল। আর এক হাতও তোল। দুই হাতের

দুই নাম। দরজার দিকে যে হাত তার নাম কি" ? "ডান হাত।" 'হাঁ, ঠিক কথা, সকলে ডান হাত তোল।' "আমরা ডান হাত তুলিয়াছি"। "ডান হাত মাথার উপর রাখ"। "আমরা ডান হাত মাথার উপর রাখিয়াছি।" "ডান হাতে বল্ লও", "আমরা ডান হাতে বল্ নিয়েছি।" "হাত নামাও, বল্ রাখ।" তারপর বাঁ হাতেও এইরূপ অভ্যাস করাইবে।

"আচ্ছা রাখালের কোন হাতে বল্ আছে বলত ?" "ডানহাতে"। এইরূপ শিক্ষক ডান বাঁর জ্ঞান কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবেন। "বল্টী টেবিলের উপর রাখ।" "বল্টী কোথায় আছে" ? "বল্ টেবিলের উপর আছে"। এইরূপ বেঞ্চের উপর রাখিতে বল। তারপর টেবিলের নীচে, তারপর বেঞ্চের নীচে ইত্যাদি শিক্ষা দাও। সকলেই বল্ ডান হাতে কর, আবার বাঁ হাতে কর ? আবার ডানহাতে কর। ইত্যাদি রূপে এক সঙ্গে কার্য্য করা শিক্ষা দাও। তারপর পূর্ব্ববৎ বল্‌গুলি একত্র করিয়া বাক্‌সে রাখিয়া দাও।

অনেক বিদ্যালয়ে ছুটীর সময় ডান বাম প্রভৃতি শিক্ষার সাহায্যার্থে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে ; সকলে ডান হাতে পুস্তক লও, সকলে বাম হাতে পুস্তক লও, ডান হাত উঠাও, ডান হাত নামাও, ডান হাতে পুস্তক লও, বাম হাত উঠাও, বাম হাত নামাও, দাঁড়াও, একে একে বাড়ী যাও ইত্যাদি।

২৪ চিত্র।—ডান বাম পরিচয়।

তৃতীয় পাঠ।—উদ্দেশ্য—নীলরঙ শিক্ষা দেওয়া। (কেহ কেহ প্রথমে লাল রঙ শিক্ষা দেওয়া ভাল মনে করেন আবার কেহ কেহ প্রথমে কাল ও সাদা শিক্ষা দেওয়াই

যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। শিক্ষক নিজের অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।। এবিষয়ে নির্দ্ধারিত কোন পদ্ধতি নাই। আমরা এখানে নীল রঙ শিক্ষার আদর্শ প্রদান করিলাম।)

প্রণালী :—পূর্ব্বের মত বালকদিগের দ্বারা বলগুলি সকলের হাতে হাতে বিতরণ করিয়া, পূর্ব্ব পাঠের পুনরালোচনার পর, "যাহার হাতে নীল রঙের বল্ আছে, সে হাত তোল"। "আচ্ছা সুধার বল্টী নীল কিনা বলত?" "না এটী নীল নয়"। (তারপর সুধার বল্টী নীলরঙের বলের পাশে রাখিয়া, তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে বল) "যাহার যাহার নীল বল্ নাই, তাহারা এই বাক্স হইতে এক একটা নীল বল্ বাহির করিয়া লও।" কেহ কেহ ভুল করিলে, তাহাদিগের ভুল বল্টী নীল রঙের বলের পাশে রাখিয়া ভুল সংশোধন করাইয়া দিবে। "সকলেই নীল বল্টী ডান হাতে লও, আর বল যে আমার ডানহাতের বল্টী নীল।" "আচ্ছা এই ঘরে নীল রঙের আর কোন জিনিষ আছে?" "ননীর সাড়ীখানি নীল"। আকাশের রঙ কোন বর্ণের মত? "আকাশের রঙ এই নীল বর্ণের মত।" (এখানে এক কথা বলা আবশ্যক। এই যে নীল বর্ণের কথা বলা হইতেছে, ইহা আকাশের মত নীল বর্ণের কথা অর্থাৎ আসমানী রঙের কথা; গাঢ়নীল অর্থাৎ নীল-বড়ির মত রঙের কথা নহে) "কি রকম দিনে আমরা আকাশে বেশী নীল দেখিতে পাই?" "যে দিন মেঘ থাকে না, সেই দিন আকাশ বেশ নীল থাকে"। তারপর আসমানী রঙের কাগজ, কাপড়, ফুল প্রভৃতি দেখাইয়া এই রঙটী বেশ করিয়া পরিচয় করাও। অন্যান্য রঙের পরিচয় করাইবারও এই রীতি। রঙগুলি শিক্ষা দিবার সময়, রঙগুলি মিশাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। কোন্ কোন্ রঙ মিশাইলে কিরূপে কি রঙ উৎপন্ন হয় পরে লিখিত হইল।

চতুর্থ পাঠ।—ঝুলান বল। উদ্দেশ্য—ঝুলন ও ঘূর্ণন শিক্ষা দেওয়া।

প্রণালী—ভিন্ন ভিন্ন রঙের বিষয় পুনরালোচনা করিয়া, শিক্ষক নিজহস্তস্থিত বলে এক গাছি সূতা বাঁধিবেন। বালকগণকে তদ্রূপ সূতা বাঁধিতে শিখাইয়া দিবেন। তারপর নিজ হস্তস্থিত বল্টী ঝুলাইয়া দিয়া—"বল্টী কি করিতেছে?" "বল্টী ঝুলিতেছে" "এ রকমে আর কি ঝুলিতে দেখিয়াছ?" "দোলনায় করিয়া ছোট ছেলেকে এইরূপ ঝুলাইয়া থাকে"। "আর কি জান?" "ঝুলনযাত্রা ও দোলের সময় ঠাকুরকে এই রকমে ঝুলান হয়"। "আর কোন জিনিষকে এরূপ ঝুলিতে দেখিয়াছ?" "বড় ঘড়ির দোলক এইরূপে ঝুলিতে থাকে"। "ঘড়ির দোলন ঝুলিবার সময় কিরকম শব্দ হয়?" "টক্ টক্ শব্দ হয়"।

"তোমাদের বল্‌গুলি ঘড়ির দোলনের মত ঝুলাও"। তারপর বল্‌টী ঘুরাইয়া তাহার সম্বন্ধেও এইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে।

পঞ্চম পাঠ ঃ—বলের বিষয় একটা ভঙ্গী-সঙ্গীত (ভঙ্গী-সঙ্গীত প্রকরণে এবিষয় বিশদীকৃত করা হইয়াছে)।

প্রণালী ঃ—হস্তের ভঙ্গী করিয়া নিম্নলিখিত কবিতা সমস্বরে আবৃত্তি করিবে ঃ—

বল্ গোল (১) বেল গোল (২)
আর গোল (৩) গোলা (৪)
গড়িয়ে দিলে (৫) গড়গড়িয়ে (৬)
অমনি তাদের (৭) চলা (৮)

(বেল গড়াইয়া দিলে, কেমন গড়াইয়া গড়াইয়া যায়, তাহা বালকগণকে পূর্ব্বেই একবার দেখাইতে হইবে।) হস্তের ভঙ্গীর প্রকরণ ঃ—

(১) ডান হাতে গোলার আকার দেখাইয়া
(২) বাঁ হাতে " " "
(৩) (পুনঃ) ডান হাতে " "
(৪) " বাম হাতে " "
(৫) ডান হাতে গড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী করিয়া
(৬) বাঁ হাতে " "
(৭) (পুনঃ) ডান হাতে " "
(৮) " বাম হাতে " "

এইরূপ ভাবে বল্ উপলক্ষ করিয়া বালকগণকে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এই পাঁচ পাঠে প্রণালীর কেবল আভাস ও আদর্শ মাত্র দেওয়া হইল। শিক্ষকগণ নিজের বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া এইরূপ নানা পাঠের সৃষ্টি করিতে পারিবেন।

রঙের বিবরণ।—কোনটী মূল রঙ, কোনটী মিশ্রিত রঙ, কোন রঙের সহিত কোন রঙের মিল করিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মিশ্র রঙের উৎপত্তি হয় তাহা শিক্ষকগণ নিজে উত্তমরূপ না জানিলে বালকগণকে শিক্ষা দিতে পারিবেন না। এইজন্ত নিম্নে কিঞ্চিৎ রঙের বিবরণ প্রদত্ত হইল। "কিন্তু তাই বলিয়া এত রঙের বিবরণ বালকদিগকে এক

দিনে কি এক বৎসরে শিক্ষা দিতে হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাহারা যতই বড় হইবে ততই নানারূপ মিশ্র রঙের বিবরণ শিখিতে থাকিবে।
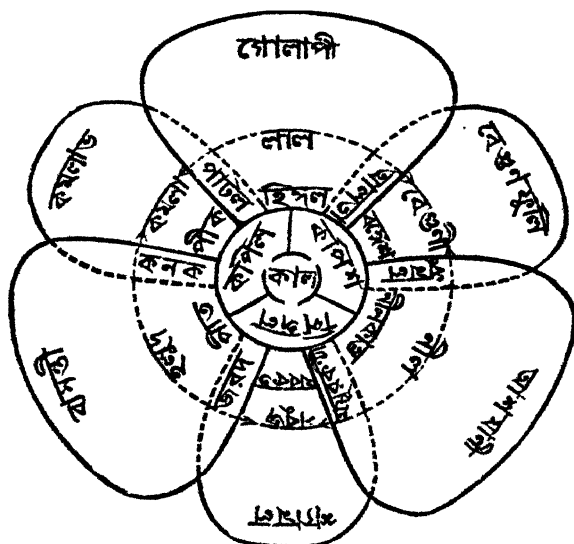
১৫ চিত্র।—রঙ পরিচয়।

লাল—(মূলবর্ণ) লোহিত, রক্ত। দাড়িম্ব ফুলের বর্ণ ; পলাশ ফুল, চীনে জবা ফুলের বর্ণ ; বিশুদ্ধ রক্তের বর্ণ লাল। পঞ্চমুখী জবা, শিমুল, ফুল, সিন্দুর হিঙ্গুল বর্ণ। সাধারণ গোলাপের বর্ণ গোলাপী বা রক্তাভ। লাল রঙ পাতলা হইলেই গোলাপী হয়, আর গাঢ় হইলেই হিঙ্গুল হয়।

নীল—(মূলবর্ণ) সাধারণতঃ আকাশের বর্ণকে নীল বর্ণ বলে। কিন্তু প্রকৃত নীল বর্ণ, আকাশের নীল বর্ণ হইতে গাঢ়। অপরাজিতা, নীল ঝাণ্টা, তিসির ফুলের বর্ণ কতক নীল। হাইকোর্টের উকিলবাবুদিগের গাউনের বর্ণ প্রকৃত নীল। আকাশের বর্ণকে আসমানী রঙ বলে। খুব গাঢ় নীল বর্ণকে (প্রায় কাল রঙের মত) নীলকান্ত বলে। দাঁড়কাকের রঙ কাল নয়, নীলকান্ত।

হলুদ—(মূলবর্ণ) হরিদ্রা বা হলুদে। শুষ্ক হরিদ্রার বর্ণ। অতসী ফুল, করবী ফুল, কোন কোন গাঁদা ফুল হলুদ বর্ণের। হলুদ গাঢ় হইলে পীত বলে। পিতলের বর্ণ পীত। পাতলা হলুদকে বাসন্তী বলে, যেমন সর্ষপ ফুলের রঙ।

সবুজ—(মিশ্রবর্ণ) নীলে হলুদে মিশাইলে সবুজ হয়। কলার পাতা, কচুপাতা, ধান গাছ প্রভৃতির রঙ। সাধরণতঃ সকল পাতাকেই সবুজ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক পাতার বর্ণ ঠিক সবুজ নয়, সবুজের সহিত একটু কাল মিশ্রিত। গাঢ় সবুজকেই মরকত বলে; দূর হইতে নূতন ধানের ক্ষেত যেমন দেখায়। শ্যামল—পাতলা সবুজ; নূতন ধানের বর্ণ বা ঘাসের উপর তিন চারি দিন এক খানা ইট চাপা দিয়া রাখিয়া, পরে সেই ইট সরাইলে, ঘাসের যে রঙ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নীলের ভাগ অতি সামান্যই থাকে। আমাদিগের দেশের অনেক চিত্রকর রামচন্দ্রের চিত্রে সবুজ রঙ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সেটী অত্যন্ত ভুল। রামের বর্ণ নব-দূর্ব্বাদলের ন্যায় গৌরবর্ণ।

কমলা—(মিশ্রবর্ণ) লাল ও হলুদে মিশাইলে কমলা হয়। পাকা-কমলার রঙ। গাঢ়-কমলা-বর্ণকে পীক বলে, কাঁচা হলুদের রঙ। চূণে হলুদে মিশাইলেও পীক বর্ণ হয়। অনেক গাঁদা ফুলের বর্ণ পীক। পাতলা-কমলা বর্ণকে কমলাভ বলে, যথা কমলা লেবুর শুষ্ক খোসার রঙ, বা ডাঁসা কমলা লেবুর রঙ।

বেগুণে—(মিশ্রবর্ণ) নীলে ও লালে মিশাইলে বেগুণে হয়। কচি বেগুণের রঙ। বেগুণ বড় হইলে যে গাঢ় বেগুণে রঙ হয়, তাহাকেই বঙ্গেশ বা বঙ্গনেশ রঙ বলে। বেগুণ ফুলের বর্ণ পাতলা বেগুণে।

আলতা—লালের সহিত একটু নীল মিশ্রিত, যথা মেজেণ্টারবর্ণ, আলতার বর্ণ।

পাটল—লালের সহিত সামান্য হলুদ, যেমন ইটের বর্ণ।

কনক—পীতের সহিত ঈষৎ লাল মিশ্রিত, পাকা সোণার বর্ণ।

জরদ—হলুদের সহিত একটু সবুজের আভা, যেমন পাকা বাতাবী লেবুর (জাম্বুরার) রঙ।

ময়ূরকণ্ঠী—নীলের ভাগ অধিক যুক্ত সবুজ, ময়ূরের কণ্ঠের রঙ।

ধূম্র—নীলের মধ্যে একটু বেগুণের আভা, রামধনুর নিম্নাংশের রঙ।

কপিল—লাল হলুদের সহিত একটু কাল রঙের মিশ্রণ।

কপিশ—নীল ও লালের সহিত একটু কাল।

পিঙ্গল—নীল ও হলুদের সহিত একটু কাল।

ধূসর—সাদার সহিত একটু কাল মিশ্রিত; ছাই। কোন দ্রব্যের প্রকৃত রঙের বিবর্ণত্ব ঘটিলে তাহাকে পাংশু, পাশুটে, পিংশে বলা হয়। ধূসরের সহিত একট লাল বা হলুদ মিশ্রিত হইলে কটা রঙ হয়।

রঙ ঘন হইতে হইতে কাল রঙের দিকে অগ্রসর হয়; আবার পাতলা হইতে হইতে সাদা রঙের দিকে চলিয়া আসে।

মিশ্র রঙের মধ্যে সবুজ, বেগুণে ও কমলা রঙের উৎপত্তি বালকগণের সম্মুখে শিক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখাইবেন। লাল, নীল ও হলুদ রঙের গুঁড়া কিনিতে পাওয়া যায়। সেইগুলি জলে গুলিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবেন। পরীক্ষার সময় একটা চীনে মাটীর বাটীতে প্রথমে একটা রঙ ঢালিবেন—মনে করুন হলুদ। তারপর এই হলুদের সহিত একটু একটু করিয়া নীল রঙ মিশাইয়া ও তুলির দ্বারা সেই রঙ কাগজে লাগাইয়া, শ্যামল, সবুজ ও মরকত বর্ণ দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে বেগুণে ও কমলা শিখাইতে হইবে। অন্যান্য মিশ্রবর্ণ নিম্ন শ্রেণীতে শিখাইবার আবশ্যকতা নাই।

২য় খেল্‌না।—একটা লম্বা বাক্সের ভিতর একটা কাষ্ঠের গোলা, একটা কাষ্ঠের ঢোল ও একটা কাষ্ঠের ছক। গোলার ব্যাস, ঢোলের ও ও ছকের উচ্চতার সমান বা কিছু কম বেশী। আর ছকের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ সমান। সূতা বাঁধিবার জন্য ইহাদের গায়ে ছোট ছোট হুক লাগান থাকে। পূর্ব্ব খেলনার সেই বলের সহিত যোগ করিয়া ২য় খেলনার সৃষ্টি। ২য় খেল্‌নার সৃষ্টিতে যে কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুঝিতে পারিলে, ফ্রবলের প্রতিভা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। একটা মাটীর
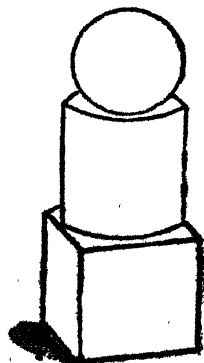
গোলার এক অংশ ছুরি দ্বারা ভূমির সমান্তর করিয়া কাট, ঠিক তার বিপরীত দিকও এইরূপ করিয়া কাট। গোলা হইতে ঢোল উৎপন্ন হইল। আবার এই ঢোলের কুব্জ পার্শ্ব চারভাগ করিয়া কাটিলেই ছক হইল। সেই প্রথম খেলার বল অবলম্বন করিয়া ঢোল, আর ঢোল হইতে ছক গঠন করা হইল। দ্রব্যাদির সাধারণ আকারও এই তিন প্রকার, গোলাকার, ঢোলাকার ও ছকাকার। আবার বিশ্বরাজ্যে গোলাকার জিনিষই বেশী। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্তই গোলাকার। নয়ন মেলিয়াই আমরা প্রথম এই সমস্ত দেখি, আর এই সমস্ত আলোক দান করিয়াই আমাদিগকে সমস্ত দেখায়। তারপর পৃথিবীতে দেখি ঢোলাকার জিনিষই বেশী। গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, মানুষের অঙ্গ, পশু পক্ষীর অঙ্গ সমস্তই ঢোলাকার। ছকাকার দ্রব্য আমরা করিয়া লইয়াছি, আমাদিগের গৃহ সামগ্রীর মধ্যে অনেক গুলিই ছকাকার যথা দালান, কোঠা, বাক্স, তক্তপোস, পুস্তক, টেবিল ইত্যাদি।

গোলার কথা।—গোলা, ঢোল ও ছক বালকের সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কোনটী দেখিয়াছে। বালক অবশ্য গোলার কথাই বলিবে। তারপর সেই উলের বল্ ও এই কাটের গোলা দুইটী লইয়া তুলনা করিতে আরম্ভ কর। উলের বল্ থস্‌থসে, নানা রঙের, উলের বল্ নরম, গড়াইলে শব্দ হয় না, তেমন তাড়াতাড়ি গড়ায় না, ফেলিয়া দিলে তেমন শব্দ হয় না, লাফাইয়া উঠে। কিন্তু কাঠের বল্ তেলতেলে সাদা রঙের, কাঠের তৈয়ারী, শক্ত, গড়াইলে শব্দ হয়, তাড়াতাড়ি গড়ায়, ফেলিয়া দিলেও শব্দ হয়, আর তেমন লাফাইয়া উঠে না। এইরূপ কাঠের বল্‌কে গোলা বলে। লোহার, সীসার, পিত্তলের বল্‌কেও গোলা বলে।

বালকেরা গোলার মত যে সকল জিনিষ দেখিয়াছে তাহার নাম করিবে। বেল, তাল, কুল, কমলা, গোলা, মারবেল, ছানাবড়া, গোলক ইত্যাদি যে কয়টা নাম করিতে পারে। শিক্ষকও ইহার মধ্যে ২।১টা সহজ মত দেখাইয়া শিখাইয়া দিতে পারেন। তারপর গোলা ঝুলাইয়া দেখাইবেন যে গোলাও বলের মত ঝুলে। গোলা ঘুরাইয়া দেখাইবে যে গোলা ঘুরাইলেও গোল দেখায়। তারপর বালকগণকে গোলাকার করিয়া দাঁড়া করাইয়া

একজনকে গোলাটী অন্তের নিকট গড়াইয়া দিতে বল? সে আবার তার নিকটবর্ত্তী বালকের নিকট গড়াইয়া [illegible] ইত্যাদি প্রণালীক্রমে বালকেরা গোলা লইয়া খেলা করিবে। দুইজন বালকের মধ্যে যে দুরত্ব সেই দুরত্বের হিসাবে কি পরিমাণ জোরে গোলা চালান আবশ্যক বালকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে। হাতের স্থিরতা জন্মাইবে। চক্ষুর স্থির দৃষ্টিরও অভ্যাস হইবে, সুতরাং চক্ষু ও হস্তের একত্র কার্য্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

ঢোলের কথা।—গোলার সহিত. ছকের ও ঢোলের আকারগত পার্থক্য কি? ঢোলের পাশ গোলার মত গোল, আর উপর নীচের ভাগ ছকের পাশের মত চ্যাপ্টা।

১৭ চিত্র—ঢোল ঘুরাণ।
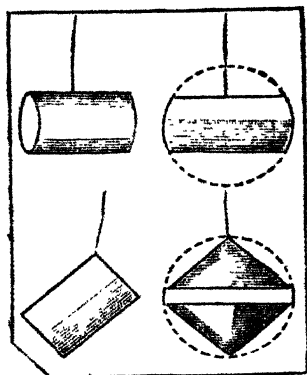
বালকেরা ঢোলের মত যে সকল জিনিষ দেখিয়াছে তাহার নাম করিবে। (গোল থাম, বাজাইবার ঢোল, গাছের গুঁড়ি, বাহু, বোতল, গেলাস প্রভৃতি) গোলাকে যে কোন পাশে গড়াইয়া দিলেই গড়াইয়া যায়, কিন্তু ঢোলকে গোলার মত পাশে গড়াইলেই গড়িয়া যায়, চ্যাপটা পাশে গড়ায় না। ঢোলকে লম্বালম্বি ঝুলাইলে ঢোলের মতই দেখায় কিন্তু পাশে ঝুলাইয়া ঘুরাইলে গোলার মত দেখায়। (১৭ চিত্র দেখ)

আবার এক ধারে ঝুলাইয়া ঘুরাইলে দুইটী মোচার মাথার মত দেখায়।

এই ঢোল গড়াইয়াও পূর্ব্বের মত খেলা করা যাইতে পারে। কিন্তু এ খেলা যে গোলার মত সুবিধাজনক হইবে না অর্থাৎ ঢোল যে গোলার মত বেশ উত্তমরূপে গড়াইবে না তাহা বালকেরাই বুঝিতে পারিবে।
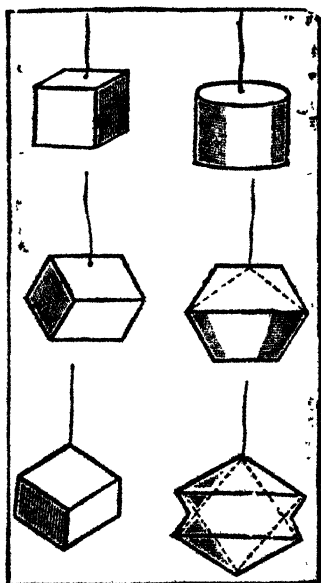
১৮ চিত্র। ছক ঘুরাণ

ছকের কথা।—ছকের মত জিনিষের নাম কর (বাক্স, পুস্তক, সাবান, ইট ইত্যাদি), পাশ (৬টী) ধার (১২) ও কোণের (৮টী) পরিচয় করাও ও গণনা করাও। তারপর ছকের ঘূর্ণনে ভিন্ন ভিন্ন আকার দেখাও। ১৮ চিত্র দেখ।

(১) পাশে সূতা বাঁধিয়া ঘুরাইলে ঢোল হয় (ঢোলের সহিত ছকের মিল)।

(২) একধারের শিরের উপর সূতা বাঁধিয়া ঘুরাইলে গাড়ীর চাকার ধুরের মত দেখায়।

(৩) এক কোণে ঘুরাইলে দুইটা মোচার মাথার মত দেখায়।

৩য় খেল্না।—একটা দুই ইঞ্চ ছককে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ৮টী ১ ইঞ্চ ছক করা হইয়াছে।
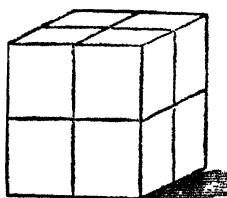
১৯ চিত্র। ছক।

২য় খেল্নায় ছকের সাধারণ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ছককে এখন ভাঙ্গিয়া দেখাইতে হইবে। বালকেরাও একটা খেলনা পাইলে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিতে ভালবাসে। ভাঙ্গা গড়া বালকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই ৩য় খেলনা, ৩ বৎসরের হইতে ৬ বৎসরের বালকের জন্য রচিত। বয়সভেদে বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

বালকের সম্মুখে ছকটী স্থাপন কর। বালকেরা আস্ত ছক ভাঙ্গিয়া যাহাতে আবার পূর্ব্ববৎ গড়িতে পারে সেরূপ শিক্ষা দাও।

গঠন শিক্ষা।—৩।৪ বৎসরের বালকগণের পক্ষে পদার্থের অনুকরণে গঠন করা আমোদজনক। ছকগুলি সাজাইয়া থাম, দেওয়াল, চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল প্রভৃতির অনুকরণ করা যাইতে পারে। শিক্ষক নিজের টেবিলের উপর গঠন করিবেন, বালকেরা তাহাদের নিজ নিজ ছক দ্বারা তাহাদের সম্মুখে মাটী বা টেবিলের উপর শিক্ষকের অনুকরণে গঠন করিবে। নিম্নে গঠনের কয়েকটী নমুনা দেওয়া হইল :—

কোন দ্রব্যের গঠন করিতে শিখিলেই চলিবেনা, সেই দ্রব্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ও কিছু কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চেয়ার উপলক্ষ করিয়া একটী পাঠের আভাস দেওয়া হইল (চিত্র দেখ)।

২০ চিত্র।—ছকের দ্বারা দ্রব্য গঠন।
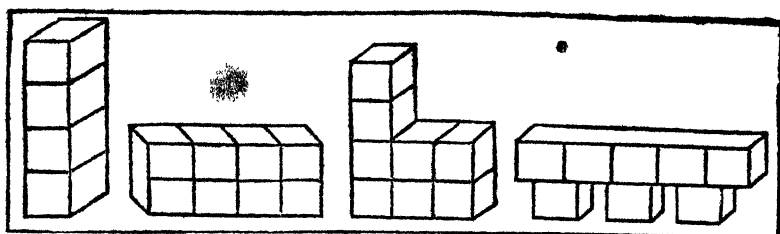
"এই জিনিষটা কোন জিনিষের মত?" "এটী চেয়ারের মত" "ইহার কোন জায়গায় বসে আর কোন জায়গায় ঠেস্ দেয়?" "(দেখাইয়া) এই জায়গায় বসে, এই জায়গায় ঠেস্ দেয়" "যেখানে ঠেস দেয় তাহাকে চেয়ারের পিঠ বলে—এই চেয়ারের পিঠ দেখাও? (শিক্ষকের চেয়ার দেখাইয়া) ইহার পিঠ দেখাও।" "চেয়ার কি দিয়া তৈয়ারী করে?" "কাঠ কোথায় পায়?" "কেমন করিয়া তক্তা করে?" "যে লোক চেয়ার, বাক্স, টেবিল তৈয়ারী করে তাহাকে কি বলে?" ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া বালককে আবশ্যকীয় দুচারিটী নূতন কথা শিখাইতে হইবে। কিন্তু সাবধান যেন মাত্রা অধিক না হয়। এইরূপ যে দিন যে জিনিষের গঠন করিবে সে দিন সেই জিনিষ সম্বন্ধে শিক্ষা দিবে।

সৌন্দর্য্য ও সমতা শিক্ষা।—টেবিল বা মাটীর উপর (ছকের) কাঠের খণ্ডগুলি পাতিয়া নানারূপ সাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহাতে বালকগণের সমতা ও সৌন্দর্য্য বোধ জন্মে। নিম্নে আদর্শ স্বরূপ কয়েকটী সাজের নমুনা দেওয়া হইল :—
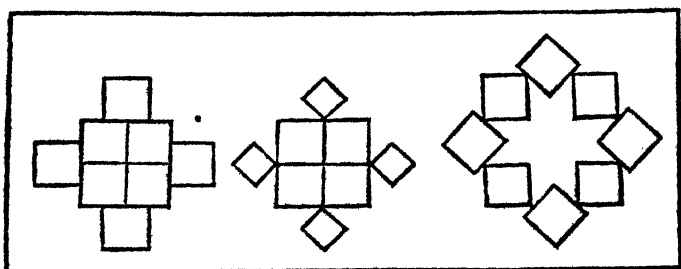
২১ চিত্র।—ছকের দ্বারা সাজ গঠন।

শিক্ষকগণ নিজেরা এই আদর্শে নানা সাজের রচনা করিতে পারিবেন। বালকেরাও নানারূপ সাজ নিজেরাই কল্পনা করিতে পারিবে। নিম্ন শ্রেণীর বালকগণকে এইরূপ সাজ রচনায় নিযুক্ত রাখিলে, তাহাদিগের সময় আনন্দে কাটিবে, কোনরূপ গোলমাল হইবে না, আর শিক্ষক এই সময়ে অন্য শ্রেণীতে কার্য্য করিবার অবসর পাইবেন।

গণনা শিক্ষা।—এক এক খণ্ড কাঠ লইয়া বালকদিগকে প্রথমে ১, ২ গণনা শিক্ষা দিতে হইবে। ছকের খণ্ডগুলি সমস্ত এক জায়গায় রাখ। বালকেরাও তাহাদের খণ্ডগুলি নিজের নিজের সম্মুখে রাখিবে। শিক্ষক এক একখানি কাষ্ঠখণ্ড সরাইবেন আর ১, ২, ৩ ইত্যাদি গণনা করিবেন, বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুকরণে এক একটা করিয়া কাঠ সরাইবে ও ১, ২, ৩ প্রভৃতি গণনা করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসে (এক দিনের নয়) বালকদিগের সংখ্যাবোধ হইবে। দুই হাতের অঙ্গুলি লইয়াও এইরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হয়। কাঠির দ্বারা সংখ্যা শিক্ষার প্রণালী অষ্টম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে।

তারপর যোগ শিক্ষা।—একটা ছোট ছক কাছে রাখ, বালকেরাও তদ্রূপ করিবে। আর একটা ছক ঐ প্রথমটার কাছে সরাইয়া বল "এক ছক আর এক ছক, ২ ছক"। আর একখানি, এই দুইখানির নিকট সরাইয়া আনিয়া বল "২ ছক ও ১ ছক, তিন ছক"—বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিবে, ইত্যাদি।

এইরূপে যোগ শিক্ষার পর বিয়োগের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। একটা ছকের সহিত আর একটা ছক যোগ কর আর পূর্ব্বের মত বল "১টা ছক ও ১টা ছক, ২টা ছক"। তারপর এই দুইটা হইতে ১টা সরাইয়া বল "২টা ছক হইতে ১টা ছক সরাইলে, ১টা ছক থাকে"। আবার দুইটা ছকের সঙ্গে ১টা যোগ করিয়া বল "২টার ছকের সঙ্গে ১ ছটা ছক যোগ করিলে ৩টা ছক হয়" "৩টা ছক হইতে ১টা ছক নিলে ২টা ছক থাকে"। "৩টা ছক হইতে ২টা ছক নিলে ১টা ছক থাকে" ইত্যাদি—দুইটা সরা-

ইয়া লইলে, যেটী অবশিষ্ট থাকিবে, সেটীও হাত দিয়া দেখাইয়া দিবে। যাহাই শিখাইবে তাহাই বস্তুর সাহায্যে, বস্তু দেখাইয়া শিখাইবে। বালকেরা অনুকরণ করিবে। ৫।৬ বৎসরের বালককে ভগ্নাংশ বিষয়ক সামান্য শিক্ষাও দিতে হইবে। যথা—

একটা বড় ছককে (ছোট ছোট ছকের সমষ্টি) পাশাপাশী ২ ভাগে ভাগ করিয়া দেখাও—"একটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা গেল, এক এক ভাগকে আধা (বা আধখানা) বলে।" "তোমাদের মধ্যে কেহ এটা লম্বালম্বী ২ ভাগে ভাগ কর। এই আধা (ছোট ছোট ছকগুলি গণনা করিয়াও দেখাইতে পার যে পূর্ব্বের আধায় যতগুলি কাষ্ঠ, এই আধায়ও ততখানি)। তারপর চারভাগ করিয়া দেখাও আর বল যে "ইহার এক এক ভাগকে সিকি বলে।" "কয়টা সিকিতে একটা পুরা জিনিষ হয়?" "কয়টা আধায় একটা পুরা জিনিষ হয়?"—এইরূপ আট-ভাগ কর ও তাহার এক এক ভাগকে যে দুয়ানী বলে, তাহা শিখাইয়া দাও। আটটা দুয়ানীতে যে একটা পূরা জিনিষ হয় তাহা জুড়িয়া দেখাও।

২২ চিত্র।—ছকের ভগ্নাংশ।

এইরূপে ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগও মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পাটীগণিত পরিচ্ছেদের ভগ্নাংশ প্রকরণে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

গড়াভাঙ্গার সাধারণ নিয়ম।—এইরূপ গড়াভাঙ্গায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করা নিতান্ত আবশ্যক :—

(১) ছকটীকে বালকের সম্মুখে (না ভাঙ্গিয়া) আস্ত রাখিয়া দিবে।

(২) বালকও কার্য্যের শেষে খণ্ড-ছকগুলি মিলাইয়া বড় ছক রচনা করিয়া বাক্সে রাখিবে।

(৩) সমস্তগুলি খণ্ড-ছকের ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) একটা গঠনের সহিত যোগ বিয়োগ করিয়া অন্যান্য গঠনের সৃষ্টি করিতে শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ একটা গঠন সম্পূর্ণরূপ না ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত দুচার খান ছক যোগ করিয়া বা তাহা হইতে দুচার খান সরাইয়া, বা দুচার খানির স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন জিনিষের রচনা করিবে।

(৫) যে জিনিষের রচনা বা গঠন করা হইবে, সেই জিনিষ সম্বন্ধে বালকগণকে সামান্য সামান্য শিক্ষাও দিতে হইবে।

(৬) বালকেরা যে জিনিষ গড়িবে, তাহার একটা নামকরণ (যে জিনিষের প্রতিকৃতি তাহার নাম অনুসারে) করা আবশ্যক। আর সেইরূপ গঠনের সেই নামই ঠিক রাখা আবশ্যক।

(৭) বালকেরা যাহা রচনা বা গঠন করিবে, তাহা যাহাতে অন্য বালকে ভাঙ্গিয়া না দেয় সে বিষয়ে সাবধান করিতে হইবে। যাহাতে বালকেরা অপরিষ্কার বা বিশৃঙ্খলভাবে কাজ না করে, সে বিষয়ে শিক্ষককে মনোযোগী হইতে হইবে। একজনের ছকগুলি যেন অন্যে ব্যবহার না করে।

(৮) প্রত্যেকবার বালকগণকে নূতন নূতন জিনিষ বা সাজ রচনা করিতে উৎসাহ দিবে। এক রকমের রচনা করা বাঞ্ছনীয় নহে।

৪র্থ খেলনা।—এটীও দ্বিতীয় খেলনার মত। একটী ২ ইঞ্চ ছক। তবে ২য় খেলনায় ছক, ৮টী ছোট ছোট ছকে ভাগ করা হইয়াছে, আর এই খেলনায় ছককে ইঁটের মত লম্বা আকারে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারাও নানা জিনিষের প্রতিকৃতির অনুকরণ করা যাইতে পারে।

আমাদিগের বিদ্যালয়ে এ সমস্তের ব্যবহার নাই বলিয়া এই চতুর্থ

খেলনা বিষয়ে অধিক লেখা হইল না। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না তাঁহারাও যদি এ বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তবে কিণ্ডার-গার্টেন সম্বন্ধীয় নানারূপ ইংরেজী পুস্তকের অন্তর্গত ছবিগুলি দেখিলেই এই সমস্ত খেলনার শিক্ষাপ্রণালী বুঝিতে পারিবেন।

৫ম খেল্না।—এটী একটা ৩ ইঞ্চ ছক। ইহাকে ২৭ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারাও নানারূপ গঠনের কার্য্য হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ খেল্না।—একটা ৩ ইঞ্চ ছক, ২৭ খানি ইঁটের মত লম্বা ফলকে ভাগ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্যের গঠন করা যাইতে পারে।

৭ম খেল্না।—বর্গক্ষেত্রও ত্রিভুজের আকারে কতকগুলি রঙ করা পাতলা কাঠ বা মোটা কাগজ কাটা ; এইগুলি মাটী বা টেবিলের উপর সাজাইয়া নানাবিধ দ্রব্যের অনুকরণ করা যাইতে পারে ও সুন্দর সুন্দর ফুল ও সাজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে রঙ করা কাগজে কতকগুলি বর্গক্ষেত্র ও কতকগুলি ত্রিভুজ (নানা রকমের) কাটিয়া দিতে পারেন। বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া নানা রকমের সাজ রচনা করিবে। বিলাতী কাপড়ে যে সকল ছবি আঁটা থাকে, তাহা সংগ্রহ করিয়াও এই রকমের খেলনার রচনা করা যাইতে পারে। একখানি ছবিকে কাঁচি দিয়া ৪ ভাগ করিয়া কাটিয়া দাও, বালকেরা সেগুলি সাজাইয়া পুরা ছবি করিবে। এইরূপ আর একখানিকে ৮ ভাগে, অন্য একখানিকে ত্রিভুজের মত ভাগ করিয়া, বালকগণকে সাজাইতে বলিলে, তাহারা বেশ আমোদ বোধ করিবে।

৮ম খেল্না।—১ ইঞ্চ, ২ ইঞ্চ, ৩ ইঞ্চ, ৪ ইঞ্চ ও ৫ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি কাঠী। কাঠীগুলি দেশালাই এর কাঠী বা ঝাঁটার কাঠীর মত সরু। কিণ্ডারগার্টেন বাক্সের সঙ্গে যে কাঠী বিক্রয় হয় সেগুলি কাঠের,

সহজেই ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। বাঁশের কাঠী কাঠের কাঠী অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর, সহজ প্রাপ্য ও সস্তা।

৬ষ্ঠ খেলনা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধযুক্ত কাষ্ঠ ফলকের ব্যবহার ছিল। তবে ৬ষ্ঠ খেলনায় কাষ্ঠ ফলকগুলির বেধ কমিয়া গিয়াছিল। ৭ম খেলনায় আবার এই বেধ একবারে কমিয়া গিয়াছে। বেধকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া (সপ্তম খেলনায়) কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট সমতল লইয়াই দ্রব্যাদির রচনা করা হইয়া থাকে। এই অষ্টম খেলনায় আবার সেই সমতলও পরিত্যাগ করিয়া কেবল সমতলস্থ সরল রেখা মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতম বিষয়ে প্রবেশ করা হইতেছে।

কিণ্ডারগার্টেন খেলনাগুলি না কিনিয়া নিজেও প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক অন্য সমস্ত খেলনা শিক্ষক ক্রয় করিতে বা প্রস্তুত করিতে পারুন বা নাই পারুন, এই অষ্টম খেলনা তাঁহাকে সংগ্রহ করিতেই হইবে। খরচও নাই, তেমন পরিশ্রমও নাই আর এই খেলনার মত আবশ্যকীয় খেলনাও আর নাই। অক্ষর শিক্ষা, অঙ্কন শিক্ষা, গণিত শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষার মূল এই খেলনায় নিহিত।

কাঠী সাজান।—খাড়া, পড়া ও তেড়া এই তিনটীই সরল জিনিষের সাধারণ অবস্থা। এক বালককে শ্রেণীর সম্মুখে খাড়া করিয়া বল "বালকটী দাঁড়াইয়া বা খাড়া হইয়া আছে।" তাহাকে টেবিলের উপর শোয়াইয়া বল "বালকটী টেবিলের উপর শুইয়া বা পড়িয়া আছে। তাহাকে দেওয়ালের গায়ে হেলাইয়া বল যে "বালকটী দেওয়ালের গায়ে হেলিয়া বা তেড়া হইয়া আছে।" তারপর একটা ছাতা টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল যে "খাড়া ছাতা," শোয়াইয়া বল যে "পড়া ছাতা," হেলাইয়া ধরিয়া বল "তেড়া ছাতা"। বালকেরাও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে খাড়া ছাতা, পড়া ছাতা ও তেড়া ছাতা বলিবে। তার পর টেবিলের উপর একটা পেন্‌সিল খাড়া করিয়া ধর, আর বালকগণকে পেন্‌সিলের অবস্থা

জিজ্ঞাসা কর। বালকেরা 'খাড়া পেন্‌সিল বলিতে' শিখিয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে পারিবে। এইরূপে পেন্‌সিল টেবিলের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া ও তেড়া করিয়া ধরিয়া বালকের জ্ঞান পরীক্ষা কর। তার পর নিজে একটা বড় কাঠী, লও ও বালকগণের হাতেও একটা কাঠী দাও। নিজে কাঠীটী টেবিলের উপর খাড়া করিয়া বল "খাড়া কাঠী", বালকেরাও নিজ নিজ কাঠী, মাটী বা ডেস্‌কের উপর খাড়া করিয়া বলিবে "খাড়া কাঠী"। এইরূপে শিক্ষক টেবিলের উপর কাঠী তেড়া করিয়া বলিবেন "তেড়া কাঠী"। বালকগণও তদ্রূপ করিবে। এইরূপে "পড়া কাঠী"ও শিখাইতে হইবে। একটু অভ্যাস হইলে পরে বালকগণকে বিদ্যালয় গৃহস্থিত খাড়া, তেড়া, পড়া বাঁশ বা কাঠ দেখাইতে হইবে। (টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চের পা, দরজার খাড়া চৌকাঠ, ঘরের থাম প্রভৃতি খাড়া ; ঘরের চালের বাঁশ বা কাঠের রুয়া তেড়া ; চৌকাঠের উপরনীচের কাঠ, বেঞ্চের তক্তা পড়া।

ইহার পর খাড়া, তেড়া, পড়া, আবার অন্য রকমে শিখাইতে হইবে। শিক্ষক নিজের সম্মুখে টেবিল বা মাটীর উপর লম্বভাবে একখানি কাঠী রাখিয়া বলিবেন "খাড়া কাঠী", তারপর সেই কাঠী ঠিক নিজের চক্ষের সমান্তর করিয়া বলিবেন "পড়া কাঠী।" বোর্ডেও চক দিয়া এইরূপে

খাড়া তেড়া পড়া
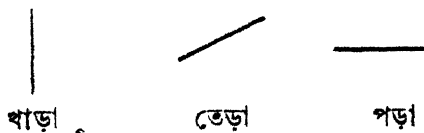
খাড়া, তেড়া ও পড়া কাঠী আঁকিয়া দিবেন। বোর্ডে অঙ্কিত এই তিন প্রকারের টান (বালকেরা রেখাকে 'টান' বলে) যাহাতে বালকেরা দেখিয়াই বুঝিতে পারে সেরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। ২।৩ দিনেই বালকেরা খাড়া টান (রেখা) পড়া টান ও তেড়া টান বুঝিবে ও বলিতে শিখিবে।

গঠন শিক্ষা।—(১) বালকগণের ডান হাতের পাশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ১০।১২টী করিয়া ২ইঞ্চ ও ৫ইঞ্চ কাঠী রাখ। তারপর নিজে বোর্ডে চক দিয়া একটা পড়া-টান দিয়া বল "এই রকমে বড় কাঠী দিয়া
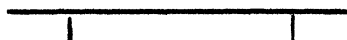
২৩ চিত্র।—বেঞ্চ।

একটা পড়া-কাঠী সাজাও।" তারপর শিক্ষক বোর্ডে চক দিয়া সেই পড়া-টানের নীচে, একটু দূরে দূরে ২টী ছোট খাড়া-টান দিয়া বলিবেন "পড়া কাঠীর নীচে এইরূপ ২টী ছোট কাঠী খাড়া করিয়া লাগাও।" বসিবার বেঞ্চ হইল। এখন বেঞ্চ বিষয়ে বালককে গল্পচ্ছলে দু'চারিটী কথা শিখাইয়া দাও।

(২) বালকের পাশে ৩ইঞ্চ, ২ইঞ্চ কাঠী রাখ। বোর্ডের উপর চক দিয়া আঁক আর বল "এই রকমে একটা ছোট পড়াকাঠী সাজাও; তার সঙ্গে এই রকমে ২টা ছোট খাড়াকাঠী লাগাও, আর তার সঙ্গে এই রকমে একটা তেড়াকাঠী লাগাও; বালকেরা সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিবে। বালকেরা ঠিক করিয়া কাঠী সাজাইতে পারিল কিনা তাহা

২৪ চিত্র।—চেয়ার।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে। একখানা চেয়ার হইল। এখন চেয়ার সম্বন্ধে বালককে ২।৪টী কথা শিখাও।

(৩) পাঁচ রকমের কাঠীর যাহাতে ব্যবহার হইয়া থাকে এরকমের একটা দৃষ্টান্ত দিলে শিক্ষকগণ কাঠীর দ্বারা গঠনের বিষয় সমস্তই বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষক বোর্ডের উপর একটা একটা করিয়া দাগ দিতে

থাকিবেন আর বালকেরা কাঠীর দ্বারা তাহার অনুকরণ করিবে। কাঠীগুলির নাম এক ইঞ্চ কাঠী, দুই ইঞ্চ কাঠী এরূপ বলিলে হয়ত বালকেরা ধরিতে পারিবে না, সেই জন্য কেহ কেহ বড়কাঠী, মেজো-কাঠী, সেজোকাঠী, ছোটকাঠী প্রভৃতি নামাকরণ করা পছন্দ করেন। যাহা হউক এ সকল বালকের বুদ্ধি ও শিক্ষকের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। ৫ রকমের কাঠীদ্বারা একটা রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্ট প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইল ঃ—

শিক্ষক শিশুগণকে এইরূপ আদেশ করিবেন ঃ—"একটা ৩ ইঞ্চ পড়াকাঠী সাজাও (শিক্ষক এইরূপ আদেশের সঙ্গে, একে একে বোর্ডে আঁকিতে থাকিবেন, আর বালকেরা মাটী বা টেবিলের উপর চিত্রের অনু-করণে কাঠী সাজাইতে থাকিবে); তার পর দুইটী ২ ইঞ্চ তেড়া কাঠী লাগাও; তার নীচে দুইটী ৪ ইঞ্চ তেড়া কাঠী সাজাও; তার নীচে একটা ৫ ইঞ্চ খাড়া কাঠী লাগাও; ২ ইঞ্চ পড়াকাঠীর উপর একটা ১ ইঞ্চ খাড়াকাঠী বসাও।" এইরূপে সাজান হইলে লণ্ঠনের সমস্ত অংশের পরিচয় করাও, অর্থাৎ কোন্‌টী লণ্ঠনের চাল, কোন্‌টী তালা (বা ছাদ), কোন্‌টী পাশ, কোন্‌টী তলা (বা মেজে), কোন্‌টী বাতি, কোন্‌টী থাম, কোন্‌টী মই লাগাইবার আড়া ইত্যাদি দেখাইতে বল।
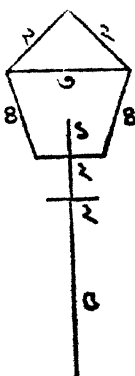
২৫ চিত্র।—রাস্তার আলো।

তারপর এই গঠন উপলক্ষ করিয়া বালকগণকে কিছু শিক্ষাও দিতে হইবে। রাস্তায় আলো দেয় কেন, এই আলোতে কি রকম তেল ব্যবহার করে, কত রকম তেলের নাম জান, কোন তেলের দ্বারা কি করা হয়, আলো কাচ দিয়া ঢাকে কেন, টিন কি কাঠ দিয়া ঢাকিলে কি হয়, না ঢাকিলে কি হয় ইত্যাদিরূপ প্রশ্নোত্তরের দ্বারা বালকগণকে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

নিম্নে আরও ২।৩টী গঠনের আদর্শ প্রদত্ত হইল শিক্ষকগণ চিন্তা

করিয়া নানারূপ গঠন আবিষ্কার করিতে পারিবেন। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে অধিকাংশ চিত্রেই প্রথমে পড়ারেখা আঁকিয়া চিত্র আরম্ভ করিতে হইবে, তারপর তেড়া, খাড়া।
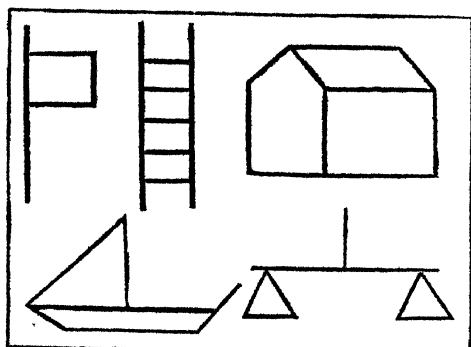
২৬ চিত্র।—পাখা, সিঁড়ি, ঘর, নৌকা, দাঁড়িপাল্লা।

অক্ষর শিক্ষা।—কাঠীর দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষর শিখান তেমন সুবিধা হয় না। ইংরাজী অক্ষরগুলি বেশ শিখান যায়। বাঙ্গালা অক্ষর শিখাইবার পক্ষে তেঁতুলের বীজ বেশ সুবিধাজনক। তবে সরল রেখাযুক্ত বাঙ্গালা অক্ষরগুলি কাঠীর সাহায্যে শিখান যাইতে পারে। আবার অক্ষর শিক্ষার সাধারণ নিয়মও এই যে, প্রথমে সরল রেখাযুক্ত অক্ষরগুলিই শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে ব্যাকরণসম্মত প্রণালী অবলম্বন করা সুবিধাজনক নহে।

ব র (ক) ঋ (ধ) (ফ) য এই কয়েকটী সরল রেখাযুক্ত। তবে 'র'এর ফোটা, 'ক'এর ও 'ফ'এর আঁকুড়ী, সরল কাঠীর দ্বারা হয় না। এইজন্য 'র'এর ফোটার স্থানে একটা ছোট মাটী বা ইটের টুকরা কি একটী বীজ ব্যবহার করিতে হইবে। আর 'ক'এর ও 'ফ' এর আঁকুড়ী, কাঠী একটু একটু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া (একেবারে বিচ্ছিন্ন না করিয়া) প্রস্তুত করিতে হইবে ও আঁকুড়ীর মাথার ফোটার স্থানে

মাটী বা ইটের ছোট টুকরা বা কোন বীজ বসাইতে হইবে। এইরূপে কাঠী ভাঙ্গিয়া অন্যান্য অনেক অক্ষর প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

এখন অক্ষর শিক্ষা দিবার প্রকরণ জানা আবশ্যক। প্রথমে 'ব' শিখাইতে হইবে। বোর্ডের উপর প্রথমে একটা খাড়াটান দাও। বালকগণকে কাঠী দিয়া, একটা 'খাড়াকাঠী' সাজাইতে বল। তারপর নিজে বোর্ডের উপর ২টা তেড়া, ও মাত্রার স্থানে একটা পড়াটান দেও। আর বালকগণকে ২টা 'তেড়াকাঠী' ও মাত্রার স্থানে একটা 'পড়াকাঠী' সাজাইতে বল। সকলকে এক সঙ্গে 'ব' বলিতে বল। তারপর একটী বটগাছ আঁকিয়া তাহার 'ব' (ঝুরি) দেখাও। যদি কোন নিকটস্থ বটগাছে 'ব' দেখান যাইতে পারে তবে আরও ভাল হয়। তারপর উক্তরূপে 'ক' প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দাও। 'ক'এর আঁকড়ীর কাঠীগুলি

২৭ চিত্র। বোর্ডে বক অঙ্কন।

শিক্ষক নিজে ভাঙ্গিয়া না দিলে বালকেরা ভাঙ্গিতে পারিবে না। এইরূপে দুইটী অক্ষর শিক্ষা হইলে দুইটী অক্ষর একত্র করিয়া 'বক' উচ্চারণ করাও।

সকলে সমস্বরে 'বক' উচ্চারণ করিবে। বোর্ডে 'বক' শব্দ লিখিয়া তাহার পাশে একটা বকের ছবি আঁকিয়া দাও। কি যদি 'ব' লেখার পর 'র' লেখা শিখান পছন্দ কর, তবে 'র' শিখাইয়া 'বর' লিখিয়া দিবে ও বোর্ডে একটা বরের আকৃতি করিয়া দিবে। এ সমস্ত চিত্রে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই। একটা মোটামুটি রকমের রৈখিক চিত্র (out-line) হইলেই চলিবে।

কেবল বরের মাথার টোপরটী একটু জাকাল করিতে হইবে, কারণ টোপরেই বরের পরিচয়। এইরূপে 'ব' ও 'ক' ঠিক রাখিয়া, বল, বস, বন, কল, রথ প্রভৃতি কথা শিখাইতে হইবে। যে সকল শব্দে কোন জিনিষ বুঝায়, এরূপ শব্দই প্রথমে শিক্ষা দিবে। কেবল একটী মাত্র চিত্র অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে আকার ইকার প্রভৃতি শিক্ষা দিতে পারা যায়। চিত্রাঙ্কনে কিঞ্চিৎ পটুতা থাকিলেই এরূপ শিক্ষা দান সহজ ও সুখকর করিতে পারিবে। মনে কর প্রথমে একটা বটগাছ আঁকিলে (কেবল লাইনের দ্বারা অঙ্কন—খুব শক্ত নয়), তার ব (ঝুরি) দেখাও; গাছের গুঁড়ি, ডাল ও ঝুরি দ্বারা যে একটা ব এর মত অক্ষর হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাহাও দেখাইতে পার। তার পর 'বট' লিখিয়া বটের গাছের বিষয় গল্প কর। এক ধারে 'বন' আঁক ও লেখ। বনের মধ্য হইতে 'বাঘ' (ব এ আকার যোগ শিখাইবার জন্য) বাহির কর। 'বিলের' (ইকার যোগ) ধারে 'বক' বসাও। গাছের উপর 'বিড়াল' বসাও, আর এক ডালে 'বুলবুল' আঁক ইত্যাদি। একখান বোর্ডে, দিন দিন একটু একটু চিত্র বাড়াইবে, আর কেবল পরিচিত পদার্থের চিত্রাঙ্কন করিয়া আকার, ইকার প্রভৃতির ব্যবহার শিখাইবে।

২৮ চিত্র। বোর্ডে বর অঙ্কন।

পূর্ব্ব দিনের (বোর্ডের) চিত্র পুঁছিয়া ফেলিবে না—ক্রমাগত তাহার সহিত যোগ করিয়া যাইবে। চিত্রগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবে যে, সমস্ত চিত্রখানি যেন একটা সম্ভবপর ব্যাপারের ছবি হয়।
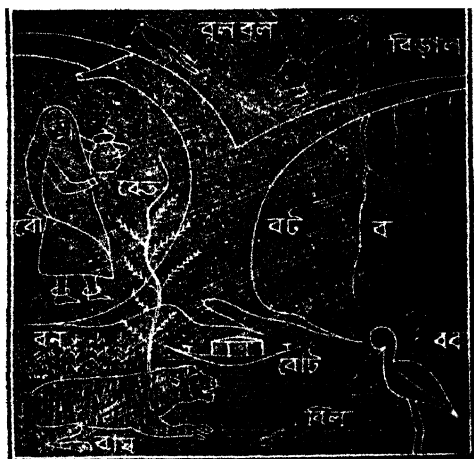
২৯ চিত্র। চিত্রাবলম্বনে শব্দ শিক্ষা।

শব্দটী শিক্ষার সঙ্গে সেই জিনিষ বা জিনিষের ছবি দেখাইলে বালকগণের বড়ই আনন্দ হয়। আর তাহারা যে দ্রব্য বিশেষের নাম পড়িতে বা লিখিতে জানে ইহা বুঝিতে পারিয়া উৎসাহিত হয়।

যেটার পর যে অক্ষর শিক্ষা দিলে সুবিধা হইতে পারে নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল।—

ব র ক ধ ঝ ঋ। য ষ ফ ঘ। ন ণ ম থ খ ল শ।

ত অ আ ভ ৯। ঢ ট ঠ চ ছ। ড উ ঊ ঙ জ।

হ ই দ গ প। এ ঐ ঞ। ও ঔ। স ঈ।

তবে যে ঠিক এই শৃঙ্খলাক্রমেই শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে। আবশ্যক বোধে শিক্ষক নিজের মত বিভাগ করিয়া লইতে পারেন। আর

এক কথা, ১০।১৫টা অক্ষর শিক্ষা হইলে পর বিশেষ কোন শৃঙ্খলার আবশ্যক হইবে না।

বীজ সাজান।—তেঁতুলের বীজ, কড়ি, ছোট ছোট পাথরের টুকরা দ্বারা বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করাইতে হইবে। প্রথম প্রথম মাটীর উপর কি স্লেটের উপর চকের দ্বারা অক্ষর লিখিয়া দিবে। বালকেরা বীজ বা কড়িগুলি অক্ষরের দাগের উপর সাজাইবে। এইরূপ দু চারি দিবস অভ্যাস হইলে, একটা অক্ষর (যথা ব) লিখিয়া দিবে আর সেই অক্ষরের একটু একটু পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য অক্ষর প্রস্তুত করাইতে শিখাইবে। মনে কর প্রথমে তেঁতুল বীজ দিয়া একটা 'ব' সাজাইলে বালক 'ব' প্রস্তুত করিল এবং মুখেও 'ব' পড়িল। তারপর একটা বীজের দ্বারা ফোঁটা দিয়া বালক 'ব' কে 'র' করিল ও 'র' পড়িল। তারপর ফোঁটার বীজটী তুলিয়া, 'ব' এ আঁকড়ী লাগাইয়া 'ক' করিবে, ও 'ক' বলিয়া পড়িবে। এইরূপে 'ক'এর আঁকড়ী সরাইয়া 'ধ' করিবে ইত্যাদি। কথা এই যে একটা অক্ষর আরম্ভ করিয়া, তাহারই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সেই আকারের অন্যান্য অক্ষর প্রস্তুত করাইতে হইবে।
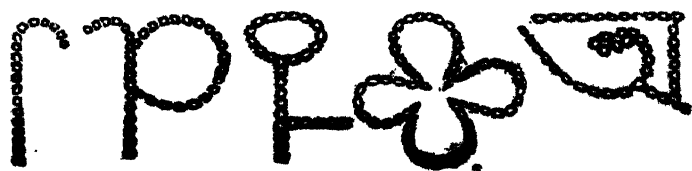
৩০ চিত্র।—বীজের ব্যবহার।

তেঁতুলের বীজের দ্বারা দ্রব্যের অনুকরণ বা নানারূপ সাজ প্রস্তুত করাইতে হইবে। কাঠী দ্বারা বক্ররেখা করা যায় না, কিন্তু তেঁতুলের বীজ সাজাইয়া সহজেই বক্ররেখা করা যাইতে পারে। এইজন্য কাঠীর গঠনে যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, বীজের দ্বারা সে সকল ত করা যাইতেই

পারে, তাহা ছাড়া লাঠী, পাখা, চাবি, ফুল প্রভৃতি বক্র রেখাযুক্ত দ্রব্যের গঠন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

অক্ষর শিক্ষা বিষয়ে আরও অনেক কথা "বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা" অনুচ্ছেদে লিখিত হইল। কাঠী, বীজ প্রভৃতির সাহায্যে অঙ্ক শিক্ষার প্রণালী 'পাটীগণিত' অনুচ্ছেদে লিখিত হইল।

৯ম খেলনা।—কতকগুলি ছোট ছোট লৌহ-বলয়। তার কতকগুলি আস্ত, আর কতকগুলি আধখান ও শিকিখান করিয়া কাটা। এই গুলির দ্বারা বক্র রেখাযুক্ত নানাবিধ সাজ প্রস্তুত করাইতে হয়।

এরূপ খেলনা আমাদিগের বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়না বটে কিন্তু আমাদিগকে বক্র রেখা ও কুটিল রেখা শিখাইতে হয়। বক্র (বেঁকা) ও কুটিল (এঁকাবেঁকা) রেখা শিখাইবার সময় যদি শিক্ষক বালকগণের হাতে একটু একটু লৌহ-তারের টুকরা দিতে পারেন তবে কাজের বেশ সুবিধা হয়। অভাবে পাতলা বাঁশের চটা বা সরু কাঠী বা বেতের টুকরা হইলেও চলিতে পারে। শিক্ষক নিজে তার বা বাঁশের চটা হাতে করিয়া বলিবেন "এই তার সোজ" তার পর বেঁকাইয়া বলিবেন "এই তার বেঁকা হইল"। বালকেরা নিজের তার বেঁকাইয়া শিক্ষকের অনুকরণ করিবে। তারপর দুইটী ছেলেকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের হাতে একগাছি দড়ি দিয়া টান করিয়া ধরিতে বলিবে। টান করিয়া ধরিলে সোজা রেখা হইল। একটা ছেলেকে অপর ছেলেটীর দিকে সরাইলেই দড়ি ঢিল পড়িয়া বেঁকা রেখার দৃষ্টান্ত হইবে। ধনুক, থালা, বাটী ও আম কাঁটাল পাতার ধার, চক্ষের ভ্রূ প্রভৃতি বেঁকা রেখা। শিক্ষক বোর্ডে নানা রকমের বেঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন। তারপর শিক্ষক হাতের তারকে সাপের গতির মত এঁকাবেঁকা করিয়া গড়িয়া, এঁকাবেঁকা রেখা দেখাইবেন। বালকেরা নিজের তারে তাহার অনুকরণ করিবে। মাটীর উপর দড়িগাছি সাপের গতির মত এঁকাবেঁকা করিয়া রাখিলেও এঁকাবেঁকা রেখার দৃষ্টান্ত

হইবে। বেগুণের পাতা, কুমড়ার পাতা ও গোলাপের পাতার ধার এঁকা-বেঁকা। শিক্ষক বোর্ডে এঁকাবেঁকা রেখা আঁকিয়া দিবেন। (এই সমস্ত পাতা বা অন্যান্য দ্রব্য শিক্ষককে পূর্ব্বেই এ পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে যে সকল বালকই যেন প্রত্যেক রকমের পাতা বা জিনিষ একটা একটা নিজেরা পরীক্ষা করিতে পারে)।

১০ম খেল্‌না।—শিক্ষকের জন্য একখান কিণ্ডারগার্টেন বোর্ড ও বালকদিগের জন্য কিণ্ডার গার্টেন স্লেট বা খাতা। চিত্রাঙ্কন শিক্ষাই এই খেলনার উদ্দেশ্য।

কিণ্ডারগার্টেন বোর্ড।—সাধারণ কাল বোর্ডের উপর লম্বালম্বী ও পাশাপাশী ১ ইঞ্চ ফাঁক করিয়া লাল রঙ্গের রুল কাটা। এরূপ রুল কাটিবার প্রণালী পরিশিষ্টে বোর্ড নির্ম্মাণ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে। এরূপ বোর্ড কিনিতেও পাওয়া যায়।

কিণ্ডারগার্টেন স্লেট।—একখানি স্লেটের এক পৃষ্ঠের উপর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ½ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে লৌহ প্রেক বা শলাকার দ্বারা রুল কাটা। এরূপ স্লেট কিনিতে পাওয়া যায়, তবে শিক্ষক নিজে হাতেও করিয়া দিতে পারেন।

কিণ্ডারগার্টেন খাতা।—কাগজের উপর পেন্‌সিল বা খুব পাতলা সবুজ বা নীল কালী দ্বারা ½ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে রুল কাটা। এরূপ খাতাও কিনিতে পাওয়া যায়।

বালকের বয়স যখন ৪ বৎসর তখনই তাহার হাতে স্লেট, পেন্‌সিল দিতে হইবে। সে পেন্‌সিলের দ্বারা স্লেটের উপর তাহার ইচ্ছা মত হিজি-বিজি করিবে। চক দিয়া মাটী বা বোর্ডের উপর এইরূপে যথেচ্ছ দাগ কাটাকাটি করিবে। ইহার দ্বারা হাতের জড়তা দূর হইবে। কিরূপ জোরে পেন্‌সিল ধরিতে হয়, কেমন করিয়া দাগ কাটিতে হয় তাহা বালক এইরূপ অনুশীলনে নিজেই বুঝিতে পারিবে।

৫ বৎসর বয়সে কিণ্ডারগার্টেন স্লেট হাতে দিবে। ইহার পূর্ব্বেই বালকদিগের খাড়া, তেড়া ও পড়া রেখার এবং বেঁকা ও এঁকাবেঁকা রেখার শিক্ষা দিতে হইবে (৮ম ও ৯ম খেলনার বিষয় পাঠ কর)।

প্রথমে স্লেটে খাড়া রেখা ও পড়া রেখা অঙ্কন অভ্যাস করিবে।

প্রথমে সমান সমান রেখা, তার পর একটা অপেক্ষা অপরটী দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ইত্যাদি অঙ্কন করিবে। ইহার দ্বারা অনুপাতের উত্তম জ্ঞান জন্মাইবে। নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকেরা এ পদ্ধতি বুঝিতে পারিবেন। শিক্ষক বোর্ডে এইরূপ দাগ কাটিবেন আর বালকেরা স্লেটে তাহার অনুকরণ করিবে।
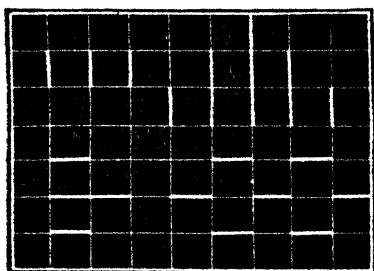
৩১ চিত্র।—খাড়া ও পড়া টান।

এইরূপ খাড়া ও পড়া রেখা অঙ্কন কিছু অভ্যাস হইলে, খাড়া ও পড়া রেখা দ্বারা নানারূপ দ্রব্য ও সাজ প্রস্তুত করিতে শিখাইতে হইবে :—
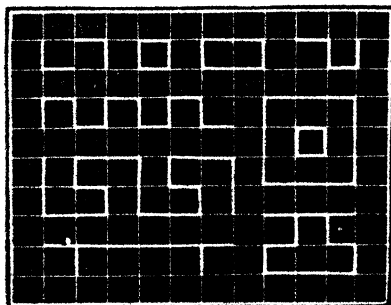
৩২ চিত্র।—খাড়া টান ও পড়া টানের যোগ।

ইহার পর তেড়া রেখা অঙ্কন শিখাইতে হইবে। বর্গক্ষেত্রগুলি কর্ণ রেখা ক্রমে যোগ করিলেই তেড়া রেখা হইবে। তার পর তেড়া, খাড়া, পড়া রেখা দ্বারা দ্রব্য ও সাজ অঙ্কন শিখাইবে। নিম্নে আদর্শ প্রদত্ত হইল।—

৩৩ চিত্র।—তেড়া টানের যোগ।
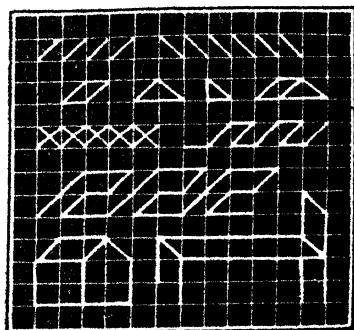
ইহার পর বেঁকা রেখার ব্যবহার শিখাইতে হইবে।—
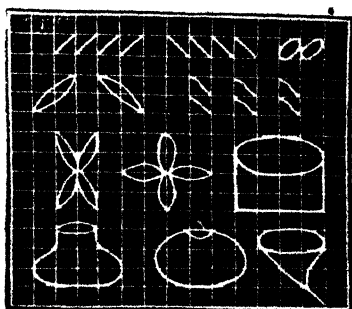
৩৪ চিত্র।—বেঁকাটানের যোগ।

প্রথম শিক্ষার সময় বালকেরা যাহাতে মোটামুটী রকমে ভাব প্রকাশ করিয়া চিত্র অঙ্কন করিতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। লাইন উত্তম হইল না, কি গঠন সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইল না, এসকলের দিকে তেমন দৃষ্টি রাখার আবশ্যক নাই; একটু একটু ভাব প্রকাশ হইলেই চিত্রাঙ্কনের প্রতি বালকের আশক্তি জন্মিবে। আর আসক্তি জন্মিলেই তাহার চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিবার জন্ত একটা আকাঙ্ক্ষা হইবে। এই আসক্তি জন্মাইয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। বালককে পঞ্চমবর্ষেই রবি বর্ম্মায় পরিণত করা উদ্দেশ্য নহে। চিত্রাঙ্কন পরিচ্ছেদে এই বিষয় সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য উপদেশ দ্রষ্টব্য।

১১শ খেল্‌না।—১০ম খেল্‌নায় বেধশূন্য রেখার ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ১১শ খেলনায় সেই রেখার সূক্ষ্মতম অংশ 'বিন্দু' লইয়া কারবার। কেমন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি! ১১শ খেলনার বিষয়, পূর্ব্বের খেলনার মত চেক্‌-কাটা কাগজ আর একটা মোটা সূঁচ। এই সূঁচের দ্বারা কাগজের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া নানারূপ লতা পাতা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এই খেল্‌না বিশেষ আবশ্যকীয়। এই রকম ছিদ্র করিবার জন্য চিহ্নযুক্ত চেক্‌কাটা মোটা কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়।

১২শ খেল্‌না।—এটীও বালিকাদিগের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। ঐ ১১শ খেলনার ছিদ্রকরা কাগজে উল কি রঙকরা সূতা দিয়া (সূঁচের সাহায্যে) নানারূপ ফুলপাতা বুনন করাই এ খেলনার উদ্দেশ্য।

১৩শ খেল্‌না।—রঙকরা কাগজ ও একখানি মাথামোটা কাঠী (ছোট ছোট বালকগণকে সূক্ষ্মমাথাযুক্ত কাঠী দিতে নাই। অসাবধানে কোথাও বিদ্ধ করিয়া কষ্ট পাইতে পারে) আর একশিশি আঁটা। কাগজের ফুল ও পাতা ও সাজ কাটা শিখাইতে হইবে। লাল কাগজে সুন্দর সুন্দর ফুল কাটিয়া ও সবুজ কাগজে পাতা কাটিয়া, আঁটার দ্বারা সাদা কাগজে লাগাইলে বেশ দেখায়। আবার থাকে থাকে কাগজ আটিয়া নানারূপ সুন্দর সুন্দর ফুল ও পাতা প্রস্তুত করা যায়। এই সমস্ত কাগজের ফুল পাতা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়াই ১৩শ খেলনার উদ্দেশ্য।

১৪শ খেল্‌না।—কাগজের চাটাই বুনন। ইহার এত রকম আছে যে তিন বৎসরের শিশু হইতে ১৩শ বৎসরের বালক পর্য্যন্ত এই খেলনায় আমোদ পাইতে পারে। এই খেলনার আসবাবও মুল্যবান নহে। বাজারে যে একপিট উজ্জ্বল রঙকরা এক রকম কাগজ

পাওয়া যায় তাহাই ইহার প্রধান উপকরণ। তবে ছোট ছেলেদের জন্য, শিক্ষককে একখানি ধারাল ছুরি ও রুলের সাহায্যে কাগজ কাটিয়া দিতে হইবে।
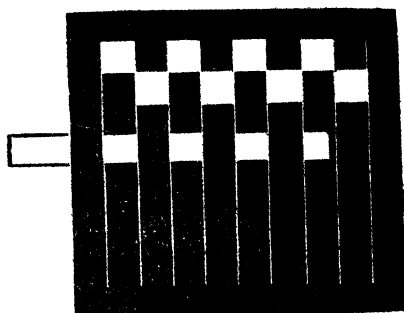
৩৫ চিত্র।—চাটাই বুনন।

একখানি আয়ত ক্ষেত্রাকার (মনে কর ৬″×৪″) রঙকরা (মনে কর সবুজ) কাগজের উপর নীচে একটু কাগজ বাদ দিয়া ফালি কাটিবে, যেন কাগজের ফালিগুলি পড়িয়া না যায়। তারপর অন্য রঙের কাগজে, (মনে কর লাল) ঠিক এই সকল ফালির প্রস্থের সমান করিয়া, আর কতকগুলি আল্‌গা ফালি কাটিয়া লও। এখন চিত্রের অনুরূপ, একটার নীচে একটার উপরে দিয়া, আল্‌গা ফালিগুলি লাগাইয়া যাও; বেশ সুন্দর চাটাই হইবে। প্রথম ফালিগুলি যেমন ভাবে বসাইবে, দ্বিতীয় লাইনে ঠিক তার বিপরীত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম লাইনে ১টার উপর ১টার নীচে চালাইলে, দ্বিতীয় লাইনে ১টার নীচে ১টার উপরে না গাঁথিলে সুন্দর দেখাইবে না। আবার এই রকমে :—

(২) এক লাইনে ২টার উপরে, ২টার নীচে, পরের লাইনে ২টার নীচে, ২টার উপরে,

(৩) " " ২টার উপরে, ১টার নীচে, " " ২টার নীচে, ১টার উপরে,

(৪) „ „ ৩টার উপরে, ১টার নীচে, „ „ ৩টার নীচে, ১টার উপরে,

(৫) „ „ ৩টার উপরে, ২টার নীচে, „ „ ৩টার নীচে, ২টার উপরে,

ইত্যাদি নানাপ্রকার চাটাই বুনন শিখাইতে পারা যায়। শিক্ষক নিজে একখানি বুনিতে আরম্ভ করিবেন আর যেরূপ আদর্শ বালকগণের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ধারানুসারে বালকগণের পরিচালনার্থ এইরূপে ডাকিয়া বলিবেন :—"১ উপর. ২ নীচ" অর্থাৎ প্রথম টার উপর দিয়া যাইবে তারপর ২টার নীচে দিয়া যাইবে ; এইরূপ ১ উপর ২ নীচ করিয়া প্রথম লাইন শেষ হইলে, আবার "২ উপর ১ নীচ" এইরূপ ডাকিয়া বলিবেন। বালক-বালিকাগণ দ্বিতীয় লাইনে এই অনুসারে কার্য্য করিবে। এই সমস্ত চাটাইএর আল্‌গা ফালিগুলি একটু আটা দিয়া আটিয়া যদি খাতার উপর লাগাইয়া দেওয়া যায়, তবে খাতার বেশ সুন্দর মলাট হয়। এই খেলনায় দুই হাতেরই চালনা হইয়া থাকে। বালকগণের নিপুণতা অভ্যাস হয়। শিল্প শিক্ষার এই সমস্তই সূচনা।

১৫শ খেল্‌না।—১০ ইঞ্চ লম্বা, ½ ইঞ্চ চওড়া ও ⅟₁₆ ইঞ্চ মত পুরু কতকগুলি বাঁশের চটা। বিলাতি কিণ্ডারগার্টেন বাক্‌সের সঙ্গে পাতলা কাঠের চটা থাকে, কিন্তু বাঁশের চটাই আমাদের পক্ষে সস্তা ও সুবিধাজনক। এইগুলির দ্বারা নানা রকমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব খেলনায় কাগজের ফালিগুলির যেমন ব্যবহার হইয়াছে, এবারে এ চটাগুলিরও প্রায় সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে। নিম্নের চিত্র দেখিলেই শিক্ষকগণ ইহার ব্যবহার বুঝিতে পারিবেন:—
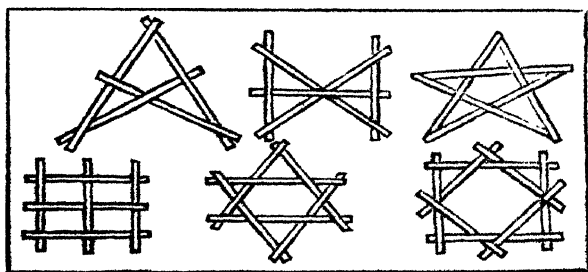
৩৬ চিত্র :—চটাসাজান।

১৬শ খেলনা।—১৫শ খেলনার মত কাঠের চটা, তবে লম্বায় ৪ ইঞ্চ মাত্র। এই ছোট ছোট চটাগুলি কব্জার দ্বারা আটা। ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যায়। ইহার ব্যবহার কতকটা পূর্ব্ব খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু জটিল।

১৭শ খেলনা।—সাদা বা রঙ করা কাগজের দশ ইঞ্চ লম্বা ও ½ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি ফালি। ব্যবহার ১৬শ খেলনার মত, তবে তাহা অপেক্ষা একটু অধিক শক্ত।

১৮শ খেলনা।—কাগজ ভাঁজ করা। এ খেলনার দ্বারা অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে পারা যায়। আর এ খেলনায় খরচও নাই। এক টুকরা সাদা কাগজ হইলেই হইল।

প্রথমে বালকগণকে ৭ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ২॥ ইঞ্চ প্রস্থ আয়ত ক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও। ভাঁজ শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, বালকগণের সঙ্গে কাগজ সম্বন্ধে গল্প কর। কাগজের রঙ সাদা, কাগজ পাতলা, মসৃণ, ভাঁজ করা যায়, সহজে ছেঁড়া যায়, ছেঁড়া নেকড়া দিয়া কাগজ তৈয়ারী করে ইত্যাদি মোটামুটী বিষয়ে একটু আলোচনা কর। তারপর এই কাগজ টুকরার ৪ কোণ, ৪ ধার। ৪ ধারের, দুই দুই ধার সমান; আবার ২ ধার বড়, আর দুই ধার ছোট। কোণ ৪টী সমকোণ। টেবিলের কোণ, স্লেটের কোণ, ঘরের কোণ প্রভৃতি সমকোণ।

তার পর ভাঁজ করা—নীচের ধার তুলিয়া উপরের ধারের সহিত মিল কর। মধ্যে টিপিয়া ভাঁজ কর। একটী আয়ত ক্ষেত্রে, ২টী সমান সমান আয়ত ক্ষেত্র হইল, ইত্যাদিরূপে শিক্ষা দাও।

ইহার পর বর্গক্ষেত্রাকার কাগজের টুকরা দাও। "চারধার সমান, ৪ কোণ সমকোণ হইলে তাহাকে বর্গক্ষেত্র বলে" ইহা বুঝাইয়া দাও। তারপর ভাঁজ আরম্ভ কর।

বর্গক্ষেত্রকে মধ্যে ভাঁজিয়া ২টী আয়তক্ষেত্রে ভাগ কর। কর্ণরেখা

ক্রমে ভাঁজিয়া ২টী সমান সমকোণী ত্রিভুজ করুন; এই রেখাকে কর্ণ রেখা বলে; কর্ণ রেখার দ্বারা এইরূপ ক্ষেত্র দুই সমানভাগে বিভক্ত হয় ইত্যাদির আলোচনা করিতে হইবে। অন্যান্য ভাঁজ নিম্নের চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। এই খেলনা জ্যামিতি শিক্ষার সূচনা।

৩৭ চিত্র।—কাগজ ভাঁজ করা।

এ সকল ভাঁজ শিক্ষার পর কাগজের নৌকা, টুপি, দোয়াত, বাক্স, পাখা প্রভৃতির গঠন শিখাইতে হইবে। এ সমস্ত খেলনা অনেকেই গড়িতে জানেন বলিয়া, এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ লিখিত হইল না। যে শিক্ষক না জানেন, তিনি অন্যের নিকট শিখিয়া লইবেন। এ বিষয়ে লিখিয়া উপদেশ দিতে গেলে কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় মাত্র, কারণ লিখিত উপদেশ বুঝিবার পক্ষে তেমন সুবিধাজনক হয় না।
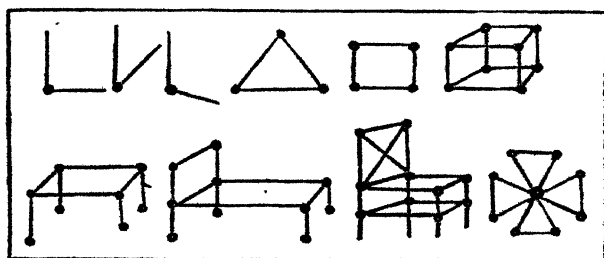
৩৮ চিত্র—মটর ও কাঠী দ্বারা গঠন।

১৯শ খেলনা।—খুব সরু ঝাঁটার কাঠীর মত কতকগুলি বাঁশের শলাকা, আর বড় বড় মটর। মটরগুলি ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া

রাখিতে হইবে, আর কাঠীগুলির অগ্রভাগ আবশ্যক মত ছুরির দ্বারা সরু করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং এক একখানা ছুরি থাকাও আবশ্যক। দেশী কামারেরা দু পয়সা, চার পয়সা দামের যে ছুরী বিক্রয় করে, তাহাই একটু ঘসিয়া ধারাল করিয়া লইলেই চলিবে। এই ভিজান মটরের সঙ্গে, কাঠী গাঁথিয়া নানারূপ গঠন করা যাইতে পারে। ৩৮ চিত্র দেখিলেই প্রণালী বুঝিতে পারা যাইবে।

মটর না ভিজাইয়া, ছোট ছোট করিয়া আলুর টুকরা কাটিয়া লইলেও হয়। তরমুজের বা কুমড়ার খোঁসা, লাউর মাথা প্রভৃতি তরকারীর পরিত্যক্ত জিনিষ গুলিও টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ব্যবহার করা যায়। পিটেপোড়া, কনককরবী প্রভৃতির ফল কাটিয়াও একাজ করিতে পারা যায়। খরচ নাই, কেবল শিক্ষকের একটু যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক।

এই খেলনায় বালকগণকে পরিমাণ মত কাঠী কাটিয়া লইতে হইবে। পরিমাণ ও অনুপাত বোধের অনুশীলন হইবে; পূর্ব্ব বর্ণিত খেলনার প্রণালী মত প্রত্যেক গঠন লইয়াই বালকগণকে কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব শিখাইতে হইবে।

২০শ খেল্‌না।—ঠাকুর-গড়া মাটী, মোম বা পুটীন (পুটীন প্রস্তুতের প্রণালী পরিশিষ্টে লিখিত হইয়াছে), কয়েকখানি বাঁশের শক্ত চটা ও মাটী রাখিবার জন্য এক এক টুক্‌রা কাঠ বা টিন। মোম, পুটীন দামী জিনিষ। মাটীর দ্বারাই যখন বেশ কাজ চলিতে পারে, তখন দামী জিনিষের আবশ্যকতা নাই। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত খেলনায় দ্রব্যাদির একটা মোটামুটী অনুকরণ করা হইয়াছে মাত্র। এই শেষ খেলনায় দ্রব্যের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ করাই উদ্দেশ্য। মাটীর দ্বারা ছক, ঢোল, বল, বোতল, গেলাস বাটী প্রভৃতি হইতে নানা রকমের ফল, ফুল, পাতা পর্য্যন্ত গঠন করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। এই খেলনা

বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও আমোদবর্দ্ধক। মাটীর দ্বারা দ্রব্যের প্রতিকৃতি করিতে গেলেই দ্রব্যটীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই খেলনায় সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সুন্দর অনুশীলন হইয়া থাকে। যাঁহারা কিণ্ডারগার্টেনের অন্য কোন খেলনাই পছন্দ করেন না, তাঁহারাও এই খেলনাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাদামাটী লইয়া খেলা করাও বালকগণের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ কাদা কোমল অঙ্গুলির অতি সহজ সঞ্চালনেই ইচ্ছানুরূপ নানা আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। মৃন্মূর্ত্তি গঠন পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

কিণ্ডারগার্টেনের অন্যান্য কার্য্য।—কিণ্ডারগার্টেন নির্ব্বাচিত বিংশতি খেলনা ছাড়া আরও কতকগুলি অতিরিক্ত খেলা ও খেলনার বিধান আছে। কিণ্ডারগার্টেন খেলনার সহিত এই গুলিকে পৃথক করিবার জন্ত, ইহাদিগকে কিণ্ডারগার্টেন খেলনা না বলিয়া কিণ্ডারগার্টেন কার্য্য বলা হইয়া থাকে। কিণ্ডারগার্টেন কার্য্যের মধ্যে ভঙ্গী-সঙ্গীত ফ্রবেল-সম্মত। অন্যান্য কার্য্য নানা ব্যক্তি দ্বারা কল্পিত।

ভঙ্গী-সঙ্গীত।—যে সকল সঙ্গীতের সঙ্গত করিবার সময় সঙ্গীত-নির্দ্দিষ্ট ভাব গুলি ভঙ্গীর দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহাকে ভঙ্গী-সঙ্গীত বলে। মনোগত ভাব প্রকাশের প্রধান উপায় শব্দ ও ভঙ্গী। যেখানে এই শব্দ ও ভঙ্গী একত্র মিলিত হয়, সেখানে ভাবও উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয়। তবে বালকগণের সহজ বোধের নিমিত্ত প্রথম প্রথম কিণ্ডারগার্টেন-সম্মত সঙ্গীতে ভঙ্গীর আধিক্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু শেষে এই আধিক্য কমিয়া গিয়া নিয়মিত ভঙ্গীতে পরিণত হয়।

ভঙ্গী-সঙ্গীত-শিক্ষায় শিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে :—

(১) কিণ্ডারগার্টেন খেলনায় বা কার্য্যে যে বিষয়ের আলোচনা হইবে, তাহা উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে হইবে (১ম খেলনার

শেষ অংশ পাঠ কর) অথবা কোন সরল উপকথা বলিয়া, তাহাই উপলক্ষ করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে হইবে।

(২) যাহাতে গীতটী বালকেরা মোটামুটী রকমে বুঝিতে পারে সেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। বালকগণের বয়স বিবেচনায় ভঙ্গী-সঙ্গীতের ভাব, ছন্দ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে। ছোট ছোট শিশুগণের পক্ষে সহজ ভাব, সরল ছন্দ ও স্বল্প পরিমাণ বিধেয়।

(৩) সঙ্গীত গুলি ছড়ার আকারে হইলেই চলিবে—পদ্যের নিয়মানুসারে অক্ষর গণনাদির বিশেষ প্রয়োজন নাই।

(৪) এই সঙ্গীত গুলি কবিতার মত আবৃত্তি করিলেই চলিবে। তবে পারিলে একটু সরল সুর সংযোগ করা মন্দ নয়। শিক্ষক প্রথমে সঙ্গীতটী খুব সহজ সুরে গান করিয়া শুনাইবেন ও গানের বা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সুসঙ্গত ভঙ্গী প্রদর্শন করিবেন। বালকগণ নিবিষ্টচিত্তে শিক্ষকের অনুকরণ করিবে।

(৫). সঙ্গীতটীর সমস্ত অংশ একেবারে শিখাইতে চেষ্টা করিবেন না। প্রথম অংশ উত্তমরূপে অভ্যস্থ হইলে, দ্বিতীয় অংশ, দ্বিতীয় অংশ হইলে তৃতীয় ইত্যাদি।

(৬) যাহাতে সকল বালকের সমান সুর ও ভঙ্গী হয়, ও যাহাতে সকল বালক এক সঙ্গে একরূপে অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে পারে, সে বিষয়েই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৭) ভাব-ভঙ্গী সমূহ যাহাতে বালকগণের সুখপ্রদ হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষার বয়স ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত। ইহার পর হইতে অভিনয় শিক্ষা দিতে হইবে। ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ২ জনের (কথোপকথন.) ও তাহার পরে বহুজনের (নাটকের) অভিনয় শিক্ষা দেওয়া রীতি।

ভঙ্গী-সঙ্গীতের আদর্শ :—১। মনে কর শ্রেণীতে বালকগণকে সাদা কাল রঙ (বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেনের প্রথম মান) শিক্ষা দেওয়া হইল। এই শিক্ষার শেষে বালকগণের সুখকর অথচ বিষয় সংস্পৃষ্ট একটা ভঙ্গীসঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিলে আমোদ ও আলোচনা দুইই হইবে। নিম্নে এইরূপ সঙ্গীত বা ছড়ার একটা আদর্শ দেওয়া হইল :—

দাঁত সাদা (১) নখ সাদা (২)
সাদা কাপড় খানি (৩)
চুল কাল (৪) ভুরু কাল (৫)
কাল চখের মণি (৬)।

(১) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা দাঁত দেখাইয়া।
(২) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুলির নখ দেখাইয়া।
(৩) দুই হাতে কোঁচার কাপড় একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া।
(৪) দক্ষিণ হাতের তর্জ্জনীর দ্বারা চুল দেখাইয়া।
(৫) বাম হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা বাম ভুরু দেখাইয়া।
(৬) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর দ্বারা দক্ষিণ চোখের মণি দেখাইয়া।

প্রথমে, প্রথম দুই লাইন শিখাইবে। তারপর অবশিষ্ট অংশ। প্রথম প্রথম অভ্যাসের জন্য ৫।৭ বারের অধিক আলোচনা করা কর্ত্তব্য নহে। মাত্রাধিক্য হইলে বালকগণের বিরক্তি জন্মিতে পারে। উত্তমরূপে অভ্যাস হইলে, সমস্ত সঙ্গীত এক সময়ে ৩ বারের অধিক আবৃত্তির প্রয়োজন নাই।

২। উপকথা অনুচ্ছেদে লিখিত ৩য় গল্পের সংশ্রবে নিম্নলিখিত সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে :—

তাই তাই তাই[১], মামাবাড়ী[২] যাই[৩],
মামা দিল[৪] দই সন্দেশ[৫], দোরে[৬] বসে খাই[৭],
মামী এল[৮] লাঠী হাতে[৯], পালাই পালাই[১০]

(১) তিনবার হাতে তালি দিয়া।
(২) ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দূরে বাড়ী দেখাইয়া।
(৩) এক পা অগ্রসর হওন, যেন কোথাও যাওয়া হচ্ছে।
(৪) ডান হাত বাড়াইয়া কোন জিনিষ দিবার মত ভঙ্গী করিয়া।

(৫) কোন জিনিষ লইবার জন্য যেমন করিয়া হাতের তালু পাতিতে হয় সেইরূপ করিয়া।

(৬) ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দরজা দেখাইয়া।

(৭) ডান হাতে খাইবার মত ভঙ্গী করিয়া।

(৮) পশ্চাতের দিকে চাহিয়া, যেন পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিতেছে এই ভাব দেখাইয়া।

(৯) দুই হাতে লাঠী ধরিবার মত ভাব করিয়া।

(১০) সকল বালক একসঙ্গে ৪।৫ পা দৌড়াইয়া যাইবে। (সঙ্গে সঙ্গে ছুটী কি টিফিনের ছুটীর ব্যবস্থা হইলে উত্তম হয়)।

৩। কোন কোন পাঠ (যথা বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন ১ম মান—শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেবল এইরূপ সঙ্গীতের সাহায্যেই শিক্ষা দিতে পারা যায়ঃ—

এইটী মস্তক মোর, এ দুটী চরণ,
এইটী উদর মম, এ দুটী নয়ন।
এই বক্ষ, এই নাভি, এই দুটী উরু,
এই মোর কটিদেশ, এই দুই ভুরু।
ললাট, চিবুক, নাসা, কর দরশন,
এই দুই গণ্ড মম, এ দুই শ্রবণ।
অধর নীচের ঠোঁট, ঊর্দ্ধে তার ওষ্ঠ,
এই দুই জঙ্ঘা মম, এ দুই প্রকোষ্ঠ।
জানু, গুল্ ফ, মণিবন্ধ, এ দুই কফোনি।
কনিষ্ঠা, ও অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী।
অঙ্গুষ্ঠ ইহার নাম, এই গ্রীবা দেশ,
দুই দিকে দুই কক্ষ, এই কৃষ্ণ কেশ।
জিহ্বা, দন্ত, দুই স্কন্ধ, এ দুই প্রগণ্ড,
দুই পার্শ্ব, এক পৃষ্ঠ, এক মেরুদণ্ড।
যকৃত দক্ষিণে আছে, প্লীহা থাকে বাম,
বক্ষ মধ্যে রক্তাধার, হৃদপিণ্ড নাম।
পাকস্থলী এই খানে, অন্ত্র যুক্ত তায়,
ফুসফুস দুই পাশে, মস্তিষ্ক মাথায়।

এই সব অঙ্গ মোর যাঁহার রচনা,
দুটী হস্ত জুড়ি করি তাঁহারে বন্দনা।

এই কবিতা আবৃত্তির সহিত যেরূপ ভঙ্গীর আবশ্যক তাহা শিক্ষকগণ বিনা উপদেশেই বুঝিতে পারিবেন, তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে, এই সমস্ত অঙ্গই দুই হাতে দেখাইতে হইবে। দুই মণিবন্ধ দেখাইবার সময়, দুই হাতের দ্বারা মণিবন্ধ জড়াইয়া ধরিতে হইবে।

৪। কোন পাঠ বা গল্পের উপলক্ষ না করিয়া, কেবল নানারূপ কর্ম্মের দ্বারাও, ভঙ্গী সঙ্গীতের দ্বারা গীত হইয়া থাকে ; যথা,—ধানকাটা, নৌকাবহা, মাছ ধরা, তাঁত বোনা প্রভৃতি কার্য্য। নিম্নে ধানকাটার বিষয়ে একটী ভঙ্গী সঙ্গীতের আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

আয়রে ভাই ধান কাটিগে কচাকচ্।
ডান হাতে ধরে কাচি, বাম হাতে ধরব গুছি,
গোড়া পেড়ে মারব ফ্যাঁস, ফসাফস্।
গুছি গুলি একে একে, রাখব ভুঁয়ে ভাগে ভাগে,
গুছিয়ে নিয়ে বাঁধব আটী, টপাটপ্।
মাথায় করে সন্ধ্যাবেলা, আনব বাড়ী করব পালা,
শুকিয়ে গেলে মলব ধান, গজাগজ্।
ভান্‌ব ধান ঢেঁকি ফেলে, রাঁধব ভাত নূতন চেলে,
খাব ভাই মনের সুখে, সপাসপ্।

৫। নিম্ন প্রাথমিকের ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী একটী ক্ষুদ্র অভিনয়ের আদর্শ প্রদত্ত হইল। মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য যোগীন্দ্রনাথ বসুর "ভারতের মানচিত্র দর্শন," কামিনী রায় কৃত "একলব্য" প্রভৃতি অভিনয়ের উত্তম বিষয়।

ষড় ঋতু।

(নিম্ন লিখিত শৃঙ্খলা ক্রমে এক এক জন করিয়া প্রবেশ)

১। গ্রীষ্মের (লাল কাপড় পরিয়া) প্রবেশ—

প্রখর ভানুর তেজে পৃথিবী তাপিত,
অনিল অনল সম ধূলি-ধূসরিত ;

কোথা জল কোথা বায়ু,
গেল প্রাণ গেল আয়ু,
ফুকারিছে জীবগণ হইয়া কাতর ;
গ্রীষ্মের প্রতাপ দেখ কত ভয়ঙ্কর।

২। বর্ষার (বেগুনে কাপড়ে) প্রবেশ—

ঢাকিয়াছি দিক দেশ সব মেঘ দিয়া,
ভরিয়াছি খাল বিল সলিল ঢালিয়া,
অশনির গরজন,
ভয়াকুল প্রাণিগণ,
বিদ্যুৎ চমকে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম,
বরষার তাই দেখ প্রতাপ কেমন।

৩। শরতের (নীল কাপড়) প্রবেশ—

গ্রীষ্ম, বর্ষা গেছে চলে ভারত ছাড়িয়া,
শীতকাল বহু দূরে আছে দাঁড়াইয়া,
ভানু-তেজ কমিয়াছে,
চপলাও নিবিয়াছে,
নিদাঘ শিশিরে গেছে কেমন মিশিয়া,
শরতের শোভা দেখ নয়ন ভরিয়া।

৪। হেমন্তের (সবুজ কাপড়) প্রবেশ—

সোণার বরণ মাঠ ধানে ঝল মল,
শিশির মুকুতা পাঁতি করে টলমল,
প্রফুল্ল সবার প্রাণ
পাইয়া নূতন ধান,
ধন-ধান্য-দাতা বলি আমারে আদরে,
হেমন্ত আমার নাম রক্ষা করি নরে।

৫। শীতের (হলুদ কাপড়) প্রবেশ—

শাল, লুই, আলোয়ান, চাদর, কম্বল,
লেপ, আর ছেঁড়া কাঁথা, যা আছে সম্বল,
বের কর শীঘ্র করি,
নহিলে যাইবে মরি,
আসিয়াছি আমি শীত সবে তাড়াইয়া,
আমার প্রতাপে সূর্য্য গিয়াছে সরিয়া।

৬। ঋতুরাজ বসন্তের (কমলা কাপড়) প্রবেশ—

(গান) বসন্তে আজি, চাঁদ চকোরে, পাগল সুধু হাসিয়া,
ঢল ঢল তনু, আনন্দে বিভোর, নাচিছে হেলিয়া দুলিয়া।
শিশির অবশে পড়িয়াছে ঢলে,
বরষা সুদূরে গিয়াছে যে চলে,
শুধু বনরাজি হাসিছে মৃদুল কুসুমে কুসুম মিলিয়া॥
কোকিলা পাপিয়া ভাবে মাতোয়ারা,
জানেনা কেন যে গাইতেছে তারা,
ধীরে ধীরে ধীরে, স্বরের লহরী, উঠিছে গগন ভেদিয়া॥
জোছনা মাখিয়া বসন্ত যামিনী,
মলয় অনিলে খেলিছে মোহিনী,
কুসুম-পরাগে পরিমল মাখি প্রকৃতি যাইছে ভাসিয়া॥

৭। সূর্য্যের (সাদা কাপড়) প্রবেশ—

এরা সবে কেউ কিছু নয়, আমি সবার রাজা ;
আমা ছাড়া হয় না ঋতু, এরা আমার প্রজা॥

৮। সকলে (সূর্য্যকে আহ্বান করিয়া)—

সূর্য্যমামা, সূর্য্যমামা, দাঁড়াও মোদের মাঝে,
তোমা ছাড়া আমাদের কি বড়াই করা সাজে।

(সূর্য্য মধ্যস্থানে দাঁড়াইলে পর, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া চক্রাকারে নৃত্য করিতে করিতে)—

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ আর ছয়,
এম্‌নি করে ঘুরে ঘুরে ষড় ঋতু হয় ;
গ্রীষ্ম এল, বর্ষা গেল, শরৎ তৎপর,
হেমন্ত পরেতে শীত বসন্তে বৎসর॥

(এক লাইন হইয়া দর্শকমণ্ডলিকে অভিবাদন করতঃ সকলের প্রস্থান।)

গ্রীষ্মকালের ভীষণ তাপ প্রকাশের জন্য লাল কাপড়, মেঘের বর্ণ অনেক সময় বেগুনে বলিয়া বর্ষার বেগুনে রঙের কাপড, শরতের আকাশ নির্ম্মল নীল বলিয়া শরতের নীল কাপড়, হেমন্তে মাঠ শস্যপূর্ণ বলিয়া হেমন্তের সবুজ কাপড়, শীতে গাছের পাতা সমস্ত পাকিয়া হলুদবর্ণ হয় বলিয়া শীতের হলুদ কাপড়, বসন্তে নানারূপ লাল হলুদ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া বসন্তে লাল হলুদ মিশ্রিত কমলা কাপড়। এইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া ছয়জনে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইলে রঙ শিক্ষা দিবারও সুবিধা হইবে। যারপর যে রঙ হওয়া আবশ্যক, এইবিন্যাসে তাহাই দেখান হইয়াছে। আবার সূর্য্য রশ্মিতে এই ছয়বর্ণ (আসমানী ও নীল এক ধরিয়া) বিদ্যমান। সাদা কাপড় পরিয়া সূর্য্য মধ্যে দাঁড়াইলে. এই ছয় জনের দ্বারা তাহার ছয়বর্ণের রশ্মি প্রকাশিত হইবে। এখানে কেবল কাপড়ের কথাই উল্লিখিত হইল.—অভিনেতৃগণের অন্যান্য সাজগোজ শিক্ষকগণ নিজের পছন্দের মত করিয়া দিবেন। ফুলের মালা, ফুলের মুকুট, ফুলের বলয় প্রভৃতির দ্বারা বসন্তকে সাজাইতে হইবে আর শরতকে নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইবে। বসন্ত ঋতুরাজ বলিয়া, তাহার কবিতা একটু বড়, এইটী গাইতে পারিলেই ভাল হয়। বালিকা বিদ্যালয়েও এ অভিনয় করান যাইতে পারে। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যই ইহা রচিত হইয়াছিল।

উপকথা।—বালকেরা উপকথা শুনিতে যে বড়ই ভালবাসে, তাহা সকলেই জানেন। সুন্দর সুন্দর উপকথা কেবল যে আনন্দবর্দ্ধক তাহা নহে, ইহার দ্বারা বালকগণের ভাষাজ্ঞান জন্মে, তাহাদিগের বর্ণনা-শক্তি বৃদ্ধি পায় আর তাহাদিগের চরিত্র-গঠিত হয়। কিন্তু উপকথা তেমন সুন্দর-ভাবে বলিতে না পারিলে সুখপ্রদ হয় না। স্থান বিশেষে স্বর হ্রস্ব, দীর্ঘ করিতে হইবে আর চোখ, মুখের ও হাতের ভঙ্গী করিতে হইবে অর্থাৎ

একাই নানা জনের অভিনয় করিতে না পারিলে গল্প সুশ্রাব্য হইবে না।

উপকথা গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—(১) সত্য ঘটনা অবলম্বনে, (২) কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে। আবার কাল্পনিক ঘটনাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (ক) স্বাভাবিক, ও (খ) অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কাল্পনিক ঘটনা অবলম্বনে যে সকল উপকথা রচিত (যথা, হিতোপদেশের গল্প, ঈসপের গল্প, পরীর গল্প, ভূতের গল্প ইত্যাদি), তাহার দ্বারা বালকগণকে প্রকারান্তরে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, এই এক শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের মত। কেহ কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক গল্পগুলি (নাটক, নভেল, উপন্যাসের গল্প) পর্য্যন্তও পছন্দ করেন না। যাহা হউক এ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। শিক্ষকগণ নিজের অভিরুচি অনুসারে ব্যবস্থা করিবেন।

বালকগণের বয়স ও জ্ঞান বিবেচনায় উপকথার ভাব, ভাষা ও পরিমাণ নিরূপণ করিতে হইবে।—বিদ্যালয়ের নীতি শিক্ষার জন্য পৃথক সময়ের ব্যবস্থা থাকিলে সেই সময়েই এইরূপ উপকথার কথন আবশ্যক। সেরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে বিদ্যালয়ের কার্য্যে যখন অবসর পাওয়া যাইবে, অথবা যে দিন বৃষ্টির জন্য বা অন্য কোন কারণে বালকগণ টিফিনের ছুটিতে বাহিরে যাইতে পারিবে না, অথবা যে দিন বা যে সময়ে ড্রিল ও ব্যায়ামের অনুশীলনে কোন বাধা ঘটিবে, সেই সময়ে উপকথা দ্বারা বালকগণকে নিযুক্ত রাখা সঙ্গত। নিম্নে শিশু-শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী তিনটী উপকথার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

(১) সত্য ঘটনা।—রঘুনাথ নামে একটা ছেলে টোলে পড়্‌ত। রঘুনাথের পণ্ডিত একদিন বল্‌লেন "রঘুনাথ ঐ ভট্টাচার্য্যিদের বাড়ী থেকে একটু আগুন নিয়ে এসত বাবা।" রঘুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়াই আগুন আন্‌তে ছুটে গেল। ভট্টাচার্য্যির গিন্নি রান্না কচ্ছিলেন। রঘুনাথ রান্নাঘরের কাছে গিয়া দুহাত পাতিয়া বলিল "মা আমাকে একটু আগুন দিন।" গিন্নি বলিলেন "তুইত বড় বোকা ছেলে, আগুন কি হাতে

করে নেওয়া যায়?" এই কথা শুনিয়াই রঘুনাথ বলিল "তা নেওয়া যায় না।" এই বলিয়াই এক অঁজল ধূলি হাতে করিল, তার পর সেই ধূলির উপর আগুন নিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে উপস্থিত। সকলে রঘুনাথের বুদ্ধি দেখে অবাক। এই রঘুনাথই শেষে খুব বড় পণ্ডিত হয়েছিল। (এক বালকের হাতে ধূলা দিয়া তার উপর আগুন রাখিয়া কার্য্যতও দেখাইয়া দিতে হইবে।)

(২) কাল্পনিক অথচ স্বাভাবিক।—একটা কাকের খুব পিপাসা লেগেছে। এক জনের বাড়ীর উঠানে একটা ঘড়া দেখে, জল খাবার জন্য সেই ঘড়ার উপর গিয়া বস্‌ল। কিন্তু ঘড়ায় জল খুব কম, কাক ঠোঁট দিয়া জল পায় না। তখন কাক এক এক খান করে পাথরের (বা ইটের) টুক্‌রা এনে জলের মধ্যে ফেলতে লাগল। যখন জল ঘড়ার মুখের কাছে এল, তখন সে পেট ভরিয়া জল খেল। (একটা গেলাসে অল্প জল রাখিয়া তার মধ্যে পাথর বা ইটের ছোট ছোট টুক্‌রা ফেল। কেমন করিয়া জল উচু হইয়া উঠে তাহা বালকগণকে দেখাইয়া দাও)।

(৩) কাল্পনিক ও অস্বাভাবিক—টুনু বুলু দুই ভাই। টুনুর জ্বর, আর বুলুর পেটের অসুখ। বাড়ীতে দুই ভাই কেবল খাব খাব করে কাঁদ্‌তে লাগল্। তাদের মা কিছুই খেতে দিল না। তখন বুলু বল্‌ল "ভাই টুনু মামার বিয়ে, চল মামার বাড়ী যাই, সেখানে অনেক জিনিষ খেতে পাব।" তাদের মামার বাড়ী অনেক দূর—কেমন করে যাবে? তাই দুজনে একটা ইঁদুরের কাছে গেল। ইঁদুর ঘুমিয়ে ছিল, তার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য টুনু বুলু তাই দিয়া বল্‌ল—

তাই তাই তাই, ওরে ইঁদুর ভাই,
মামা বাড়ী বে' দেখতে কেমন করে যাই?

ইঁদুর বল্‌ল, তা আমাকে যদি খুব খেতে দিস্ তবে আমি তোদের দুজনকে পিঠে করে নে যেতে পারি।" টনু বুলু বল্‌ল, "আচ্ছা তোমাকে খুব খেতে দেব।" ইঁদুর রাজি হ'ল। টুনু বুলু ইঁদুরের পিঠে উঠে ছুট্। মামা বাড়ীতে এলেই, মামী তাদের দেখে খুব সুখী হ'ল। আর দই সন্দেশ খেতে দিল

তাই তাই তাই, মামা বাড়ী যাই,
মামা দিল দই সন্দেশ দোরে বসে খাই।

তারা দুই ভাই দোরে বসে দই সন্দেশ খেতে লাগল; আর ইঁদুরটাও তাদের পাশে বসে খেতে লাগল্। ইঁদুরটা খুব বড় কিনা তাই তার কুটুর কুটুর করে খাওয়ার খুব শব্দ হ'তে লাগল।

মামী জেগে উঠ্‌ল। মামী ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। মামী দেখে যেমনত একটা ইঁদুর, আর কাদের দুটী ছেলে এসে সব সন্দেশ খেয়ে ফেল্‌লে। অমনি এক লাঠী নিয়ে তাড়া। টুনু বুলু ভোঁ দৌড়—এক দৌড়ে বাড়ী আসা।

তাই তাই তাই মামা বাড়ী যাই
মামা দিল দই সন্দেশ, দোরে বসে খাই,
মামী এল লাঠী হাতে, পালাই পালাই।

এইরূপ উপকথা, দুই তিন দিন বলিবার পর, বালকগণকে বর্ণিত উপকথা বিবৃত করিতে বলিবে। প্রথম প্রথম ধারাবাহিক প্রশ্ন করিয়া গল্প আদায় করা যাইতে পারে। যথা—কাকের কি হয়েছিল? সে উঠানে কি দেখিল? জল খাইতে পারিল না কেন? তার পর কি করিল? ইত্যাদি

ইংলিশ এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট (সরকিউলার ৩২২) নিম্নলিখিত কিণ্ডারগার্টেন কার্য্যাবলী অনুমোদন করিয়াছেন :—

(১) মৃন্ময় মূর্ত্তি গঠন (সপ্তম প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে)।

(২) অঙ্কন ও রঞ্জন।—অঙ্কনের বিষয় পূর্ব্বে (১০ম খেলনায়) বর্ণিত হইয়াছে। তবে সে কেবল পেন্‌সিলের দ্বারা অঙ্কন। আজ কাল রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কনশিক্ষারম্ভ করাই অনেকে সুসঙ্গত মনে করেন। রঙ চিত্তাকর্ষক ও রঙের দ্বারা অঙ্কিত লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি প্রকৃত পদার্থের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া এই সকল চিত্র অধিকতর উৎসাহবর্দ্ধক। রঙের দ্বারা চিত্রাঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে খরচও বেশী নয়। প্রত্যেক বালককে মূল্যবান রঙের বাক্স কিনিতে হইবে না। বাজারে যে সকল গুঁড়া রঙ—খুনখারাপী, ম্যাজেণ্টার, ভাইওলেট গ্রীন, নীলবড়ি, পেউড়ী প্রভৃতি বিক্রয় হয় তাহাই দুচার পয়সার করিয়া কিনিয়া জলে গুলিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে। কতকগুলি অল্পদামের চীনামাটীর ছোট ছোট বাটি (৻১০ ৻১৫ /০ দাম) কিনিয়া রাখিবে। পাঁঠার ঘাড়ের লোম দিয়া কতকগুলি তুলি প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তুলি কিনিতেও পাওয়া যায়। সাধারণ কাজ চলার মত একটা তুলির দাম

৵১৫ কি ।৵০। ৩ কি ৪ নম্বর তুলিই বালকগণের পক্ষে উপযোগী। বালকগণের হাতে একটা তুলি দাও, ও এক একটা বাটিতে একটু একটু রঙ ঢালিয়া দাও। প্রথমে এক রঙেই চিত্রাদি অঙ্কন করিবে। বালকেরা প্রথম প্রথম তুলির দ্বারা নিজের ইচ্ছামত কাগজে রঙ লাগাইবে। এইরূপ দু চার দিন স্বাধীনভাবে তুলি চালনা করিলে, তাহারা বিনা উপদেশেই তুলির ব্যবহার কিছু কিছু বুঝিতে পারিবে অর্থাৎ কিরূপ করিয়া তুলি ধরিতে হইবে, কিরূপ জোরে তুলি চাপিয়া ধরিলে মোটা রেখা হইবে, কিরূপ করিলে সরু রেখা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জ্ঞান জন্মিবে। সময়মত শিক্ষককেও একটু একটু সাহায্য করিতে হইবে। তার পর তুলির দ্বারা চেক্ (বর্গক্ষেত্রাঙ্কিত) কাগজে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করাও। ১,½ কি ¼ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে পেনসিলের রূল কাটিয়া দাও বা এইরূপ চেক কাগজ ক্রয় করিয়া আন। তার পর তুলির দ্বারা যেরূপ ধারাবাহিক রূপে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নিম্নের চিত্র-দেখিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন :—

৩৯ চিত্র—তুলি ব্যবহার।

সন্ধির স্থান ফাঁক রাখিলে এই সমস্ত চিত্র সুন্দর দেখায়। ফুলের

পাঁপড়ী গুলির জোড়ের স্থান, পাতার ও ডালের জোড়ের স্থান, মাছির শরীরের নানা জোড়ের স্থান, বোতল, সরইএর সংযোগ স্থান ফাঁক রাখা হইয়াছে। তবে জোড়ের স্থান ফাঁক না রাখিয়াও চিত্রাঙ্কন করাইতে পারা যায়। যথা।—

৪০ চিত্র। এক রঙের ডাল পাতা।

রঙের দ্বারা কেবল ফুল পাতা না করাইয়া নানারূপ বড়ডারের (পাড়) চিত্রও করান যাইতে পারে। যথা ঃ—
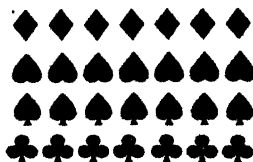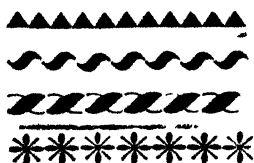
৪১ চিত্র। এক রঙের বড়ডার।

কেবল এক রঙের দ্বারা নানারূপ বৃক্ষ, পাতা, পশু, পক্ষীর চিত্রাদির অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।
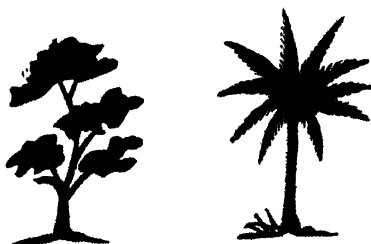
৪২ চিত্র। এক রঙের দ্বারা বৃক্ষ।

কেবল এক রঙের দ্বারা নানারূপ অঙ্গভঙ্গীর ভাবও দেখান যাইতে

পারে। কিন্তু বালকগণের পক্ষে এরূপ অঙ্কন সহজ নহে। শিক্ষকগণের আমোদার্থ নিম্নে একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল ঃ—

৪৩ চিত্র।—এক রঙের দ্বারা ভঙ্গী।

বিনা লাইটে, কেবল এক রঙের দ্বারা চিত্র অঙ্কনে, হয় কাল রঙ না হয় কপিল রঙ (Burnt Sienna) ব্যবহার করিবে।

(৩) কাগজ কাটা।—সাদা কাগজে জ্যামিতিক চিত্রাঙ্কণ করিয়া কাঁচির দ্বারা কাটা। কাগজ ভাঁজ করিয়াও নানারূপ জ্যামিতিক চিত্র দেখান যাইতে পারে (১৮ খেলনা)। সাদা কাগজে অক্ষর কাটিয়া, লাল, নীল বা সবুজ কাগজের উপর আঠার দ্বারা আটিয়া নীতি বাক্য রচনা করা যাইতে পারে। এইরূপ নীতি বাক্যের দৃষ্টান্ত ;—"সময় চলিয়া গেলে ফিরিবেনা আর, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পাতন, লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন, সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, যতন বিহনে কোথা মিলয়ে রতন, দানেই হস্তের শোভা না হয় কঙ্কণে, বিদ্যাই আনিয়া দেয় সুদিন সম্পদ" ইত্যাদি। কাগজ কাটিয়া ঘড়ি প্রস্তুত করাইলে ছোট ছোট বালকগণকে সেই সঙ্গে ঘড়িতে সময় দেখা শিখান যাইতে পারে। সাদা কাগজে চারিটী গোল বৃত্ত কাটিয়া একখানি নীল কাগজের উপর বৃত্তাভাসের পথে (ঋতু পরিবর্ত্তনের চিত্রানুকরণে) আঠার দ্বারা আঁটিয়া ঋতুপরিবর্ত্তনের চিত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সূর্য্যের বিপরীত অংশ কালির দ্বারা কাল করিয়া দিতে হইবে। নক্ষত্রাকারে একটুকরা কাগজ কাটিয়া (সূর্য্য) বৃত্তাভাসের মধ্যে বসাইবে।

লাল কালির দ্বারা পৃথিবীর গতিপথ চিহ্নিত করিবে। ছোট ছোট নক্ষত্র কাটিয়া নীল কাগজে লাগাইয়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুব নক্ষত্র, এবং কালপুরুষ ও লুব্ধক প্রস্তুত করিলে, আমোদের সঙ্গে অনেক শিক্ষা হয়।

শক্ত কাগজ কাটিয়া বাক্স প্রস্তুত করা শিখান হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য কিরূপ কাগজ কাটিতে হইবে, তাহা নিম্ন চিত্র দৃষ্টে বুঝিতে পারিবে :—
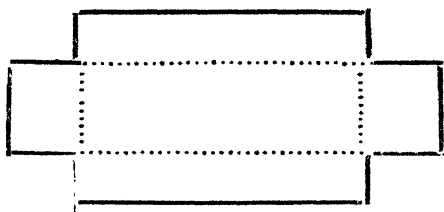
৪৪ চিত্র।—কাগজের বাক্স।

(৪) তার বেঁকাইয়া নানারূপ ক্ষেত্র ও অক্ষর নির্ম্মাণ।

বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন।—(বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রিজলিউসন নং ১, তারিখ ১লা জানুয়ারী, ১৮৯১) আমাদিগের প্রদেশে বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন নামে যে প্রণালী আছে, তাহা ফ্রবলের কিণ্ডারগার্টেন ও হারবার্টের পদার্থ-পরিচয় মিশ্রিত একপ্রকার প্রণালী। যাঁহারা কিণ্ডার গার্টেন ও পদার্থ পরিচয় প্রকরণ দুইটি উত্তম রূপে পাঠ করিবেন, তাঁহারা বঙ্গীয় কিণ্ডারগার্টেন সমস্ত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

২। বর্ণপরিচয়।

কিণ্ডারগার্টেনের অষ্টম খেলনায় অক্ষর শিক্ষার প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষকগণ এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে একবার উক্ত অংশ পাঠ করিয়া লইবেন। "লেখা ও পড়া একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া বর্ত্তমান প্রণালী-সম্মত। লেখা শিখাইবার পূর্ব্বে কিরূপে খাড়া, পড়া ও তেড়া রেখা শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাও ১০ম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে। হস্তাক্ষর শিক্ষার পরিচ্ছেদে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক অক্ষর

শিক্ষার সঙ্গে, তাহার উচ্চারণ তাহার লেখা, তাহা দ্বারা সহজ শব্দ নির্ম্মাণ ও সেই শব্দ পঠনশিক্ষা দিতে হইবে।

অক্ষর উচ্চারণের ধারা।—অক্ষর গুলির উচ্চারণ শিক্ষায় তিনটী ধারা অবলম্বিত হইয়া থাকে, (১) বর্ণের ধারা (২) ধ্বনির ধারা (৩) শব্দের ধারা।

(১) বর্ণের ধারা।—প্রথমে শৃঙ্খলাক্রমে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালার সাধারণ উচ্চারণ শিক্ষা দিয়া, পরে তাহার দ্বারা শব্দ নির্ম্মাণ শিক্ষা দেওয়াকে বর্ণের ধারা বলে। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বর্ণমালা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাই বর্ণের ধারা। এই প্রণালীই ভাষা শিক্ষাদানের প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ, অন্যান্য প্রণালী অপেক্ষা এইটীই সহজ—শিক্ষকের পক্ষেত নিশ্চয়ই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে দেখা যায় যে এই প্রণালীতে বর্ণ গুলির প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমরা যখন ক, খ প্রভৃতির উচ্চারণ শিক্ষা দান করি তখন প্রকৃত ক, খ উচ্চারণ না করিয়া, স্বরযুক্ত (অযুক্ত) ক, খ উচ্চারণ করিয়া থাকি। ইহাতে যে দোষ হয় তাহা একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছি। ‘বক’ উচ্চারণ করিতে আমরা অকার যুক্ত ব উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু অকার যুক্ত ‘ক’ ত উচ্চারণ করিলাম না। এখানে ক এর ঠিক উচ্চারণ হইল। কিন্তু ক শিখাইবার সময় আমরা অকার যুক্ত ‘ক’ এর উচ্চারণ শিখাইয়া থাকি। এইজন্য পণ্ডিতেরা একটা ধ্বনির ধারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(২) ধ্বনির ধারা।—স্বরবর্ণের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া, ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত যে ধ্বনি মাত্র করা হয় তাহাকে ধ্বনির ধারা বলে। ‘ম’ উচ্চারণ করিবার সময়, আমরা প্রথমে ওষ্ঠ অধর সংলগ্ন করি, পরে ম এর অকারাংশ উচ্চারণের জন্য আবার ওষ্ঠদ্বয় বিভিন্ন করি। কিন্তু যদি ম উচ্চারণে আমরা ওষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিয়াই আর

ফাঁক না করি, তবেই ম এর প্রকৃত উচ্চারণ হয়। 'আম্‌' উচ্চারণ করিতে যে অকারশূন্য ম এর উচ্চারণ হয়, তাহাই ম এর প্রকৃত ধ্বনি। ক্ষুদ্র শিশুর অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণ গুলি যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই ব্যঞ্জনের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে এ প্রথা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও, খুব কঠিন। সকল শিক্ষকের দ্বারা এই প্রথানুযায়ী বর্ণ শিক্ষা হওয়া সম্ভবপর নয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপে বর্ণের উচ্চারণ শিক্ষা দিলে বালকগণের তোত্‌লামী অভ্যাস হইতে পারে। কিন্তু এ প্রথার সে রূপ কোন দোষ থাকিলেও, বর্ণের প্রকৃত শক্তি শিক্ষা দানের নিমিত্ত ইহার আলোচনা যে বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

(৩) শব্দের ধারা।—এই ধারাকে সাধারণতঃ 'দেখা পড়া' ধারা বলে। এই ধারার প্রবর্ত্তকেরা বলেন যে, যখন আমরা প্রথমে শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকি অর্থাৎ যখন আমরা অ আ ক খ না পড়িয়াই প্রথমে নানা শব্দের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করি, তখন বিশ্লেষণ প্রথানুসারে শব্দ ভাঙ্গিয়া বর্ণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ শব্দই আমাদিগের পরিচিত, আর বর্ণ অপরিচিত। এই প্রণালীতে বর্ণ শিক্ষা দানের একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। বোর্ডের উপর উত্তম অক্ষরে 'বক, বর, বন, বল' লিখিয়া দিলে। বালকেরা এ সমস্ত কথা জানে। তারপর, দর্শনী কাঠীর দ্বারা এক একটী শব্দ দেখাও, আর উচ্চারণ কর ও বালকগণকে বোর্ড লিখিত শব্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উচ্চারণ করিতে বল। এইরূপে শব্দের আকৃতি বোধ জন্মিলে—অর্থাৎ যখন বালকেরা বোর্ড লিখিত শব্দ শিক্ষকের বিনা সাহায্যে পড়িতে শিখিবে—তখন বক, বর ও বন, বল প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণ পৃথক করিয়া (ধ্বনির ধারানুসারে) শিখাইতে হইবে। বর্ণের আকার ও উচ্চারণ এক সঙ্গেই শিক্ষা হইবে।

(৪) **বিশেষ উচ্চারণের ধারা।**—ইংরাজী বর্ণমালা অসম্পূর্ণ বলিয়া, ইংরাজেরা একটা বিশেষ উচ্চারণের ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরাজীর অনেক বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ এক, কিন্তু শব্দের সংযোগে তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ উচ্চারণ হইয়া থাকে। cut এখানে c এর উচ্চারণ ক এর, city এখানে c এর উচ্চারণ স এর মত। এইজন্য ইংরাজী ২৬টী অক্ষর ভাঙ্গিয়া, তাঁহারা ৪০টী অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা অক্ষর গুলি, অন্যান্য ভাষার অক্ষরের সহিত তুলনায়, এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বাঙ্গালা বর্ণমালায় এ ধারার কোন আবশ্যকতা নাই।

উচ্চারণ।—বালকগণকে বর্ণ গুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দিতে হইবে। অ, আ না বলিয়া, কেহ কেহ স্বরের অ, স্বরের আ, এইরূপ ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন। স্বরের অ, আ ভিন্ন, ব্যঞ্জনের অ, আ নাই। যে বর্ণকে অন্তস্থ অ (য়) বলা হয়, তাহার উচ্চারণ অ নয়, 'ইয়'। সুতরাং অন্তস্থ য় কে, 'ইয়' বলিয়া উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই দুইটী কথা শিশুগণের উচ্চাবণের পক্ষে শক্ত বিবেচনা করিয়া, কেহ কেহ ছোট ই, বড় ঈ এবং ছোট উ, বড় ঊ, এরূপও পড়াইয়া থাকেন। এ মন্দ নয়। বর্ণের উচ্চারণের সময় ওষ্ঠদ্বয়ের যথোচিত সঞ্চালন ও বিস্ফারণ আবশ্যক। মুখ বুঁজিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণ বিশেষ দোষের। ক, খ প্রভৃতি যেন ঠিক কণ্ঠ হইতেই নির্গত হয়। গ, ঘ উচ্চারণে যেন সুস্পষ্ট পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এক রকমে উচ্চারণ করা জেলা বিশেষের দোষ—এইজন্য ঘর কে 'গর, 'ভাত' কে 'বাত,' 'ধান' কে 'দান' বলিতে শুনা যায়। ঙ কে উঁয়্যা বলা ভুল, ঠিক কণ্ঠ হইতে 'অঙ্গ' মত ধ্বনি নির্গত হইবে। বাঙ্গালার সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণই এক মাত্র 'অ' এর যোগে উচ্চারিত হয়, সুতরাং 'য়্যা' হইবে না। 'রঙ' উচ্চারণে ঙ এর প্রকৃত ব্যঞ্জন উচ্চারণ পাওয়া যায়—ইহার সহিত অ যোগ করিয়া পড়িলেই, ঙ বর্ণের উচ্চারণ হইবে। চ বর্গ উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সহিত সংলগ্ন করিতে হইবে। কোন কোন জেলায় কেবল জিহ্বার অগ্রভাগ দন্তমূলে লাগাইয়া চ বর্গের উচ্চারণ

করিয়া থাকে। কিন্তু চ তালব্য বর্ণ, দন্ত বর্ণ নহে। ঞ এর উচ্চারণ ইঁ (ন) য়—জিহ্বা তালুর সহিত লাগাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। ট বর্গের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ বক্র করিয়া দন্ত ও তালুর সন্ধিস্থলের কিঞ্চিৎ উপরে স্পর্শ করাইতে হইবে। ত বর্গের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দন্ত স্পর্শ করিবে। প বর্গের উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ নীচের দন্তপাটীর নিম্নে থাকিবে, কারণ প বর্গে কেবল ওষ্ঠের কার্য্য। ক বর্গে জিহ্বার অগ্রভাগ কণ্ঠের নিকট, চ বর্গে তালুর মধ্য ভাগে, ট বর্গে দন্ত ও তালুর সন্ধিস্থলে, ত বর্গে দন্তের উপর, প বর্গে দন্তের নীচে—কেমন শৃঙ্খলাক্রমে জিহ্বা মুখ গহ্বরে ঘুরিয়া আসিল। য উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ (বাঙ্গালার এই য এর প্রকৃত উচ্চারণ হয় না বলিয়া) তালুতে, র উচ্চারণে দন্ত তালুর সন্ধিস্থলে, ল উচ্চারণে দন্তে ও ব উচ্চারণে দন্তের নীচে থাকিবে।

বাঙ্গালায় ণ ও ন এর ভিন্ন উচ্চারণ নাই। তবে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা ট বর্গের বর্ণ-উচ্চারণ স্থানে ও ন উচ্চারণের সময় ত বর্গের বর্ণ-উচ্চারণের স্থানে থাকিবে। বাঙ্গালায় ব দুইটীরও উচ্চারণ এক কিন্তু শিক্ষকগণের প্রকৃত-উচ্চারণ জানিয়া রাখা ভাল। অন্তস্থ ব, 'ওয়াও' মত উচ্চারণ করিতে হয়। তিনটী শ একরূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন: শ উচ্চারণে (চ বর্গের মত) জিহ্বা তালুর সহিত সংলগ্ন হইবে, স উচ্চারণে (ত বর্গের মত) জিহ্বা দন্ত স্পর্শ করিবে,। এই স কতকটা কোমল ছ এর মত উচ্চারিত হয় (ইংরাজীর s ও পার্শির সিন)। ছাত্রগণ অন্ততঃ বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়িলে, তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে বাঙ্গালা ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথায় 'স' দেখিলে, তাহা যেন কোমল ছ এর মত পড়ে। কারণ বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের নানা দেশীয় নামের স কোমল 'ছ' এর মতই উচ্চারণ করিতে হইবে। যথা ইয়াসিন, সাইন বোর্ড, সলফর,

লিসবন, ওয়েলেসলি, সোডা ওয়াটার, সংক্তজিন ইত্যাদি। ষ এর উচ্চারণ কোমল খ এর মত। ড়, ঢ় ও র এর উচ্চারণ পৃথক করিতে পারে না বলিয়া, অনেক ছাত্র ড এ বিন্দু র, ঢ এ বিন্দু র—ও বএ বিন্দু র এইরূপে পড়িয়া থাকে। জিহ্বা খুব বক্র করিয়া তালুর সহিত লাগাইয়া ড়, ঢ় উচ্চারণ করিতে হইবে। 'সকল' বলিতে 'হকল', 'শশা স্থানে 'হোহা,' 'শাক' স্থানে 'হাগ' আবার 'হরি' বলিতে 'শরি,' 'হাত' বলিতে 'সাত' ইত্যাদি বিকৃত উচ্চারণ, স ও হ এর উচ্চারণ গত পার্থক্য না শিখাই-বার দোষেই ঘটিয়া থাকে। কোন কোন জেলায় চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ একেবারেই হয় না, যথা চাদ, বাশ, পাঠা ; আবার কোন কোন জেলায় কিছু বেশী মাত্রায় ব্যবহৃত হয় যথা কেঁন, এসেঁছ, কুঁড়ে ইত্যাদি। শিক্ষককে প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হইবে। বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় অবশ্য তাহাদিগকে এই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না, শিক্ষক নিজে উত্তম রূপ উচ্চারণ করিলে বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে।

স্বর সংযোগ।—আকার, ইকার প্রভৃতির সংযোগ শিক্ষায় বালকগণের চক্ষু কর্ণ—দুইই ব্যবহার করাইবে। শিক্ষক বোর্ডে লিখি-বেন ও উচ্চারণ করিবেন বালকেরা বোর্ডের উপর দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষ-কের অনুকরণে উচ্চারণ করিবে। মনে কর আকার সংযোগ শিক্ষা দিতে হইবে। বোর্ডের উপর ক, আ এই দুই অক্ষর খুব পাশাপাশী করিয়া লিখিয়া দিলে। তারপর ক, আ এই বর্ণ দুইটী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে এত দ্রুত উচ্চারণ করিবে যে ক এর সঙ্গে আ যুক্ত হইয়া কা উচ্চারিত হইবে। আবার লেখাতে এইরূপ প্রথমে ক আ থাকিবে, পরে আ বর্ণের অ ভাগ অল্পে অল্পে পুঁছিয়া দিবে, কেবল মাত্র া থাকিবে। এখন কা এই রূপ লিখিয়া কা উচ্চারণ শিক্ষা দাও। ক এর সহিত যে আ যুক্ত হইল, ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া উদ্দেশ্য। এই-

রূপে ব আ=বা শিখাইবে। পরে কাকা বাবা প্রভৃতি শব্দ শিক্ষা দিবে। ইকার সংযোগ প্রথমে ই/চ এইরূপ লিখিবে, তারপর ইকারের মাথার ঝুঁটিটাকে বামের দিকে টানিয়া নামাইবে, পরে অনাবশ্যকীয় অংশ পুঁছিয়া ও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন

করিয়া কেবল ি এই অংশ রাখিবে। এইরূপে নি শিখাইয়া 'চিনি' কথা শিখাইবে। উকার সংযোগে ক/উ এইরূপে লিখিয়া, পরে একটু একটু পরিবর্ত্তন করিয়া কু করিবে। তার পর "কুকুর" কথা শিখাইবে। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত কথা লিখিতে পড়িতে শিখিলে বালকগণের আনন্দ হইবে ও শিখিতে আগ্রহ জন্মিবে। অন্যান্য স্বর সংযোগও এইরূপে শিখাইবে।

সংযুক্তবর্ণ।—সংযুক্তবর্ণ শিক্ষাদানেও পূর্ব্বোক্ত রীতি অবলম্বন করিতে হইবে। 'শস্য' লিখিবার সময় প্রথম স্য না লিখিয়া সয় এই রূপ লিখিবে ও পড়িবার সময় 'শসয়' (শসইয়) এইরূপ পড়িবে। তারপর স এ যুক্ত য় পুঁছিয়া পুঁছিয়া ্য এইরূপে পরিবর্ত্তন করিবে। 'ভাদ্র' শিখাইবার সময় দ্র কে দর এইরূপে লিখিবে, ও 'ভাদর' এইরূপ পড়িবে। তার পর পুঁছিয়া পুঁছিয়া ্র করিবে ও 'ভাদ্র' পড়িবে। 'সর্প' শিখাইবার সময় র্প কে র/প এইরূপ লিখিবে, পরে র এর কতক অংশ পুঁছিয়া কেবল একটা র্ (রেফের) টান মাত্র রাখিবে। কিরূপে বর্ণ গুলি সংযুক্ত হয় তাহাই বালকগণকে দেখান উদ্দেশ্য। 'অজ্ঞ' শিখাইবার সময় জ এর সহিত যে কেমন করিয়া ঞ সংযুক্ত হইল অর্থাৎ জ এর কোন অংশের সহিত ঞ এর কোন অংশ যুক্ত হইয়া জ্ঞ এই অক্ষর হইল, তাহা দেখাইয়া দিবে। এক কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বালকেরা বানানগুলি চোখের সাহায্যেই অধিক পরিমাণে শিক্ষা করে,

সুতরাং বানান শিক্ষায় বোডের যথেষ্ট ব্যবহার হওয়া কর্ত্তব্য। বালকগণকে লেখা ও পড়া এক সঙ্গে শিখাইতে হইবে।

৩। ধারাপাত।

দৈনিক কাজ কর্ম্মে ধারাপাতের বিশেষ আবশ্যক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ধারাপাত শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাধারণ দোকানদারগণ কেবল ধারাপাতের বিদ্যাতেই সুচারুরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতেছে।

সংখ্যা অবধারণে বালকগণের একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা সংখ্যাদি পরিচায়ক নাম না জানিলেও, সংখ্যার তারতম্য বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকে। একটী শিশুকে একটী সন্দেশ দিয়া, আর একজনকে দুইটী সন্দেশ দিলে, যাহার একটা সে দুইটার দিকে লোলুপ দৃষ্টি করিয়া থাকে। অনেক জীবজন্তুরও এইরূপ সংখ্যাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। যে বিড়ালী নিজের ছানা কি অপরের ছানা তাহা চিনিতে পারে না, তাহার যদি ৪টী ছানার স্থানে ৩টী হইয়া থাকে, তবে সে ৪র্থটী খুজিয়া বেড়ায়। এইরূপ নানা কারণে পরিমাণ-বোধ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

রোমান অঙ্ক।—শতকিয়া শিক্ষাই ধারাপাতের আরম্ভ। দ্রব্যাদির সাহায্যে কিরূপে সংখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে তাহা (কিণ্ডারগার্টেন ৩য় খেলনা) বর্ণিত হইয়াছে। দ্রব্যের মধ্যে হস্তের অঙ্গুলীর দ্বারা সংখ্যা শিক্ষাদানের প্রণালী বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দশ দশ করিয়া গণনার প্রথা এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঘড়ির উপর যে অঙ্ক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও প্রকারন্তরে অঙ্গুলী চিহ্ন মাত্র; I II III IIII যথাক্রমে একটী, দুইটী, তিনটী ও চারিটী অঙ্গুলী জ্ঞাপক। পাঁচ লিখিতে যে V চিহ্ন দেওয়া হয় তাহাও পাঁচটী অঙ্গুলীর

চিহ্ন মাত্র; কনিষ্ঠা হইতে তর্জ্জনী পর্য্যন্ত অঙ্গুলীগুলি একত্র করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী পৃথক রাখিলেই ঠিক V চিহ্ন হইল। বালকগণকে এই V চিহ্ন এইরূপে বুঝাইতে হইবে: বোর্ডের উপর হাত রাখিয়া চকের দ্বারা হাতের চারিদিকে দাগ দিলেই হাত অঙ্কন হইবে। সেই হাতের উপর একটা V লিখিয়া হাতের চিহ্ন পুছিয়া ফেলিবে। এইরূপ (একহাত আর এক অঙ্গুলী) VI; সাত আট প্রভৃতিও তদ্রূপ। নয় লিখিতে প্রথমে VIIII এইরূপে লিখিবে। দুই হাত ক্রসের আকারে রাখিলেই দশ X হইল। এই রূপ XX পর্য্যন্ত রোমান অঙ্ক শিক্ষা দিলেই চলিবে। অঙ্ক বিষয়ক একটু জ্ঞান জন্মিলে, IX এইরূপ নয় শিক্ষা দিবে—বামের ক্ষুদ্র অঙ্ক বাদ দিতে হয় বলিয়া দিবে। এইরূপ দাগের দ্বারা এক দুই শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। বিশেষ ঘড়ির ব্যবহার যখন আমাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন এই অঙ্ক শিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য।

৪৫ চিত্র। পাঁচ পরিচয়।

শতকিয়া শিক্ষা।—৩ কি ৪ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের কাঠি (দেশলাই বা ঝাঁটার কাঠির মত সরু) সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। বালকগণকে টেবিলের চারিধারে দাঁড় করাইয়া—বা শিক্ষক সহ সকলে মাদুরে বসিয়া—প্রত্যেক বালকের ডান হাতের দিকে কতকগুলি কাঠী গুছাইয়া রাখ। শিক্ষক নিজের ডান হাতের দিকেও কতকগুলি কাঠী রাখিবেন। তার পর একটী, দুটী, তিনটী করিয়া কাঠী বামের দিকে সরাও, আর সঙ্গে সঙ্গে এক, দুই, তিন ইত্যাদি গণিতে থাক। বালকগণ শিক্ষকের সঙ্গে তদ্রূপ করিবে। এইরূপে দশ পর্য্যন্ত গণনা অভ্যাস হইলে, দশটী কাঠী একত্র করিয়া, সুতার দ্বারা বাঁধিয়া একটী আটী কর। তার পর এই আটীর ডান দিকে আবার পূর্ব্ববৎ

এক একটী কাঠী রাখ আর এগার বার ইত্যাদি গণনা শিখাও। ২০ পর্য্যন্ত গণনা হইলে, এই দশ কাঠীর দ্বারা আবার আর একটী আটী কর। এই প্রণালীতে ১০০ পর্য্যন্ত গণনা শিখাইয়া, ১০টী দশের আটী একত্র বাঁধিয়া একটা এক শতের আটী কর। তার পর ১০১, ১০২ ইত্যাদি ঐ প্রণালী মত শিখাও। বালকদিগকেও কাঠী সাজাইয়া সংখ্যা প্রকাশ শিক্ষা দিতে হইবে। প্রশ্ন কর—কাঠীর দ্বারা ৮৩ সাজাও। উত্তর :—

৪৬ চিত্র। ৮৩ সাজান।

এই সমস্ত কার্য্যের জন্য কতকগুলি দশের আটী ও একটী শতের আটী বাঁধিয়া রাখিবে ও কতকগুলি আল্‌গা কাঠীও সংগ্রহ রাখিবে। এই কাঠী-গুলি একটা খালি কাগজের বাক্‌সের ভিতর গুছাইয়া রাখিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে। কেবল কাঠির দ্বারা এইরূপ গণনা শিক্ষা দিলে বালক-গণের হয়ত এমন একটা ধারণা হইতে পারে যে সংখ্যা বুঝি কেবল কাঠী গণনাতেই লাগে। এইজন্য ফুল, পাতা, ফল, কড়ি, মুড়ি, তেঁতুলের বীজ, পয়সা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক। দশের সংখ্যার জন্য, ১০টী ফুল সূতায় গাঁথিয়া, ১০টী পাতা বাঁশের শলাকায় বিদ্ধ করিয়া, ১০টী কড়ি একটা একটা কাপড়ের থলির ভিতর পুরিয়া, ১০টী মুড়ি এক একটা খালি দেশলাইর বাক্‌সে রাখিয়া, ১০টী পয়সা কাগজে মুড়িয়া রাখিলেই বেশ হইবে। এক কাঠির দ্বারা প্রত্যহ শিক্ষা দিলে বালকগণের বিরক্তিও জন্মাইতে পারে; সেজন্যও নানারূপ দ্রব্যের ব্যবহার আবশ্যক। শতকিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির সংখ্যা বোধ হইলে, দ্রব্য উপলক্ষ ব্যতীত শতকিয়া পড়িতে শিক্ষা দিবে। সকলে একসঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অতি

উত্তম প্রথা। এইরূপ পড়াকেই 'ডাকপড়া' বলে।* সাধারণ শতকিয়া অভ্যাস হইলে, ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি ক্রমে এক এক বাদ দিয়া ও ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি ক্রমে দুই দুই বাদ দিয়া পড়া শিক্ষা দিবে। এই সময়ে 'জোড়, বিজোড়' কথা দুইটী শিখাইবে। কড়ি বা তেঁতুলের বীজ লইয়া বালকগণকে জোড়, বিজোড় খেলা শিখাইবে; আমোদের সঙ্গে অনেক শিখাইতে পারা যাইবে।

কড়া, গণ্ডা প্রভৃতি।—বার বৎসর পর্য্যন্ত মুখস্থ করিবার উপযুক্ত কাল। কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, চোক প্রভৃতি এই সময়ের মধ্যেই মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে। এই সময়ে অন্ততঃ কুড়ির ঘর পর্য্যন্ত নামতাও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা এই সমস্ত গণনা 'ডাক পড়ার' নিয়মে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া থাকে। পাঠশালায় প্রত্যহ কি একদিন পর একদিন, এইরূপে ডাকপড়ার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। টাকা পয়সা বিষয়ে কড়া গণ্ডার যে ব্যবহার, বালকগণকে প্রথমে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ক্রান্তি = কাণা কড়ি, কড়া = কড়ি, গণ্ডা = ডেবুয়া বা দামড়ী (উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এখনও চল আছে, তবে দামের তারতম্য হইয়াছে। তেঁতুলের বীজের মত তাম্রখণ্ড বিশেষ), বুড়ি = পয়সা, পণ = আনা, চোক = সিকি, এবং কাহণ = টাকা। নিম্নের চিত্রানুরূপ একখানা কাগজে টাকা, পয়সা, কড়ি প্রভৃতি উত্তম আটার দ্বারা আটিয়া রাখিলে বালকগণের বুঝিবার সুবিধা হইবে। এক খণ্ড তাম্র শলাকা, তেঁতুলের বীজের আকারে কাটিয়া লইলেই 'ডেবুয়ার' কাজ চলিবে।

যদি কাগজখানি চুরি যাইবার ভয় থাকে তবে সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে বা বাক্‌সে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে যে সকল মেকী টাকা, সিকি পাওয়া যায়, সেইগুলির এইরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে।
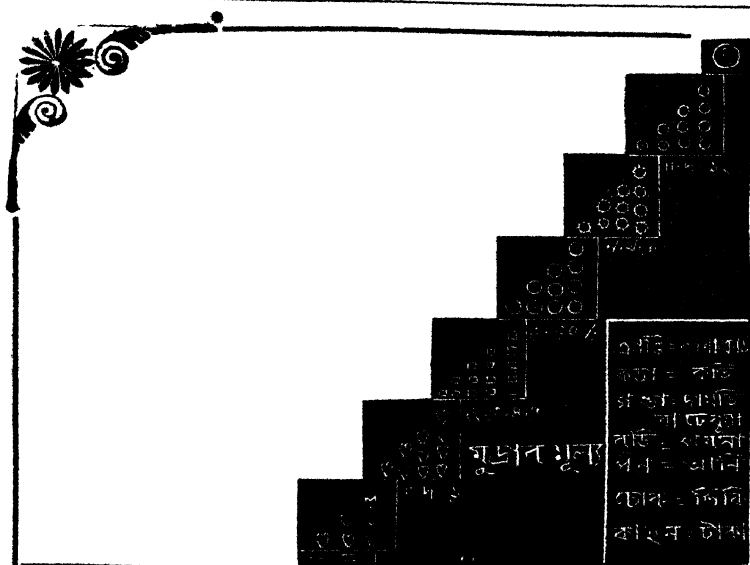
৪৭ চিত্র।—মুদ্রা পরিচয়।

বিদেশীকে শতকিয়া শিখান।—অনেক সাহেব মেম বাঙ্গালা শিখিবার জন্য বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এরূপ ছাত্র হইলে কেবল শতকিয়ার পড়া মাত্র শিক্ষা দিতে হইবে। প্রথমে এক দুই করিয়া দশ পর্য্যন্ত শিখাইয়া লও। তারপর অন্যান্য সংখ্যার নাম শিক্ষায় অন্য প্রণালী অবলম্বন করিলে কাজ কিছু সহজ হইতে পারে। এইরূপে বুঝাইয়া দাও; এগার=এক+আরও অর্থাৎ দশের পর আরও এক, তের=তিন আরও ইত্যাদি। বার, বাইশ, বত্রিশ প্রভৃতি শব্দে, 'দ্বি' কথার 'ব' মাত্র আছে, বার=ব+আরও। 'উন' শব্দের দ্বারা পরবর্ত্তী সংখ্যার এক কম বুঝায়। উনত্রিশ=ত্রিশ অপেক্ষা এক উন বা কম। শূন্যের 'শ', ব তে লাগিয়া বিশ, তিনে লাগিয়া ত্রিশ ইত্যাদি। একুশ, বাইশ প্রভৃতি শব্দে 'বিশের' ইশ মাত্র আছে; এক+ইশ=একুশ। কোন সংখ্যা বাচক শব্দের পূর্ব্বে এ থাকিলে এক, ব থাকিলে দুই (দ্বি) ত থাকিলে তিন, চ থাকিলে চার, প থাকিলে পাঁচ, ছ থাকিলে ছয়, সা থাকিলে সাত ও আ থাকিলে আট সংসৃষ্ট সংখ্যা বুঝাইবে; যথা বত্রিশ=ব (দুই) আর ত্রিশ, চৌয়ান্ন=চৌ (চার) আর আন্ন আধ+গণ্য, অর্থাৎ যতদূর গণনা করিতে হইবে তাহার অর্দ্ধেক=পঞ্চাশ), সাতান্ন,—

সাত+আশী ইত্যাদি। তবে চৌদ্দ, ষোল শব্দগুলি চার+আরও, কি ছয়+আরও করিয়া বুঝান যাইবে না ; আর ষাট, সত্তর, নব্বই প্রভৃতি শব্দেও শূন্যের 'শ' যুক্ত নাই। এইরূপ দুই চারিটী ব্যতিক্রম বলিয়া দিতে হইবে।

মৌখিক যোগ, বিয়োগ।—নামতা মুখস্থ করাইবার প্রণালীতে যোগ, বিয়োগের ধারাও কিছু মুখস্থ করান উচিত। যথা চারে তিনে সাত, চারে চারে আট, চারে পাঁচে নয় ইত্যাদি। এইরূপ নয়ে নয়ে আঠার পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলে যোগ, বিয়োগ উভয় কার্য্যেরই সাহায্য হইবে। তারপর বালকগণকে দুই অঙ্কযুক্ত সংখ্যার যোগ শিখাইবে। যথা ৩৫ আর ৬৭ কত হয়?—এইরূপ অঙ্কে প্রথমে একক যোগ না করিয়া, দশক দুইটী যোগ করা সুবিধাজনক; ৩ আর ৬এ নয় দশ, ও ৫ আর ৭এ বার অর্থাৎ এক দশ দুই; সর্ব্বসমেত দশ দশ আর ২, অর্থাৎ ১০২। বিয়োগেও এই প্রণালী অবলম্বন করিবে। ইচ্ছা করিলে মনে মনে এককের ঘর হইতেও যোগ বিয়োগ আরম্ভ করিতে পারে, কিন্তু বালকেরা মৌখিক যোগ, বিয়োগে দশকের ঘর হইতে কার্য্য আরম্ভ করাই সুবিধাজনক মনে করে। শিক্ষক এ বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৪। হস্তাক্ষর।

আরম্ভ।—লেখা শিখাইবার প্রণালী কিণ্ডারগার্টেন ১০ম খেলনায় বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে বালককে কয়লা বা চক দিয়া মাটীর উপরে, বা পেনসিল দিয়া স্লেটের উপরে তাহার স্বেচ্ছামত হিজিবিজি লিখিতে দিবে। ইহাতে তাহার কতকটা হাত ঠিক হইবে। কি পরিমাণ জোরে লিখিলে মোটা দাগ পড়ে ও কি পরিমাণ জোর লিখিলে সরু দাগ পড়ে, তাহা সে আপনা আপনি বুঝিতে পারিবে। ইহার পরে পূর্ব্বের উপদেশমত (১০ম খেলনা) খাড়া, পড়া, তেড়া, এবং বেঁকা ও এঁকা-বেঁকা রেখা শিক্ষা দিতে হইবে। লেখা শিখাইবার সময় ব, র, ক

প্রভৃতি সহজ সহজ অক্ষর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। ইংরাজীতে যেমন ছাপার অক্ষর ও লেখার অক্ষর ভিন্ন ভিন্ন, বাঙ্গালায় তাহা নহে বলিয়া এক সঙ্গে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া সমধিক সুবিধাজনক। যাহার অক্ষর যতদূর ছাপার অক্ষরের সদৃশ, তাহার অক্ষর তত সুন্দর। সেইজন্য লিখিবার সময় বালকেরা যাহাতে ছাপার অক্ষরের অনুকরণ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আজ কাল বাঙ্গালা কাপিবুক দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন কাপিবুকে একটা বাঙ্গালা জড়া লেখারও আদর্শ আছে। এরূপ আদর্শ না থাকাই ভাল। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় সুবিধার জন্য ছাপার অক্ষরগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একটা জড়া লেখা করা হইয়া থাকে; তাই বলিয়া সে লেখা আদর্শ হইতে পারে না। ছাপার লেখাই আদর্শ থাকিবে। কাজের সুবিধার জন্য তাড়াতাড়ি যাহা লেখা হয় তাহাকে উত্তম লেখা বলে না। যে ছাপার মত লিখিতে পারে ও তাড়াতাড়ি লিখিতে পারে সেই সর্ব্বোত্তম লেখক। ইংরাজী স্ক্রিপ্ট (জড়া) অক্ষরেরও একটা আদর্শ আছে। তাড়াতাড়ি লিখিবার সময় কয়জনের লেখা সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়া থাকে? তাই বলিয়া ইংরাজী কাপিবুকে একটা বিশ্রী জড়া লেখার আদর্শ দেওয়া হয় না।

শিক্ষাদানের নিয়ম।—(১) লেখার সময় বালকগণ সহজ ও সরল ভাবে বসিবে। ঘাড় বাঁকাইয়া, মাথা একদিকে হেলাইয়া, জিব বাহির করিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া, পিঠ কুব্জ করিয়া লিখিবার অভ্যাস প্রথম হইতেই নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। মস্তক যেন কাগজের উপর অত্যধিক ঝুকিয়া না পড়ে।

(২) লিখিবার উপকরণ উত্তম হওয়া আবশ্যক। ভাল কাগজ, ভাল কলম, ও ভাল কালি না হইলে লেখা ভাল হইবে না। কাগজের উপর কালকালির দাগগুলি যত উজ্জ্বল দেখাইবে, লেখাও তত সুন্দর দেখাইবে। পাতলা ও ময়লা রঙের কাগজ, ফ্যাড়ফেড়ে কলম, ও জলো কালিতে ভাল লেখাও বিশ্রী হইয়া যায়। বালকের স্লেট বেশ পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে জল ও কয়লা দ্বারা ঘষিয়া তেলের দাগ

তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। স্লেটে ভাল দাগ না বসিলে বালক লিখিয়া আনন্দ পাইবে না। নিম্ন শ্রেণীতে রুল কাটা স্লেট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) লিখিবার পূর্ব্বে, হাত বেশ করিয়া কাপড়ে মুছিয়া লইতে হইবে। হাতের তেল কাগজে লাগিলে লেখা চপ্‌সিয়া যাইবে আর কাগজও ময়লা দেখাইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লেখার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সর্ব্ব প্রধান সহায়।

(৪) পেন্‌সিল বা কলম ধরিবার প্রণালী বালকগণকে প্রথম হই-তেই শিখাইতে হইবে। একবার অভ্যাস খারাপ হইয়া গেলে শেষে আর বদ্‌লাইতে পারা যাইবে না। তবে অঙ্গুলির স্বাভাবিক জড়তাবশতঃ কেহ কেহ ভিন্ন প্রকারে কলম ধরিতে সুবিধা মনে করে। সে পৃথক কথা।

মধ্যমার অগ্রভাগের উপর কলম রাখিবে, তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্র-ভাগের দ্বারা কলম ধরিবে। কাগজের সহিত কলমের অগ্রভাগের ১৫'২০ ডিগ্রি মত কোণ হইবে। কলমের উর্দ্ধাংশ তর্জ্জনী ও বৃদ্ধার সংযোগ-স্থলে রাখিবে। কনিষ্ঠা কাগজের উপরে থাকিবে। অনামিকার অগ্রভাগ কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্য হইতে হাতের তালুর দিকে বাহির হইয়া থাকিবে।
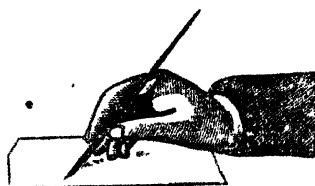
৪৮ চিত্র।—কলম ধরা।

(৫) আদর্শ সুন্দর হওয়া আবশ্যক। সুন্দর বড় বড় অক্ষরে নীতি-বাক্য লিখিয়া দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখিলে ভাল হয়। শিক্ষকের নিজের

হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষককে সম্মুখে লিখিতে দেখিলে বালকগণ অক্ষরের আকৃতি যে পরিমাণ অনুধাবন করিতে পারে, মুদ্রিত কাপিবুকের সাহায্যে তাহা পারে না।

(৬) অক্ষরগুলি লিখিবার ক্রম বোর্ডের উপর বুঝাইয়া দিতে হইবে। ব লিখিতে হইলে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কোন দিক দিয়া কোথায় গিয়া শেষ করিতে হইবে, তাহা না দেখাইয়া দিলে বালকেরা ধরিতে পারিবে না। শিক্ষক বোর্ডে লিখিয়া দেখাইবেন।

(৭) প্রথমে এক একটী করিয়া অক্ষর লিখিতে শিখাইবে। কোন অক্ষর লিখিতে ভুল করিলে, বোর্ডে সেই ভুল অক্ষর ও শুদ্ধ অক্ষর লিখিয়া তাহাদিগের পার্থক্য বুঝাইয়া দিবে। বালকের লেখার খাতায় তাহার ভুল অক্ষরগুলি লাল কালির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া দিবে।

(৮) লেখা শিখাইবার সময়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকগণের লেখা পরীক্ষা করিবে। একটা লাল পেন্‌সিল হাতে রাখিবে; যখন যাহার যে ভুল দেখিতে পাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ লাল পেন্‌সিল দিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে।

(৯) শ্রেণীতে বালকেরা যদি এক সময়ে একটী অক্ষর বা একটী বাক্যের অনুশীলন করে, তবে শিক্ষকের পক্ষে লেখা শিখান সুবিধা হয়। ভুল হইলে তখনই বোর্ডে লিখিয়া দেখান যাইতে পারে।

(১০) উত্তম হস্তাক্ষর কেবল অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যাহাতে প্রচুর পরিমাণে লেখার আলোচনা হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে।

অনেক সময় বালকেরা, যেমন তেমন করিয়া, তাড়াতাড়ি কলম চালাইয়া, কতকগুলি ছাই মাথা মুণ্ড লিখিয়া আনিয়া হাতের লেখার বুঝ দিয়া থাকে; আর শিক্ষকও অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে একটা নাম দস্তখত করিয়া তাঁহার দায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ উভয় পক্ষের অবহেলায় বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। লেখা ভালত হয়ই না, পরন্তু

বালকগণের বিদ্যালয়ের সকল কার্য্যেই অবহেলার প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়।

অক্ষরের অংশ।—প্রথমে নিম্নলিখিত রেখাগুলির অঙ্কন শিক্ষা দিলে, লেখা শিখান সহজ হইতে পারে :

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

৪৯ চিত্র।—অক্ষরের প্রাথমিক অংশ।

(১) এই রেখা বালকেরা নীচের দিক হইতে টানিয়া উপরের দিকে ও উপরের দিক হইতে টানিয়া নীচের দিকে আঁকিবে (২) বাম হইতে ডান দিকে (৩,৪) উপর হইতে নীচের দিকে (৫) ডান হইতে বাম দিকে (৬) বাম হইতে ডান দিকে (৭) নীচ হইতে উপর দিকে (৮) উপর হইতে নীচে (৯) ডান হইতে বামের দিকে ঘুরাইয়া শূন্য দিবে।

প্রথম প্রথম বোর্ডের উপর বা মাটীর উপর চক্ দিয়া মক্‌স করা অর্থাৎ শিক্ষকের লেখার উপর হাত বুলান উত্তম প্রথা।

মুদ্রিত অক্ষর গুলিতে স্থূল সূক্ষ্ম নানারূপ দাগ থাকে। লিখিবার সময় দাগ গুলি সরু মোটা না করিলেও চলিতে পারে।

অঙ্ক লিখন।—অ, আ, ক, খ শব্দের অংশ মাত্র। একাধিক বর্ণ একত্র না হইলে কোন অর্থ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু ১, ২ প্রভৃতি অর্থযুক্ত চিহ্ন। প্রত্যেক চিহ্নে এক একটা বিশেষ সংখ্যা বোধ হয়। সুতরাং এই সমস্ত সংখ্যা লিখন শিক্ষায় তৎতৎ সংখ্যার জ্ঞান দানও আবশ্যক। এইজন্য প্রথম অঙ্ক লিখন শিক্ষা দিতে হইলে, বোর্ডে কাঠির চিত্র আঁকিয়া তাহার উপর অঙ্ক লিখিতে হইবে যথা ;—

৫০ চিত্র।—অঙ্ক লেখা।

তারপব অল্পে অল্পে দাগ গুলি পুঁছিয়া ফেলিয়া কেবল অঙ্কেব চিহ্নই বাখিতে হইবে। এইরূপে ৯ পর্য্যন্ত শিখান হইলে, দশেব বেলা বোর্ডে একটা 'দশেব আটী' আঁকিয়া তাহাব গায়ে বড করিয়া একটা ১ লিখিয়া দিবে। দশেব আটী বড বলিয়া তাহাব গায়ে লিখিত একও বড়। এই আটির পব আব আলগা কাঠী নাই বলিয়া, সেখানে একটা শূন্য দিবে। বুঝাইয়া দাও, আলগা কাঠী না থাকিলেই সেখানে এইরূপ একটা ০ চিহ্ন দেওয়া হয়। 'দশেব আটিব' ডাহিনে একটা আলগা কাঠী আঁকিয়া তার উপর একটা ছোট করিয়া ১ লেখ। শেষে আটি কাঠী পুঁছিয়া ফেলিলে '১১' এইরূপ এগাব থাকিবে। এইরূপে ১২, ১৩, প্রভৃতি শিখাইবে। তাব পর অভ্যাস হইয়া গেলে এককেব ও দশকেব অঙ্ক এক আকারেই লিখিবে। বামে থাকিলেই যে দশকেব অঙ্ক বুঝায় ইহা বালকগণ সহজেই বুঝিতে পাবিবে।

৫। শ্রুতলিপি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।—বালকেরা অক্ষরের আকৃতি না দেখিয়া লিখিতে পারে কি না তাহার পরীক্ষা হয়। শুদ্ধ বানান মনে আছে কি না, তাহার পরীক্ষা হয়। আর দ্রুত লিখিবার অভ্যাস হইতেছে কি না, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এসকল ব্যতীত শ্রুতলিপি শিক্ষায় বালকের মনোযোগ শক্তি ও স্মরণ শক্তির বৃদ্ধি সাধন হয়।

শিক্ষাদিবার নিয়ম।—(১) বালকের বয়স ও জ্ঞান দিকে চনায় শ্রুতলিপির অংশ নির্দ্ধারণ করিবে। ছোট ছোট বালকগণকে

২।৩টী শব্দ লেখাইলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪।৫, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৭।৮ ও ছাত্রবৃত্তিতে ১০।১২ লাইন লেখাইলেই চলিতে পারে।

(২) বালকগণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দযুক্ত প্রবন্ধাংশ বাছিয়া লয়েন; এরূপ করা অনিষ্টকর। বালকের পাঠ্য পুস্তক হইতে অথবা সেই রকমের অন্য কোন পুস্তক হইতে শ্রুতলিপি দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক শিক্ষক কঠিন কঠিন শব্দগুলি প্রথমে একবার বোর্ডে লেখাইয়া লয়েন। এ নিয়মও বেশ—কারণ শিখান উদ্দেশ্য, ঠকান নয়।

(৩) যে অংশের শ্রুতলিপি দিতে হইবে, শ্রুতলিপি লেখাইবার পূর্ব্বে, তাহা একবার পড়িয়া শুনাইবে। কারণ বিষয় জানিলে লিখিবার সুবিধা হয়, বাক্য বা বাক্যাংশ সহজেই মনে থাকে।

(৪) বাক্যাংশ বা বাক্য, একবারের অধিক ডাকিয়া দিবেনা। কিন্তু তাই বলিয়া তাড়াতাড়ি করিবে না। বালকেরা সাধারণতঃ যত সময়ে সেই অংশ লিখিতে পারে মনে কর, তত সময় থামিয়া, তবে অপরাংশ ডাকিয়া দিবে। শিক্ষকের বলা শেষ না হইলে বালকগণ লিখিতে আরম্ভ করিবে না। যে সকল বালক বাক্যাংশ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে লিখিতে আরম্ভ করে, তাহারা বাক্যাংশের প্রথম ২।১টী কথাই শুনে, কিন্তু শেষাংশের প্রতি মনোযোগ থাকে না বলিয়া 'তারপর কি, তারপর কি' করিয়া চীৎকার করে। একবারের বেশী না বলিলেই, বালকগণ বাধ্য হইয়া মনোযোগী হইবে ও একবার শুনিয়াই সমস্ত বাক্যাংশ মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি দুয়েরই অনুশীলন হয়। তবে বাক্যাংশের পরিমাণ, ছাত্রের বয়স বা জ্ঞান বিবেচনায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নিম্ন প্রাথমিকের বালকগণের জন্য একসঙ্গে ৩।৪টী, উচ্চ প্রাথমিকের

বালকের জন্য ৪।৫, ও ছাত্রবৃত্তির বালকের জন্য ৫।৬টী কথার বাক্য বা বাক্যাংশ ডাকিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া অসংলগ্ন বাক্যাংশ ডাকিতে নাই। "রাম রাজপদে প্রতিষ্টিত হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন"—এই অংশের শ্রুতলিপি লেখাইতে হইবে। এখন নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩।৭ কথার অংশ একসঙ্গে ডাকিয়া দিতে হইবে বলিয়া, "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত॥ হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে॥" ইত্যাদি প্রকারে পড়িতে হইবে না। শ্রুতলিপি ডাকা শেষ হইলে, সমস্ত অংশ আর পুনরায় পড়িয়া শুনাইবে না। প্রথমেইত পড়িয়া শুনাইয়াছ।

(৫) বালকেরা প্রায়ই যুক্ত অক্ষরগুলি লিখিতে জানে না। 'পুষ্প' লিখিতে হয়ত একটা আস্ত 'ষ'এর নীচে একটা 'প' লিখিয়া রাখিল। শ্রুতলিপিতে এগুলি শিখাইতে হইবে।

(৬) শ্রুতলিপি পরীক্ষার সময়, অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসের নীচে একটা দাগ দিয়া দিবে। বালক পুস্তক দেখিয়া নিজেই শুদ্ধ বানান লিখিবে। যে বানানগুলি প্রায় বালকেই লিখিতে ভুল করে, সেগুলি বোর্ডে লেখাইয়া লইবে। অনেক শিক্ষক অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাসগুলির শুদ্ধ বানান ৩।৪ বার করিয়া লেখাইয়া লয়েন। এ প্রথা মন্দ নয়।

(৭) সকল সময় নিজে শ্রুতলিপি পরীক্ষা না করিয়া মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইবে। এর স্লেট তাকে, তার স্লেট ওকে, এইরূপে বালকেরা পরস্পরের স্লেট বদল করিয়া লইবে। বালকেরা স্লেট পরীক্ষার সময় অশুদ্ধ বানানগুলির নীচে দাগ দিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে যার স্লেট তাহাকে দিয়াও পরীক্ষা করান মন্দ নহে।

(৮) কোন কোন শিক্ষক বোর্ডে কতকগুলি অশুদ্ধ বানান লিখিয়া দিয়া, বালকগণকে শুদ্ধ করিতে বলিয়া থাকেন। এরূপ করা

অত্যন্ত দোষের। আমরা চক্ষুর দ্বারা বানান শিখি—লিখিবার সময় শুদ্ধ শব্দটীর বর্ণগুলি চোখে ভাসিতে থাকে। সুতরাং অশুদ্ধ বানান দেখাইয়া কখনই বালকের চোখ নষ্ট করিয়া দিবে না।

(৯) ঠিক এক প্রণালীতে শ্রুতলিপি শিখাইলে বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে না। মধ্যে মধ্যে শ্রুতলিপিতে শব্দ বাদ দিয়া ডাকিয়া দিবে। বালকেরা সে সমস্ত শব্দ পূরণ করিয়া দিবে। যথা ঃ—পানীয় জল———না হইলে——অসুখ হইতে পারে। ওলাউঠার——জল ও দুগ্ধের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে——সাবধান হওয়া——!
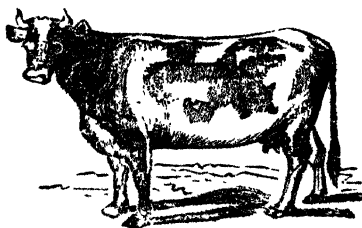
তৃতীয় প্রকরণ—ভাষাবিষয়ক।

১। সাহিত্য।

উদ্দেশ্য—(১) ভাষাবোধ অর্থাৎ লিখিত ভাষা পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দিষ্ট ভাব বুঝিবার ক্ষমতা-লাভ। (২) রচনা শক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাষাতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লাভ। (৩) বিষয় জ্ঞান অর্থাৎ নানাবিষয় সম্পর্কীয় বিবরণ পাঠ ও সেই সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, আলোচনা বা বিস্তার দ্বারা তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ। (৪) মনোবৃত্তির বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুমিতি, কার্য্য কারণাদি সম্বন্ধ বোধ, যুক্তিপ্রয়োগ শক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় যাবতীয় মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি। (৫) জ্ঞান তৃষ্ণার উদ্রেক অর্থাৎ শিক্ষণীয় বিষয় সমুদায়ের পাঠ ও আলোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কুতুহল বা অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার স্পৃহা বর্দ্ধন। (দীননাথ সেন—শিক্ষাদান প্রণালী)

সাহিত্যের শিক্ষকতা।—যে শিক্ষকের সাহিত্য বিষয়ক জ্ঞান শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকেই সীমাবদ্ধ, সে শিক্ষক সাহিত্য শিক্ষা দানের উপ

যোগী হইতে পারেন না। হেমচন্দ্রের কবিতাবলী পড়াইতে হইলে, অন্ততঃ হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী উত্তমরূপে পাঠ করা আবশ্যক। যে গ্রন্থকারের পুস্তক পড়াইতে হইবে তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক না পড়িলে, তাঁহার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। সাহিত্য ভাবের রাজ্য। সাহিত্য বিদ্যালয় পাঠ্যের প্রাণ-স্বরূপ। দর্শন, বিজ্ঞান গণিতাদি পাঠ-জনিত শ্রান্তি, সাহিত্য পাঠে বিদূরিত হয়। শিক্ষক যোগ্য হইলে, সাহিত্য পাঠের ঘণ্টায়, বালকগণকে বিদ্যালয়ের প্রাচীরাবদ্ধ কক্ষ হইতে কল্পনা ও বর্ণনার সাহায্যে মদন মোহনের প্রভাত সমীরণে', মধুসূদনের 'অশোক কাননে', হেমচন্দ্রের 'নিবীড় অরণ্যে', নবীন চন্দ্রের 'আম্রবনে' ও রবীন্দ্রনাথের 'গিরিগুহা শায়িত নির্ঝরের স্বপনে' পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারেন। শিক্ষকের ভাবের আবেগ চাই, কল্পনার স্ফুরণ চাই, ও বর্ণনার চাতুর্য্য এবং মাধুর্য্য চাই। এ সমস্ত কেবল উত্তম উত্তম গ্রন্থাদি পাঠের উপর নির্ভর করে। সাহিত্য কেবল বালকের বুদ্ধি বৃত্তির উপর নহে, তাহার সমস্ত প্রকৃতির উপর কার্য্য করিয়া থাকে। মানব-চরিত্রের বিচিত্র খেলা ও প্রকৃতির প্রহেলিকাময়ী লীলা, বালক সাহিত্য পুস্তকের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারে। তেমন সুচতুর পরিচালক হইলে, বিদ্যালয় গৃহেই কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বিদ্যা-সাগর প্রভৃতির বীজ বপন করিতে পারেন। কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি, সমাস প্রভৃতি লইয়া অপরিমিত অনুশীলন করিলে সাহিত্যের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়—সুরসাল রসশূন্য হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে এ সকলের আব-শ্যকতা আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ আছে। সাহিত্য গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট উন্নত ভাব সমূহ উপলব্ধি করাই, সাহিত্য পাঠের পৌনেষোল আনা উদ্দেশ্য। ব্যাকরণাদির আলোচনা সামান্য মাত্রই আবশ্যক। আমি পরীক্ষার কথা বলিতেছি না—সেরূপ কোন প্রয়োজন থাকিলে, পরীক্ষা ও পরীক্ষকের রীতি বুঝিয়া পৌনেষোল আনা ব্যাকরণ পড়ানও আব-

শুক হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে সাহিত্য পাঠের প্রকৃত ফল লাভ করা যায় না। উপরন্তু ব্যাকরণগত নীরস খুটীনাটী আলোচনা করিতে করিতে এরূপ কু অভ্যাস হইয়া যায় যে, সাহিত্যের প্রকৃত মাধুর্য্যের প্রতি তেমন আর লক্ষ্য থাকে না। নিম্নে সাহিত্য শিক্ষাদানের সাধারণ নিয়মাদি উল্লিখিত হইল। বিদ্যালয়ের শ্রেণী অনুসারে এই সকল প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে।

সাহিত্য শিক্ষায় লক্ষ্য।—সাহিত্য শিক্ষায় আমরা তিনটী বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া থাকি:—পাঠ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা। এই তিনটীর মধ্যে উত্তমরূপ পাঠ বা আবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। সাহিত্য পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য—শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া, সভ্য সমাজে নিজের উচ্চ উচ্চ মনোভাব উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হওয়া। এই প্রকাশের ক্ষমতা কেবল শব্দ যোজনার উপর নির্ভর করে না, কথনের প্রণালী ও ভঙ্গীর উপরও যথেষ্ট নির্ভর করিয়া থাকে। শব্দের ও বাক্যের আবশ্যকতা বিবেচনায় আমরা বাক্য কথনের সময়, শব্দ বিশেষ বা বাক্যের অংশ বিশেষ অপেক্ষাকৃত জোরে উচ্চারণ করিয়া থাকি। ইহা ভিন্ন বক্তব্য বিষয়ের ভাবের সহিত যোগ দিয়া, আমরা আমাদিগের কথার সুরও নিয়মিত করিয়া থাকি। খেদসূচক বিষয় হইলে গম্ভীর স্বরে, আনন্দের বিষয় হইলে মধুর স্বরে, বীরত্বের বিষয় হইলে তেজসূচক স্বরে বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকি। ইহাতেই বক্তব্য বিষয়ের কথন দ্বারা আমরা আমাদিগের বাঞ্ছিত ফল লাভ করি। ভিক্ষুক দ্বারে আসিয়া তেজসূচক স্বরে প্রার্থনা করিলে সে ভিক্ষা পায় না; কিম্বা করুণ স্বরে কাহাকেও তিরস্কার করিলে কোন ফলোদয় হয় না। সেইজন্য উত্তমরূপ পাঠ করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যকীয়।

পাঠ।—বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পাঠ শিক্ষা দিতে এই সকল

নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। (১) ছোট ছোট বালকেরা যখন বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে। কমা, সেমিকোলান, দাঁড়ি প্রভৃতি বিরাম বোধক চিহ্ন ব্যতীত, পাঠকালে বাক্যের অংশে অংশে, অর্থবোধে, অনেক বিরাম প্রয়োগ করিতে হয়। বিশেষণ গুলি বিশেষ্যের সঙ্গে, ক্রিয়ার বিশেষণ ক্রিয়ার সঙ্গে, সম্বন্ধ কারক তাহার সম্বন্ধীয়ের সঙ্গে, কর্ম্ম কারক তাহার ক্রিয়ার সঙ্গে একত্র পঠিত হইয়া থাকে। (বালকদিগকে যে ব্যাকরণ শিখাইয়া লইয়া, পাঠ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নহে, শিক্ষকদিগের সাহায্যার্থে এই সকল সঙ্কেত নির্দ্দেশ করা হইতেছে)। বালকদিগকে প্রথমে পড়িয়া শুনাইতে হইবে, —তাহারা অনুকরণ করিবে। কোন কোন শিক্ষককে পেন্‌সিল দিয়া এইরূপ দাগ দিতেও দেখিয়াছি। যথা :—

একদা | দুইটী দুষ্ট বালক | একটা বড় পুকুরের ধারে | অতি অসাবধানে ছুটাছুটি করিতেছিল।

এইরূপ করিয়া না পড়িয়া যদি নিম্নের বিরাম লক্ষ্য করিয়া পড়া যায় তবে অর্থবোধ হইবে না :—

একদা দুইটী | দুষ্ট বালক একটা | বড় পুকুরের | ধারে অতি | অসাবধানে ছুটা | ছুটি করিতেছিল।

দাগ দিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখি না। শিক্ষক নিজে উত্তম করিয়া পড়িয়া দিলেই বালকেরা সহজেই অনুকরণ করিতে পারিবে। তবে বিশেষ আবশ্যক হইলে, অতি নির্ব্বোধ বালকের পক্ষে, এইরূপ দাগের প্রয়োজনীয়তা হইতে পারে। তারপর বিশেষণাদি গুণবাচক শব্দের ও ভাবের যোগ রাখিয়া, কোন কোন শব্দ একটু অপেক্ষাকৃত অধিক জোর দিয়া পড়িতে হয়। যেমন এখানে 'দুষ্ট', 'বড়' ও "অতি অসাবধানে"—এই সকল শব্দের প্রতি একটু অধিক জোর দেওয়া আবশ্যক।

(২) কমা, সেমিকোলান, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্ন দেখিয়া বালকেরা থামিবে। কতক্ষণ থামিতে হইবে তাহা শিক্ষকের পাঠ শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে। কমার নিকট এক, সেমিকোলানের নিকট দুই, ও দাঁড়ির নিকট তিন গণনা করিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ থামিবে—এই নিয়মানুসারে থামিতে শিক্ষা দিলে, সহজ বিষয় কঠিন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। কোন কোন বালক আবার কমা দেখিলে হয়ত বড় করিয়া 'এক' বলিয়াও ফেলিবে। নিয়ম চাই বটে, কিন্তু বালককে নিয়ম না শিখাইয়া সেই নিয়মের কার্য্য অর্থাৎ পড়া শিখাইয়া দাও। প্রশ্ন বোধক চিহ্ন বিশিষ্ট বাক্য কিরূপ স্বরে পড়িতে হয়, তাহা অনেক বালক জানে না। এ বিষয়ে শিক্ষককে বিশেষ উপদেশ দিতে হইবে, অর্থাৎ উত্তম করিয়া পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আর বালকগণের নিকট তদ্রূপ পাঠ আদায় করিতে হইবে। আশ্চর্য্য বোধক চিহ্ন সম্বন্ধেও কিছু কিছু উপদেশ আবশ্যক।

(৩) পড়ার স্বর অত্যধিক উচ্চ বা নীচ ভাল নহে। আমরা সাধারণতঃ যে স্বরে কথা বলি, তাহাই পাঠের পক্ষে উত্তম স্বর। অনেক বালক সুর করিয়া বা ঘ্যাঙাইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই শিক্ষক এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে চেষ্টা করিবেন। খেদ সূচক অংশ অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে ও ধীরে পড়িতে হয়। বীরত্বব্যঞ্জক অংশ একটু উচ্চ ও দ্রুত পড়া রীতি। যাঁহারা উত্তমরূপ অভিনয় বা বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অভিনয় বা বক্তৃতা শ্রবণ করিলে, এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা হয়। তবে অভিনয়ে যেরূপ ক্রন্দন, হাস্য, রোষ প্রভৃতি ভাবের প্রকৃত অনুকরণ করা হইয়া থাকে, শ্রেণীস্থ পাঠে ততদূর করার রীতি নাই। কেবল ভাব বুঝিয়া পাঠের স্বর উচ্চ, নীচ, ধীর, দ্রুত বা গম্ভীর করিতে হইবে মাত্র।

(৪) পাঠের কালে ভাব অনুসারে চোখ, মুখ ও হস্তের কিঞ্চিৎ

ভঙ্গির আবশ্যক। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে পাঠ করিলে ভাবের উদয় হয় না। তাই বলিয়া যাত্রার দলের ছোকরার মত অস্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালনও বাঞ্ছনীয় নহে।

(৫) উচ্চারণের জড়তা পরিত্যাগ করাইতে হইবে। যাহারা বাল্যকাল হইতে খুব তাড়াতাড়ি কিম্বা অস্পষ্ট স্বরে পড়িতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ জড়তাযুক্ত হইয়া থাকে। শব্দ একবারে উচ্চারণ করিতে না পারিলে, শব্দের অংশ অংশ উচ্চারণ করিবে। "প্রাকৃতিক" কথা একবারে উচ্চারণ করিতে যদি জড়তা আসিয়া পড়ে, তবে 'প্রা', 'কৃ', 'তিক' এইরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া উচ্চারণ করাইয়া লইতে হইবে। বোর্ডে এইরূপ কঠিন শব্দগুলি লিখিয়া, পাঠের পূর্ব্বে বালকগণকে অভ্যাস করান মন্দ নহে।

(৬) কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ দেশজ দোষে বিকৃত হইয়া থাকে। "ভালবাসা" স্থানে 'বালবাসা', 'ধন্যবাদ' স্থানে 'দন্যবাদ', 'ঘর' স্থানে 'গর,'—এইরূপ বর্গের চতুর্থ বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোষ ছাড়াইতে হইলে, চতুর্থবর্ণযুক্ত শব্দগুলি উচ্চারণের সময়, ঐ চতুর্থবর্ণে বিশেষ জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিবে। তাহা হইলে ধীরে ধীরে এই দোষ পরিত্যক্ত হইবে। 'বড়' স্থানে বর, ও 'চাঁদ' স্থানে চাদ শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থানেও, যে বর্ণের ভুল উচ্চারণ হয়, পাঠকালে সেইটীর প্রতি সমধিক জোর দেওয়া আবশ্যক। লেখা আছে 'শোকে' কিন্তু পড়িবার সময় পড়ে 'শুকে'; 'মাছে আলো দাও' আর 'ঘরে আলু দাও'—অর্থাৎ ওকার স্থানে উকার ও উকারের স্থানে ওকার—ইহাও কোন কোন জেলার দোষ। তারপর আরও কতকগুলি উচ্চারণের বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক যথা :—অনন্ত, অভয়, অঘোর, অন্ধ, প্রভৃতি শব্দে অ কারের প্রকৃত উচ্চারণ হয়, কিন্তু অখিল, অধীন,

অধিকারী, প্রভৃতি শব্দে 'অ'কারের উচ্চারণ একটু 'ও' সংযুক্ত *। এইরূপ ব্রজেন্দ্র, ব্রজরাজ পড়িতে 'ব্র' অকার যুক্ত না হইয়া একটু 'ও'কার যুক্ত হইবে। রক্ষ, রক্ষা, অজ্ঞ, অজ্ঞতা প্রভৃতির অ ওকারযুক্ত। আবার বেল, তেল, বেত, দেড়, পেট, এবং, দেশ, মেঘ, কেবল, একদা, ছেঁড়া, দেড়া, এখানে প্রভৃতি শব্দে 'এ' কারের প্রকৃত উচ্চারণ; কিন্তু কেন, এত, দেখ, হের, এক, কেমন, যেমন, তেমন, এখন, বেড়া, তেড়া, ভেড়া, বেঁকা, বেঙ, প্রভৃতি শব্দে 'এ' কারের উচ্চারণ কতকটা 'যফলা আকার' তুল্য। 'বায়ু' উচ্চারণে 'বাউ' হইবেনা, 'বায়উ' হইবে, 'ময়ূর' উচ্চারণে 'মোয়উর' হইবে।

(৭) কি বাড়ীতে, কি স্কুলে, কি পাঠ মুখস্থের সময়, কি আবৃত্তির সময়, কোন সময়েই যেন বালক তাড়াতাড়ি ও অস্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করে। তবে একবার পাঠের রীতি উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইয়া গেলে, আর কোনরূপ বিধির আবশ্যক থাকিবে না। তখন বালকের অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বা গুণ গুণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করাতেও কোনরূপ ক্ষতির কারণ হইবে না। কিন্তু প্রথম অবস্থায়, বালকগণকে কোন সময়েই অস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে দিবে না।

(৮) কোন কোন বালক স্বভাবতঃ একটু লজ্জাশীল। এই লজ্জাবশতই অস্পষ্টরূপে ও মৃদুস্বরে পাঠ করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীতেই এইরূপ দোষ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সকল

---

* যদি অকারের পরস্থিত ব্যঞ্জনান্ত স্বর অ আ উ ঐ ও ঔ হয় তবে অকারের উচ্চারণ সম্পূর্ণ অকারের মতই হইয়া থাকে, যথা অভয়, সকল; অনাদি, সখা; অপূর্ব্ব, সম্পূর্ণ; অশেষ, নরেন্দ্র; অঘোর, মহোৎসব; অধৈর্য্য, শনৈঃ; অগৌণ, জলৌকা; ইত্যাদি। কিন্তু যদি অকারের পরস্থিত ব্যঞ্জনান্ত স্বর ই ঈ উ ঋ হয় তবে অকারের উচ্চারণ একটু ওকার যুক্ত হয়, যথা অধিকারী, বদি; অমিত্র, নদী; অরুণ, বন্ধু; অমৃত, মসৃণ ইত্যাদি। তবে ব্যতিক্রম আছে। (রবীন্দ্র বাবুর 'শব্দতত্ত্ব' পাঠ কর)।

বালককে দণ্ডায়মান করাইয়া সমস্বরে পাঠ করাইলে এই লাজুক বালকগণের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায়। লাজুক বালকেরা এইরূপ সমস্বরে পাঠের সময় উপযুক্তরূপে ও উচ্চস্বরে সকলের সহিত আবৃত্তি করিতেছে কি না, এ বিষয়ে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ অনেক বালক সমস্বরে পাঠের সময়ও তাহাদিগের লজ্জাশীলতার বশে, মৃদুস্বরে ও অস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিয়া থাকে।

(৯) বিদ্যালয়ের জন্মদিনে বা পুরস্কার বিতরণ দিনে বা গ্রীষ্মের বন্ধ কি পূজার ছুটীর পূর্ব্ব দিনে, কোন কোন বিদ্যালয়ে সভা হইয়া থাকে। এই সভায় সাধারণের সমক্ষে আবৃত্তি করাতে বালকগণের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও উত্তমরূপ আবৃত্তি করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র "কথোপকথনের" অভিনয় করা যাইতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ বসুকৃত "ভারতের মানচিত্র দর্শন" ও শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কৃত "একলব্যের গুরুদক্ষিণা" বিদ্যালয় অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী। (কিণ্ডারগার্টেন পরিচ্ছেদে আবৃত্তি ও অভিনয়ের অংশ দেখ) উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ "মেঘনাদ বধের" বা "পলাশীর যুদ্ধের" কোন অংশ অভিনয় করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে রবীন্দ্র নাথ, মানকুমারী, গিরীন্দ্র মোহিনী, গোবিন্দ চন্দ্র দাস কৃত গ্রন্থাবলীতে যথেষ্ট আবৃত্তির উপযুক্ত কবিতা আছে। কলিকাতার নীতি বিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রচারিত 'সঙ্গীত মুকুল' নামক পুস্তকে বালকগণের আবৃত্তির উপযোগী অনেকগুলি কবিতা ও সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তমরূপ ভঙ্গীর সহিত এগুলি আবৃত্তি করিতে পারিলে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত শিক্ষকের কর্ত্তব্য যে, তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন সদ্‌গ্রন্থ বালকগণকে পড়িয়া শুনান। শিক্ষককে উত্তমরূপ পাঠক হইতে হইবে।

(১০) শ্রেণীতে পর পর পাঠের যে রীতি আছে, তাহা সুফলপ্রদ নহে। প্রথম বালক যখন পড়িতে আরম্ভ করে, তখন দ্বিতীয় বালক প্রথম বালকের পড়া না শুনিয়া নিজের যে অংশ পড়িতে হইবে, তাহাই আন্দাজ করিয়া মনে মনে অভ্যাস করিতে থাকে। এইরূপ

তৃতীয়, চতুর্থ হইতে শেষ বালক পর্য্যন্ত সকলেই একটা আন্দাজ করিয়া নিজ নিজ অংশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। সুতরাং কে কিরূপ পড়িল তাহার দিকে মনোযোগ থাকে না। এক জনের পাঠের পর অন্য কাহাকে যে পড়িতে হইবে, তাহা যেন বালকেরা পূর্ব্ব হইতে না জানিতে পারে। শিক্ষক যে কোন বালককে পড়িতে বলিতে পারেন। তারপর উপরিস্থ বালকের ভুল ধরিয়া নিম্নের বালক উপরে উঠিতে পারে, বিদ্যালয়ের এইরূপ রীতি আছে। ইহাতে শ্রেণীর বালকগণ নিবিষ্টচিত্তে কেবল ভুল ধরিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে। বালক পড়িল

> একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
> কাঁদেন বাঘের বাচ্চা আঁধার কুটীরে
> বিবরে, ইত্যাদি।

নিম্নের বালক বলিয়া উঠিল 'বাঘের বাচ্চা' নয় "রাঘব বাঞ্ছা" আর উপরে গিয়া বসিল। শিক্ষকও ইহাতেই তুষ্ট হইলেন। দৃষ্টি শক্তির দুর্ব্বলতা বা অর্থবোধের অভাবে কোন বালকের পক্ষে এরূপ পড়া অসম্ভব নহে, কিন্তু 'বাঘের বাচ্চা', 'রাঘব বাঞ্ছা' হইলেই বিশুদ্ধ পাঠ হইয়া গেল না। আমরা কেবল বালকগণকে ভুল ধরিতেই শিক্ষা দিয়া থাকি, কিন্তু গুণের সুখ্যাতি করিতে শিক্ষা দিয়া থাকি না। বালকেরা পুস্তক বন্ধ করিয়া চক্ষু বুঁজিয়া বসিয়া থাকুক—আর কাহার পড়া কেমন মধুর ও ভাব-ব্যঞ্জক হইতেছে তাহাই লক্ষ্য করুক—দোষ অপেক্ষা গুণ দেখিতে অভ্যাস করুক। এইরূপে গুণের আলোচনা করিতে করিতে নিজের দোষ অলক্ষিতে সংশোধিত হইয়া যাইবে। শব্দ পাঠের ভুল সংশোধনের কিঞ্চিৎ আবশ্যকতা আছে বটে; কিন্তু প্রকৃত ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ, স্বর অবস্থানুযায়ী হ্রস্ব, দীর্ঘ করিয়া যে পাঠ করা হয় তাহাই উত্তম পাঠ। পাঠের এই সর্ব্ব প্রধান বিষয় বালক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে কি না দেখিতে হইবে। শিক্ষকের নিজেরও উচিত, পাঠ্য পুস্তকের লাইনের প্রতি চক্ষু

না রাখিয়া, বালকগণের পড়ার দিকে কাণ রাখা। তাহা হইলে কাহার পড়া কিরূপ সুন্দর হইতেছে, তাহা বিচার করিতে সক্ষম হইবেন।

শব্দার্থ।—অভিধানের সাহায্যে শব্দার্থ শিক্ষা করা উত্তম পদ্ধতি বটে। কিন্তু ছোট ছোট বালকেরা একে অভিধানে খুঁজিয়া শব্দ বাহির করিতে জানে না, আর তাহা জানিলেও, অভিধান লিখিত শব্দের বহু অর্থের মধ্যে কোন অর্থটী পাঠ্য অংশের উপযোগী তাহা স্থির করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং এই শ্রেণীর বালকদিগকে শব্দের অর্থ শিখাইয়া দিতে হয়। শব্দার্থ শিক্ষা দিতে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে :—

(১) যে সকল শব্দ বালকেরা সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে ও যাহার অর্থ বা ভাব তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার অর্থ বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেক অর্থ পুস্তকে এইরূপে সমস্ত শব্দের অর্থ লেখাতে, বার পয়সার পুস্তকের 'অর্থপুস্তকের' দাম বার আনা হইয়া থাকে। কোন অর্থ পুস্তকে দেখিয়াছি, আমি=নিজে, তুমি=যাহার সহিত কথা বলা হইতেছে, কাঁদিতেছে=অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, এইরূপ প্রায় সকল কথারই অর্থ লেখা হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এইরূপ অর্থপুস্তক কিনিতে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। আবার তিনি নিজেও এইরূপ অর্থ পুস্তক খুলিয়া, নির্দ্দিষ্ট পাঠের অর্থগুলি বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের অর্থ-শিক্ষা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ অনাবশ্যকীয় কার্য্যে সময় নষ্ট করাতেই বালকগণ নিম্নশ্রেণীতে সমস্ত দিন রাত্র খাটিয়াও পড়া মুখস্থ করিয়া উঠিতে পারে না।

(২) বালকেরা যে অংশ পাঠ করিতেছে সেই অংশের ভাব বুঝিতে পারিতেছে কি না ইহাই দেখিতে হইবে। সেই ভাব বুঝিতে যে সকল শব্দের অর্থের প্রয়োজন, কেবল তাহাই শিখাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ শব্দার্থ শিক্ষা দিবার প্রণালী সাধারণতঃ পাঁচটী :

(ক) ভঙ্গীর দ্বারা; (খ) দ্রব্য বা তাহার আদর্শ ও চিত্রের দ্বারা; (গ) দৃষ্টান্ত দ্বারা (ঘ) প্রতিশব্দের দ্বারা (ঙ) শব্দ ব্যাখ্যা দ্বারা। কিন্তু প্রত্যেক নূতন শব্দ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য রচনার দ্বারা সেই শব্দের ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে।

(ক) "তাঁহারা তখন আহার করিতেছিলেন"—হাতের দ্বারা আহারের মত ভঙ্গী করিলেই বালক 'আহারের' অর্থ বুঝিয়া লইবে। এইরূপ চক্ষুর সাহায্যে বালকেরা যাহা শিক্ষা করে, তাহা তাহাদিগের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুই শিক্ষাকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে। (খ) "ঈগল পক্ষী ছাগল ধরিয়া লইয়া গেল"—এখানে 'ঈগল=পক্ষী বিশেষ' বলিলে বালকদিগের ঈগল বিষয়ক কোন জ্ঞান হইবে না। একখানি ঈগলের ছবি দেখাইয়া তাহার সম্বন্ধে দুচারিটী কথা বলিয়া দিলে বালক ঈগল পাখীর কথা বেশ আনন্দের সহিত মনে করিয়া রাখিবে। "কাঠের দ্বারা খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়"—খাট অনেক বালক দেখিয়া থাকিতে পারে, পালঙ্ক অনেকেই দেখে নাই। বোর্ডের উপর পালঙ্কের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। (গ) "আটাল, বালি ও পলি মাটীর মধ্যে, কোন্ ফসলের পক্ষে কোন্‌টী উপযোগী ইত্যাদি"—তিন রকমের মাটী পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। পাঠের সময় বালকদিগকে ঐ সকল দেখাইতে হইবে। (ঘ) যে সকল দ্রব্য বা বিষয় সম্বন্ধে বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞান আছে সে সকল দ্রব্যাদি-প্রকাশক-শব্দের প্রচলিত প্রতিশব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে যথা—"মাতঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রণয়" প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'হাতী', 'কালরং' ও 'ভালবাসা' বলিলে চলিতে পারে। অথবা কেবল বালকের শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে "কলা, কাজ, কুয়াসার" পরিবর্ত্তে 'কদলী, কার্য্য, কুজ্‌ঝটিকা' শব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কঠিন প্রতিশব্দ যেন একদিনে বেশী শিক্ষা দেওয়া না হয়, আর যে সকল শব্দের প্রতিশব্দ বালকগণের ব্যবহারে আসিতে পারে, কেবল তাহাই যেন শিক্ষা দেওয়া হয়। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে দৈনিক এইরূপ প্রতিশব্দ ২।৩টী, উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীতে ৩।৪টী ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে ৪।৫টীর অধিক শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহারও শিক্ষা দিতে হইবে। "বানর কলা খাইতেছে, বানর রম্ভা বড় ভাল-বাসে;—শীতকালে কুয়াসা হয়, কুজ্‌ঝটিকায় আঁধার হয়"—ইত্যাদি রূপ বাক্য রচনা করিয়া বালকগণ শব্দ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহার শিক্ষা করিবে। শিক্ষক

প্রথমে দুই একটী বাক্য রচনা করিয়া আদর্শ দেখাইয়া দিবেন। ৫। মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে প্রতিশব্দ শিক্ষা দিবার সময় মধ্যে মধ্যে অমরকোষ প্রভৃতি হইতে এক আধটা শ্লোক বা শ্লোকাংশ বলিয়া দিলে বালকেরা আগ্রহের সহিত মনে করিয়া রাখিবে। এইরূপে প্রয়োজনীয় কতকগুলি শব্দের (যথা—চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, জল, বায়ু ইত্যাদি) প্রতিশব্দ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যকও বটে। উত্তম গদ্য রচনায় ও পদ্য রচনায় এ সকলের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। (৬) "বায়ু অতি স্বচ্ছ পদার্থ"—এখানে স্বচ্ছ কথার প্রতিশব্দ বলিয়া দিলে বালক কিছুই বুঝিতে পারিবে না। 'প্রকৃতিবাদ' অভিধানে স্বচ্ছ কথার এই সকল অর্থ লিখিত আছে—"স্বচ্ছ, নির্ম্মল, শুভ্র, পরিষ্কার" কিন্তু এখানে এই সকল প্রতিশব্দের কোন কথার দ্বারাই গ্রন্থকারের ভাব পরিস্ফুট হইবে না। "যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়" বলিলেও বালক উত্তমরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায়, ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখা যায়, তবে কি জানালা ও ছিদ্র 'স্বচ্ছ'? এই সকল শব্দ শিক্ষায় শিক্ষকের নিজের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এখানে দ্রব্যের সাহায্যে বালকের মনে স্বচ্ছের ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। একটু জলের ভিতর একটা পয়সা ফেলিয়া দেখাও পয়সা দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুধের বাটীর ভিতর পয়স' ফেলিলে দেখা গেল না। জল স্বচ্ছ। একখানা কাচের অপর পার্শ্বে একটা কলম রাখিয়া দেখাও যে কলম বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু স্লেটের অপর পার্শ্বে রাখিলে দেখা গেল না। কাচ স্বচ্ছ। কাচ অপরিষ্কৃত হইলে কি জল ঘোলা হইলে তেমন স্বচ্ছ থাকে না। ধোঁয়া কি কুয়াসা যুক্ত হইলে বায়ুও তেমন স্বচ্ছ থাকে না। খুব কুয়াসা হইলে অল্প দূরের লোকও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরিষ্কার বায়ু স্বচ্ছ বলিয়া আমরা অনেক দূরের পদার্থও দেখিতে পাই। ভাববাচক ও গুণবাচক শব্দগুলি, সেই গুণ বা ভাবযুক্ত বস্তুর সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। "কৃষ্ণবর্ণ" শব্দের অর্থে, বর্ণের অভাব বলিলে বালকের কালবর্ণের বোধ হইবে না। কাল বস্তু দেখাইয়া 'কাল' বুঝাইতে হইবে।

(৩) উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে সন্ধি, সমাসযুক্ত শব্দ গুলির বিভাগ করিয়া অর্থ শিক্ষা দিতে হইবে। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়া দিলে শব্দ বুঝিতে বালকগণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। বালকগণের মোটামুটি রকমের তদ্ধিত কৃতের জ্ঞান

থাকা বাঞ্ছনীয়। অনেক স্থলে কেবল মৌখিক আলোচনায় বালকগণকে এগুলি বেশ শিখিতে দেখা যায়। শিক্ষক যদি অভিধান দেখিয়া প্রস্তুত হইতে না পারেন তবে তিনি অর্থ পুস্তক ক্রয় করিবেন। যেরূপ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

পুত্র=পুৎ নরকবিশেষ, ত্রৈ ত্রাণ করা—যে শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে, সেই পুত্র।—(পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ)

শ্মশান='শ্ম' শব, 'শান' শয়নস্থান। শব অর্থাৎ মৃত দেহের শয়নের স্থান। (শ্ম শব্দেন শবঃ প্রোক্তঃ শানং শয়ন মুচ্যতে)

দুর্ভিক্ষ='দুর' অভাব, 'ভিক্ষা' ভিক্ষার পদার্থ।—যে সময়ে ভিক্ষার পর্য্যন্ত অভাব অর্থাৎ পাওয়া যায় না। (ভিক্ষায়াঃ প্রায়ো দুষ্প্রাপ্যত্বং)

(৪) নূতন শব্দগুলি শিক্ষা দিবার সময় বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে পুনরালোচনার সময়, সেই শব্দগুলির প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যাভাগ পুঁছিয়া ফেলিয়া, কেবল শব্দ কয়েকটী রাখিতে হইবে। পরে একটী একটী শব্দ (দর্শনীর বা পয়েণ্টার দ্বারা) নির্দ্দেশ করিয়া বালকগণের নিকট সেই সকল শব্দের প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা আদায় করিতে হইবে।

(৫) অর্থ পুস্তকের কোন আবশ্যকতা নাই। শিক্ষক মুখে মুখে শিখাইয়া দিলেই বালকগণের বেশ মনে থাকিবে। পুরাতন পাঠ মধ্যে মধ্যে পুনরালোচনা করিলে, বালকগণ শব্দার্থ আর কখনই ভুলিবে না। কেবল নূতন নূতন কথারই প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, সদা ব্যবহৃত বা পূর্ব্ব পরিচিত শব্দের কোনরূপ অর্থাদি শিক্ষার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যহ ৩।৪টী নূতন শব্দ শিক্ষা করিতে বালকগণ কোনই ক্লান্তি বোধ করিবে না, কিন্তু অর্থ পুস্তকে লিখিত ভূরি ভূরি অনাবশ্যকীয় কথার অর্থ মুখস্থ করিতে গেলে, বালকগণের

যথেষ্ট কষ্ট হইবে ও ততোধিক বিরক্তি জন্মিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "যদি বালকগণ সেই ৩।৪টী শব্দের অর্থ খাতায় লিখিয়া রাখে তাহা হইলে কেমন হয়?" মন্দ হয় না, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীতে অর্থাৎ নিম্ন প্রাইমারী হইতে উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত এরূপ খাতা না করিলেও ক্ষতি নাই। এই সমস্ত শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকাদি কম। সুতরাং শিক্ষক যথেষ্ট পুনরালোচনার দ্বারাই বালকগণকে সমস্ত বিষয়ে উত্তমরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। বালকের কাজ বাড়াইয়া তাহার খেলার সময় কর্ত্তন করা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা।—বালকগন, পাঠ্য পুস্তক লিখিত প্রবন্ধ বা আখ্যায়িকার কোন কঠিন অংশের ভাব বুঝিতে না পারিলে ব্যাখার আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রবন্ধে এইরূপ কঠিন (বালকের পক্ষে) অংশের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়, সে প্রবন্ধ, সে শ্রেণীর বা সে বালকের পক্ষে উপযোগী নহে। প্রতি পৃষ্ঠায় একটী কঠিন অংশ, বিশেষ দোষজনক নহে। কিন্তু ইহার অধিক হইলে বালকগণ পাঠের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে।

(১) বিশেষ কঠিন ভাবযুক্ত কোন প্রবন্ধ পড়াইবার পূর্ব্বে সরল ভাষায় সেই প্রবন্ধের ভাব বালকগণকে বলিয়া দিলে, তাহারা প্রবন্ধ পাঠে তত কষ্টবোধ করিবেনা। কোন আখ্যায়িকার অংশ বিশেষ (যেমন অনেক গ্রন্থে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে) পড়াইতে হইলে তাহার পূর্ব্বভাগ বালকগণকে পাঠের পূর্ব্বে বলিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে বালকগণ সহজে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু পূর্ণ আখ্যায়িকার আভাস পূর্ব্বে দিলে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, কেহ কেহ গল্পের আভাস পূর্ব্বে বলা যুক্তি যুক্ত মনে করেন না। এবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। আখ্যায়িকার কাঠিন্য, বালকগণের বুদ্ধিবৃত্তি ও শিক্ষকের শিক্ষা

কৌশলের উপর এ সমস্তই নির্ভর করে। শিক্ষক এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, পূর্ণ গল্পের আভাস পূর্ব্বে দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন। এ বিষয় কোনরূপ বাঁধাবাধি নিয়ম নাই।

(২) বালকগণ গল্পের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি না তাহা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বা পাঠের শেষে ধারাবাহিক প্রশ্নের দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষক এরূপ প্রশ্নাদির প্রণালী বুঝিতে পারিবেন :—

"রাজা দশরথের চার পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম রাম ইত্যাদি"—প্রশ্ন, কাহার চার পুত্র ছিল? রাজা দশরথের কয় পুত্র ছিল? জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি? রাজা দশরথের বড় ছেলের নাম কি? ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বালকগণ পাঠের বিষয় বুঝিয়াছে। বালকগণের নিকট উত্তরগুলি পূর্ণ বাক্যে আদায় করিতে হইবে। নিম্নশ্রেণীতে ইহাই যথেষ্ট ব্যাখ্যা।

(৩) উচ্চ শ্রেণীতে (উঃ প্রাঃ হইতে) বালকেরা গল্পের বা প্রবন্ধের সারাংশ নিজ ভাষায় রচনা করিয়া মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিবে। সম্পূর্ণ গল্প বা প্রবন্ধ বৃহৎ হইলে শিক্ষক তাঁহার অংশবিশেষ লিখিতে বা বলিতে আদেশ করিতে পারেন। বালকেরা বলিতে বা লিখিতে না পারিলে, তাহাদিগের স্মরণশক্তির সাহায্যার্থ, বোর্ডে সূচিপত্রানুযায়ী বিষয়ের অংশসমূহ লিখিয়া দিবে। সেই সূচিপত্র অনুসরণ করিয়া বালকেরা গল্প বা প্রবন্ধ রচনা করিবে। প্রবন্ধের অন্তর্গত উত্তম উত্তম শব্দ বা বাক্যাংশ বোর্ডে লিখিয়া, সেগুলি বালকগণকে নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে আদেশ করিলে, নূতন শব্দ শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা হইবে।

(৪) কোন প্রবন্ধাদিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা কোন প্রসিদ্ধ গল্প বা আখ্যায়িকার বিবরণ ঘটিত কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকিলে, শিক্ষক

সেই বিষয়টী সংক্ষেপে ছাত্রগণকে বলিয়া দিবেন ও বালকগণ যাহাতে স্বীয় রচনাতে ঐ বিবরণ বিবৃত করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

(৫) কোন অংশ বালকগণের পক্ষে কঠিন ভাববিশিষ্ট হইলে, শিক্ষক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন বা উত্তম কৌশল-সম্পন্ন প্রশ্নের দ্বারা বালকগণের দ্বারাই সেই ভাব উদ্ধার করাইয়া লইবেন; যথাঃ—

"জীবন মরণের সমষ্টি মাত্র,"—এই অংশের ভাব বুঝাইয়া দিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রকার প্রশ্নের দ্বারা বালকগণকে ভাব-উপলব্ধি বিষয়ে সাহায্য করা যাইতে পারেঃ—

প্রঃ। মানুষের আয়ু কতদিন?

উঃ। ৬০।৬৫ বৎসর।

প্রঃ। এ ৬০।৬৫ বৎসর পরে কি হয়?

উঃ। মানুষের আয়ু শেষ হইয়া যায়।

প্রঃ। আয়ু শেষ হইলে কি হয়?

উঃ। মানুষ মরিয়া যায়।

প্রঃ। তোমার বয়স কত?

উঃ। ১৪ বৎসর।

প্রঃ। মনে কর তোমার যদি ৬৪ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু থাকে, তবে তোমার আর কতদিন আয়ু আছে?

উঃ। ৫০ বৎসর।

প্রঃ। তাহ'লে তোমার আয়ুর ১৪ বৎসর শেষ হইয়াছে? আয়ু শেষ হওয়ার নামই যদি মৃত্যু হয়, তবে তোমার সম্পূর্ণ মৃত্যু না হউক ১৪ বৎসরের মত মৃত্যু হইয়াছে। আগামী বৎসর আর এক বৎসরের মৃত্যু হইবে বা আয়ু শেষ হইবে। এইরূপ এক এক বৎসরের আয়ু শেষ হইতে হইতে, একে একে সমস্ত আয়ুই ফুরাইয়া যাইবে। তা হলেই এই একটু একটু মৃত্যু সমষ্টিকেই, আমরা জীবন বলিয়া থাকি ইত্যাদি। (ছাত্রদিগের বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় ইহা ছাড়া আরও অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইতে পারে বা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝান আবশ্যক হইতে পারে।)

(৬) পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের অন্তর্গত উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হয়। এইরূপ লিখিত ব্যাখ্যা দীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। গ্রন্থকারের উহ্য ভাব পরিস্ফুট করাই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। শব্দ পরিবর্ত্তনের নাম ব্যাখ্যা নহে। এমন কি অনেক সময় ব্যাখ্যায় শব্দ পরিবর্ত্তনেরও আবশ্যক হয় না। শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক সময় বালকেরা লেখকের সুনির্ব্বাচিত শব্দের পরিবর্ত্তে কতকগুলি বিশ্রী শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কদর্য্য ভাষার সৃষ্টি করিয়া বসে। ইহাতে ব্যাখ্যা না হইয়া বরং ব্যাভিচার হয়।

"প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষা ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর ভয়ঙ্কর।" এই অংশের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে, ছদ্মবেশী বন্ধু যে কেন অধিকতর ভয়ঙ্কর তাহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে। 'প্রকাশ্য' 'শত্রু,' 'ছদ্মবেশী' বন্ধু' প্রভৃতি কথা পরিবর্ত্তন না করিলেও চলিতে পারে। যথা—"প্রকাশ্য শত্রু প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই তাহার হস্ত হইতে নিজকে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি বন্ধুর ভাণ করিয়া প্রথমে বিশ্বাসী হয় ও পরে গোপনে শত্রুতা সাধন করে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কোনই উপায় নাই। এই জন্য ছদ্মবেশী বন্ধু অধিকতর বিপদজনক।"

পরীক্ষার কাগজে সাধারণতঃ এই পরিমাণ ব্যাখ্যা লিখিলেই চলিতে পারে। কোন কোন পরীক্ষক বলেন যে তাঁহারা মুদ্রিত এক লাইনের ব্যাখ্যায়, পরীক্ষা-কাগজ-লিখিত ৫ লাইনের অধিক লম্বা ব্যাখ্যা পছন্দ করেন না। তবে যে অংশের ব্যাখ্যা করিতে হইবে তাহাতে ভাবের সংক্ষেপত্ব অধিক হইলে, কোন লাইনের ব্যাখ্যায় ৭।৮ লাইনও লেখা যাইতে পারে। ফলকথা খুব লম্বা ব্যাখ্যা পরীক্ষা কাগজে বর্জ্জনীয়।

সময় সময় পাঠ্যপুস্তকান্তর্গত কোন কোন অংশ বালকদিগের নিকট ব্যাখ্যা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। যথা—"ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ" বা "আমরা যাহা করি ও ভাবি ঈশ্বর তাহা জানিতে পারেন"। এইরূপ অংশ, বস্তু বা সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইবার উপায় নাই। এখানে বালকদিগের মনে একটা অন্ধবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে

হইবে। 'লজ্জাবতী-লতা' হইতে "সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে, মেঘে ঢাকা" ইত্যাদিরূপ অংশের ভাবও ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীর ১২।১৪ বৎসরের বালকের সহজ বোধগম্য নহে। এখন উপর উপর ভাব গ্রহণ করিয়া যাউক, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্ত ভাবের মধ্যে আপনা হইতেই নিগূঢ় ভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে। বালকদিগকে যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দিতে হইবে, আর যাহা তাহারা বুঝিতে অক্ষম, তাহা জানিবার জন্য তাহাদিগের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে।

সাহিত্যে ব্যাকরণ।—দুচারিটী ব্যাকরণের কথা মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করা মন্দ নহে। যে সকল শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়ান হয় না, সে সকল শ্রেণীতে (যথা নিঃ প্রাঃ শ্রেণী) বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এ সকল বিষয়ের সূত্র শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই, কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয় বোধ করাইয়া দেওয়াই আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যের তালিকায় ব্যাকরণের কথা উল্লিখিত না থাকিলেও, ব্যাকরণের ঐ সকল স্থূল বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ইহাতে উত্তম ভাষার কতকগুলি প্রধান লক্ষণের পরিচয় হইয়া থাকে। আর ঐ সকল বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়াও কঠিন ব্যাপার নহে। উচ্চ শ্রেণীতে সময় মত সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ প্রভৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগকে অভিধান দেখিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। একটী কঠিন কথা পাইলেই শিক্ষক যে কোন বালককে সেই শব্দের অর্থ বাহির করিতে আদেশ করিবেন। শব্দের বহু অর্থ লেখা থাকে। কোন্ অর্থ পাঠের সহিত মিলিবে, তাহা বালকেরাই প্রথমে নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবে। অভিধানে কেমন অকারাদি ক্রমে কথা গুলি সাজান থাকে, তারপর আকার, ইকার, ও ককারাদি ক্রমে কলাগুলিই বা কোনটার পর কোন্টা লিখিত থাকে, তাহা দুচার দিন

বালকগণকে শিক্ষা দিলেই তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে। না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করাইলেই বালকেরা অভিধান ব্যবহার করিতে শিখিবে। শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক ছাড়া, বালকগণকে অন্যান্য পুস্তক পড়িতেও উৎসাহিত করিতে হইবে। স্বদেশী বা বিদেশী যে কোন ভাষায়ই হউক অনেক গ্রন্থাদি পাঠ না করিলে, সে ভাষায় কখনই অধিকার জন্মে না। কেবল বিদ্যালয়ের পাঠ্য পড়িয়া কেহ কখন কোন ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন নাই।

যে বিষয় পড়াইতে হইবে সেই বিষয় সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি, অন্যান্য পুস্তক হইতে পড়িয়া রাখিলে শিক্ষকের শিক্ষাদান শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। অভিধানাদি দেখিয়া, অন্যান্য পুস্তক হইতে বিষয়ান্তর্গত বিবরণাদির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া, পাঠ্য পুস্তকের বিষয় উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া আসিলে, শিক্ষক বালকগণের যথেষ্টরূপ মনাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন ও বালকগণেরও প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। 'পাঠনারনোট' পরিচ্ছেদে সাহিত্য শিক্ষাদানের পদ্ধতির আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রেণীর উপযোগিতা অনুসারে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া নোট প্রস্তুত করিতে হইবে। তবে এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোন বিশেষ প্রণালীর দাস হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। মধ্যে মধ্যে প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে।

সাহিত্য পাঠনার আদর্শ।—সাধারণতঃ সাহিত্য পাঠনায় বিদ্যালয়ে এই কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে :—(১) পাঠ (২) শব্দার্থ (৩) ব্যাখ্যা (৪) পাঠ সংসৃষ্ট ব্যাকরণাদি। কোন কোন শিক্ষক প্রথমে শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাদি শিক্ষা দিয়া পরে পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে প্রবন্ধের অর্থ বোধ হইলে পাঠ সহজেই সুন্দর হয়। কেহ কেহ প্রথমেই পাঠ শিক্ষা দেওয়া সুবিধাজনক মনে করেন। যাহা হউক কিরূপে পাঠ শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা এখন

লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না, তখন আর এ বিষয়ে তর্কযুক্তি প্রদর্শন বৃথা। তবে কেমন করিয়া শব্দার্থ ব্যাখ্যা প্রভৃতির শিক্ষা দিতে হইবে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল।

নিম্ন প্রাথমিকের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী উপলক্ষ করিয়া এই পাঠনার আদর্শ রচিত হইয়াছে। নিম্ন প্রাথমিকের বালকদিগকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। প্রকৃত ব্যাখ্যা তত সহজ জিনিষ নয়, নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রের আয়ত্তের বাহিরে। যদি শব্দের অর্থ, বাক্যের ভাব এবং সর্ব্বোপরি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে, তবেই তাহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।

(নিম্নলিখিত 'পাঠনার আদর্শ' ভূদেব বাবুর "শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব" হইতে গৃহীত হইল। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আদর্শ আর কোথায় পাইব ?)

শিক্ষক।—পড়।

বা। "এই ভূমণ্ডলে এবম্বিধ বহুতর ক্ষুদ্রজীব জন্তু আছে, যে তাহারা মানব জাতির কখন কোন অপকার করেনা" (নীতি বোধ)

শি। ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ কি ?

বা। ভূমণ্ডল শব্দের অর্থ পৃথিবী। (বালক না পারিলে শিক্ষক বলিয়া দিবেন ও বোর্ডে লিখিবেন)

শি। এবম্বিধ ?

বা। এমন—এই প্রকার। (বোর্ডে লিখন)

শি। এবম্বিধের বিপরীত অর্থ বুঝায়, এমন শব্দ কি ?—এবম্বিধ মানে এই প্রকার—তাহার বিপরীত অর্থাৎ এই প্রকার নয়—অন্য প্রকার ?

বা। অন্য প্রকার—অন্যবিধ। (বোর্ডে লিখন)

শি। মানব জাতি বলিলে মনুষ্যের কোন জাতি বুঝায় ? ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ?

বা। মানব জাতি বলিলে মানুষের সকল জাতিকেই বুঝায়।

শি। তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাকে কি জাতি ভেদ বলেনা ?

বা। হাঁ, তাহাকেও জাতি ভেদ বলে।

শি। হিন্দু, ইংরাজ, মোগল, পাঠান—ইহাদিগের মধ্যে যে প্রভেদ?

বা। তাহাকেও জাতিভেদ বলে।

শি। তবে যখন সমুদায় মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়, তখন মনুষ্যের সহিত কাহার প্রভেদ করিয়া ঐরূপ কহা যায়?

বা। তখন অন্য জীব জন্তুর সহিত প্রভেদ করিয়া মনুষ্যকে এক জাতি বলা যায়।

শি। অন্য জীব জন্তুর সহিত ভেদ করিয়া সমুদয় মনুষ্যকে এক জাতি কহে; মনুষ্যের মধ্যেও পরস্পর প্রভেদ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির নাম হয়; আর আমরা এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং এক ভাষা ভাষী, আমাদিগের মধ্যেও যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভেদ তাহার নামও জাতিভেদ। কিন্তু ইহার আর একটী নাম আছে, জান?

বা। (নিরুত্তর)

শি। ইহাকে বর্ণ ভেদও বলে। আচ্ছা, অপকার শব্দের অর্থ কি?

বা। অপকার অর্থ অনিষ্ট, মন্দ, হানি। (বোর্ডে লিখন)

শি। অপকারের বিপরীত কি?

বা। উপকার। (বোর্ডে লিখন)

শি। আচ্ছা, তুমি পড়িলে—"আমাদিগের কখন কোন অপকার করেনা, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অনেক আছে"—'কখন' অপকার করে না কি?

বা। কখন অপকার করেনা—অর্থাৎ কোন সময়ে একটুও হানি করেনা।

শি। তবে কখন কখন অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে? তাহার দুই একটীর নাম বল।

বা। বিছা—বোলতা—ভিমরূল।

শি। হাঁ, বৃশ্চিক, বরটা, ভৃঙ্গ (বোর্ডে লিখন)। ইহারা কোন্ সময়ে আমাদিগের অপকার করে?—ইহারা কখন হানিকর হয়?

বা। উহাদের গায়ে হাত দিলেই উহারা কামড়ায়।

শি। গায়ে হাত দিলে উহারা কামড়ায় কেন, বলিতে পার?

বা। উহারা ভয় পায়। উহাদের লাগে।

শি। ভয় পায় অথবা ক্লেশ হয় এই জন্যই উহারা দংশন করে; আর উহাদিগকে ভয় বা ব্যথা না দিলে উহারা দংশন করেনা। তবে গোবিন্দ, তোমার নিকট

সে দিন যে বোলতাটী আসিয়াছিল তাহাকে কি জন্য মারিতে উদ্যত হইয়াছিলে?

বা। পাছে আমাকে কামড়ায় এই জন্যই মারিতে গিয়াছিলাম।

শি। অতএব যে সকল জন্তু কখন কখন আমাদিগের অনুপকার করিতে পারে, আমরা অগ্রেই তাহাদিগকে মারিতে বা স্থানান্তর করিতে উদ্যত হই। আচ্ছা,—"কখন কোন অপকার করেনা"—'কোন অপকার' কি?

বা। একটুও অপকার করেনা।

শি। অর্থাৎ অল্প মাত্রায়ও অপকার করেনা। তা হ'লে অল্প অল্প অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তু আছে?—কয়েকটীর নাম করত?

বা। মশা, মাছি, উকুণ।

শি। হাঁ, মশক, মক্ষিকা, মৎকুণ (বোর্ডে লিখন)—ইহারা মানুষের উৎপাৎ করে—এইজন্যই মনুষ্যেরা ইহাদিগকে নষ্ট করে। আচ্ছা, কখন কখন অপকার করে এমন ক্ষুদ্র জন্তুর নাম করিয়াছ, আর অল্প মাত্রায় অনিষ্ট করে এমন কতকগুলির নাম করিলে, এখন কখন কোন অপকার করেনা এমন দুই একটী ক্ষুদ্র জন্তুর নাম করত?

বা। এমন অনেক আছে, নাম জানিনা।

শি। প্রাণী-বিদ্যা বলিয়া একটী শাস্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে নানারূপ জীব জন্তুর আকার প্রকার, নাম, ব্যবহার জানিতে পারিবে। আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে অনপকারী এমন দুই একটীর নাম তোমাদিগের জানা আছে—এইক্ষণে স্মরণ হইতেছেনা—একটীর নাম প্রজাপতি—প্রজাপতি কখন আমাদিগের কোন অপকার করেনা—আর উহার কি মনোহর দৃশ্য—কি কোমল শরীর! যাহারা উহাদের পক্ষচ্ছেদ করিয়া দুর্দ্দশা করে তাহারা কি নিষ্ঠুর!

বা। গঙ্গাফড়িঙ কখন কাহারও মন্দ করেনা।

শি। প্রজাপতি এবং গঙ্গাফড়িঙ—দুইটী হইল।

বা। আর্শুলা।

শি। (একটী বালক আর্শুলায় গরল হয় বলিলে, ঈষৎ হাস্য সহকারে) তবে তিনটী হইলনা।

বা। টিকটিকি।

শি। এই তিনটী হইল।—এইরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ আছে। ভাল, জিজ্ঞাসা

করি, যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণী কখন কখন মনুষ্যের অপকারী হয়, মনুষ্যেরা ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগকে বিনাশ করে; আর যাহারা সর্ব্বদা অল্প অল্প বিরক্ত করে, সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকেও আমরা মারিয়া ফেলি; কিন্তু প্রজাপতি প্রভৃতি যে গুলি কোন অনিষ্ট করে না, বালকেরা উহাদিগকে কেন যন্ত্রণা দেয় আর বিনাশ করে?—এই নিষ্ঠুরতা বালক-দিগের কিসের দোষ?

বা। উহা তাহাদিগের স্বভাবের দোষ।

শি। ঠিক বলেছ; ইহার পর আর কি আছে পড়।

বা। "কিন্তু কোন কোন লোক স্বভাবতঃ এমন নিষ্ঠুর যে, দেখিবামাত্র ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র জীবকে নানা প্রকারে ক্লেশ দেয় এবং উহাদিগের প্রাণ বধ করে।"

শি। এই স্থানে 'স্বভাবতঃ'এমন নিষ্ঠুর, কেন বলিয়াছে বুঝিতে পারিলে? ইত্যাদি।

"এমন করিয়া পড়াইতে গেলে এক পাঠেই সমুদায় দিন শেষ হয়, আর এক বৎসরেও একখানি বহি সমাপ্ত হয় না"—যদি কেহ এমত আপত্তি করেন, তাহার উত্তর এই যে এরূপ একটী পাঠ পড়াইলে একশত-পাঠের কার্য্যকারী হয় এবং শীঘ্র অপঠিত অংশ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে। এই প্রণালী মতে পুস্তকের প্রথম দুই তিনটী প্রবন্ধ পড়াইতে যদি ৪ মাস সময় লাগে, তবে পুস্তকের অবশিষ্ট নয় দশটী (মনে কর) প্রবন্ধ পড়াইতে এক মাস সময় লাগিবে। কাজেই সময়ের অভাব হইবার আশঙ্কা নাই। অপরন্তু পড়ার মত পড়া হইবে।

২। ব্যাকরণ।

আবশ্যকতা।—ভাষা শিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ বিশেষ আবশ্যকীয় নহে। ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনেক লোকে শুদ্ধ ভাষায় বা সামান্য ভুল ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। অনেক লোক ব্যাকরণ না পড়িয়া উত্তম ভাষায় প্রবন্ধাদিও রচনা করিতে পারেন। তবে ব্যাকরণ শিক্ষা কোন কোন কারণে বাঞ্ছনীয় বটে। ব্যাকরণ শিক্ষা

করিলে বলিতে বা লিখিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা কম হয়, নূতন নূতন শব্দ গঠনে শক্তি জন্মে এবং রচনা করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষদানের কথা।—ছোট ছোট বালকগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া একটু শক্ত কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষক তেমন বিচক্ষণ ও ধৈর্য্যশীল হইলে কার্য্য তত কঠিন বলিয়া বোধ হইবে না। তবে খুব নীচের শ্রেণীতে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। নিম্ন-প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণীতে ব্যাকরণের শিক্ষা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

"ব্যাকরণের" সূত্র, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জন বর্ণ, কণ্ঠ্যবর্ণ, তালব্য বর্ণ—প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই, কি প্রথমে পদের সূত্রাদিও শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা পদ পরিচয় করানই প্রথমে আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমে 'বিশেষ্য পদ।' দৃষ্টান্ত দ্বারা কেবল বস্তু, ব্যক্তি ও জাতিবাচক বিশেষ্যই শিক্ষা দিতে হইবে।

বিশেষ্য ও ক্রিয়া।—গুণ বাচক ও ক্রিয়া বাচক বিশেষ্যাদি নিঃ প্রাঃ শ্রেণীতে শিক্ষা না দিলেও চলিতে পারে। অতি সহজেই বালকদিগের বস্তুবাচক বিশেষ্যের পরিচয় হইয়া যাইবে। বালক-দিগকে বলিয়া দিতে হইবে যে বস্তু 'বিশেষ্য' নহে,—বস্তুর 'নাম' বিশেষ্য। বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। বিশেষ্য বোধ হইলেই সামান্য সামান্য ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে; 'বালক পড়িতেছে'—বালক কি করিতেছে? 'পড়িতেছে'। এখানে 'পড়িতেছে'কে ক্রিয়া-পদ বলে। 'যদু লিখিতেছে'—যদু কি করিতেছ? 'লিখিতেছে'। এখানে 'লিখিতেছে' ক্রিয়াপদ। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ২।৪ দিন বিশেষ্য ও তাহার ক্রিয়া পদ শিক্ষা দিতে হইবে। তার পর দুই শব্দ যুক্ত (ভূ কৃ যোগে) ক্রিয়াপদের শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। যথা—

বকু গান করিতেছে; 'বকু কি করিতেছে?' 'গান করিতেছে' এখানে 'গান করিতেছে' ক্রিয়া পদ। এইরূপ ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছে, মিস্ত্রি রং করিতেছে, ফজী বাতাস করিতেছে, দর্জ্জি সেলাই করিতেছে, টুনু খেলা করিতেছে, খোকা প্রস্রাব করিয়াছে, বাঘ হালুম হালুম করিতেছে, বানর কিচির মিচির করিতেছে, গরু হাম্বা হাম্বা করিতেছে ইত্যাদি। 'কে করিতেছে'? 'ব্রাহ্মণ, মিস্ত্রি, ফজী, দর্জ্জি করিতেছে।' এখানে ব্রাহ্মণ, মিস্ত্রি, ফজী, দর্জ্জি, কর্ত্তা—যে করে তাহাকে কর্ত্তা বলে। এইরূপে কর্ত্তা কথাটা শিখান যাইতে পারে। এ সমস্ত অবশ্য এক দিনে শিখাইতে বলিতেছি না। কেবল পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেছি। বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণাশক্তির পরিমাণ বুঝিয়া যতদিন আবশ্যক, ততদিনে শিক্ষা দিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীতে (নিঃ প্রাঃ প্রভৃতি) প্রতিদিন একসঙ্গে ১০ মিনিটের অধিক কাল ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। উক্তরূপে—রান্না হইয়াছে, খাওয়া হইয়াছে, বিছানা হইয়াছে, ইত্যাদি ভূ ধাতুর ক্রিয়াপদ শিক্ষা দিতে হইবে। বাঙ্গালায় ভূ, কৃ নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদই অধিক, সুতরাং বালকগণের ক্রিয়া-পদের পরিচয় পাইতে বিশেষ কষ্ট বা বিলম্ব হইবে না। এই সমস্ত ক্রিয়ার কেবল মৌখিক আলোচনা করিলে হইবে না। বোর্ডে লিখিয়া দিয়া, বালকগণের দ্বারা ক্রিয়া পদগুলি চিহ্নিত করাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু এক কথা মনে রাখা উচিত যে, কখনই কঠিন বা জটিল প্রশ্ন করিয়া বালকগণকে ভীত বা বিরক্ত করিতে হইবে না—শিক্ষার প্রারম্ভে এই কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

ক্রিয়া পদের অন্যান্য আকার গুলিও এই সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারা যায়। করিয়াছিল, হইয়াছিল, হইবে, করিবে ইত্যাদি ভূ কৃ যুক্ত ক্রিয়া দেখিলেই বালকগণ অতি সহজে বুঝিয়া লইতে পারিবে। তবে কালের বিষয় এ সময়ে বলিবার আবশ্যকতা নাই।

কর্ম্মপদ।—ইহার পরে অগ্রে বিশেষণ কি অগ্রে কর্ম্মকারকের পদ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য—এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যাহা হউক শিক্ষক নিজের সুবিধা বুঝিয়া অগ্রে যাহা পছন্দ করেন তাহাই শিক্ষা দিবেন। আমি নিজে কর্ম্মপদ শিক্ষা দিয়া ফল লাভ করিয়াছি বলিয়া, অগ্রে কর্ম্মপদ শিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করিতেছি। 'খোদাই ভাত খাইতেছে'—এখানে বিশেষ্যপদ কয়টী আছে? 'খোদাই আর ভাত'। কে খাইতেছে? 'খোদাই খাইতেছে'—তবে কর্ত্তা কে? 'খোদাই' কর্ত্তা। কি 'খাইতেছে'—'ভাত খাইতেছে'—ভাত কর্ম্ম। 'যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম,' এরূপ সূত্রাদি বলিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। তবে যদি বালকগণ বুঝিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আপত্যেরও কোন কারণ নাই। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। 'খোদাই' বই পড়িতেছে'—কে পড়িতেছে—কি পড়ি-তেছে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া কর্ত্তা আর কর্ম্মপদ পরিচয় করান যাইতে পারে। কোন্ ক্রিয়ার কর্ত্তা বা কোন্ ক্রিয়ার কর্ম্ম, আপাততঃ সে সমস্ত বলিবার আবশ্যক নাই। কেবল কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া পদের পরিচয় হওয়াই আবশ্যক।

বিশেষণ।—বিশেষণ শিক্ষায় প্রথমে কেবল বিশেষ্যের বিশেষণই শিক্ষা দিতে হইবে। গুণবাচক বিশেষণ গুলি অপেক্ষাকৃত সহজ। দুইটী বালকের নিকট হইতে দুখানি ছোট বড় স্লেট বা পুস্তক বা পেনসিল লইয়া টেবিলের উপর রাখ। এখন জিজ্ঞাসাকর 'রূপুর কোন শ্লেট, আর পানুর কোন শ্লেট?' হয়ত বালকেরা কেহ এ প্রশ্নের উত্তরে বলিবে "রূপুর নাম লেখা স্লেট, কি পানুর স্লেটের এক কোণ ভাঙ্গা"—কিন্তু শিক্ষক যদি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হন, তবে তাঁহার মনোমত উত্তর পাইতে পারেন। স্লেট কি পেনসিল দুইটী পাশাপাশি রাখিয়া, ২।৩ বার অঙ্গুলির দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে মাপের ভঙ্গি

দেখাইলেই, বালকেরা বুঝিবে যে শিক্ষক মহাশয় ছোট বড় মাপ করিতেছেন। তখন কাহার কোন স্লেট জিজ্ঞাসা করিলেই—"রূপুর বড় স্লেট, পানুর ছোট স্লেট"—এইরূপ উত্তর পাইবারই সম্ভাবনা। এইরূপ দুইটী বালককে খাড়া করাইয়া —"কে লম্বা, কে খাট" জিজ্ঞাসা করিলেই—"শান্তি লম্বা, সাধন খাট" এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইবে। "কে কাল, কে ফরসা ; কে শান্ত, কে দুষ্ট" ইত্যাদি—প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। প্রশ্নের উত্তর গুলি বোর্ডে নিম্নলিখিত প্রকারে লেখা আবশ্যক ঃ—

বড় স্লেট	ছোট স্লেট
লম্বা ছেলে	খাট ছেলে
কাল ছাতা	সাদা ছাতা
লাল কাগজ	সবুজ কাগজ

বালকগণ ইহার মধ্যে প্রথমে বিশেষ্য পদগুলি নির্দ্দেশ করিবে। তারপর যে সকল কথায় দুইটী বিশেষ্যকে পৃথক করিয়া দিতেছে, সে কথাগুলি লক্ষ্য করিবে। এই সমস্ত কথাকে 'বিশেষণ' কহে। এইরূপ বহুতর দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে গুণবাচক বিশেষণের বোধ হইবে। বালকেরাও যাহাতে এইরূপ কর্ত্তৃক্রিয়াযুক্ত, বিশেষ্যবিশেষণযুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে পারে এবিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। তারপর সংখ্যা বাচক বিশেষণ শিক্ষা দিতে হইবে। "একটী কলম, দুইখানা পুস্তক, পাঁচটী গরু ইত্যাদি।" প্রথম, দ্বিতীয় প্রভৃতির ব্যবহার এইরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। শ্রেণীতে "প্রথম বালক, দ্বিতীয় বালক, তৃতীয় বালক, বা স্কুলে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় মান, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ ইত্যাদি কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং বালকগণের পক্ষে ইহার ব্যবহার শিক্ষা শক্ত হইবেনা। তবে যে সকল কথা তাহারা জানেনা বা সাধারণতঃ ব্যবহার করেনা,

যেমন পঞ্চদশ, বিংশ ইত্যাদি, সেরূপ শব্দের ব্যবস্থার শিক্ষা দিবার আপাততঃ আবশ্যকতা নাই।

ইহার পর ক্রিয়ার বিশেষণ ও বিশেষণের বিশেষণ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। "সুরেন তাড়াতাড়ি লিখিতেছে" সুরেন কেমন করিয়া লিখিতেছে? হয়ত এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ বলিবে "কলম দিয়া লিখিতেছে"। কিন্তু যদি শিক্ষক 'তাড়াতাড়ি লিখিতেছে' এই বাক্যাংশ বলিবার সময়, হাতের দ্বারা—তাড়াতাড়ি লিখিবার ভঙ্গি প্রদর্শন করেন, তবে বালকগণ উত্তরে সম্ভবতঃ 'তাড়াতাড়ি লিখিতেছে' এই কথাই বলিবে।—"ধীরেন্ ধীরে ধীরে লিখিতেছে"—কেমন করিয়া লিখিতেছে? ধীরে ধীরে লিখিতেছে। "বুলু জোরে দৌড়াইতেছে"—কেমন করিয়া দৌড়াইতেছে? জোরে দৌড়াইতেছে।—এইরূপ কৃষ্ণ খুব দুষ্ট, কামিনী খুব সুন্দর, সাগরের মেয়ে খুব কাল, মিথ্যা বলা অতি অন্যায় কার্য্য, উপেন বাবু বড় ভাল মানুষ, ইত্যাদি রূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিশেষণের বিশেষণও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি এরূপ বুঝিতে পারা যায় যে বালকগণ ক্রিয়ার বিশেষণ কি বিশেষণের বিশেষণ উত্তম রূপ ধারণা করিতে পারিতেছে না, তবে এ সকল উচ্চ প্রাইমারীর প্রথম বর্ষে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সর্ব্বনাম।—'আমি, তুমি, সে' এই তিনটী সর্ব্বনাম ও এই সকল সর্ব্বনামের কর্ম্ম কারক ও সম্বন্ধ পদগুলি বালকদিগকে সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। শ্রেণীতে যত বালক আছে সকলকেই 'তুমি বলিয়া ডাকিতে পারি, কিন্তু 'হরি' বলিয়া কেবল হরিকেই ডাকিতে পারি; হরি বলিলে অন্য আর কোন বালকই উত্তর দিবে না। 'হরি' এক জনের নাম, কিন্তু 'তুমি' সকলেরই নাম। এই জন্য 'তুমি' এই কথাকে 'সর্ব্বনাম' বলে। এইরূপে 'আমি, সে' কথা দুটী বুঝাইয়া দিতে হইবে। তার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিয়া ক্রমে সর্ব্বনামের

কর্ম্ম ও সম্বন্ধ পদ শিক্ষা দিতে হইবে। 'আমি তোমাকে মারিব, সে আমাকে দেখিতেছে ইত্যাদি' দৃষ্টান্তের দ্বারা (বিশেষ্যের কর্ম্মপদ শিক্ষা দিবার পদ্ধতিতে) সর্ব্বনামের কর্ম্ম পদ শিখাইতে হইবে। সর্ব্বনামের সম্বন্ধপদ শিক্ষাদিবার সময়ে প্রথমে বিশেষ্যের সম্বন্ধ পদ বুঝাইতে হইবে। "রামের পুস্তক, খোকার লাঠীম, ভুলুর জামা" ইত্যাদি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্বন্ধের ভাব বুঝাইতে পারা যায়। এ পুস্তক কার? রামের। এই পুস্তকের সঙ্গে কেবল রামেরই সম্বন্ধ, অন্য কাহারও নহে। এ জামাটা কার? ভুলুর। এ জামার সঙ্গে কেবল ভুলুরই সম্বন্ধ। এই প্রকারে ইত্যাদি। 'সম্বন্ধ' কথাটীর অর্থ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলে বালকেরা সহজে সম্বন্ধ বুঝিবে। তার পর সম্বন্ধ পদের শেষ বর্ণ 'র' হইয়া থাকে, এইরূপ একটা মোটামুটি সঙ্কেতও বুঝিতে পারিবে। এখন "আমার, তোমার, তাহার, আমাদিগের, তোমাদিগের, তাহাদিগের" প্রভৃতি শব্দ। এই সকল শব্দের ব্যবহার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বনামের কর্ম্মকারকে শেষ বর্ণ 'কে' থাকে, ইহা বুঝিলে কর্ম্মকারকের একটা আন্দাজ করিতে পারিবে। এই সমস্ত সর্ব্বনামের পদ নিম্ন প্রাইমারীর উচ্চ শ্রেণীতেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

কাল।—ইহার পর ক্রিয়ার তিন কাল শিক্ষা দিলেই, নিম্ন-প্রাথমিকের ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বোর্ডের উপর নিম্নলিখিত বাক্য ৩টী লিখিয়া দাও ঃ—

দাদা পাঠশালায় পড়িয়াছিল।
আমি পাঠশালায় পড়ি।
খোকা পাঠশালায় পড়িবে।

"আমি এখন পড়ি; দাদা আগে পড়িত, এখন আর পড়েনা; খোকা বড় হইলে, পরে পড়িবে—এখন সে পড়িতে পারেনা।" এই প্রকারে ক্রিয়াপদগুলির অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইতে হইবে। তিন চারিদিন

এইরূপ নানা দৃষ্টান্তের সাহায্যে ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ বুঝাইতে পারিলে, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের একটা জ্ঞান জন্মিবে। প্রথমে বর্ত্তমান, অতীত, কথাগুলি না শিখাইয়া 'এ কাজটা এখন হই-তেছে, এ কাজটা পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে, আর এ কাজটা পরে হইবে, এইভাবে 'এখন' 'পূর্ব্বে' ও 'পরে' এই সকল কথা দ্বারা ক্রিয়াপদগুলি ভিন্ন করিতে শিক্ষা দিলে ভাল হয়। পরে বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে, 'বর্ত্তমান অতীত, ভবিষ্যৎ' কথা তিনটীর অর্থ বুঝাইয়া দিয়া, শিখাইয়া দিলেই চলিবে।

যদি কোন শিক্ষক নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে এতদূর শিখাইতে না পারেন, তবে তিনি কিছু কিছু বাদ দিতে পারেন। কিন্তু নাম জাতি ও বস্তুবাচক বিশেষ্য, গুণ ও সংখ্যাবাচক বিশেষণ, সাধারণ ক্রিয়া পদ ও কর্ত্তা কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই কর্ত্তব্য—নির্দ্দিষ্ট-পাঠ্য তালিকায় ব্যাকরণ শিক্ষার কথা থাকুক আর নাই থাকুক। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে যাহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল, যদি উক্ত শ্রেণীতে তাহার কোন কোন অংশের শিক্ষা না হইয়া থাকে, তবে প্রথমে উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বর্ষে সেই সকলের আলোচনা করিতে হইবে।

কারক।—তার পর করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ কারক শিক্ষা দিতে হইবে। "ফটিক ছুরি দিয়া হাত কাটিয়াছে"—কে কাটিয়াছে? ফটিক। 'ফটিক' কর্ত্তা—যে করে সেই কর্ত্তা। কি কাটিয়াছে? হাত কাটিয়াছে। 'হাত' কর্ম্মকারক—যাহাতে কর্ম্ম ঘটে তাহাই কর্ম্মকারক। এখানে হাতের উপরই কাটার কর্ম্মটী—হইয়াছে (ঘটিয়াছে)। সুতরাং হাতই কর্ম্মকারক। ফটিক কি করিয়াছে? কাটিয়াছে। 'কাটিয়াছে'—ক্রিয়া। যে কথার দ্বারা কিছু করা বুঝায় তাহাই ক্রিয়া—এখানে 'কাটি-য়াছে' কথায় কাটার কাজ করা বুঝাইতেছে সেইজন্য 'কাটিয়াছে' ক্রিয়া। এইরূপে পূর্ব্বের জ্ঞানের পুনরালোচনা করিয়া, তার পর 'করণ' বুঝাইতে

হইবে। শিক্ষা কেবল আলোচনার উপরই নির্ভর করে।—'ছাত্রগণকে ইহা একবার বলিয়া দিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই,—ইহাই মনে করিয়া যে সকল শিক্ষক নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাহারা কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। পুনরালোচনাই জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা। তার পর, কি দিয়া হাত কাটিয়াছে?—ছুরি দিয়া। যা দিয়া কোন কাজ করা যায় তাহাকে করণ বা করণকারক বলে।—এখানে ছুরি করণ কারক। এইরূপ গগণ কলম দিয়া লিখিতেছে, পুঁটী বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতেছে, শশী সিপ্ দিয়া মাছ ধরিতেছে, ইত্যাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা করণ বুঝাইতে হইবে। 'দিয়া' কথার ব্যবহার শিক্ষার পরে, ভাল ভাষায় বাক্য রচনা করিয়া, 'দ্বারা' কথার দ্বারাও যে করণ কারক ব্যক্ত হয় তাহা বুঝাইবে। সম্প্রদান বুঝাইতেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। "ইন্দু ভিক্ষুককে পয়সা দিয়াছে"—কে দিয়াছে, কি দিয়াছে প্রভৃতির আলোচনা করিয়া কাহাকে দিয়াছে জিজ্ঞাসা কর। 'ভিক্ষুককে' দিয়াছে—যাহাকে কিছু দেওয়া অর্থাৎ দান করা যায় তাহাকে 'সম্প্রদান' বলে। সম্প্রদান কথাটির অর্থও উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে। কথাটির অর্থ বুঝিলে "অম্বিকা বাবু বরকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন"—এইরূপ দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ইহার পর অপাদান কারকের শিক্ষা দিতে হইবে। কারক গুলি উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে—বালকগণকে সূত্র মুখস্থ করাইবার প্রয়োজন নাই। কেবল তাহারা কারকের ব্যবহার শিক্ষা করিবে। "গাছ থেকে আম পড়িল"—কি পড়িল? আম। 'আম' কর্ত্তা ইত্যাদির আলোচনা করিয়া "কোথা থেকে পড়িল" জিজ্ঞাসা কর। "গাছ থেকে"। আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে হইবে। "পূর্ণের মা নদী থেকে জল আনিতেছে, যদু বাজার হইতে মাছ আনিয়াছে" ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্তে 'থেকে ও হইতে' ব্যবহার করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে সকল শব্দের

সঙ্গে 'থেকে বা হইতে' থাকে তাহাদিগকে অপাদান কারক বলে। শেষে অপাদানের অর্থ বুঝাইতে পারিলে ভাল হয়। কেবল অপাদানের নহে প্রত্যেক দৃষ্টান্তের সমস্ত পদগুলিরই পরিচয় করাইবে। এইরূপ অধিকরণও বুঝাইতে হইবে। "লিলী বিছানায় ঘুমাইতেছে"—কোথায় ঘুমাইতেছে? বিছানায়। "পুকুরে মাছ আছে"—কোথায় মাছ আছে ? পুকুরে। "শিক্ষক চেয়ারে বসিয়া আছেন, খাঁচায় পাখী আছে" ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইবে যে যাহাতে কোন জিনিষ থাকে, তাহাকে 'অধিকরণ' কারক বলে। প্রথমে কেবল স্থান বাচক অধিকরণ শিক্ষা দিতে হইবে। পরে কাল বাচক। বিষয়, ব্যাপ্তি, ভাব, দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। "ও ভাই এদিকে এস; মতি, তুমি পড়; হরি, আমাকে ভাল কর" ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্বোধন পদ বুঝাইতে হইবে। যে কথায় কাহাকেও সম্বোধন করা অর্থাৎ ডাকা যায় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে। শিক্ষক নিজে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দিবেন, এবং বালকগণের নিকট হইতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আদায় করিবেন। কেবল সুসঙ্গত দৃষ্টান্তের উপরই ব্যাকরণ শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। ইহার পর বচন শিক্ষা দিয়া দুই একটা শব্দের রূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। বালকদিগের যখন কারকের জ্ঞান হইয়াছে তখন শব্দরূপ শিখিতে বিলম্ব হইবে না। তবে প্রথমা দ্বিতীয়া প্রভৃতি কথা ব্যবহার না করিয়া কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলেই চলিবে। "রাম চামচ দ্বারা দুধ খাইতেছে" এখানে রাম কর্ত্তা, চামচ দ্বারা খাইতেছে—চামচ করণ। দুধ খাইতেছে—দুধ কর্ম্ম। শব্দরূপ শিক্ষার পরে অকর্ম্মক (খুকী হাসিতেছে) সকর্ম্মক (দাদা চাঁদ দেখিতেছে) দ্বিকর্ম্মক (তুমি আমাকে কি কথা বলিলে, মা খোকাকে ভাত খাওয়াইতেছেন, পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন) কথা তিনটী অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিবে। তার পরে দুই তিনটা ধাতুর রূপ শিক্ষা

দিবে। 'আমি করিতেছি' 'তুমি করিতেছ' 'সে করিতেছে'; 'আমি করিয়াছি', 'সে করিয়াছে' 'তুমি করিয়াছ', 'আমি করিব' 'তুমি করিবে' 'সে করিবে' ইত্যাদি।

এখন অব্যয় (যাহার বিভক্তি, বচন, লিঙ্গ, কারকাদি কিছুই নাই যেমন শব্দ তেমনই থাকিয়া যায় অর্থাৎ যাহার ব্যয় নাই) শব্দগুলি শিক্ষা দিলেই উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বর্ষের কার্য্য একরূপ শেষ হইল। কিন্তু যদি সুবিধা হয় তবে পূর্ব্বে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সময় যাহা যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যথা—গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। একটী ফুল হাতে করিয়া—"এই ফুলটী বেশ সুন্দর"—এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কর, এই ফুলের কি গুণ আছে? বালকেরা নানারূপ উত্তর দিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনোমত উত্তর পাইবার জন্য শিক্ষককেই প্রথমে প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই উল্লেখ করিতে হইবে। এই ফুলটীর কি গুণ আছে? সৌন্দর্য্য। সোনা খুব চকচকে। সোনার কি গুণ আছে? চাকচিক্য। শ্যামাকান্ত খুব বলবান। শ্যামাকান্তের কি গুণ আছে? বল। ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের দ্বারা গুণবাচক বিশেষ্য বুঝাইতে হইবে। এই প্রকার "তাঁহার আগমনে সকলে সুখী হইল"।—তাঁহার কোন (ক্রিয়ায়) কার্য্যে সকলে সুখী হইল?—আগমনে"। ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার পর, ইহা, তাহা, কে প্রভৃতি সর্ব্বনাম এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া শিক্ষা দিলেই প্রথম বর্ষের কার্য্য সুচারু হইল।

স্বর ও ব্যঞ্জন।—উচ্চ প্রাথমিকের দ্বিতীয় বর্ষে বালকগণকে (বিনা সাহায্যে উচ্চারিত) হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, সমানস্বর ও স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ বুঝাইয়া দিবে। অ, আ প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে আর কোনরূপ বর্ণের সাহায্য আবশ্যক করে না; কিন্তু ক, খ বলিতে

'অ'কারের সাহায্য প্রয়োজন অ, ই প্রভৃতি পাঁচটীকে হ্রস্ব স্বর (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু খাট রকমের) বলে। আর আ, ঈ, ঊ প্রভৃতি আটটীকে দীর্ঘ (অর্থাৎ উচ্চারণ একটু লম্বা) স্বর বলে। শিক্ষককে দীর্ঘ ও হ্রস্বের উচ্চারণ-পার্থক্য দেখাইয়া দিতে হইবে। তারপর অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, এ ঐ, ও ঔ প্রভৃতি প্রত্যেক জোড়াকে সমান স্বর বলে, কারণ তাহারা আকারে ও উচ্চারণে অনেকটা এক রকমের।

তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের পাঁচটীবর্গ 'ক খ পাঁচটী কবর্গ, চ ছ পাঁচটী চবর্গ ইত্যাদি এবং য র ল ব অন্তঃস্থবর্ণ, শ ষ স হ উষ্মবর্ণ, ইহাই বলিয়া দিবে। কণ্ঠ্য তালব্য প্রভৃতি বর্ণের বিভাগ (আবশ্যক হইলে) মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীতে শিক্ষা কবিতে পারে।

সন্ধি।—ইহার পর বর্ণ বিশ্লেষণ (যথা ব্রহ্মা = ব + র্ + অ + হ্ + ম + আ) শিক্ষা দিয়া সন্ধি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। এ সন্ধি শিক্ষাতেও সূত্র না বলিয়া প্রথমে কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারাই সন্ধি বুঝাইতে হইবে। পরে বালকদিগের দ্বারা সূত্র প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া শিক্ষা দিবে। যথা—

ঘন + অন্ধকার = ঘনান্ধকার

নীল + অম্বর (কাপড়) = নীলাম্বর

এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া, অকারের পর অকার (অর্থাৎ নীল শব্দের ল বর্ণে অ আছে) থাকিলে, দুই শব্দ যোগ করিলে অ উঠিয়া গিয়া, 'ল'য়ে আকার হইল, ইহাই উত্তমরূপে দেখাইয়া দিতে হইবে। বোর্ডে অনেক দৃষ্টান্ত লিখিয়া দিয়া বালকদিগের দ্বারা এইরূপ সংযোগ করাইতে হইবে। তারপর "কুশ + আসন, ধন + আগার" প্রভৃতি অকারের পর আকার, দয়া + অর্ণব (সমুদ্র), লতা + অগ্র এইরূপ আকারের পর অকার; তারপর "মহা + আশয়, বিদ্যা + আলয়" প্রভৃতি আকারের পর আকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিবে। বালকদিগের

কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিলে বোর্ডে এইরূপ একটা সংক্ষেপ সঙ্কেত লিখিয়া দিবে—

অ+অ
অ+আ
আ+অ
আ+আ } =আ

এই প্রণালীতে ইকার, উকার, ঋকার বিষয়ক দৃষ্টান্ত শিক্ষা হইলে, তাহাও বোর্ডে সংক্ষেপে উক্ত প্রকারে লিখিবে। এখন সমস্তের একটা সূত্র শিখাইয়া দাও—"সমান স্বর পরে থাকিলে পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়, পরের স্বর উঠিয়া যায়।" তারপর অন্যান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা আর কতকগুলি সন্ধির বিষয় পূর্ব্ব প্রণালীতে শিক্ষা দিয়া, তাহারও সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে যথা ঃ—

অ+ই
অ+ঈ
আ+ই
আ+ঈ } =এ

অ+উ
আ+উ
অ+ঊ
আ+ঊ } =ও ইত্যাদি

এখন একটা সংক্ষেপ সূত্র শিক্ষা দাও "অ কি আকারের পর, ই ঈ থাকিলে এ, উ ঊ থাকিলে ও, ঋ ৠ থাকিলে অর্, এ ঐ থাকিলে ঐ এবং ও ঔ থাকিলে ঔ হয়।" এইরূপে, কোন উচ্চ প্রাইমারীর ব্যাকরণ দৃষ্টে সন্ধির বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। যে সকল সন্ধি উচ্চ প্রাইমারীর ছাত্রদিগের উপযোগী, উঃ প্রাঃ ব্যাকরণে সেই সকল সন্ধি দেওয়া থাকে। এ বিষয়ে তারিণীশঙ্কর সান্যালের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বা তদ্রূপ অন্য কোন পুস্তকের অনুসরণ করিলে চলিবে। এক কথা বলা হয় নাই—সন্ধি শিক্ষায় যে সকল দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইবে, বালকেরা সম্ভবতঃ তাহার অনেক শব্দ সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ। এইজন্য সন্ধি

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন ব্যবহৃত শব্দের অর্থ শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। সাধারণ বাক্যকথন ভাষায় সন্ধি সমাসযুক্ত পদ ব্যবহৃত হয় না। বিশেষ, অশিক্ষিত গ্রাম্য গৃহস্থের ঘরে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শব্দের সংখ্যা নিতান্তই কম। নিত্য প্রয়োজনীয় আহার বিহারাদির পরিচালনার্থে যে সকল শব্দের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন, কেবল সেই-গুলিরই কোনরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে সন্ধি সমাস একটু উপরের শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া যুক্তি। প্রায়ই সংস্কৃত পদের সন্ধি সমাস হইয়া থাকে। কিছুদিন সাধুভাষার আলোচনা না করিলে ও সংস্কৃত শব্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি না পাইলে, সন্ধি সমাস শিক্ষায় কোন ফল হয় না।

সমাস।—সন্ধি শিক্ষার পর, প্রথমে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমাস শিক্ষা দিবে। প্রথমে সমাস কাহাকে বলে তাহার সূত্র মুখস্থ না করাইয়া কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। যথা :—

বৃদ্ধ যে পুরুষ = বৃদ্ধপুরুষ ঠাকুর (পুজনীয়) যে দাদা = ঠাকুরদাদা
মহান যে জন = মহাজন ডেপুটী (ছোট) যে ম্যাজিষ্ট্রেট = ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
বট যে বৃক্ষ = বটবৃক্ষ ছোট যে লাট (প্রভু) = ছোটলাট

ইত্যাদি নানারূপ দৃষ্টান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিয়া বলিতে হইবে যে "দুই পদ একত্র হইয়া একটা অর্থ বুঝাইলেই সেই দুই পদে সমাস হয়।" "বৃদ্ধ, মহান, বট, ঠাকুর, ডেপুটী, লাট" এগুলি একটা একটা গুণ বুঝাই-তেছে। এগুলি কি পদ? বিশেষণ। আর পুরুষ, জন, বৃক্ষ, দাদা, লাট এগুলি কি পদ? বিশেষ্যপদ। এইরূপ বিশেষ্য বিশেষণে যে সমাস হয় তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাস শিক্ষা দিবার সময় বালকদিগের সুবিধার জন্য এই একটা সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে কর্ম্মধারয় সমাস ভাঙ্গিবার সময় দুই শব্দের মধ্যে একটা, 'যে' লাগান যায়। এইরূপ বহুব্রীহি সমাসও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিখাইতে হইবে। যথা ;—

পীত অম্বর (কাপড়) যাহার = পীতাম্বর (কৃষ্ণ)
শূল পাণিতে (হাতে) যাহার = শূলপাণি (শিব)
পদ্ম নাভিতে যাহার = পদ্মনাভ (বিষ্ণু)

এখানে 'পীতবর্ণ কাপড' 'শূল ও পাণি', 'পদ্ম ও নাভিকে' না বুঝাইয়া কৃষ্ণ, শিব ও বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। যে যে পদে সমাস করা যায়, সেই সেই পদের অর্থ না বুঝাইয়া, যাহাতে অন্য কোন একটা বিশেষ অর্থ বুঝায়, তাহাকে 'বহুব্রীহি' সমাস কহে। এইরূপে উপপদ শিক্ষা দিতে হইবে। যথা ঃ—

পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ (পদ্ম ; শৈবালাদি নয়)
জলে চরে যে = জলচর (জলচর জীব ; নৌকা প্রভৃতি নয়)
ঘর পোড়ায় যে = ঘরপোড়া (হনুমান ; কেহ ঘর পোড়াইলে তাহাকে ঘরপোড়া বলে ; পোড়া ঘর নয়।)

যে সমাস বহুব্রীহির মত, কিন্তু একটা ধাতুর সহিত যুক্ত হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। উপপদ শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিবে। বালকেরা কর্ম্মধারয়, বহুব্রীহি ও উপপদ সমাসে প্রায়ই গোলমাল করিয়া থাকে। এই তিনটীর পার্থক্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। কারকের বোধ হইলে তৎপুরুষ সমাস বুঝিতে কষ্ট হইবে না। দ্বন্দ সমাস সহজ। অব্যয়ীভাব প্রভৃতির আপাততঃ আবশ্যকতা নাই।

তার পর স্ত্রী-প্রত্যয়, তদ্ধিত ও কৃৎ কিছু কিছু শিক্ষা দিলেই উচ্চ প্রাইমারী শ্রেণীর ব্যাকরণ শিক্ষা শেষ হইল। আজকাল ইংরেজী অনুকরণে পদ পরিচয় বা পদব্যাখ্যা অর্থাৎ পার্জিং বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রবেশ করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে শিক্ষকেরা ইহাও শিক্ষা দিতে পারেন। ইহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। ণত্ববিধান, ষত্ববিধান ও চিহ্নপ্রকরণ শ্রুতলিপির সঙ্গে শিক্ষণীয়। মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণীদ্বয়ে এই সমস্ত বিষয়ই অধিক মাত্রায় শিক্ষা করিবে। মধ্য বাঙ্গালার উপযুক্ত কোন

বড় ব্যাকরণ হইতে শিক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে উচ্চপ্রাইমারীর জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিলেই মধ্য বাঙ্গালার বালকগণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। যাহা হউক এ বিষয় শিক্ষক বা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী-কমিটীর বিবেচ্য। তবে এক কথা বলা আবশ্যক যে মধ্য বাঙ্গালার দ্বিতীয় বর্ষে একটু ছন্দ অলঙ্কার শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল হয়। ছন্দ অলঙ্কারের সূত্র নহে, কেবল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। ছন্দের মধ্যে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর দুই ভাগ করিয়া নিম্নলিখিত ছন্দগুলির দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে :—

মিত্রাক্ষর—(মিতাক্ষরী) পয়ার, পয়ায়, মধ্যসম, মালতী, একাবলী, লঘুতোটক, দীর্ঘ-তোটক, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ; (অমিতাক্ষরী) গান, ছড়া।

অমিত্রাক্ষর—(মিতাক্ষরী)—মাইকেলের মেঘনাদ বধ ; (অমিতাক্ষরী) রাজকৃষ্ণ ও গিরীশচন্দ্রের নাটকাদি।

অলঙ্কারের মধ্যে, নিম্নলিখিত অলঙ্কারগুলি মধ্যবাঙ্গালা শ্রেণীতে শিক্ষণীয় :—

শব্দালঙ্কার—অনুপ্রাস ও যমক।

অর্থালঙ্কার—উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অর্থান্তরন্যাস, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি এবং বিশেষোক্তি।

ব্যাকরণ শিক্ষা দানে আর এক কথা মনে রাখা উচিত। প্রথম প্রথম ব্যাকরণে ব্যবহৃত (বিশেষ) শব্দগুলি ব্যবহার না করাই যুক্তিযুক্ত। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি শব্দ সাধারণ ভাষায় অপ্রচলিত। সেইজন্য বস্তু বাচক শব্দ, নাম বাচক, গুণ বাচক, কার্য্য বাচক ইত্যাদি রূপ (শিক্ষকের সুবিধামত) কথা প্রস্তুত করিয়া লইলে বালকগণের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। 'সন্ধি' না বলিয়া 'শব্দ জুড়িবার রীতি' এইরূপ বলাই সুবিধাজনক। তৎপর যখন একটু বিষয় বোধ হইয়া যাইবে, তখন বিশুদ্ধ শব্দ শিখাইয়া দিতে হইবে।

৩। রচনা

ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গেই রচনা শিক্ষা আরম্ভ হইয়া থাকে। যখন ভাষা-শিক্ষা রচনা শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হয় না, তখন রচনা শিক্ষার জন্য পৃথক্ সময়ের ব্যবস্থা থাকা ভাল।

বাক্যরচনা।—প্রথমে ব্যাকরণের প্রণালী অনুসরণ করিয়া কেবল কর্ত্তা ক্রিয়া যুক্ত বাক্য রচনা করিতে শিক্ষা দিবে। বোর্ডে কতকগুলি বিশেষ্য পদ লিখিয়া দিবে, বালকেরা একে একে গিয়া, তাহাতে ক্রিয়াপদ যুক্ত করিয়া আসিবে ঃ—

ঘোড়া দৌড়াইতেছে
গাছ
পাখী
যদু

বালকেরা 'দৌড়াইতেছে', 'পড়িতেছে', 'উড়িতেছে', 'খেলিতেছে', ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া আসিবে। তারপর বিশেষ্যের সহিত বিশেষণ যোগ শিক্ষা দাও। পূর্ব্ববৎ বোর্ডে লিখিয়া দাও ঃ—হাতি, ফুল, বাড়ী, পুস্তক। বালকেরা 'কাল', 'লাল', 'বড়', 'উত্তম' প্রভৃতি রকমের বিশেষণ যোগ করিল। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস হইলে কেবল বিশেষ্য লিখিয়া দিয়া তাহার সহিত বিশেষণ ও ক্রিয়া যোগ করিতে শিক্ষা দাও। যথা—

হলদে পাখী উড়িতেছে
হাতি
ফুল

বালকেরা 'হাতির' সহিত 'দুষ্ট ও দৌড়াইতেছে', 'ফুলের' সহিত 'লাল ও ফুটিয়াছে' যোগ করিয়া দিল। কিন্তু এক বিষয়ে একটু সাবধান হইতে হইবে। বাক্য রচনাকালে বালকেরা অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া,

অনেক সময় কেবল ব্যাকরণের দিকেই লক্ষ্য রাখে।* হয় ত কেহ লিখিয়া বসিল 'লাল হাতি হাসিতেছে'; ব্যাকরণ গত কোন ভুল নাই বটে, কিন্তু এইরূপ বাক্যের ভাব অসঙ্গত বলিয়া, সম্পূর্ণ বাক্যই অশুদ্ধ। সাধারণতঃ বাক্য রচনা করিতে বলিলেই, হয় 'রাম' না হয় 'শ্যাম', এই দুই জনের একজনকে কর্ত্তা ঠিক করিয়া, যত ক্রিয়া পদ আছে, সমস্তই ইহাদের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। 'গান করিতেছে', 'সেলাই করিতেছে', 'দৌড়াইতেছে' 'শুইয়া আছে'—এইরূপ ক্রিয়াপদে অবশ্য 'রাম,' 'শ্যাম' দিলে অর্থ উত্তম না হউক, এক রকম কাজ চলা মত হয়, কিন্তু 'হাম্বা হাম্বা ডাকিতেছে' এইরূপ ক্রিয়ার সঙ্গেও 'রাম শ্যামকে' যুক্ত করিতে ছাড়েনা। বালকদিগকে সুন্দর ও সঙ্গত উত্তর দিতে শিক্ষা দিতে হইবে; ইহাতে আর এক উপকার এই হইবে যে, তাহাদের চিন্তাশক্তি ও যুক্তিশক্তির যথেষ্ট অনুশীলন হইবে। 'রাম গান করিতেছে' না বলিয়া, 'পাখী গান করিতেছে' বলিলে বাক্যটীর দ্বারা কেমন একটা সাধারণ সত্য ঘটনা বিবৃত হইল। 'রাম গান করিতেছে' বলিলে সেরূপ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। 'রাম' কে? সে কি গান করিতে জানে? কেন গান করিতেছে? যদি রামের সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে এত বিষয় জানিতাম, তবে 'রাম গান করিতেছে' বলিলে কিছু বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কেবল রাম গান করিতেছে বলিলে সেরূপ কিছুই বোধ হয় না। সেইরূপ 'বালিকা (কি দর্জ্জি) সেলাই করিতেছে', 'ঘোড়া দৌড়াইতেছে', 'রোগী শুইয়া আছে', এইরূপ সঙ্গত উত্তর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে বালকেরা প্রথমে এতদূর পারিয়া উঠিবে না, কিন্তু এই আদর্শের দিকে তাহাদিগের লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দিবে।

ইহার পর একটী একটী বিশেষ্য পদ বলিয়া দাও ও সেগুলিকে একে একে কর্ম্ম করিয়া, এক একটী বাক্য রচনা করিতে বল। মনে কর 'বাঘ' লিখিয়া দিলে। এক বালক উত্তর করিল 'রাম বাঘ খাইয়াছে'।

ইহাতে ব্যাকরণগত কোন ভুল নাই, কিন্তু এরূপ উত্তর মূলেই ভুল। এই বাক্য সঙ্গত ভাবযুক্ত নহে। ভাব লইয়াই বাক্য। যেখানে ভাব হইল না, সেখানে বাক্যও হইলনা। যদি বাক্যই না হইল, তবে তাহার ব্যাকরণ লইয়া কি হইবে? অন্য আর এক বালক লিখিল 'শ্যাম বাঘ ধরিতেছে'; তারপর 'যদু বাঘ দেখিতেছে', পূর্ব্বাপেক্ষা এরূপ বাক্য কিছু ভাল। তবে পরীক্ষায় ইহাতেও পূর্ণ নম্বর পায় না; 'শিকারী বাঘ মারিতেছে' এইরূপ বাক্যই, পরীক্ষকেরা পূর্ণ নম্বরের উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন। তবে ঘটনা বিশেষের সহিত যুক্ত হইলে সমস্ত বাক্যই সঙ্গত হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময় মধ্যপ্রদেশের লোক একবার বাঘ খাইয়াছিল। সেই ঘঠনার উপলক্ষে 'রামদীন বাঘ খাইয়াছিল' একথা সঙ্গত। 'শ্যাম' অর্থে যদি আমরা সেই সার্কাসের শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে বুঝি, তবে তাঁহার পক্ষে বাঘ ধরা অসঙ্গত নয়। বাঘ দেখাটা অনেক সময়েই সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু শিকারীর পক্ষে বাঘ মারা একটা সাধারণ রীতিসম্মত কার্য্য বলিয়া, এই শেষ বাক্যই উত্তম।

ব্যাকরণের সাধারণ দৃষ্টান্ত দিবার সময় ব্যাকরণের নিয়মের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখায় ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় না। কিন্তু রচনার সময় ভাব ও ব্যাকরণ উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইরূপে ক্রিয়ার বিশেষণ ও তিনকাল-প্রকাশক-ক্রিয়া-পদগুলির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে। কিছুদিন এইরূপ বাক্য রচনা শিক্ষার পর ছোট ছোট গল্পের রচনা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

গল্পরচনা।—কোন পুস্তক হইতে এইরূপ আমোদজনক একটী গল্প পাঠ কর বা নিজে এইরূপ সরল একটী গল্প রচনা করিয়া বালকগণকে শুনাও (শ্রীযুক্ত আসান উল্লাকৃত কিণ্ডারগার্টেন প্রাইমার):—

"একটী ছেলে ভারি পেটুক। পেট ভরিয়া গেলেও সে খাইতে ছাড়েনা। এইরূপে খাইতে খাইতে তার খুব পেটের অসুখ হইল। একদিন কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গেল। কবিরাজ মহাশয়, তাহার খাওয়ার কথা শুনিয়া, তাহাকে শুইতে বলিলেন। সে শুইলে পর, কবিরাজ মহাশয় তাহার চোখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। বালক বলিল "আমার পেটের অসুখ, চোখের নয়"। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "না তোমার চোখের অসুখ, পেটের নয়। আমি তোমার চোখ ভাল করিয়া দিলেই, তোমার পেট সারিবে।"

এই গল্পটী বলা হইলে শিক্ষক বালকদিগের নিকট হইতে ধারা বাহিক প্রশ্ন করিয়া গল্পের সমস্ত বিষয় আদায় করিয়া লইবেন। যথা—

প্রঃ। পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও কি করিত ?

উঃ। পেটুক বালক পেট ভরিয়া গেলেও খাইত।

বালকেরা পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিবে। শিক্ষক আংশিক উত্তর, বা গ্রাম্য কি অসাধু ভাষায় উত্তর গ্রহণ করিবেন না। সেরূপ উত্তর করিলে, তিনি শুদ্ধ করিয়া দিবেন ও সেই বালকের নিকট হইতে পুনরায় শুদ্ধ উত্তর আদায় করিবেন।

প্রঃ। খাইতে খাইতে তাহার কি হইল ?

উঃ। এইরূপ খাইতে খাইতে তার পেটের অসুখ হইল।

প্রঃ। পেটের অসুখ হইলে সে কি করিল ?

উঃ। পেটের অসুখ হইলে সে কবিরাজের নিকট ঔষধ আনিতে গেল।

প্রঃ। কবিরাজ মহাশয় তাহার কথা শুনিয়া কি করিলেন ? ইত্যাদি।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরগুলি শেষে স্লেটে বা কাগজে লিখিলেই ধারাবাহিক গল্প হইয়া যাইবে। প্রথমে কিছু দিন মুখে মুখে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বেশ অভ্যাস হইয়া গেলে শেষে স্লেটে বা কাগজে লিখিতে শিক্ষা দিবে। ইহার পর কেবল গল্প পড়িয়া শুনাইবে, আর প্রশ্ন করিবার আবশ্যক নাই। বালকেরা গল্পের বিষয় মনে রাখিয়া নিজের ভাষায় রচনা করিবে। পুস্তকস্থিত গল্পে বালকগণের অনুকরণের উপযুক্ত কোন সুন্দর শব্দ বা বাক্যাংশ থাকিলে সে গুলি (বেশী নয়)

বোর্ডে লিখিয়া দিবে, ও সেই শব্দগুলি বালকগণকে নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করিতে বলিবে। গল্প রচনায় 'কথামালা, ঈসপের গল্প' প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্য লইবে। এইরূপ গল্প রচনা অভ্যাস হইয়া গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনী (প্রথমে দেশীয় লোকের) পড়িয়া শুনাইবে। কালীময় ঘটককৃত চরিতাষ্টক ও শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন কৃত চরিতমালার সাহায্য লইবে। বালকেরা নিজের ভাষায় সে গুলি বর্ণনা করিবে। তার পর অন্যান্য ঐতিহাসিক বিবরণ শিখাইতে আরম্ভ করিবে।

প্রবন্ধ রচনা।—বর্ণনাত্মক রচনা সহজ, কিন্তু ভাবাত্মক রচনা শক্ত। সেই জন্য প্রথমে কেবল বর্ণনাত্মক রচনাই শিক্ষা দিবে। বালকদিগকে (মধ্য বাঙ্গালা ২য় শ্রেণী হইতে) কল্পনা করিয়া কোন স্থানের বর্ণনা লিখিতে বলিবে। "তোমার গ্রাম বা কোন বাজার, কি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইবার পথ, কি কোন উৎসব বর্ণনা করিয়া রচনা লেখ"—এইরূপ প্রশ্ন করিবে। কিন্তু প্রথমে লিখিবার ধারা ও উপকরণ বলিয়া না দিলে বালক পারিবে না। সেই জন্য কিছুদিন নিম্নলিখিত প্রণালীতে বোর্ডে রচনার ধারা লিখিয়া দিবে ;—

বিষয়—নিজ গ্রামের বর্ণনা।

১। গ্রামের নাম—সেই নাম হইবার যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, তবে সে কারণ।

২। কোন জেলায়—সহর হইতে কতদূরে—কোন নদী বা রেলের ধারে। চতুঃসীমা।

৩। গ্রামে পাহাড়, বন, বিল, নদী প্রভৃতি যে কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকে তাহার বর্ণনা। স্বাস্থ্য।

৪। গ্রামের চাষবাসের অবস্থা, জমি কি পরিমাণে উর্ব্বরা, কি কি ফসল জন্মে।

৫। লোক সংখ্যা—কোন্ জাতি প্রধান, লোকের অবস্থা, ব্যবসায় বাণিজ্য।

৬। ডাকঘর, কাছারি, স্কুল, হাসপাতাল, মন্দির, মসজিদ, বাজার, হাট প্রভৃতির বর্ণনা।

৭। গ্রাম ক্রমশঃ উন্নত না অবনত হইতেছে? তাহার কারণ।

বর্ণনাত্মক রচনার অভ্যাস হইয়া গেলে (মধ্য ১ম শ্রেণীতে) মধ্যে মধ্যে সহজ ভাবাত্মক রচনা অভ্যাস করাইবে। কিন্তু ইহাতেও প্রথম প্রথম রচনার ধারা বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। যথা:—

স্বাস্থ্যরক্ষা।

১। কিরূপ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তি বলা যায়? স্বাস্থ্যের সুখ ও স্বাস্থ্যভঙ্গে দুঃখ।

২। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম:—

(ক) নির্ম্মল বায়ু সেবন।

(খ) লঘুপাক দ্রব্য ভক্ষণ ও আহারের নিয়ম করণ। (আহারের অব্যবহিত পরে পাঠ না করা)

(গ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

(ঘ) পরিশ্রম ও ব্যায়াম। দিবানিদ্রা ও অধিক নিদ্রা না যাওয়া।

(ঙ) নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ।

(চ) দুর্ভাবনার বশ না হওয়া। সকল সময়েই সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা।

৩। স্বাস্থ্যরক্ষা না করিতে পারিলে সাংসারিক সুখ লাভের পক্ষে কি ব্যাঘাত হয়?

রচনার নিয়ম।—এইরূপ রচনা লিখিতে বালকগণকে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিবে:—

১। যে বিষয়ে রচনা লিখিতে হইবে, সে বিষয় সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিবে মনে করিয়াছ, তাহা প্রথমে পৃথক কাগজে ধারাবাহিক রূপে সংক্ষেপে লিখিয়া রাখ (উপরোক্ত দৃষ্টান্তের অনুরূপ) ও সেই ধারা অবলম্বন করিয়া রচনা লেখ।

রচনা লিখিবার সংক্ষিপ্ত ধারা এইরূপ:—

(১) প্রথমে বিষয়টী কি তাহার বর্ণনা করিবে (২) পরে তাহার ভালমন্দ দুই দিক দেখাইবে। (৩) তারপর সে সম্বন্ধে কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা মন্তব্য আকারে প্রকাশ করিবে।

২। রচনার ভাষা সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাক্য দীর্ঘ না হওয়াই ভাল। সরল ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য বেশ মধুব। অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে। বালকেরা অনেক সময় সুদীর্ঘ সমাসযুক্ত কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। সেরূপ চেষ্টাও আবশ্যক সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার একটা সময় আছে। এন্‌ট্রান্স স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর ও নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রগণ এরূপ চেষ্টা করিলে বিশেষ অন্যায় হয় না। কিন্তু তাহাদের পক্ষেও সরল ভাষায় রচনা লেখা বাঞ্ছনীয়। আজ কা'ল সরল ভাষাই পণ্ডিতগণের পছন্দ। কঠিন ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে, কঠিন ভাষাযুক্ত অনেকগুলি গ্রন্থ পড়া আবশ্যক। তাহা না হইলে ভাষা আয়ত্ত হয় না। "ঝড়ে কলাগাছগুলি, পুকুরের ভিতর পড়িয়া গিয়া, পচিয়া উঠিয়াছে।" এই ব্যাপার বর্ণনায় এক বালক লিখিতেছে—"বাতাভিহত কদলী বৃক্ষ সকল (সীতার বনবাসে পড়া) জলে পড়ে পচে পচে গেছে"।

৩। রচনায় উদাহরণ দিতে হইলে, লোক প্রসিদ্ধ ঘটনা, গল্প বা উপাখ্যানের উল্লেখই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই উদাহরণ স্বল্প কথায়ও বিষয়ের উপযোগী করিয়া বিবৃত করিবে। একটী দৃষ্টান্তে ৪।৫ লাইনের অধিক লেখা উচিত নহে। মনে কর 'পরোপকার' সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে। ক্ষুদ্রের দ্বারাও যে মহতের উপকার হইয়া থাকে, ইহাই দেখাইবার জন্য, রামায়ণ হইতে দৃষ্টান্ত দিবে মনে করিয়াছ। এইরূপ লেখ :—"বনের পশু বানরের সহায়তায় রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতি ক্ষুদ্র কাঠ বিড়ালীরাও সমুদ্রে সেতু বন্ধন রূপ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল"। ইহাই যথেষ্ট। রামচন্দ্র কেন বনে আসিলেন, কোন্ রাস্তায় গেলেন—পঞ্চবটী বনে কি হইল—কিরূপে বালীবধ হইল প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক। ঐ বিষয়ে আর একটা দৃষ্টান্ত :— "ক্ষুদ্র ইন্দুরও একদিন জাল কাটিয়া দিয়া, সিংহকে ব্যাধের হস্ত হইতে

রক্ষা করিয়াছিল" (ঈসপের প্রসিদ্ধ উপকথা হইতে গৃহীত)। অনেক বালক রচনার কলেবর বৃদ্ধি করিবার জন্য দৃষ্টান্তগুলি অযথা লম্বা করিয়া ফেলে। রচনায় লেখার পরিমাণ দেখা হয়না, লেখার ভাব ও ভাষা দেখা হয়।

৪। পরীক্ষার কাগজে লিখিত রচনায়, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বচন বা পদ্যাংশ উদ্ধৃত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিলে, ১ লাইন কি ২ লাইনের অধিক উদ্ধৃত করিবে না। আর এক রচনায়, অতি সঙ্গত বাক্য, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২টীর অধিকও উদ্ধৃত করিবে না।

৫। রচনায় "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা আর আলস্যে থাকিও না" বা "আমি বিদ্যাবুদ্ধিহীন—আমার রচনা লেখা ধৃষ্টতা"—ইত্যাদি রূপ বাক্য লেখা নিষেধ। কোন সভায় বক্তৃতা করিতে বা রচনা পাঠ করিতে হইলে, এ সমস্তের ব্যবহার চলিতে পারে; কিন্তু বিদ্যালয়ের রচনায় এরূপ লিখিতে নাই।

৬। রচনায় শৃঙ্খলা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বিষয়ের এক একটী ভাগ পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে (প্যারাগ্রাফে) লিখিতে হইবে।

৭। এক কি দেড় ঘণ্টার পরিমাণ সময়ে যে রচনা লিখিতে হয় তাহাতে ৫০।৬০ লাইনের অধিক লেখা সঙ্গত নহে। পরীক্ষার কাগজে এইরূপ দীর্ঘ রচনাই যথেষ্ট। ½ ঘণ্টার রচনার পক্ষে ২০।২৫ লাইন লিখিলেই চলিতে পারে। পরীক্ষা কাগজে যেরূপ রচনা লিখিতে হইবে নিম্নে তাহার একটী আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

অধ্যবসায়।

অবিশ্রান্ত উৎযোগ ও পরিশ্রমের সহিত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে যত্ন ও চেষ্টা তাহাকে অধ্যবসায় বলে। অবলম্বিত-কার্য্য-সাধন-তৎপর ব্যক্তিকেই অধ্যবসায়ী কহে। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি কোন কার্য্য অসম্পন্ন বা অর্দ্ধ সম্পন্ন করিয়া রাখিতে পারেন না। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যের প্রত্যেক অংশ সুসম্পন্ন করিতে না পারিলে তাঁহার

মন স্থির হয় না। অধ্যবসায়ী ব্যক্তিকে সময়নিষ্ঠ হইতে হইবে, আলস্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অলসব্যক্তিও যত্ন চেষ্টা করিলে অধ্যবসায়শীল হইতে পারে, অধ্যবসায় অভ্যাসের ফল। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি সঙ্কল্পিত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অবিচলিত যত্ন করিয়া বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। 'যতনে রতন মিলে'—এবাক্য পরীক্ষিত সত্য। সংসার সুখের উপকরণ ধন, মান ও যশ, অধ্যবসায় লব্ধ।

দুই বেলা রীতিমত রন্ধন ও গৃহসংস্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও, অবিশ্রান্ত যত্ন ও চেষ্টায় বিদ্যাসাগর প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অধ্যবসায় গুণে যেরূপ ধন, মান ও যশ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। অধ্যবসায় রূপ গুণ থাকিলে জীবনের সকল ব্যবসায়েতেই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্কটলণ্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস কয়েক বার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় একদিন দেখিলেন যে একটা উর্ণনাভ ছয়বার চেষ্টাতেও গৃহ প্রাচীরে সূত্র সংলগ্ন করিতে পারিল না বলিয়া, সপ্তম বার চেষ্টায় বিরত হইল না। তিনি এই ক্ষুদ্র কীটের নিকট অধ্যবসায় শিক্ষা করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও শেষে জয়যুক্ত হইলেন।

কার্য্যের প্রারম্ভ দেখিয়াই আমাদিগের নিরুৎসাহ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এমন অনেক কণ্টক আছে, যাহা দেখিতে ভয়ানক বোধ হয় বটে, কিন্তু আঁটিয়া ধরিলে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারের পথ সরল নহে—পাহাড় পর্ব্বত ও গর্ত্ত গহ্বর পরিপূর্ণ। উত্থান, পতন জীবনের সহচর। কেবল অধ্যবসায়ের গুণেই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জীবন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই জন্য কি বিদ্যালয়ে, কি সংসার ক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই অধ্যবসায়ের অনুশীলন আবশ্যক।

প্রশ্ন। শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদ (প্যারাগ্রাফ) লিখ।

এরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ ১৫।২০ লাইনের অধিক লিখিবার আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু এরূপ রচনা বালকেরা কঠিন মনে করে। কারণ এই ১৫ লাইনের মধ্যে অতি আবশ্যকীয় কথা গুলি সংক্ষিপ্ত আকারে পূরিয়া দিতে হইবে। উদাহরণাদি বা উদ্ধৃত বাক্য একবারেই থাকিবে না। উপরন্তু ভাষা আড়ম্বর শূন্য ও সংযত হইবে। নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইল :—

"শিক্ষা বালক বালিকাদিগকে কার্য্যোপযোগী করে। সুশিক্ষা, নিজের কার্য্য বা অপরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার শক্তি বিধান করে। এইজন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণই রাজকার্য্যে বা অপরকার্য্যে অধিকতর আদৃত। যাঁহার শিক্ষা যতদূর উন্নত তাঁহার পদোন্নতি তদনুযায়ী হইয়া থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যে শিক্ষিত লোকই বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা শিক্ষারগুণে অবলম্বিত ব্যবসায়ে উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। শিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তি বহু সুখের অধিকারী, যথা উত্তম পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠ, সঙ্গীতচর্চ্চা, চিত্রানুশীলন ইত্যাদি। শিক্ষিত ব্যক্তিগণই ভদ্রসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন। শিক্ষাই মানুষকে নানাগুণে অলঙ্কৃত করে। এই শিক্ষার গুণেই একজন আর একজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ শিক্ষার গুণেই এক জাতি অপর জাতির শাসন-কর্ত্তা। সুশিক্ষা মনের সঙ্কীর্ণতা বিনষ্ট করে, কুসংস্কার দূরীভূত করে ও মানুষকে ধর্ম্মপরায়ণ করে।"

পত্র রচনা।—পত্রের ভাষা সরল হইবে। পত্রে কঠিন ভাষা কখনই ব্যবহৃত হয় না। ইহা ছাড়া পত্রে একজনকে সম্বোধন করিয়া বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু রচনায় কোন ব্যক্তি বিশেষকে সেরূপ সম্বোধন করা হয় না। পত্রে এইজন্য সম্বোধন সূচক কতকগুলি পদেরও ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিম্নে একখানি পত্রের আদর্শ প্রদত্ত হইল ঃ—

শ্রীহরি।

বরিশাল।

৬ই আষাঢ় ১৩১৪ বাং

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আমি কা'ল সন্ধ্যার সময় এখানে পৌঁছিয়াছি। গাড়ীতে অনেক লোক হইয়াছিল। রাত্রে একটুকুও ঘুমাইতে পারি নাই। ষ্টীমারে সকালবেলা বেশ ঘুমাইয়া-ছিলাম। আমাদের সহযাত্রী এক ভদ্র লোকের একটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক ষ্টীমার হইতে চুরি হইয়া গেছে। একজন ভদ্রবেশধারী লোক নাকি রাত্রে ষ্টীমারে তাঁহার পাশে শুইয়াছিল। শেষ রাত্রে সেই লোকটী বাক্স লইয়া পলাইয়াছে। ভদ্রলোকটী কিছুই টের পান নাই। ষ্টীমার রাত্রে চাঁদপুর ঘাটেই বাঁধা ছিল। এই কথা শুনিয়া আমি ট্রাঙ্কের সঙ্গে এক দড়ি

বাধিয়া সেই দড়ি বিছানার নীচে রাখিয়া ঘুমাইলাম। মাসীমা আমার এইরূপ দড়ি বাঁধার কথা শুনিয়া বলিলেন যে, চোরের যেমন বুদ্ধি, তাহাতে আমার দড়ি কাটিয়াও নাকি বাক্স লইয়া যাইতে পারিত। পুলিশের এত গোলমাল সত্ত্বেও চোরে কেমন চুরি করিতেছে।

আজ স্কুলে গিয়াছিলাম। ভর্ত্তি হইতে ৭।৷০ টাকা লাগিয়াছে। হেড্ মাষ্টার বাবু খুব ভাল লোক। তিনি আপনাকে চেনেন। যিনি গণিত শিক্ষা দেন, তিনি অঙ্কগুলি বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। ষ্টক আরম্ভ হইয়াছে। ডিস্কাউন্ট পর্য্যন্ত পাবনাতেই পড়িয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমার কোন অসুবিধা হইবে না।

মাসীমার নিকট মা যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানিলাম সাবন, রূপু, পানু, লিলি ভাল আছে। টুনু কোলাঘাটে দিদিমার কাছে আছে—সেও ভাল আছে। ইহাদের সঙ্গে আর পূজার পূর্ব্বে দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই। ৫ই অক্টোবর পূজার ছুটি আরম্ভ হইবে। এখনও অনেক দেরী। আমরা সকলে ভাল আছি। ইতি

সেবক

শ্রী—

দলিলাদির রচনা শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা—কেহ কেহ বলেন, বালকগণকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলে, তাহাদিগকে কেহ সাংসারিক কাজকর্ম্মে ঠকাইতে পারিবে না। একথা কতক সত্য হইতে পারে, কিন্তু আবার দলিলাদির নানারূপ ঘোর ফের শিখাইয়া অন্যকে ঠকাইবার একটা প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াও অসম্ভব নহে। দলিলের ভাষার প্রতি অক্ষর মানবের চাতুরীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্ত—"আমি, কি আমার ওয়ারিস কি স্থলাভিষিক্তগণ যদি অস্বীকার করি বা করে তাহা না মঞ্জুর"। এর অর্থ কি? অর্থাৎ একটী কাজ করিয়া তাহা অস্বীকার করাও রীতি আছে। কিন্তু "আমি এই ক্ষেত্রে তাহা করিব না" এই দলিলে তাহাই প্রতিজ্ঞা করিতেছি দলিলের ছত্রে ছত্রে এই কথা যে "আমি এইরূপ ছলনা করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না।" সুতরাং দলিল শিখাইতে গিয়া যাহাতে ছলচাতুরী শিক্ষা দেওয়া না হয় সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় দলিল।—ছাত্রদিগকে বিক্রয় কবালা, পাট্টা, কবুলিয়ত, হ্যাণ্ডনোট, কর্জ্জপত্র, রেহানী তমঃসুক, ওকালতনামা প্রভৃতি ৬।৭ রকমের দলিল লেখা শিখান যাইতে পারে। তবে এই সকল দলিলের বিষয় ও ভাব যথা সম্ভব সরল হওয়া আবশ্যক। নানারূপ ঘোরফেরযুক্ত বা অনেকরূপ সত্ব যুক্ত জটিল দলিল শিখাইতে চেষ্টা করিয়া সময় নষ্ট করিও না।

শিক্ষা দানের ধারা—এক বালককে অন্য বালকের নিকট তাহার স্লেট, কি ছাতা, কি পুস্তক বিক্রয় করিতে বল। মনে কর রামচন্দ্র দাস, যদুনাথ সেনের নিকট তাহার স্লেট বিক্রয় করিল। যদু, রামকে ১২টা পয়সা দিল। এখন যদুকে বল, "এই স্লেট যে রামের, তাহা মধু ইয়াসিন ও প্রিয়নাথ জানে; কিন্তু ইহারা আজ স্কুলে আসে নাই। কাজেই এই স্লেট বিক্রয়ের কথা জানিল না। তাহারা যদি কাল তোমাকে চোর বলিয়া ধরে, তবে তুমি কি করিবে?—তুমি যে কিনিয়া লইয়াছ, একথা যদি তাহারা বিশ্বাস না করে? তাই রামের কাছ থেকে এক খানা কাগজ লিখে লও।" রামের দ্বারা একখানা কাগজ লিখাইয়া লও। মনে কর রাম এইরূপ লিখিয়া দিল, "আমি যদুর কাছে স্লেট বিক্রয় করি-লাম। (দস্তখত) রাম।" "এ কাগজ দেখিয়া লোকে বিশ্বাস নাও করিতে পারে। অনেক যদু আছে, এ স্লেট যে, এই যদুর কাছে বিক্রয় করিয়াছে, তার প্রমাণ কি? তাই তোমার নামটি পুরা করিয়া লিখিয়া লও।" রাম আবার লিখিল "আমি যদুনাথ সেনের নিকট স্লেট বিক্রয় করিলাম (দস্তখত) রাম"। "এ কোন রাম বিক্রয় করিয়াছে?" দস্তখতও পুরা করিয়া লেখাও। "রাম চন্দ্র দাস"। "আচ্ছা এই গ্রামেইত আর এক যদুনাথ সেন আছে, এখন এই স্লেট যে সেই যদুনাথের নিকট বিক্রয় করা হয় নাই, তার প্রমাণ কি? কাজেই যদুর পিতার নাম লেখ।" রাম পুনরায় লিখিল "আমি এই স্লেট শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র সেনের পুত্র যদুনাথ

সেনের নিকট বিক্রয় করিলাম। (দস্তখত) শ্রী রামচন্দ্র দাস"। "কেশবপুরের ঈশান চন্দ্র সেনের পুত্রের নামও যদুনাথ সেন। কাজেই গ্রামের কথাও উল্লেখ কর।" এইরূপে জেলা, থানা প্রভৃতির আবশ্যকতা শিক্ষা দিতে হইবে। আবার এইরূপ কোন্ রামচন্দ্র দাসের নিকট হইতে ক্রয় করা হইল, তাহারও পরিচয় থাকা আবশ্যক। কাজেই শেষে রসিদখানা এইরূপ দাঁড়াইবে :—

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সেন, পিতার নাম ঈশান চন্দ্র সেন, জাতি বৈদ্য, সাকিন চণ্ডীপুর, জেলা নদীয়া বরাবর—

আমি শ্রীরাম চন্দ্র দাস, পিতার নাম মদন চন্দ্র দাস, জাতি কায়স্থ, সাকিন হরিপুর, জেলা পাবনা, এই স্বীকার করিতেছি যে আমি আপনার নিকট তিন আনা পাইয়া আমার স্লেট বিক্রয় করিলাম। তারিখ ১০ই পৌষ ১৩১৪ বাং

শ্রীরামচন্দ্র দাস।

এই প্রণালীতে দলিলের পাঠ শিখাইতে হইবে। দলিল লিখিত ইংরেজী ও পার্সি কথাগুলির অর্থ শিখাইয়া দেওয়া উচিত। নিম্নলিখিত শব্দগুলি আবশ্যক মত শিখাইলেই চলিবে :—

জমিদারী, তালুক, পত্তনী, ইজারা, পরগণা, প্রজা, খাজানা, জোত, লাখিরাজ, ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পীরোত্তর, কিস্তি, বাস্তু, খামার, মাঠান, শালিজমি, সুনাজমি, আউল, সুয়েম, দুয়েম, চাহারম, পতিতজমি, জলকর, শীকস্তি, পয়স্তি, পাট্টা, কবুলিয়ত, কবালা, খত, তমঃসুক, রেহান, বন্ধক, মৌরসী, কায়েমী, জরিপ, জমাবন্দি, চৌহদ্দি, নকসা, উত্তরাধিকারী, বকলম, মোকাম, সাকিন, গ্রাম, পরগণা, থানা, জেলা, ডিসট্রিক্ট, রেজেষ্টারী, ষ্টাম্প। পার্শি শব্দ ক্রমেই বাদ দেওয়া হইতেছে। পেছরে ও জওজে প্রভৃতি কথার চলন উঠিয়া যাইতেছে। ওয়ারিসান কথার পরিবর্তে 'উত্তরাধিকারী' ও পেশার পরিবর্তে 'ব্যবসায়' লেখা হইয়া থাকে। বাহাল তবিয়াদ, কচায়েন, দরবস্তহকুক প্রভৃতি অনেক কথা একবারেই উঠিয়া গিয়াছে।

নিম্নে সরল দলিলের একখানি আদর্শ প্রদত্ত হইল :—

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু রামচরণ সিংহ, পিতার নাম মৃত গোলক চন্দ্র সিংহ, জাতি কায়স্থ, ব্যবসায় চাকুরী, সাকিন রঘুনাথপুর, থানা বিষ্ণুপুর, জেলা বীরভুম, বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীরাজীব লোচন রায়, পিতার নাম মৃত গৌর গোবিন্দ রায়, জাতি বৈদ্য, ব্যবসায়

চিকিৎসা, সাকিন বেলতলা, থানা নন্দিগ্রাম, জেলা বীরভূম, জমি বিক্রয় কবালা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে, আমার কন্যার বিবাহের জন্য টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আমি আমার নিজ গ্রামের অন্তর্গত নিম্নের চৌহিদ্দিস্থিত অনুমান ২॥ বিঘামত এক খণ্ড মৌরসী জমি মহাশয়ের নিকট ৫০০৲ পাঁচশত টাকা লইয়া বিক্রয় করিলাম। অদ্য হইতে মহাশয় আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া, ঐ জমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন। আমি কি আমার উত্তরাধিকারীগণ ঐ জমিতে কোনরূপ দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না। মুল্যের সমস্ত টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়া, সুস্থ শরীরে ও সরলমনে এই বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ২৭শে চৈত্র সন ১৩১৪ সাল।

চৌহিদ্দি ।

পূর্ব্বে রামকুমার চক্রবর্ত্তীর বশত বাড়ী, দক্ষিণে যদুনাথ দের বাগান, পশ্চিমে হরিলাল ঘোষ ও কেশব লাল ঘোষের মাঠান জমি, এবং উত্তরে মনাই নদী। এই চৌহিদ্দির মধ্যে অনুমান ২॥ বিঘা জমি।

লেখক
শ্রীরোহিণী লাল অধিকারী
সাং দুর্গাপুর

সাক্ষী
শ্রীইয়াসিন আলী
সাং নাজিরা
শ্রীবামনদাস রায়
সাং হলুদবাড়ী।

কথোপকথন।—বালকগণ যদি নিজ নিজ জেলার প্রচলিত বাক্যকথনের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতার ভাষা অনুকরণ করে, তবে বাক্য কথনের সঙ্গে সঙ্গে রচনারও যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে, কারণ পুস্তকাদি সমস্তই কলিকাতার ভাষায় রচিত। শিক্ষক নিজে কলিকাতার ভাষায় কথা বলিবেন, আর ছাত্রগণকেও সেই ভাষায় কথা বলিতে অভ্যাস করাইবেন। আর এক কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে ভিন্ন ভিন্ন জেলার শিক্ষিত সম্প্রদায় একত্র হইলে, তাঁহারা সকলেই কলিকাতার ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষিত সমাজে মিশিতে

হইলেও কলিকাতার ভাষায় কথা বলিতে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বক্তৃতা, কথকতা, অভিনয় প্রভৃতিতে কলিকাতার ভাষাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যাঁহারা এই মতের বিরুদ্ধ, তাঁহাদিগের চিন্তার জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ বসু লিখিত "বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি" নামক পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাই সমস্ত বাঙ্গালীর আদর্শ ভাষা হওয়া উচিত। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের সময় নদীয়ার ভাষাই বঙ্গের আদর্শ ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। অতএব কলিকাতার ভাষাকে এখন বঙ্গের আদর্শ ভাষা জ্ঞান করিলে, আমাদের রীতি ও ইতিহাসসঙ্গত কার্য্যই করা হইবে। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ যদি কলিকাতার ভাষাকে আদর্শ বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহারই রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তাহা হইলে গৌরবহানি বা হীনতা ঘটিল ভাবিয়া তাঁহার মনঃকষ্ট পাইবার কারণ থাকিবে না। রাজধানীর সম্মান সকল দেশেই আছে, সকল লোকেই করে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত করিতে হইলে, উহাকে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির একতাসাধক শক্তি করিয়া তুলিতে হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, সমস্ত বঙ্গকে এক ভাষায় কথা কহিতে হইবে। এক জাতির মধ্যে ভাষার প্রভেদ, সাংঘাতিক প্রভেদ। এ প্রভেদ তুলিয়া দিতে সময় আবশ্যক, অনেককে অনেক কষ্টও পাইতে হইবে। তথাপি এ প্রভেদ আমাদিগকে তুলিয়া দিতেই হইবে।"
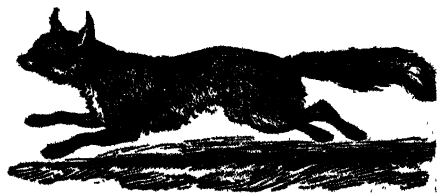
চতুর্থ প্রকরণ—গণিতবিষয়ক।

১। পাটীগণিত।

পাটীগণিত শিক্ষার উপকারিতা।—(১) বিচার শক্তিকে বলবতী করে। 'এক আর এক দুই', 'দুই আর এক তিন', 'সমান সংখ্যার সহিত সমান সংখ্যা যোগ করিলে ফলও সমান হয়' ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রান্ত বিচার মনকে বৃহৎ বিচারের পথ প্রদর্শন করে। (২) সত্য নির্দ্ধারণের সহায়তা করে। অসত্যের এরূপ প্রবল শত্রু আর কিছুই নাই। চারি হইতে দুই বাদ দিলে দুই ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না, ৩×৫=১৫ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। এ সমস্ত সত্য সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে এবং সর্ব্ব বিষয়েই সম ভাবে প্রযোজ্য। এ সত্যের পরীক্ষাও অতি সহজ, অল্পবুদ্ধি বালককেও সহজে পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে। (৩) মনোযোগ বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য করে। একটু অমনোযোগী হইলেই প্রকৃত সংখ্যা নির্দ্ধারণে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। (৪) আত্মশক্তির বোধ

জন্মায়। একটু কঠিন অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইলেই বালকের কেমন একটু আনন্দ হয়; সে বুঝিতে পারে যে তাহারও বুদ্ধিশক্তি কঠিন বিষয় নির্দ্ধারণে সক্ষম। (৫) সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ইহার যে প্রকার আবশ্যকতা, তাহার বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। প্রত্যহই প্রতি সংসারে সামান্য বাজার খরচ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব এই পাটীগণিতের সাহায্যেই পরিচালিত হইতেছে। আবার ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, বিজ্ঞান আলোচনায়, জটিল শিল্পে পাটী-গণিতই প্রধান সহায়।

পাটীগণিত শিক্ষাদানে কয়েকটী কথা।—নূতন শিক্ষক প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশায় কঠিন অঙ্কদ্বারা বালকগণকে বিব্রত করিতে চেষ্টা করেন। বালকেরা না পারিলে, তিনি নিজে কসিয়া দিয়া বাহাদুরী লাভ করিয়া থাকেন। এই রোগ মধ্যে মধ্যে পুরাতন শিক্ষকেও দেখিতে পাওয়া যায়। বালককে কঠিন অঙ্ক কসিতে দিয়া, তাহার অঙ্কশাস্ত্রানুশীলনের প্রবৃত্তি নষ্ট করিয়া দিতে নাই। আবার অনেক শিক্ষক ও পরীক্ষকের, ছেলে-ঠকান একটা রোগ আছে। বালককে শিখাইতে হইবে, ঠকাইতে হইবে না; সে কি জানে তাহারই পরীক্ষা করিতে হইবে, সে কি জানে না তাহার পরীক্ষা করিতে হইবে না। অনেক বালক শিক্ষকের দোষে অঙ্কশাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। সকল বালক জটিল অঙ্ক কসিতে সক্ষম হয় না বটে, তবে সুবিবেচক পরীক্ষকগণ পরীক্ষায় যেরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে শতকরা ৯৯ জন ছাত্রকে যে সহজেই উত্তীর্ণ করান যাইতে পারে, ইহাতে আর ভুল নাই। আবার সময় সময় শিক্ষকগণ বালকগণকে কেবল নিযুক্ত রাখিবার জন্যই একটী সুবৃহৎ গুণ বা ভাগের অঙ্ক দিয়া কার্য্যান্তরে গমন করেন। ইহাতেও বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। বালকেরা স্বভাবত চঞ্চল প্রকৃতি, অধিকক্ষণ এককার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া রাখিতে পারে না; সুতরাং অঙ্কের প্রতি একটা বিরক্তি জন্মে। এই জন্য কঠিন ও জটিল অঙ্ক খুব সাবধানে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তারপর শিক্ষকের অসাবধানতায় আর একটী দোষ ঘটিয়া থাকে। এক বালক অপর এক বালকের অঙ্ক নকল করিয়া শিক্ষককে ঠকাইতে চেষ্টা করে। যাহাতে এক বালক অন্য বালকের কোনরূপ সাহায্য না পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম প্রভৃতি বালকগণকে একটী অঙ্ক, ও দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি বালকগণকে তদ্রূপ অপর

একটী অঙ্ক কষিতে দিলে পরস্পরে নকল করিতে পারে না। অথবা এক বেঞ্চের উপরেই প্রথম এক জনকে এক মুখে ও দ্বিতীয় জনকে অপর মুখে (প্রথম জনকে উত্তর মুখ করিয়া দ্বিতীয়কে দক্ষিণ মুখ করিয়া ইত্যাদি) বসাইলেও নকল নিবারণ করা যায়; বা যদি স্লেটে অঙ্ক কষার ব্যবস্থা হয়, তবে একটু ফাকে ফাকে দাঁড়া করাইয়া দিলেও বেশ হয়। কোন প্রকারে যাহাতে নকলের সুবিধা না পায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। "নকল করিও না" বলিয়া উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা নকলের সুবিধা না দেওয়াই শ্রেয়। নকলে বালকের আত্মশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তবে আবশ্যক হইলে এক বালক অপর বালককে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে পারে। বালকেরা বালকের নিকট মন খুলিয়া নিজের অভাব জানাইতে পারে ও বালকেরাও বালকের অভাব সহজে বুঝিতে পারে। এইজন্য অনেক সময় শিক্ষকের ব্যাখ্যা অপেক্ষা বালকের সহপাঠী অপর বালকের ব্যাখ্যা তাহার মনঃপুতা হইয়া থাকে।

একটী নূতন নিয়ম শিখাইয়া বালকগণকে সেই নিয়মের সহজ সহজ যথেষ্ট অঙ্ক কসান আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় জটিল অঙ্ক সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। প্রথম চার নিয়ম শিক্ষার পরে যখন ভগ্নাংশাদি কসিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রথম চারি নিয়মের জটিল অঙ্ক মধ্যে মধ্যে কসান যাইতে পারে। জটিল অঙ্কের জন্য পরিপক্ক বুদ্ধির আবশ্যক। তারপর জটিল অঙ্ক কসাইবার সময়ও, সহজ বাছিয়া লইতে হইবে। একেবারে বিষম জটিল অঙ্ক দিয়া বালকের বুদ্ধিভ্রম জন্মান উচিত নহে। আবার জটিল অঙ্কে, অধিক পরিমাণ কঠিন গুণ ভাগ থাকা অন্যায়। যেখানে বুদ্ধির অধিক আবশ্যক সেখানে পরিশ্রমের মাত্রা কম হওয়া যুক্তি সঙ্গত। "রাম যদুর নিকট হইতে ৫৩৮৮৶৩।০ কড়া কর্জ্জ করিয়া ২ দিন ১৫৮৶৮ গণ্ডা করিয়া ও আর একদিন ৫০০৷/৷ শোধ করিল। তাহার আর কত দেনা রহিল।" এই অঙ্কে বুদ্ধি ও পরিশ্রম দুইই আবশ্যক। এই অঙ্কে পণ, কড়া, গণ্ডা বাদ দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। অন্ততঃ পক্ষে কড়া ও গণ্ডা বাদ দেওয়াত নিতান্তই আবশ্যক।

বালকদিগের বয়স দৃষ্টে অঙ্কের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে হাজার, উচ্চ প্রাথমিকে লক্ষ ও ছাত্রবৃত্তিতে কোটীর অধিক সংখ্যা দ্বারা গুণ ভাগ করাইবে না। এইরূপ অন্যান্য অঙ্ক সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

পাটীগণিতের পুস্তকে যেরূপ ধারাবাহিক রূপে কঠিন হইতে কঠিনতর অঙ্ক সাজান থাকে বা প্রতিপরিচ্ছেদে যতগুলি অঙ্ক থাকে তাহার যে সমস্তই, সেই শৃঙ্খলাক্রমে কসাইতে হইবে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। অঙ্কগুলি শ্রেণীর উপযোগী দেখিয়া

বাছিয়া লইবে ও বিদ্যালয়ের সময় বিবেচনায় কতগুলি অঙ্ক কসাইতে পারিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে।

কি জটিল কি সরল—অনেক গুলি অঙ্ক কসাইয়া বালকগণকেও তদ্রূপ অঙ্ক প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। একদিনে নানা রকমের অঙ্ক না কসাইয়া এক রকমের অনেক-গুলি অঙ্ক কসান আবশ্যক। নিম্ন প্রাথমিকে প্রত্যহ অর্দ্ধঘণ্টা, উচ্চ প্রাথমিকে ৪৫ মিনিট ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলে ১ ঘণ্টা অঙ্ক কসাইলেই যথেষ্ট হইবে।

বাড়ীতে অঙ্ক কসিতে দিলে নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রগণকে ১টী, উচ্চ প্রাথমিকের ছাত্রগণকে ২টী ও ছাত্রবৃত্তির ছাত্রগণকে ৩টীর অধিক দেওয়া উচিত নহে। বাড়ীতে কঠিন অঙ্ক কসিতে দিবে না। যাহাতে স্বল্প সময়ে সুশৃঙ্খলার সহিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া একবারেই সঠিক উত্তর সমাধান করিতে পারে সেইরূপ ভাবে বালকগণকে উৎসাহিত করিবে। (বালকগণের অঙ্কের খাতার নমুনা পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

সংখ্যা লিখন ও পঠন।—সংখ্যা শিক্ষা দিবার পদ্ধতি কিণ্ডারগার্টেন ও ধারাপাত প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। লিখন ও পঠনের কথাও উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কাঠি, বীজ, ফুল, পাতা প্রভৃতির দ্বারা শিখাইলে যে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ফলপ্রদ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষক কাঠী ও ফুল পাতার সাহায্যেই বালকগণকে এক শতকের অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিবেন। যথা ৩২ লেখ

কাঠীর দ্বারা — অঙ্কের দ্বারা

৩২

২০ লেখ

২০

১১৩ লেখ

১১৩
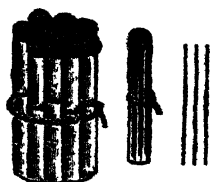
৫১, ৫২, ৫৩ চিত্র।—কাঠীর দ্বারা অঙ্ক লেখা।

তারপর শিক্ষক এইরূপ কাঠীর বা পাতার গুচ্ছের দ্বারা সংখ্যা সাজাইয়া বালকগণকে পড়িতে বলিবেন ও অঙ্কের দ্বারা লিখিতে বলিবেন। এই প্রণালীতে শতকের সংখ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার পর বস্তু ছাড়িয়া সংখ্যার সাহায্যেই শিক্ষাদান চলিতে পারে।

গ্রাব সাহেবের প্রণালী।—গ্রাব সাহেবের প্রণালী অবলম্বনে সংখ্যা শিক্ষা দিলে, প্রথম হইতেই যোগবিয়োগ ও গুণভাগের কতকটা আভাস দিতে পারা যায়। অনেক শিক্ষক এই প্রণালীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। তবে সকল প্রণালীর প্রয়োগই শিক্ষকের পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে। যাহা হউক নিম্নে গ্রাব সাহেবের প্রণালী বিবৃত হইল :—

‘এক’ শিক্ষা দিবার প্রণালী

১। একটা কাঠী হাতে লও, এক হাত তোল, একটা আঙ্গুল দেখাও, একখান স্লেট রাখ ইত্যাদি।

স্লেটের উপর একটা দাগ কাট, একটা বিন্দু আঁক, একটা যোগের চিহ্ন দাও ইত্যাদি।

ব্ল্যাক বোর্ডেও ঠিক স্লেটের অনুরূপ চিহ্নাদি কর।

২। তোমার টেবিলের উপর একটা কাঠী রাখ; তুলিয়া লও কয়টা থাকিল?

স্লেটে একটা দাগ কাট মুছিয়া ফেল, কয়টা দাগ থাকিল?

৩। বালকগণকে ব্ল্যাক বোর্ডের নিকট যাইতে বল। একটা দাগ কাটিতে বল। যথা; তারপর '১' লেখা দেখাইয়া দাও ও লেখাইয়া লও (লেখা শিক্ষা দিবার প্রণালী ২৪৭ পৃষ্ঠায় দেখ)

'দুই' শিক্ষার প্রণালী।

১। প্রত্যেকেই একটা করিয়া কাঠী লও—ডেস্কের উপরে রাখ, আর একটা লও, আগের কাঠীর পাশে রাখ। কয়টা কাঠী ?

স্লেটে একটা দাগ কাট; পাশে আর একটা দাগ কাট, কয়টা দাগ কাটিলে ?

ব্ল্যাক বোর্ডে একটা দাগ কাট; আর একটা দাগ কাট—কয়টা দাগ ?

একবার হাততালি দাও, আর একবার হাততালি দাও,—কয়বার হাততালি দিলে ?

২। গণনা—ডেস্‌কের উপর একটা কাঠী রাখ, একটু দূরে এক সঙ্গে আর দুইটী কাঠী রাখ। এখন গণ (বাম হইতে ডান দিকে) 'এক', দুই' (ডান হইতে বাম দিকে) দুই, এক।

স্লেটে এইরূপ দাগ কাট | | |, পড়।

বোর্ডেও ঐরূপ দাগ কাট, আর পড়।

যোগ—ডেস্‌কের উপর পাশাপাশি দুইখান কাঠী রাখিয়া জিজ্ঞাসা কর, কয়খান কাঠী রাখা হইয়াছে ? একখান কাঠী, আর একখান কাঠীতে কয় খান কাঠী হয় ? উত্তর—'একখান কাঠী আর একখান কাঠীতে দুই খান কাঠী হয়।" দুই খান পুস্তক, স্লেট পেন্‌সিল প্রভৃতির দ্বারা ও এইরূপ অনুকরণ করিবে। স্লেটে ও ব্লাক বোর্ডে পাশাপাশি দুইটী দাগ কাট। এই একটা দাগ আর এই একটা দাগ, কয়টা দাগ হইল ? বিন্দু ও অন্যান্য চিহ্নের দ্বারাও এইরূপ পরীক্ষা করিবে।

৪। বিয়োগ—ডেস্‌কের উপর দুইটী পয়সা রাখ, একটী তুলে লও, কয়টা পয়সা থাক্‌ল ? উত্তর—একটা পয়সা থাকিল ? দুইটী পয়সা থেকে একটী পয়সা তুলে নিলে, কয়টা পয়সা থাকে ? উত্তর, দুইটী পয়সা থেকে একটী পয়সা গেলে, একটা পয়সা থাকে। এইরূপ অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা। স্লেটের উপর দুইটী দাগ কাট; একটা মুছিয়া ফেল, কয়টা থাকিল ? দুইটাই মুছিয়া ফেল; কয়টা থাকিল ? উত্তর 'একটাও থাকিল না'।

৫। গুণ—একটা পয়সা রাখ, আর একটা পয়সা রাখ। একটা পয়সা কবার রাখিলে ? উত্তর 'একটা পয়সা দুবার রাখিলাম'। স্লেট ও বোর্ডে দাগ কাটিয়া ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন করিবে। ১কে দুইবার লইলে, ২ হয়।

৬। ভাগ—ডেস্কের উপর দুইটী পয়সা রাখ। দুইটী বালককে ডাকিয়া দুইজনকে দুইটী পয়সা দাও। রাম কয়টা পয়সা পাইয়াছে? যদু কয়টা পয়সা পাইয়াছে? দুইটী পয়সা যদি দুইজন বালক ভাগ করিয়া লয়, তবে এক একজনে কয়টা করিয়া পায়?

৭। তুলনা—রামকে একটা পয়সা দাও, আর যদুকে দুইটী পয়সা দাও। রামের কয়টা পয়সা? যদুর? রামের চেয়ে যদুর কয়টা বেশী? দুই, একের চেয়ে কত বেশী? যদুর চেয়ে রামের কয়টা কম? এইরূপ দাগ কাটিয়া স্লেটে ও বোর্ডে দেখাও।

৮। কাজের হিসাবে যোগ—রাম কবার একটা সন্দেশ খায়। সকালবেলা একটা সন্দেশ খায়, আর সন্ধ্যাবেলা একটা। সে কয়টা সন্দেশ খায়?

বিয়োগ—রামের দুইটা মর্বেল ছিল—একটা পুকুরের মধ্যে পড়িয়া গেল—আর কয়টা রহিল?

গুণ—যদু মাছ ধরতে গেল—দুইবারই এক পুঁটীমাছই পাইল—সে কয়টা পুঁটী ধরেছিল?

ভাগ—দুই জন বালক যদি দুইটা কুল ভাগ করিয়া নেয়, তবে এক এক জনের ভাগে কয়টা করিয়া কুল পড়ে?

এই প্রকার প্রত্যেক রকমের অন্ততঃ ১০টা করিয়া দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দান কর।

৯। 'দুই' অঙ্কের লেখা শিখাও। প্রথমে এইরূপ ১ ‿ দুই খণ্ড করিয়া, তারপর একত্রে ২।

১০। + − × ÷ = চিহ্নগুলির অর্থ সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া, বোর্ডে ও স্লেটে এইরূপ অঙ্কাদি কসাও:—

দাগের দ্বারা	অঙ্কের দ্বারা
। + । = ।।	১ + ১ = ২
।। − । = ।	২ − ১ = ১
। × ।। = ।।	১ × ২ = ২
।। ÷ ।। = ।	২ ÷ ২ = ১

বুদ্ধিমান শিক্ষকগণ এই দুই অঙ্কের প্রণালী দৃষ্টেই অন্যান্য অঙ্ক শিক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারিবেন।

কাঠীর সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা।—টেবিলের উপর কতকগুলি কাঠী ছড়াইয়া রাখ। বালকগণকে একটী একটী করিয়া গণনা করিতে বল। দশটী হইলেই একটী করিয়া আটী বাঁধিতে বল। কতগুলি হইল? (মনে কর) ৫ আটী, আর ৩টী;—৫ আটীতে ৫০, আর ৩টী, ৫৩। তারপর পার্শ্বের চিত্র অনুসারে কাঠী সাজাইয়া দাও ও যোগ করিতে বল।

৫৪ চিত্র।—কাঠীর দ্বারা যোগ।

আলগা কাঠীগুলি ক্রমে ক্রমে গণিয়া আটী বাঁধ। এক আটী হইল ও ৩ খান আল্‌গা থাকিল। এখন এই আটীর সহিত আর আটীগুলি একত্রিত করিলে, আটটী আটী হইল। আট আটী আর তিনটী, ৮৩ হইল। তার পর বোর্ডে ঐরূপ চিত্র দ্বারা আটী আর কাঠী সাজাইয়া দাও এবং যোগ করিতে বল। এবার বোর্ডে যোগ-শেষ-রেখার নীচে, যোগফল লিখিতে বল, যথা—

৫৫ চিত্র।—কাঠীর দ্বারা যোগফল।

অঙ্ক দ্বারাও ৮৩ লিখিতে বল। বিয়োগ শিক্ষাও এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে। টেবিলের উপর কাঠী ছড়াইয়া রাখ, কতগুলি কাঠী আছে গণ—১২টী কাঠী লইলাম, কয়টী থাকিল? নিম্নের চিত্রানুরূপ কাঠী সাজাও।

৫৬ চিত্র।—কাঠীর দ্বারা অঙ্ক সাজান।

৩টী কাঠী সরাও—কয়টী কাঠী থাকিল? ১৩টী কাঠী সরাও, কয়টী কাঠী থাকিল? ৬টী কাঠী সরাও—কয়টী কাঠী থাকিল? ৮টী কাঠী সরাও—কয়টী কাঠী থাকিল (এবার একটী দশের আটী খুলিতে হইবে)? বোর্ডে কাঠী ও আটীর চিত্র কর। যথা—

৫৭ চিত্র।—কাঠীর চিত্রে বিয়োগ।

ইহা হইতে ১৩টী কাঠী লইলে কয়টী থাকিবে দেখাও? ৭কাঠী লইলে কত থাকিবে ইত্যাদি। তারপর বোর্ডে নিম্নলিখিতরূপ চিত্র অঙ্কিত কর, যথা—

৫৮ চিত্র।—কাঠীর দ্বারা বিয়োগ।

নীচের লাইনে যত কাঠী আছে, উপরের লাইন হইতে তত কাঠী বাদ দিতে হইবে। উপরের ৪টী আল্‌গা কাঠী ও নীচের ৪টী আল্‌গা কাঠী মুছিয়া ফেল। ৪টী কাঠী বাদ গেল। নীচে ২টী আল্‌গা কাঠী থাকিল। নীচের দুইটী দশের আটী ও উপরের দুইটী দশের আটী মুছিয়া ফেল। উপরে দুইটী দশের আটী থাকিল। যথা—

৫৯ চিত্র।—বিয়োগ ফল।

এখন উপর হইতে আরও দুইটা আল্‌গা কাঠী সরাইতে হইলেই একটা আটী খুলিতে হইবে। নীচের দুইটী ও উপরের দুইটী পুঁছিয়া ফেল। এক আটী ও আটটী কাঠী অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে নানা প্রকারে কাঠী সাজাইয়া ও চিত্রাঙ্কন করিয়া যোগ ও বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্রের সাহায্যে যোগ বিয়োগ শিক্ষা।—বল ফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র নিম্নলিখিত রূপ একটী কাঠের আসবাব ঃ—
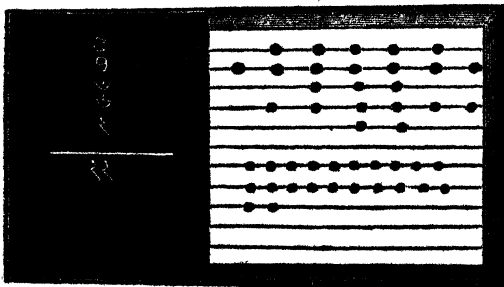
৬০ চিত্র।—বলফ্রেম বা গুঁটীকা যন্ত্র।

এক অংশে তক্তা লাগান ও কাল রং করা। তার উপর চকের দ্বারা অঙ্ক লিখিতে পারা যায়। অপর অংশে তার লাগান—তাহার মধ্যে কতকগুলি কাঠের গুঁটী পরাণ।

এই গুঁটী গুলি সরাইয়া বাম দিকের তক্তা-লাগান-অংশের পশ্চাতে রাখিতে পারা যায়। পশ্চাৎ হইতে সরাইয়া, ইচ্ছামত গুঁটীগুলিকে সম্মুখে আনিতে পারা যায়। চিত্রে প্রথম লাইনে পাঁচটী, দ্বিতীয় লাইনে সাতটী, তৃতীয় লাইনে তিনটী, চতুর্থ লাইনে ছয়টী ও পঞ্চম লাইনে দুইটী গুঁটীকা সরাইয়া আনা হইয়াছে। কতগুলি গুঁটী হইল বালককে গণিতে বল। অপর অংশে, অঙ্কের দ্বারা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে। ডান দিকে গুঁটীর দ্বারা ও বাম দিকে অঙ্কের দ্বারা যোগ ফল দেখান হইয়াছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে, এক সঙ্গে দ্রব্যের ও অঙ্কের দ্বারা যোগ শিখাইতে পারা যায়। এইরূপেই বিয়োগ শিক্ষা দিতে হইবে।

যোগ, বিয়োগ শিক্ষাদানের সাধারণ রীতি।—কর গণনা করিয়া হিসাব করা ভাল অভ্যাস নহে। যোগের নামতা, অন্ততঃ দশের ঘর পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। ৭ আর ৫ এ বার, ৯ আর ৬ এ পনর—এই রকম মুখে মুখেই বলিয়া ফেলিবে। যোগের নামতা শিখাইলে বিয়োগ শিক্ষারও সুবিধা হয়। ৬ আর ৪ এ দশ—দশ হইতে ৪ গেলে যে ৬ থাকিবে তাহা আর পৃথক করিয়া শিখাইতে হইবে না।

কাঠীর সাহায্যে যে যোগ শিক্ষার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতেই সমস্ত কথা বলা হইয়াছে। কেবল "হাতে থাক্‌ল দুই"—এই 'দুই' কি তাহা বলা হয় নাই। 'দুই' অর্থাৎ দুইটী দশের আটী বা দুই দশ; সেইরূপ শতকের ঘরের হইলে দুইটী শতকের আটী বা দুইশ ইত্যাদি ও কাঠীর সাহায্যে বেশ বুঝান যাইতে পারে।

যে সকল বিয়োগে উপরে বড় রাশি ও নীচে ছোট রাশি থাকে তাহা শিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন নয়।

যথা	(১)	(২)					
	৯	৭৪	৭০		৪	৭	৪
	৬	৩২	৩০	+	২	৩	২
	৩	৪২	৪০		২	৪	২

কেবল দ্বিতীয় অঙ্কে ইহাই বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে ৭৪, ৭০ আর ৪; এবং ৩২, ৩০ আর ২; ৭০ হইতে ৩০, ও ৩৪ হইতে ২ বাদ

দিয়া এই অঙ্কের ফল পাওয়া যাইবে। ৭৪ হইতে ৩২ বাদ দিয়া যে ৪ লেখা যায় তাহা ৪০ এর ৪।

যেখানে উপরের স্থানে ক্ষুদ্র ও নীচে বড় রাশি থাকে, সেই খানে বিয়োগের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া একটু কঠিন। ৭৫ হইতে ৪৮ বিয়োগ করিতে হইবে। কাঠীর দ্বারা ৭৫ সাজাও, তাহা হইতে দশকের ৪টী আঁটী সরাও। ৪০ বাদ দেওয়া হইল। এখন আল্‌গা ৫টী কাঠী হইতে, ৮টী কাঠী লওয়া যায় না। কাজেই একটা দশের আটী খুলিয়া লও। আল্‌গা ১৫টী কাঠী হইল। ইহা হইতে ৮টী সরাও। ২টী দশের আটী আর ৭টী কাঠী অর্থাৎ ২৭ থাকিল। এইরূপ অঙ্কের দ্বারা শিক্ষা দিবার সময়ও বামের ঘর হইতে একটা দশ সরাইয়া লওয়া হইল, ইহাই মনে রাখিতে হইবে, যথা—

৭৫	৬	১৫
৪৮	৪	৮
২৭	২	৭

৭ হইতে এক দশ সরাইয়া যে ৫ এর সহিত যোগ করিতে হইল তাহা বুঝাইয়া দিবে। এইজন্য উপরে ছোট অঙ্ক থাকিলে তাহাতে ১০ যোগ করিয়া নাচের অঙ্ক অপেক্ষা বড় করিয়া লইতে হয়। ৫ থাকিলে পনর, ৬ থাকিলে ষোল, ৭ থাকিলে সতর ইত্যাদি, অঙ্কের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে।

যখন বামের অঙ্কের এক দশক সরাইয়া লইলাম, তখন সে অঙ্কেরও এক কমিয়া গেল। সুতরাং ৭কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বিয়োগ দিয়া, ২ নামাইলাম। এ প্রণালীতে ২।১ দিন অঙ্ক কসান যাইতে

পারে। এ প্রণালী * বুঝিবার পক্ষে সহজ ও বুঝাইবার পক্ষে সহজ ; কিন্তু সকল সময় কাজের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। যথা—

```
৪০০২          ৩|৯|৯|১২
৩৬৫৭          ৩|৬|৫| ৭
              ---------
               ৩  ৪  ৫
```

এই সমস্ত শূন্যের স্থান পূরণ করিয়া লইতে হইলে ৪ হইতে ১০০০ সরাইয়া, তাহা হইতে ১০০ সরাইয়া, তাহা হইতে আবার ১০ সরাইতে হইবে। অনেক হিসাব বাধিয়া গেল। সেইজন্য উপরের অঙ্কে এক বাদ না দিয়া নীচের অঙ্কে এক যোগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাও বালকগণকে এক রকমে বুঝাইতে পারা যায়। সেই পূর্ব্বের অঙ্কে, ৭কে ৬ মনে করিয়া, তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া, ২ রাখিয়াছিলাম। আর ৭কে ৭ই রাখিয়া, ৪কে ৫ মনে করিয়া, ৭ হইতে বাদ দিলেও ২ থাকে। সুতরাং উপর হইতে ১ বাদ দেওয়াতে যে ফল, নীচের অঙ্কে ১ যোগ করাতেও সেই ফল। কাজেই যোগ করিয়া করাই সুবিধা। বালকেরা সহজে না বুঝিলে, বুঝাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিও না—কেবল এই প্রণালীতে অঙ্ক কসাইয়া যাও। আগে কৌশল অভ্যস্ত হইয়া যাউক, শেষে কারণ আপনিই বুঝিবে।

গুণন।—নামতাই গুণনের প্রাণ। বালকগণকে উত্তমরূপ নামতা শিখাইতে হইবে। নিম্ন প্রাইমারীতে ১০এর ঘর পর্য্যন্ত, উচ্চ প্রাইমারীতে ১৬এর ঘর পর্য্যন্ত এবং ছাত্রবৃত্তিতে ২০এর ঘর পর্য্যন্ত। নামতা শেখা নিতান্তই দরকার। অনেক পাঠশালায় নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতেই ২০এর ঘর পর্য্যন্ত নামতা শেখান হইয়া থাকে। ডাক পড়িয়া নামতা শেখা উত্তম পদ্ধতি।

* সে কালের পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা, উপরের লাইনের দশকাদির অঙ্ক হইতে, এক দশক সরানকে 'উপর ছাঁটা' ও নীচের লাইনে ১ যোগ করাকে 'নীচে আঁটার' নিয়ম বলিতেন।

এক অঙ্কের দ্বারা, এক অঙ্কের গুণন শিখান সহজ। এক অঙ্ক দ্বারা একাধিক অঙ্কের গুণন শিখানও সহজ, তবে একটু বুঝাইয়া দিতে হয়। যথা—

```
 ৩৭              ৩০ | ৭
  ৫               ৫ | ৫
----            ---------
১৮৫             ১৫০+৩৫
```

উপরের অঙ্কের স্থানীয় মান লিখিয়া ৫ এর দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে গুণ করিয়া গুণফল যোগ করতঃ বুঝাইয়া দিবে। দশের দ্বারা অনেকগুলি অঙ্ককে গুণ করিয়া দেখাইয়া দিবে যে সেই সেই অঙ্কের পীঠে একটা শূন্য দিলেই, দশের দ্বারা গুণের কাজ শেষ হয়। তারপর ২০ ও ৩০ এর দ্বারা কতকগুলি সংখ্যাকে গুণ করিয়া শিখাইতে হইবে। যথা

```
 ৪৬৭             ৪৬৭
  ২০              ১০
-----           -----
৯৩৪০            ৪৬৭০
                   ২
                -----
                 ৯৩৪০
```

এখানে ২০কে তাহার উৎপাদক সংখ্যায় বিভক্ত করিয়া গুণ করা হইল। সুতরাং ২০,৩০ প্রভৃতি দ্বারা গুণ করিতে হইলে ২,৩ ইত্যাদি দ্বারা গুণ করিয়া—ডান দিকে একটা শূন্য বসাইয়া দিলেই হইল। ইহার পর দুই সংখ্যা দ্বারা গুণ শিখাইতে হইবে।

```
  ৩২৭             ৩২৭
   ৪৬              ৪৬
------          ------
  ১৯৬২            ১৯৬২
 ১৩০৮০           ১৩০৮
------          ------
 ১৫০৪২           ১৫০৪২
```

৬ এর দ্বারা গুণ করিয়া পরে ৪০ এর দ্বারা গুণ করা হইল। দশকের সংখ্যা দ্বারা গুণ করিবার সময় যে আমরা কেন ডাহিনের এক ঘর সরাইয়া অঙ্ক লিখিতে আরম্ভ করি তাহা এইরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এখানে ৪ এর দ্বারা গুণ করার অর্থ—৪০এর দ্বারা গুণ। সুতরাং এককের

ঘরে যে শূন্য পড়িবে তাহা না লিখিলেও চলে, কারণ কোন সংখ্যাকে শূন্যের সহিত যোগ করিলে বা না করিলে ফলের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। আর এক কথা, যে রাশি দ্বারা গুণ করা যায় তাহাকে 'গুণক', আর যে রাশিকে গুণ করা যায় তাহাকে 'গুণ্য' কহে—ইহা বালকদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে।

ভাগ।—গুণ যেমন যোগের সহজ উপায়, ভাগ তেমন বিয়োগের সহজ উপায়, তাহাই প্রথমে বুঝাইয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ—৮এর মধ্যে ২ কত বার আছে?

```
 ৮
 ২
---
 ৬
 ২
---
 ৪
 ২
---
 ২
 ২
---
 ০
```

৮ এর মধ্যে ২ চারি বার আছে। এইরূপ আরও কয়টী সহজ সহজ অঙ্ক কসাইতে হইবে।

বিয়োগের ফল সহজে বাহির করার নাম ভাগ—ইহাই দেখাইয়া দিবে ও বুঝাইয়া দিবে। ভাগ অঙ্ক সহজে লিখিবার ধারা—

```
২)৮(৪
  ৮
 ---
```

প্রথমে অবশ্য এক অঙ্কের দ্বারা ভাগ শিখাইবে। আবার যে সকল অঙ্কে অবশিষ্ট থাকে সে গুলি দিবে না। তারপর দুই অঙ্কের কথা—

```
৩) ৬৯ (২৩      ৩) ৬০ (২০      ৩) ৯ (৩       ২০
   ৬              ৬০              ৯           ৩
  ---                            ---         ---
    ৯                                         ২৩
    ৯
   ---
```

এই বারে ৬৯কে, ৬০ আর ৯এ (স্থানীয় মান) বিভক্ত করিয়া, ৩ এর দ্বারা পৃথক পৃথক ভাগ দিয়া দেখাইবে। তারপর অবশিষ্টের

কথা। এবারও প্রথমে বিয়োগের প্রথার ব্যাখ্যান আরম্ভ করিবে। যথা ৯ এর মধ্যে ২ কতবার আছে?

৯ এর মধ্যে ২ চারি বার আছে; কিন্তু তবুও এক থাকিয়া যায়। ৯টা পয়সা ৪ জন বালককে ভাগ করিয়া দাও। একটা পয়সা থাকিয়া যায়। এর নাম অবশিষ্ট। এখন ৯কে ২ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট লিখিবার রীতি দেখাও

```
 ৯
 ২
---
 ৭
 ২
---
 ৫
 ২
---
 ৩
 ২
---
 ১
```

```
২) ৯ (৪
   ৮
   --
   ১
```

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া, পরে দুই অঙ্কের যে সকল ভাগে অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অঙ্ক আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহারও প্রথমে দশকে যেন অবশিষ্ট না থাকে। প্রথম এককে অবশিষ্ট, পরে দশকাদিতে; যথা—

```
(১)    ৩) ৬৮ (২২        (২)    ৩) ৭৯ (২৬
          ৬                        ৬
          --                       --
           ৮                       ১৯
           ৬                       ১৮
           --                      --
           ২                        ১
```

দ্বিতীয় অঙ্কে দশকের ৭, ৩ দ্বারা ভাগে মিলিল না। ১০ অবশিষ্ট থাকিলে, তাহার সহিত ৯ যোগে ১৯ হইল। এরূপ বুঝাইতে গেলে বালকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে ১০ অবশিষ্ট রাখিবার কারণ কি, ১০ কেত ৩ দ্বারা বেশ ভাগ করা যায়। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, আমরা ৭কে ভাগ করি নাই, ৭০কে ভাগ করিয়াছি। ৩ দ্বারা ভাগ করিলে এক এক ভাগে ২০ করিয়া পড়ে। অবশিষ্ট ১০কে, আর দশ দশ করিয়া ভাগ করা যায় না। কাজেই সেই দশের সঙ্গে ৯ যোগ করিয়া যে ১৯ হইল, তাহাকে ৩ দ্বারা ভাগ করিয়া, প্রত্যেক ভাগে ৬ অঙ্ক হইল ১ অবশিষ্ট রহিল। যদি শিক্ষক ৭ খান দশ টাকার নোট ও ৯টা

টাকা আনিয়া বালকগণকে ভাগ করিতে বলেন, তবে তাহারা এ অঙ্ক বেশ বুঝিবে। অভাব পক্ষে দশের আটীর দ্বারাও বেশ বুঝান যাইবে। ৩ ভাগ করিতে গেলেই, এক এক ভাগে প্রথমে দুইটী করিয়া দশের আঁটী পড়িবে। আর যে আঁটী থাকিবে, তাহা না খুলিয়া ভাগ করা যাইবে না।

এক কথা বালকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা দ্রব্যকে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি। দশটী হাতীকে ৫ দিয়া ভাগ করা যায়, কিন্তু ১০টা হাতীকে ৫টা হাতী দিয়া ভাগ কবা যায় না। ভাজ্য ও ভাজক কাহাকে বলে তাহাও বলিয়া দিবে।

মিশ্র নিয়ম।—টাকা আনা প্রভৃতির অঙ্কগুলি শিখাইতে হইলে প্রথমে বালকগণকে মুদ্রাগুলি দেখান দরকার। আর তাহার ব্যবহার শিখানও দরকার। ধারাপাতের অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। যাহা হউক ইংরাজী মিশ্রনিয়ম শিক্ষা করা অপেক্ষা, আমাদের দেশী নিয়ম শিক্ষা করা সহজ। আমাদিগের ধারাপাতের অঙ্কগুলি বেশ বুদ্ধি বিবেচনা ও কৌশলে গঠিত। কিন্তু সকল ধারা অপেক্ষা, ফরাসীস মেট্রিক ধারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সভ্যদেশে এই মেট্রিক ধারা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল ইংরাজ জাতি কুসংস্কারবশতঃ তাঁহাদিগের পুরাতন ধারা ধরিয়া আছেন বলিয়া, আমাদের দেশেও ইংরাজী ও আমাদের পুরাতন ধারা চলিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে যেরূপ মেট্রিক ধারা গৃহীত হইতেছে, তাহাতে ইংরাজ জাতি যে আর অধিক কাল তাঁহাদিগের সেই পুরাতন জটিল ধারা ধরিয়া থাকিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না।

টাকাপয়সা বিষয়ক মিশ্র নিয়মই প্রথম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ায় পূর্ব্বে ১ টাকায় কয় শিকি, কয় আনা, কয় পয়সা ইত্যাদি ভাগ করিয়া দেখান আবশ্যক। তারপর ২ টাকায় কত শিকি হয়, কত আনা হয়, কত পয়সা হয় ইত্যাদি।

এই সমস্ত অঙ্ক, বালকেরা গুণ করিয়া কসিতে শিখিবে। আর ঐরূপ, এত পয়সায় কত আনা, সিকি, টাকা; এত আনায় কত সিকি ও টাকা; এত সিকিতে কত টাকা ইত্যাদি ভাগ করিয়া কসিতে শিখিবে। এইরূপে মন, সের, বিঘা, কাঠা বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে।

যোগের প্রথমে কেবল টাকা আনা দিয়া আরম্ভ করিবে, তারপর গণ্ডা ও কড়া। দুই চারিটী অঙ্ক পাই দিয়াও কসাইবে, কারণ এখন কড়া উঠিয়া গিয়াছে। কতগুলি আনা একত্র করিয়া কত শিকি (চোক) হইল আর কতগুলি শিকি একত্র হইলে কত টাকা হইল, ইহা বুঝিতে পারিলেই যোগশিক্ষা হইল। বিয়োগে একটু কষ্ট আছে, যথা নিম্নলিখিত অঙ্কে :—

৫।৶৹
২৷৹
———
২৸৶৹

এখানে এক আনা আর দুই আনা হইলেই তিন আনা মিলে, তাহা সহজেই বুঝা গেল। কিন্তু দুই শিকি থেকে কেমন করে তিন সিকি বাদ দেওয়া যায়? সেই যেমন অমিশ্র বিয়োগের সময় এক দশ সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপ ৫ হইতে ১ টাকা বা চারি সিকি সরাইতে হইয়াছে। তাহা হইলে উপরে ৬ সিকি হইল, তাহা হইতে এখন তিন সিকি বাদে, তিন সিকি নামিল। ৫এর স্থানে ৪ থাকিল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলে ২ নামিল। এ হইল "উপর ছাঁটা" নিয়ম। কিন্তু এ সকল অঙ্ক "নীচে আঁটার" নিয়মে কসাই সুবিধা। এই 'নীচে আঁটার' নিয়ম অমিশ্র বিয়োগে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এখানেও তাহাই প্রযুজ্য। তারপর গুণের কথা। ৫৵৬ কে ৫ দিয়া গুণ করিবার পূর্ব্বে, ৫৵৬কে ৫ বার লিখিয়া যোগ করিয়া দেখান কর্ত্তব্য। দুই অঙ্ক দ্বারা গুণ করিতে হইলে, সেই

অঙ্কটীকে ভাগভাগ করিয়া নিলে অনেক সময় হিসাবের সুবিধা হয়। মনে কর ৫৸/৬ গণ্ডাকে ৪২ দিয়া গুণ করিতে হইবে। এখন ৫৸/৬কে প্রথমে ৬ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৭ দিয়া গুণ করিলেই ৪২ দ্বারা গুণ করার ফল হয়। যদি ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হয়, তবে প্রথমে ৫ দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণফলকে ৯ দিয়া গুণ করিলে ৪৫ দ্বারা গুণ করার কাজ হইল। তারপর ৫৸/৬কে ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল, ৪৫ দ্বারা গুণ করিয়া যে ফল হইয়াছে তাহার সহিত যোগ কর। ৪৭ দ্বারা গুণের কাজ হইল। যথা :—

একেবারে ৪৭ দিয়া গুণ করিতে হইলে, ৬কে ৪৭ দিয়া গুণ করিয়া যত গণ্ডা হইল, তাহাকে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া আনা বাহির করিতে হইবে ইত্যাদিরূপ প্রণালী সময় সময় কষ্টকর বলিয়া মনে হয়। আর ৫, ৯, ২ দিয়া বেশ মুখে মুখে গুণ করা যায়। যাহা হউক, দুই রকম প্রণালীই শিক্ষা করিতে হইবে। মিশ্র পূরণের আর একটী রীতি প্রচলিত আছে। ৫৸/৬ কে ১০ দিয়া গুণ করিবে এবং উহার ডানদিকে ৫৸/৬কে ৭ দিয়া, এবং ১০ দ্বারা পূরণের ফলকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া, যোগ করিলেই ফল নির্ণীত হয়। যথা :—

৫৸/ ৬ × ৭ = ৪০৸/২ ৭এর গুণফল
১০
৫৮৸/ × ৪ = ২৩৫। ৪০এর গুণফল
২৭৬৶/২ ৪৭ এর গুণফল

ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

জমা খরচ।—প্রথম কিরূপে সংসারের বাজার খরচ লিখিতে হয়, তাহাই শিখাইতে হইবে। বালককে একটা টাকা বা এক টাকার পয়সা দাও। পয়সা দাও বা পয়সার পরিবর্ত্তে তেঁতুলের বীজ দিয়া বল, সে গুলিই যেন পয়সা। তুমি নিজে দোকানী সাজ। বালকের নিকট (মনে কর) ✓৫ পয়সার মাছ, ✓১০ পয়সার চাউল, ৻৹ পয়সার পান, /০ আনার লঙ্কা, ৻৫ পয়সার আলু ইত্যাদি বিক্রয় করিলে। এখন বালককে হিসাব লিখিয়া দিতে বল। কেমন করিয়া লিখিয়া দিবে বলিয়া দিও না—বালক কি করে তাহাই দেখ। বালক অবশ্য তার মত একটা লিখিয়া আনিবে। সেই সময় তুমি বোর্ডে বা বালকের স্লেটে হিসাব লিখিবার একটা সহজ ধারা দেখাইয়া দিবে। এইরূপে ধীরে ধীরে কঠিন বিষয় শিখাইতে হইবে। জমিদারী ও মহাজনী কাগজ পত্রের মধ্যে অনেকগুলি এমন কঠিন আছে যে তাহা বালকগণকে সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। এ সকল নিজে ব্যবসায় বাণিজ্য না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। তবে সহজ সহজ কাগজগুলি বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। বাজার খরচ লেখা, ধোপার হিসাব লেখা, জমির ধানের হিসাব লেখা ও মজুর খাটাইবার হিসাব লেখা প্রত্যেক বালক বালিকারই জানা উচিত।

জমিদারী কাগজের মধ্যে দাখিলা, চিঠা, জমাবন্দি ও মহাজনী কাগজের মধ্যে জমাখরচ (রোকড়) ও খতিয়ান শিক্ষা দিলেই চলে।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু.।—গুণনীয়ক ও গুণিতক কথা দুইটী উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ১৬ কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে কিছুই থাকে না; ৪, ১৬ এর গুণনীয়ক আর ১৬, ৪ এর গুণিতক। তার পর "সাধারণ" কথার তাৎপর্য্য কি তাহা বলা আবশ্যক। ১৮ আর ১২ এই দুই রাশির সাধারণ গুণনীয়ক ২; ২ দ্বারা উক্ত দুই রাশিকেই ভাগ করা যায়। ৩ ও ইহাদের সাধারণ গুণনীয়ক। কারণ ৩ দ্বারাও দুইটী রাশিকে ভাগ করা যায়। সেইরূপ ৬ ও একটী সাধারণ গুণনীয়ক। আর

কোন সাধারণ রাশি দ্বারা ১৮ ও ১২ উভয় অঙ্ককেই ভাগ করিয়া মিলান যায় না। ৯ দিয়া ১৮ কে ভাগ করা যায় বটে, কিন্তু ১২ কে ভাগ করা যায় না। সুতরাং ৯ সাধারণ গুণনীয়ক হইল না। এখন ২, ৩, ৬ কেবল এই তিনটী রাশিই সাধারণ গুণনীয়ক হইল। ইহাদের মধ্যে ৬ই সকলের অপেক্ষা বড়। ভাল কথায় 'বড়'কে 'গরিষ্ঠ' বলে। অতএব ৬, ১২.ও ১৮ এর গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। আবার ৩ ও ৪ এই দুই রাশির দ্বারাই ২৪কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। অতএব ২৪, ৩ ও ৪ এই দুই রাশির সাধারণ গুণিতক। এইরূপ, এই দুই রাশি দ্বারা ৩৬ কে ভাগ করিলে মিলিয়া যায়। ১২কে ভাগ করিলেও মিলিয়া যায়। সুতরাং ১২, ২৪, ৩৬ সকল রাশিই ৩ ও ৪ এর সাধারণ গুণিতক। ১৮ কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দ্বারা ভাগ করিলে মিলে না। অতএব ১৮ সাধারণ গুণিতক হইল না। তাহা হইলে ১২, ২৪, ৩৬ ,৪৮ প্রভৃতিই সাধারণ গুণিতক। এখন ইহার মধ্যে ১২ সকলের ছোট। ১২ এর ছোট এমন আর কোন রাশিই নাই যাহাকে ৩ ও ৪ দিয়া ভাগ করিলে ভাগ শেষ থাকিবে না; ৯কে ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না। আর ৮কে ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলে, কিন্তু ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলে না। সুতরাং ১২ই সকলের ছোট সাধারণ গুণিতক। ছোটকে ভাল কথায় 'লঘিষ্ঠ' বলে। ১২, ৩ ও ৪ এর 'লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক'।

এই সময়ে বালকগণকে কতকগুলি সাধারণ ভাগের নিয়ম শিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যথা যুগ্ম রাশিকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, যে রাশির শেষে ৫ বা ০ থাকে তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায়, রাশির অঙ্ক গুলির যোগ ফলকে যদি ৩ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় তবে সে রাশিকেও ৩ দ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যাইবে ইত্যাদি।

গ. সা. গু. ও ল. সা. গু. অঙ্ক কসিবার যে কৌশল পাটীগণিতে লিখিত আছে, তাহা ছাড়া আর কোন সুবিধাজনক কৌশলই নাই। তবে সেই কৌশলে অঙ্ক কসিলে কেন যে ফল পাওয়া যায়, তাহা বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহার যুক্তি বালকেরা এমতাবস্থায় বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা। কেবল অঙ্ক কসিবার কৌশল শিখাইয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

ভগ্নাংশ।—কোন ইনস্পেক্টার একটী নূতন স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া শিক্ষককে ভগ্নাংশ শিক্ষাদিতে আদেশ করেন। শিক্ষক ২ খান সমান কাঠী আনিয়া, এক খানিকে অসমান ৩ অংশে বিভক্ত করতঃ, তাহার এক খণ্ড হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন "এই একখান আস্ত কাঠী; আর এই এক এক খণ্ড উহার ভগ্ন অংশ বা ভগ্নাংশ।" তারপর তিনি বোর্ডে এইরূপ লিখিলেন "একটী পূর্ণ দ্রব্যের যে কোন অংশকে ভগ্নাংশ কহে।" ইনস্পেক্টার পরিদর্শন পুস্তকে লিখিয়া গেলেন "অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত না করিলে সাহায্য দেওয়া যাইবে না"। অনেক শিক্ষকেরই এরূপ ভুল বিশ্বাস আছে। ভগ্নাংশ, ভগ্ন অংশ বটে, কিন্তু সমান সমান ভগ্ন অংশ, অসমান নহে। ৩ খান সমান কাঠী লও। প্রত্যেক খানি যেন ২ ফুট করিয়া লম্বা। এক খানি আস্ত রাখ, এক খানিকে সমান তিন ভাগে (৮ ইঞ্চ করিয়া) ভাগ কর, আর এক খানিকে অসমান ৩ অংশে ভাগ কর। যথা—

(১) ————————————

(২) ———— ———— ————

(৩) ———— —— ————

প্রথম খানি সমস্ত কাঠী; দ্বিতীয় চিত্রে সমস্ত কাঠীর "ভগ্নাংশ"; ৩য় চিত্রে সমস্ত কাঠীর "খণ্ডাংশ" সূচিত হইয়াছে।

ভগ্নাংশ শিক্ষা দানের পক্ষে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রদ—

একটা আলুকে (গোলাকার হইলেই ভাল) সমান ২ ভাগে কাট। এখন এই প্রণালীতে বুঝাইতে আরম্ভ কর:—

১। আমার বাম হাতে আলুর অৰ্দ্ধেক, ডান হাতে আলুর অপর অৰ্দ্ধেক।

২। এখন দুই হাতের দুই অৰ্দ্ধেক একত্র করিলাম, কি হইল? উঃ আস্ত একটা আলু হইল।

৩। এই আস্ত আলু হইতে অৰ্দ্ধেক সরাইলাম, হাতে কি থাকিল? উঃ অৰ্দ্ধেক থাকিল।

৪। তাহা হইলে একটা জিনিষের অৰ্দ্ধ বাদ দিলে (অৰ্দ্ধ খণ্ড সরাইলে) কত থাকে? উঃ অৰ্দ্ধেক থাকে।

৫। আবার দুই অৰ্দ্ধেক একত্র করিয়া যোগ করিলে কত হয়?—এক হয়।

আবার প্রত্যেক অৰ্দ্ধ অংশকে দুই ভাগ কর। সম্পূর্ণ আলুটী চার অংশে বিভক্ত হইল। বালকদিগকে এখন দেখাও

১। এখন আলুর কয় ভাগ হইল? উঃ—এখন আলুর চার সমান ভাগ হইয়াছে।

২। এখন চার ভাগ এক সঙ্গে করিলাম, কি হইল? এখন আবার একটা আলু হইল।

৩। এখন এই আলু থেকে চার ভাগের ১ ভাগ সরাইলে, কি থাকিল? চার ভাগের তিন ভাগ থাকিল।

৪। এখন চার ভাগের দুই ভাগ সরাইলে, কত থাকিল? চারভাগের ২ ভাগ থাকিল।

৫। অৰ্দ্ধেক সরাইলে যেরূপ হইয়াছিল, এখনও তাহাই হইল কিনা? তবে অৰ্দ্ধেক বা, চার ভাগের ২ ভাগও তাই।

৬। এই চার ভাগের তিন ভাগ সরাইলে কত থাকিল?

৭। এইবার, এই ১ ভাগের সঙ্গে, আর এক ভাগ যোগ করিলাম কত হইল? এবারে ৪ ভাগের দুই ভাগ বা অৰ্দ্ধেক হইল।

৮। এই বারে, চার ভাগের দুই ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলে কত হইল? চার ভাগের তিন ভাগ।

৯। এইবারে চার ভাগের তিন ভাগের সঙ্গে আর এক ভাগ যোগ দিলাম ইত্যাদি।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ মুখে মুখে শিখাইতে পারা যায়। এইরূপ শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{২}{৩}$, $\frac{৩}{৪}$ প্রভৃতি অঙ্ক লেখা শিক্ষা দিতে হইবে ও যখন প্রশ্ন করিবে যে 'আলুর চার ভাগের তিন ভাগ ও চার ভাগের এক ভাগ যোগ করিলাম, কত হইল ?'—তখন বোর্ডে ও লিখিতে হইবে

$$\frac{৩}{৪} + \frac{১}{৪} = ?$$

বালকেরা উত্তরের স্থান পূর্ণ করিবে। কাঠী বা কাগজের টুকরা ভাগ করিয়াও এইরূপ শিক্ষা দেওয়া চলে। এই প্রণালীতে অন্ততঃ ৫ এর ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলে যদি কিণ্ডারগার্টেন বাক্স থাকে তবে নিম্ন লিখিত রূপে ছক সাজাইয়া ভগ্নাংশ শিক্ষা দেওয়া যায়।
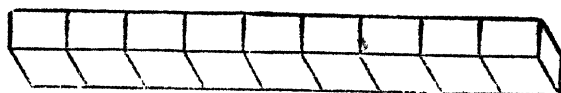
৬১ চিত্র।—ছকের সাহায্যে ভগ্নাংশ।

এইরূপে ৯টা ছক সাজান হইল। এই সমস্তটাকে একটা অর্থাৎ একখান বেঞ্চ মনে করা হইল। এই বেঞ্চকে ৯ সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এখন ইহা হইতে ১টা বা ২টা করিয়া ছক তুলিয়া লও বা যোগ কর আর বালকগণকে প্রশ্ন কর। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডের উপর লিখিয়াও দেখাও। কিণ্ডারগার্টেন বাক্স না থাকিলে, এই রূপ কতকগুলি মাটীর ছক করিয়া লইলেও চলে।

লব ও হর কথা দুইটীর অর্থ বুঝাইবে ও কোনটীকে লব বলে আর কোনটীকে হর বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিবে। বোর্ডে নিম্নের চিত্রানুরূপ চিত্র করিয়া বুঝাইবে :—
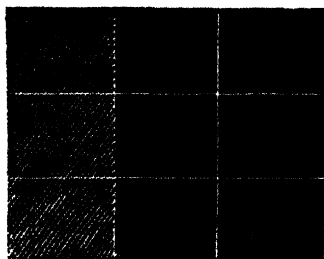
৬২ চিত্র।—চিত্রের সাহায্যে লব হর শিক্ষা।

এই ক্ষেত্রটীকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক অংশ $\frac{১}{৯}$। সাদা অংশ $\frac{৩}{৯}$। কাল অংশ $\frac{৬}{৯}$। এইরূপ বোর্ডের উপর অন্যান্য অংশ চকের দ্বারা রঙ্ করিয়া বালকগণকে $\frac{২}{৯}$. $\frac{৫}{৯}$, $\frac{৮}{৯}$ প্রভৃতি বুঝাইতে ও শিখাইতে হইবে।

অপ্রকৃত ভগ্নাংশ শিক্ষা দিতে হইলে এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে: ৬১ চিত্রের মত ৯টী ছক সাজাও। মনে কর ১ খানা আস্ত বেঞ্চকে ৯ সমান অংশে ভাগ করা হইয়াছে। সমস্ত জিনিষটা $\frac{৯}{৯}$ অর্থাৎ ৯ ভাগের ৯। এখন আরও দুইটী সমান ছক আনিয়া এই কল্পিত বেঞ্চের উপর রাখ। এখন $\frac{১১}{৯}$ এইরূপ ভগ্নাংশ দাঁড়াইল অর্থাৎ সম্পূর্ণ একখান বেঞ্চ, আর $\frac{২}{৯}$ ভগ্ন বেঞ্চ, ইহাই লিখিবার সময় $\frac{১১}{৯}$ বা ১$\frac{২}{৯}$ লেখা হইয়া থাকে। প্রকৃত ও অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাহাকে বলে, এখন শিখাইয়া দাও। তারপর ভগ্নাংশের সামান্য সামান্য বিষয় নিম্নের অনুরূপ চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও :—

$\frac{১}{৩}$ × ২ কত ?

নিম্নের চিত্রে একটা আস্ত জিনিষকে (মনে কর একখণ্ড কাগজকে) ৬ সমান ভাগ করা হইয়াছে। এক একটি অংশ ক্ষেত্রের $\frac{১}{৬}$, আর দুইটী অংশ ক্ষেত্রের $\frac{২}{৬}$। এইরূপ দুই অংশকে আবার ২ বার নিতে হইবে। তাহা হইলে ২টা ২টা করিয়া ৪টা অংশ হইল। সুতরাং ৪টা ঘর, সমস্ত ক্ষেত্রের $\frac{৪}{৬}$। আবার ক্ষেত্রকে ৩ ভাগ করিলে, এই ৩ ভাগের ২ ভাগে, পূর্ব্বের ৬ ভাগের ৪ ভাগ থাকে। কাজেই $\frac{৪}{৬}$ ক্ষেত্রের যে অংশ, $\frac{২}{৩}$ ও তাই। $\therefore \frac{৪}{৬} = \frac{২}{৩}$।
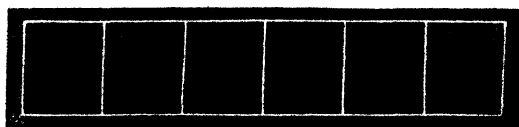
৬৩ চিত্র।—ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ।

২ এর $\frac{৫}{৬}$ = কত? সমান দুইটী ক্ষেত্রকে ৬ ভাগ করিয়া বুঝান যাইতে পারে।
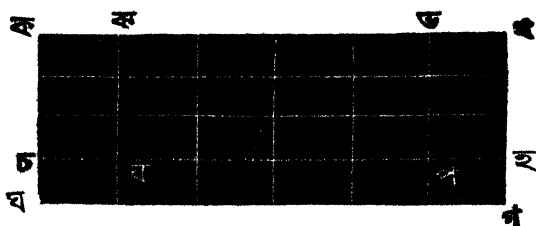
৬৪ চিত্র।—ক্ষেত্রের সাহায্যে ভগ্নাংশের গুণ।

$\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{৫}{৬}$ কত?

কখগঘ যেন আর একখণ্ড কাগজ। এবারে লম্বালম্বী ৬ ভাগে ও আড়াআড়ি ৪ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে (৪ ও ৬ আমাদের অঙ্কের হর বলিয়া ৪ আর ৬ ভাগে ভাগ করা হইল)। এখন দেখ কচহখ সমস্ত ক্ষেত্রের ৪ ভাগের ৩। আবার কচযক্ষ, কচহখ এর $\frac{১}{৬}$ অর্থাৎ $\frac{৩}{২৪}$ ক্ষেত্রের

৫/৬ ; এইরূপে কচপভ ক্ষেত্রাংশ (সাদা দাগ চিহ্নিত অংশ) ১৫/২৪ ক্ষেত্রের ৫/৮, এই অংশই আমাদের অঙ্কের উত্তর। সমস্ত ক্ষেত্র ২৪ অংশে বিভক্ত হইয়াছে ; কচপভ অংশে ১৫ ভাগ আছে। তাহা হইলে কচপভ অংশ ২৪ ভাগের ১৫ ভাগ। সুতরাং

$$\frac{৩}{৪} \text{এর} \frac{৫}{৬} = \frac{১৫}{২৪} = \frac{৫}{৮}$$

ভগ্নাংশের বড় বড় অঙ্ক কসিবার প্রণালী বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ প্রদর্শিত যে প্রণালী, তাহাই উত্তম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। বড় অঙ্ক হইলে একেবারে ধারাবাহিক রূপে সমস্ত অংশ এক সঙ্গে না কসিয়া, অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কসিয়া তাহাদের ফল একত্র করিলেই চলিতে পারে। এই প্রণালীতে একটী অঙ্ক পরিশিষ্টে (খাতার নমুনায়) কসিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দশমিক ভগ্নাংশ।—এও ভগ্নাংশ, তবে এই পার্থক্য যে দশমিক ভগ্নাংশে দ্রব্য গুলিকে ১০ সমান ভাগে (বা দশের কোন শক্তির) ভাগ করা হয়। ৳ সাধারণ ভগ্নাংশ, দশমিক নহে। ৳ সাধারণ ভগ্নাংশও বটে, দশমিক ভগ্নাংশও বটে। নিম্ন লিখিতরূপ দু চারটী অঙ্কের দ্বারা অখণ্ড সংখ্যা ও দশমিক ভগ্নাংশের ভাব বুঝাইতে পারা যায় :—

৬৬৬৬·৬৬৬৬ = ৬০০০ + ৬০০ + ৬০ + ৬ + ·৬ + ·০৬ + ·০০৬ + ·০০০৬।

দশমিকের যোগ, বিয়োগ ও গুণ শিক্ষা দেওয়া সহজ। ভাগ শিক্ষা দেওয়াও যে কঠিন তাহা নহে, তবে বালকেরা অনেক সময় ভাগফলে দশমিক স্থান নির্দ্দেশ করিতে গোলমাল করিয়া থাকে। যখন দশমিকের স্থান বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তখন ভাজক ও ভাগফলে গুণ করিয়া পরীক্ষা করিবে। গুণ্য ও গুণকের দশমিক স্থান যোগ

করিয়া, গুণফলে দশমিক স্থাপন করিতে হয়, ইহা জানা আছে। এখন যদি ভাগফলে চিহ্নিত দশমিক স্থান ও ভাজকের দশমিকের স্থানের সংখ্যা যোগ করিয়া দশমিক চিহ্ন দিলে, ভাজ্যের দশমিক স্থান না মিলে, তবেই বুঝিতে হইবে ভাগফলে দশমিকের স্থান ঠিক হয় নাই। এখন যাহাতে মিলে ভাগফলে এরূপ স্থানে দশমিকের চিহ্ন ঠিক করিয়া দিতে হইবে। ইহা ছাড়া ভাজ্য বা ভাজকে আবশ্যক মত শূন্য বসাইয়া দশমিক অংশ সমান করিয়া নিলেও অনেক সময় সুবিধা হইয়া থাকে।

অসীম ও সসীম দশমিক।—কতকগুলি অঙ্ক কসিয়া দেখাও যে সকল দশমিকই সসীম হয় না যথা ঃ—

$\frac{৪}{১০}$ = ·৪	$\frac{৩}{১১}$ = ·২৭২৭২৭...
$\frac{৩}{৫}$ = ·৬	$\frac{৪}{৭}$ = ·৫৭১৪২৮৫৭...
$\frac{৫}{১৬}$ = ·৩১২৫	$\frac{৮}{৯}$ = ·৮৮৮৮....

এখন দেখা যাইতেছে, যে সকল রাশির হর ২ কি ৫ বা ইহাদের কোন গুণিতক, কেবল সেই সকল রাশিকেই সসীম দশমিকে পরিবর্ত্তিত করা যায়।

অসীম বা পৌনঃপুনিক দশমিকের নীচে ৯ লেখে কেন এইরূপে বুঝান যাইতে পারে :—

একবার ·৩̇ = ·৩৩৩৩৩......

দশ বার ·৩̇ = ৩·৩৩৩৩......

এই দশবার ·৩̇ হইতে একবার ·৩̇ বাদ দিলে থাকে ৯ বার ·৩̇

আবার অপর দিকে ৩·৩৩৩৩... হইতে ·৩৩৩৩. দ ব দিলে থাকে কেবল ৩। সুতরাং

৯ × ·৩̇ = ৩

দুই দিক ৯ দিয়া ভাগ করিলে

·৩̇ = $\frac{৩}{৯}$

সাঙ্কেতিক।—দোকানদারেরা গুণ করিয়া জিনিষের দাম হিসাব করেনা। তাহারা যেরূপ সঙ্কেতে জিনিষের দাম হিসাব করে, তাহাকেই সাঙ্কেতিক কহে। সাঙ্কেতিক হিসাব সহজ ও অনেক সময় মুখে মুখে করা যায়। সরল অবস্থায় যে ভগ্নাংশের লব 'এক', তাহাকেই সাঙ্কেতিকের সমাংশক কহে। ১/২, ১/৬, ১/১২ সমাংশক, কিন্তু ২/৩, ৩/১৬, ৫/৮ সমাংশক নয়। সমাংশকের সাহায্যে আমরা কেবল মাত্র ভাগ করিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া লই। কিন্তু অন্যরূপ ভগ্নাংশ হইলে কেবল ভাগে কুলায় না। ভাগের পরে আবার গুণ করিতে হয়। আবার সমাংশকের হর যত ছোট হয়, ততই কাজের সুবিধা হইয়া থাকে। যে কোন ভগ্নাংশকে আবশ্যক মত সমাংশকে পরিণত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) ৭/২০ এই ভগ্নাংশকে 'সমাংশকে' পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, প্রথমে ইহার হরের উৎপাদক নির্ণয় করা আবশ্যক। ১,২,৩,৪,৫,১০, ২০—এই সংখ্যাগুলিই ২০ এর উৎপাদক। এই সকল উৎপাদকের মধ্যে ১+২+৪ যোগ করিয়া ৭ (লব) মিলান যায়। আবার ৫+২ করিলেও ৭ মিলে। এখন ১/২০, ২/২০, ৪/২০ হইলে, ১/২০, ১/১০, ১/৫ এইরূপ সমাংশক হয় ও ৫/২০, ২/২০ লইলে ১/৪, ১/১০ এইরূপ সমাংশক হয়; তবে কোন্ সমাংশক লইতে হইবে? ১/৪ ও ১/১০ লওয়াই সুবিধা জনক, কারণ তাহা হইলে, কেবল দুইটীমাত্র ভাগেই কাজ হইয়া গেল। অপরটী হইলে ৩টী ভাগ করিতে হয়।

(২) ১৩/৩২ এই ভগ্নাংশকে সমাংশক ভাগে লইতে হইবে। ৩২এর উৎপাদক ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২। এখন ১৩ মিল করিতে হইলে ৮+৪ +১ আবশ্যক। ১৩/৩২ = ৮/৩২, ৪/৩২, ১/৩২ = ১/৪, ১/৮, ১/৩২।

যদি ভগ্নাংশের মূল্য ১/২ এর অনেক বেশী হয়, তবে সাধারণ ভাবে সমাংশক নির্ণয় না করিয়া, ১ হইতে সেই ভগ্নাংশের অন্তর কত তাহাই

নির্ণয় করিয়া লইলে, অনেক স্থলে অঙ্ক কসিবার সুবিধা হয়। মনে কর কোন দ্রব্যের মূল্য ⅞ টাকা; এখন ১৲ টাকার হিসাবে সেই জিনিষের মূল্য কত বাহির করিয়া, সেই মূল্য হইতে অষ্টমাংশ বাদ দিলেই প্রকৃত মূল্য পাওয়া গেল।

দৃষ্টান্ত, ৫৸৵০ দরে ২৪০/ মণের মূল্য কত?

৫৸৵ = ৫⅞ = ৬—⅛

সুতরাং ৬৲ হিসাবে দাম বাহির করিয়া তাহা হইতে ৵১০ হিসাবে যে দাম হয় তাহা বাদ দিলেই হইল :—

৵০, এক টাকার ⅛ | ২৪০৲ এক টাকা হিসাবে দাম
| ৬
| ১৪৪০৲ ৬৲ হিসাবে দাম
| ৩০৲ ৵০ হিসাবে দাম
(বাদ দিয়া) | ১৪১০৲ ৫৸৵০ হিসাবে দাম

আর একটা দৃষ্টান্ত—২৷৵০ হিসাবে ৫৸৭ সেরের দাম কত?

/২, ১/ মনের $\frac{1}{20}$ | ২৷৵০ এক মণের দাম
| ৬
| ১৪৷০ ৬ মণের দাম
/১, /২ সেরের ½ | /১০ পাই /২ সেরের দাম
| ৻১১ পাই /১ সেরের দাম
| ১৪/৩ পাই ৫৸৭ এর দাম

দোকানদারেরা হিসাবের সময় ভগ্নাংশকে আস্ত পাই বা পয়সা ধরিয়া লয়। সুতরাং হিসাবের সময়ও ভগ্নাংশকে আস্ত পাই বা পয়সা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইজন্য উত্তরে পাইএর ভগ্নাংশ ধরা হয় নাই। মিশ্র সাঙ্কেতিকের অঙ্ক সরল সাঙ্কেতিকের নিয়মে করা যাইতে পারে :—

দৃষ্টান্ত—৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ টনের দাম হইলে, ২৫ টন ৭ হঃ ৩ কোঃ এর দাম কত?

প্রথমে বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে ১ টনের মূল্য ১ পাউণ্ড হইলে, ১ হন্দরের মূল্য ১ শিলিং, ১ কো এর মূল্য ৩ পেন্স।

	পাঃ	শিঃ	পেঃ	
১০ শিঃ, ১ পাঃ এর ½	২৫	৭	৯ ৪	১ পাঃ টন দরে সমস্ত জিনিষের দাম
	১০১	১১	০	৪ পাঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম
২ শিঃ ৬ পেঃ, ১০ শিঃ এর ¼	১২	১৩	১০½	১০ শিঃ " " "
	৩	৩	৫⅝	২ শিঃ ৬ পেঃ দরে " "
	১১৭	৮	৪⅛	৪ পাঃ ১২ শিঃ ৬ পেঃ দরে সমস্ত জিনিষের দাম

ঐকিক নিয়ম ।—ঐকিক নিয়ম শিখাইতে হইলে প্রথমে নিম্ন-লিখিত রূপ অঙ্ক দ্বারা আরম্ভ করিবে :—

১। (মুখে মুখে)

১টা গরুর দাম ১০৲, ১২টার দাম কত ?

১টা পাঁঠার দাম ২।০, ৫টার দাম কত ?

এইরূপ কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বোর্ডে নিয়ম লিখ ;—

কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জিনিষের দাম বাহির করিতে হইলে, ১টা জিনিষের যে দাম, তাহাকে সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা গুণ করিতে হইবে ।

২। (মুখে মুখে)

১০ গজ বনাতের দাম ৩০৲ টাকা, ১ গজের দাম কত ?

১২ সের সন্দেশের দাম ২৫।০, ১ সেরের দাম কত ?

বোর্ডে এইরূপ লিখ :—যত জিনিষ কেনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যার দ্বারা সমস্ত জিনিষের দাম ভাগ করিলেই ১টা জিনিষের দাম পাওয়া যায় ।

৩। উক্ত ২ প্রণালীর সংযোগ—যদি ১০ গজ বনাতের দাম ৩০৲ হয়, তবে ১ গজ বনাতের দাম ৩৲—ইহা জান। এখন ৫ গজ বনাতের দাম কত ?

১২ সের সন্দেশের দাম ২৫।০ হইলে ৯ সেরের দাম কত ?

ইহার পরেই বোর্ডে অঙ্ক কসিবার ধারা লিখিয়া দাও ।

১২ সের সন্দেশের দাম ২৫।০

১ " " " ২৫।÷১২=২৵০

৯ " " " ২৵×৯=১৯৵০

কেবল এই ঐকিক নিয়মের অঙ্কেই নহে, সকল রূপ অঙ্কেই প্রথম খুব সরল সরল অঙ্ক কসাইবে ।

অনুপাত ও সমানুপাত।—খুব সরল অঙ্কের দ্বারা আরম্ভ কর :—

১৲ টাকার সঙ্গে ২৲টাকার সম্পর্ক কত ? ১৲টাকা ২৲টাকার অর্দ্ধেক, ২৲টাকা ১৲টাকার দ্বিগুণ।

২৲ টাকার সঙ্গে ৪৲ টাকার সম্পর্ক কি ? উত্তর পুর্ব্ববৎ।

১০৲ টাকার সঙ্গে ২০৲ টাকার সম্পর্ক কত ? ইত্যাদি

বোর্ডে লিখ ১/২, ২/৪ = ১/২, ১০/২০ = ১/২ ইত্যাদি রূপ ভগ্নাংশের দ্বারাও ঐ সম্পর্ক প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বলিয়া দাও যে ২ ÷ ১, ৪ ÷ ২, ২০ ÷ ১০ ইত্যাদির দ্বারাও ঐ সকল ফলই পাওয়া যায়।

তারপর বুঝাইয়া দাও ৪ ÷ ২ এই অঙ্ক, সংক্ষেপে ৪:২ এইরূপেও লেখা হয়। : এইরূপ চিহ্নের দ্বারা, চিহ্নের উভয় পার্শ্বস্থ অঙ্কের যে কি সম্পর্ক তাহা নির্ণয় করিতে হইবে, ইহাই বুঝায়। ইহাকেই অনুপাত বলে। এখন বুঝাইয়া দাও যে

২ : ৪ যে সম্পর্ক, ৩ : ৬ এ ও সেই সম্পর্ক, ইহাকেই সমানুপাত বলে।

২ : ৪ যে সম্পর্ক, ৩ : ৯ সেই সম্পর্ক নহে, ইহা সমানুপাত নহে।

তারপর দেখাইয়া দাও যে সমান সম্পর্ক বিশিষ্ট অনুপাত গুলি এইরূপে লিখিত হইয়া থাকে :—

২ : ৪ : : ৩ : ৬ (অর্থাৎ, ২ ÷ ৪ = ৩ ÷ ৬)

: : চিহ্নের অর্থ—ক্ষুদ্র চারিটী বিন্দু দ্বারা দুইটী রেখার (সমান বোধক =) চারিটী প্রান্ত বিন্দুমাত্র সংক্ষেপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এখন বুঝাইতে পারা যাইবে যে সমান সম্পর্ক বিশিষ্ট দুইটী অনুপাতের ১ম ও ৪র্থ এবং ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলে ফল সমান হয়, যথা—

২ × ৬ = ৪ × ৩

ত্রৈরাশিক।—এখন ত্রৈরাশিক বুঝাইতে আরম্ভ কর। যে সমানুপাতের তিনটী রাশি মাত্র জানা আছে, তাহাকেই ত্রৈরাশিক কহে। তিনটী রাশি জানা থাকিলে আমরা চতুর্থ রাশি বাহির করিয়া লইতে

পারি। কারণ আমরা জানি যে সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশি গুণ করিলে যে ফল হয়, ২য় ও ৩য় রাশি গুণ করিলেও তাহাই হইবে।

দৃষ্টান্ত—২টা গরুর দাম ৪৲ টাকা, ৩টার দাম কত ?

২ : ৪ : : ৩ : কত ?

অর্থাৎ ২ এর সহিত ৪ এর যে সম্পর্ক, ৩এর সহিত কোন রাশির সেই সম্পর্ক ?

২ × কত = ৪ × ৩ = ১২ ?

৩ × ৪ হইল ১২, এখন ২এর সহিত কত গুণ করিলে ১২ হইবে ? ১২কে ২ দ্বারা ভাগ করিলেই জানিতে পারি। ১২ ÷ ২ = ৬, তাহা হইলে

২ : ৪ = ৩ : ৬

কাজেই আমরা ২ : ৪ :: ৩ : কত ?—এই অঙ্ক কসিতে হইলে প্রথমে ৪ এর সহিত ৩ এর (অর্থাৎ মধ্যের ২ রাশির) গুণ করিয়া যে ফল হয় তাহাকে প্রথম রাশি দ্বারা ভাগ দিয়া থাকি। যথা—

$$কত = \frac{৩ \times ৪}{২} = ৬$$

তারপর ত্রৈরাশিকের রাশিগুলি সাজান সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। কতকগুলি সহজ সহজ অঙ্ক কসান হইলে, নিম্নলিখিতরূপ আরও কতকগুলি অঙ্ক কসাইতে হইবে। তাহা হইলে বালকেরা রাশি সাজান বুঝিতে পারিবে।

ত্রৈরাশিক অঙ্কে সমান সমান বিষয় জ্ঞাপক রাশিগুলি পাশে পাশে বসাইতে হয়।

গরু	গরু	টাকা	টাকা
২ :	৩ : :	৪ :	ক

ইহাতেও মধ্যের ২ রাশি মধ্যেই থাকিল ও পার্শ্বের দুই রাশি পার্শ্বেই থাকিল। মধ্যের ২ রাশি ৪ × ৩ হইলে যে ফল হয় ৩ × ৪ হইলেও তাহাই হয়। সুতরাং এইরূপ সাজাইলে ফলের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

তারপর এইরূপ দৃষ্টান্ত।—৫ জন লোকে ৩ বিঘা জমির ধান কাটিতে পারে, ১০ জন লোকে কত বিঘা জমির ধান কাটিবে ? একেবারে অঙ্ক না কসিয়া আগে ফলের আন্দাজ

করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ৫ জনে যে কাজ করে ১০ জনে তাহার দ্বিগুণ কাজ করিবে। সুতরাং অঙ্কের ফল বড় হইবে।

জন	জন	বিঘা	বিঘা
৫ :	১০ : :	৩ :	ক

$$ক = \frac{১০ \times ৩}{৫} = ৬ \text{ বিঘা}$$

আবার অন্যরূপ দৃষ্টান্ত—৫ জন লোকে ১২ দিনে একটা কাজ করে ১০ জন লোকে কত দিনে সেই কাজটা করিবে? ৫ জন লোকের যতদিন লাগিবে ১০ জনের নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম দিন লাগিবে, সুতরাং ফল কম হইবে। ১০ অপেক্ষা ৫ ছোট, ১২ অপেক্ষাও ফল ছোট হইবে। ১০ এর সহিত ৫ এর যে সম্পর্ক ১২ দিনের সহিত ফলেরও সেই সম্পর্ক হইবে।

জন	জন	দিন	দিন
১০ :	৫ : :	১২ :	ক

$$ক = \frac{৫ \times ১২}{১০} = ৬ \text{ দিন}$$

৫ : ১০ : : ১২ : ক এইরূপ লিখা হইলে ভুল হইত। কারণ ৫ জনের দ্বিগুণ ১০ জন, কিন্তু ১২ দিনের দ্বিগুনত আর ফল হইতে পারে না ইত্যাদিরূপ বুঝাইয়া দিবে।

ফল বেশী হইলে কিরূপে সাজাইতে হইবে আর কম হইলেই বা কিরূপে সাজাইতে হইবে, তাহা উক্ত দুই প্রকারের কতকগুলি অঙ্ক কসাইলেই বুঝিতে পারিবে।

সুদকষা।—সুদকষা, ডিস্কাউণ্ট ও কোম্পানির কাগজের অঙ্ক বালকেরা সাধারণতঃ ভীষণ শক্ত বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ এই—অনেক শিক্ষক এই সকল অঙ্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপার বালকগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া না দিয়া, একেবারেই অঙ্ক কসিতে দিয়া থাকেন। বালকেরা ইহার ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ কেহ কৌশল মাত্র অবলম্বন করিয়া ২।৪টী অঙ্ক কসিয়া থাকে। কিন্তু অনেক বালকই এ সকল অঙ্ক শক্ত বলিয়া চেষ্টাও করে না। উত্তমরূপে বুঝা-

ইয়া দিলে শতকরা ৯৫ জন ছাত্র যে অনায়াসে এই সকল অঙ্ক কসিতে সমর্থ হইবে তাহাতে ভুল নাই।

ঘরের যেমন ভাড়া আছে, টাকারও তেমনি ভাড়া আছে। যদুর বাড়ীতে রাম বাবু থাকেন; তিনি যদুকে মাসে ২০৲ করিয়া ভাড়া দেন। হরি মাইতীর গাড়ীতে ইন্দু বাবু চড়েন; ইন্দু বাবু হরি মাইতীকে মাসে ১৫৲ করিয়া ভাড়া দেন। তেমনি চুনী পোদ্দারের টাকা কালী বাবু নিয়া, চুনীকে মাসে মাসে সেই টাকার ভাড়া দেন। ১৲ টাকার ভাড়া মাসে ৴১০ পয়সা। কালীবাবু চুনীর কাছ হইতে ১০৲ নিয়াছেন, মাসে কত ভাড়া দিয়া থাকেন? ৫ মাসে কত ভাড়া হইল? ১৫ দিনে কত ভাড়া হইল? ইত্যাদিরূপ প্রশ্ন করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে। এই টাকার ভাড়াকেই সুদ বলে। জিনিষপত্র ভাড়া করিয়া আনিলে, যেমন সেই জিনিষ ফেরৎ দিতে হয়, টাকা কর্জ্জ করিলেও সেই টাকা ফেরৎ দিতে হয় এবং সেই টাকার সুদ বা ভাড়াও দিতে হয়।

তারপর দৃষ্টান্ত—মাসে ১৲ টাকার সুদ ৴১০, ১০৲ টাকার এক মাসের সুদ কত? ৮ মাসের সুদ কত? এক বৎসরের সুদ কত? মাসে ৴১০ হিসাবে ১০৲ টাকার সুদ কত? ২০৲ টাকার সুদ কত? ৫০৲ টাকার সুদ কত? ১০০৲ টাকার সুদ কত? ঐ হিসাবে ১০০৲ টাকার এক মাসের সুদ কত? ৩ মাসের সুদ কত? ১ বৎসরের সুদ কত?

সাধারণতঃ এই এক বৎসরের ১০০৲ টাকার সুদকেই সুদের 'হার' বলে। (শতকরা শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও)

ছোট ছোট অনেক গুলি 'সহজ অঙ্ক কসাইলেই বালকগণের বোধ জন্মিবে। একবার বিষয়টী বুঝিতে পারিলেই আর কঠিন অঙ্ক কসিতে কষ্ট বোধ করিবে না। তাড়াতাড়ি করিয়া বালকগণকে এক দিনেই পণ্ডিত করিতে চেষ্টা করিও না। অন্ততঃ ৫।৭ দিন কেবল সহজ অঙ্কই কসাইবে, তবে তাহাদের বুদ্ধি খুলিবে।

ডিস্কাউণ্ট ।—ব্যবসায় বাণিজ্যে বণিকগণ সকল সময় নগদ টাকা দিয়া জিনিষ ক্রয় করিতে পারে না। মনে কর মথুর কুণ্ডুর পাটের কারবার আছে ; মথুর পাট কিনিয়া গুদাম বোঝাই করিতেছে ; কিনিতে কিনিতে তাহার তহবিলে টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আরও পাট ক্রয় করা দরকার। এমন সময় শিবু সা এক নৌকা পাট নিয়া উপস্থিত। মথুর শিবুর নিকট হইতে বাকী করিয়া সেই পাট কিনিয়া রাখিল। দাম ৬ মাস পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া স্বীকার করিল। পাটের দাম ৩০০৲ স্থির হইল ; মথুর দামের টাকা ৬ মাস পরে দিবে স্বীকার করিল ; শিবু এই ৬ মাসের সুদের দাবী করিল। তখন বাজারের অন্যান্য কারবারিগণ শতকরা তিন টাকা করিয়া সুদ দেয়। সুতরাং সেই হিসাবে ৩০০৲ টাকার ৬ মাসের সুদ ৪॥০ হইল। এখন মথুর শিবুকে এই মর্ম্মে একখানা হাতচিঠা লিখিয়া দিল যে, ৬ মাস পরে সে শিবুকে ৩০৪॥০ দিবে। এই যে ৪॥০ টাকা বেশী দিতে হইতেছে ইহাকেই ডিস্কাউণ্ট বলে। এও সুদ বিশেষ। কিন্তু যদি মথুর শিবুকে এখনই টাকা দিতে পারে, তবে আর সুদ দিতে হইবে না। সুতরাং ৬ মাস পরে যে দাম বাবদ ৩০৪॥০ দিতে হইত, এখন (বর্ত্তমান কালে) সে মূল্য ৩০০৲ টাকাতেই হইয়া যায়। অতএব ৬ মাস পরে দেয় ৩০৪॥০ টাকার (শতকরা ৩৲ হিসাবে) বর্ত্তমান মূল্য ৩০০৲। গ্রামের বা সহরের পরিচিত ব্যবসায়ীগণের কারবারের দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে, বালকগণের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে। ফল কথা প্রথমে অঙ্ক কসাইবার জন্য বিশেষ তাড়াতাড়ি না করিয়া, পূর্ব্বে বালকগণকে বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সহজ সহজ অঙ্ক কসাইবে।

কোম্পানীর কাগজ।—গভর্ণমেণ্টেরও যে টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হয় তাহা বালকেরা জানে না। তাহাদের

বিশ্বাস, যখন গভর্ণমেণ্টের টাকার কল আছে, তখন ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া লইলেই হইল। বালকগণকে বুঝাইতে হইবে যে গভর্ণমেণ্টের আয়ের একটা সীমা আছে। প্রজারা যে বাৎসরিক খাজানা দেয় ও গভর্ণমেণ্টের যে অন্যান্য রূপ কারবারে বাজে আয় হয়, তাহাই গভর্ণমেণ্টের বাৎসরিক আয়। আর সোণা, রূপা, তামা প্রভৃতি, গভর্ণমেণ্টকেও অর্থ দিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এখন কি অবস্থায় গভর্ণমেণ্টকে কর্জ্জ করিতে হয় তাহা বলা দরকার। যখন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় বা বহুদূর বিস্তৃত রেল পথ বা সেতু নির্ম্মাণ করিতে হয় বা ভীষণ দুর্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয়, তখন গভর্ণমেণ্টের বাঁধা আয়ে কুলায় না। কাজেই টাকা কর্জ্জ করিবার আবশ্যক হয়। গভর্ণমেণ্ট, গেজেটে বিজ্ঞাপন দেন যে ৫০০০০০০ (মনে কর) টাকা কর্জ্জ করা আবশ্যক। শতকরা ৫৲ হিসাবে স্থদ দেওয়া হইবে। প্রজাদের মধ্যে যাহারা অবস্থাপন্ন তাহারা গভর্ণমেণ্টকে টাকা কর্জ্জ দেয়। দুর্গানাথ বাবু ৫০০০৲ দিলেন, হায়দারজান চৌধুরি ২৫০০০৲ টাকা দিলেন ইত্যাদি। ইঁহারা ৬ মাস পর পর, স্থানীয় খাজাঞ্চীখানা হইতে তাঁহাদের টাকার স্থদ লইয়া আসেন। বাজে লোককে টাকা কর্জ্জ দিলে, গভর্ণমেণ্টের স্থদ অপেক্ষা বেশী স্থদ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু টাকা একেবারে মারা যাইবারও সম্ভাবনা থাকে। গভর্ণমেণ্টকে কর্জ্জ দিলে টাকা মারা যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর এক কথা, বাজে লোককে টাকা কর্জ্জ দিলে সে টাকা যেমন ইচ্ছামত আদায় করা যায়, গভর্ণমেণ্টকে টাকা কর্জ্জ দিলে, মুল টাকা ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। আমার যখন টাকা আবশ্যক, তখন গভর্ণমেণ্টের নিকট টাকা চাহিলে পাইব না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছা করেন তখনই টাকা ফিরাইয়া দিতে পারেন। তবে আমার টাকার আবশ্যক হইলে গভর্ণমেণ্ট-গচ্ছিত-টাকা (কাগজ) বিক্রয় করিতে পারি।

কিন্তু কে আমার কাগজ কিনিবে, কাহার আবশ্যক আছে, তাহাত আমি জানিনা। এই জন্য দালালের দোকান আছে। তাহারা একজনের নিকট হইতে কাগজ কিনিয়া অপরের নিকট বিক্রয় করে। তাহারা প্রতি ১০০৲ টাকায় ৵০ আনা করিয়া কমিশন (পারিশ্রমিক), ব্রোকারেজ বা দালালি কাটিয়া রাখে। দৃষ্টান্ত—যদু ১০০৲ টাকার কাগজ বিক্রয় করিবে। সে দালালের নিকট গেল। দালাল তাহাকে ৯৯৸৵০ দিল; ৵০ আনা কাটিয়া রাখিল। আবার হরিবাবু দালালের দোকানে ১০০৲ টাকার কাগজ কিনিতে গেলেন। দালাল হরিবাবুর নিকট হইতে ১০০৵০ লইয়া কাগজ বিক্রয় করিল। এই যে ৵০ আনা, ইহার নামই ব্রোকারেজ বা দালালী। দালাল, কাগজ কিনিবার সময় ৵০ পাইল ও বিক্রয়ের সময়ও ৵০ পাইল। সুতরাং ১০০৲ টাকার কাগজ কেনা বেচায়, তাহার।০ লাভ হইল। কোম্পানির কাগজ কেন নাম হইল তাহা ও বুঝান আবশ্যক। পূর্ব্বে ভারতরাজত্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছিল। তাঁহারাই প্রথমে প্রজার নিকট হইতে কর্জ্জ আরম্ভ করেন। টাকা কর্জ্জ করিয়া কোম্পানি উত্তমর্ণকে একখানি হাতচিঠা (খতের মত) দিতেন। সেই হাতচিঠাতে লেখা থাকিত—কোম্পানী অমুকের নিকট হইতে এত টাকা কর্জ্জ করিলেন, ঐ টাকার সুদ শতকরা এত হিসাবে দিবেন ইত্যাদি। এই কাগজের নামই লোকে কোম্পানীর কাগজ (কোম্পানী প্রদত্ত হ্যাণ্ডনোট কাগজ) বলিত। এখন যদিও কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাগজের সেই নামই আছে। এখন কোম্পানীর পরিবর্ত্তে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই হাতচিঠা দেওয়া হয়। এই কাগজ ১০০৲ টাকার নোটের মত একখানি হ্যাণ্ডনোট।

তারপর, কাগজের দাম কম ও বেশী হয় কেন তাহা বলা আবশ্যক। যখন কোম্পানী বিশেষ বিপদগ্রস্থ হইয়া প্রজা সাধারণের নিকট

টাকা কর্জ্জ প্রার্থী হইয়া থাকেন, তখন প্রজারা সহজে টাকা দিতে চাহে না বলিয়া, গভর্ণমেণ্টকে ১০০৲ টাকার কাগজ ১০০৲ টাকার কমে বিক্রয় করিতে হয়। রুষ্ জাপান যুদ্ধের সময়, রুষকে বিপন্ন বুঝিয়া কেহ তাহাকে টাকা কর্জ্জ দিতে অগ্রসর হইল না; রুষ গভর্ণমেণ্ট কাগজের দাম খুব কমাইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাগজের দাম খুব কমিয়াছিল। ১০০৲ টাকার কাগজ ৭০৲ ৭৫৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু কাগজে '১০০৲ কর্জ্জ করিলাম' বলিয়াই লেখা হইয়া থাকে এবং তাহার সুদও ১০০৲ টাকার হিসাবেই পাওয়া যায়। আবার গভর্ণমেণ্টের যখন খুব স্বচ্ছল অবস্থা থাকে, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যাদির জন্য টাকার দরকার হয়, তখন আবার প্রজারা চোর ডাকাইতের হাত হইতে ধন সম্পত্তি বাচাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকেন। ১০০৲ টাকার দাম এ সময়ে বেশী হয়। ১০০৲ টাকার কাগজ কিনিতে ১১০৲ ১১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়। কিন্তু কাগজে ১০০৲ লেখা থাকে ও সুদও ১০০৲ টাকার হিসাবেই দেওয়া হয়। ছেলেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে ১০০৲ টাকার কাগজ ১১৫৲ টাকায় কিনিয়া কি লাভ হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাইতে হইবে। মনে কর ১০০৲ টাকার সুদ ৩৲ টাকা। ১০০৲ টাকার কাগজ ১১৫৲ দিয়া কিনিলাম। ৫ বৎসরে ১৫৲ সুদ পাইলাম। যে ১৫৲ টাকা বেশী দিয়াছিলাম, তাহা ৫ বৎসরে উঠিয়া গেল। তারপর হইতে যে সুদ পাওয়া যাইবে, তাহা লাভ। আর টাকাও নিরাপদে থাকিল। এইরূপে এক এক অংশ বুঝাইতে হইবে আর সরল সরল অঙ্ক কসাইতে হইবে।

বিবিধ প্রশ্ন।—জড়িত অঙ্ক গুলি শিক্ষা দিবার সময়ও প্রথমে খুব সরল (অথচ জড়িত) অঙ্ক শিখাইতে আরম্ভ করিবে। ছোট ছোট সংখ্যা দিয়া এমন অঙ্ক প্রস্তুত করিয়া লইবে, যাহার উত্তর বালকেরা এক রকম মুখে মুখে দিতে পারে। আবার একটা অঙ্ক না পারিলেই যে

তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝাইয়া দিবে, তাহাও উচিত নহে। বালককে অঙ্ক কষিবার ধারা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় শিক্ষা দিবে।

দৃষ্টান্ত—এমন একটী সংখ্যা নির্ণয় কর, যাহা হইতে ৫ বাদ দিয়া, অবশিষ্টের সহিত ৭ গুণ করিলে, ৭০ হয়।

মনে কর বালক কষিতে পারিতেছে না। তাহাকে একটা ছোট রাশি ধরিয়া লইতে বল—যেন ১০। তাহা হইতে একটি ছোট রাশি বাদ দিতে বল—যেন ৪; অবশিষ্ট থাকিল ৬; এই ৬কে ৩ দিয়া গুণ কর; হইল ১৮। এখন বালককে বল যে এই ৪, ৩ ও ১৮ বলিয়া দেওয়া হইল; সেই ১০ কেমন করিয়া বাহির করিবে? একটা অঙ্কের দ্বারা বুঝিবে না বা একেবারেও বুঝিবে না। বিরক্ত হইলেও চলিবে না, শিক্ষকের খুব ধৈর্য্যগুণ চাই।

এক রকমের কতকগুলি অঙ্ক কসাইয়া বালকদিগকেও সেইরূপ অঙ্ক রচনা করিতে বলিবে ও তাহাদিগকে সেই স্বরচিত অঙ্ক কষিতে দিবে।

২। জ্যামিতি।

জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ।—জ্যামিতি শিক্ষায় লাভ দ্বিবিধ—ব্যবহারিক ও মানসিক। (১) ব্যবহারিক—আমরা গোলক, ঢোল, সমঘন, চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ প্রভৃতি নানাবিধ আকারের চিত্রাদি আঁকিতে শিক্ষা করি। ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কারিকরগণের পক্ষে এই সমস্ত চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করা যে নিতান্তই প্রয়োজনীয় তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই, অন্যের পক্ষেও এই শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। যে সমতা, সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ, জ্যামিতি শিক্ষায় সেই সমতার বোধ জন্মে। আর (২) মানসিক—জ্যামিতির সাহায্যে আমরা নানাবিধ ক্ষেত্রের বাহু, কোণ, ক্ষেত্রফল প্রভৃতির সম্বন্ধ অসম্বদ্ধ যন্ত্রাদির দ্বারা পরিমাণ

না করিয়াও, কেবল সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। ইহা অপেক্ষা আমরা উত্তমতর এই ফল লাভ করি যে, জ্যামিতির আলোচনায় আমরা শৃঙ্খলাক্রমে তর্ক করিতে শিক্ষা করি এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পথ বুঝিতে পারি।

জ্যামিতি শিক্ষার ধারা।—সূত্র মুখস্থ করাইবার আবশ্যকতা নাই। একেবারেই প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে শিক্ষা দান আরম্ভ করা যাইতে পারে। তবে কয়েকটী সূত্রের বিষয় মাত্র শিখাইয়া লওয়া আবশ্যক। বিন্দুর কথা সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। বোর্ডে এইরূপে কয়েকটী বিন্দু দাও—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৬৫ চিত্র—বিন্দু শিক্ষা।

১ হইতে ৭ পর্য্যন্ত বিন্দুগুলি কেমন বড় হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট হইতে হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এই যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট অদৃশ্য বিন্দু ইহাই জ্যামিতির বিন্দু। এই রূপে স্থূল দাগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত কয়েকটা রেখা টান। যে রেখারটীর স্থূলত্ব একেবারেই নাই, উহাই জ্যামিতির রেখা।

তবে আপাততঃ একটা সাধারণ বিন্দুব দ্বারা 'বিন্দুর' বিষয় এবং সাধারণ রেখা দ্বারা 'বেখার' বিষয় বুঝাইলেও চলিতে পারে। তারপর 'সরল রেখা' ও 'বক্ররেখা' অঙ্কন করিয়া দেখাও ও বালকদিগের দ্বারা অঙ্কন করাও। ইহার পর ত্রিভুজ—দুই বাহু সমান হইলে সমদ্বিবাহু, তিন বাহু সমান হইলে সমবাহু ইত্যাদি চিত্রগুলি কেবল অঙ্কনের দ্বারা বুঝাইয়া দিবে। বালকেরা প্রথম হইতেই একখানা স্কেল ও একটা কম্পাস পেনসিল ব্যবহার করিতে শিখিবে। শিক্ষক বা ছাত্রকে

ব্লাকবোর্ডে যে সকল ক্ষেত্র অঙ্কন করিতে হইবে, তাহা ব্লাকবোর্ডস্কেল ও কম্পাসের সাহায্যে করিবে। যেমন তেমন করিয়া চিত্রাঙ্কন নিতান্তই দোষের। প্রথম প্রতিজ্ঞা শিখাইতে উপরোক্ত সূত্র ছাড়া, বৃত্তের বিষয়ও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। আর জ্যামিতিতে বৃত্তই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় ক্ষেত্র। ইহা দ্বারাই জ্যামিতির সমস্ত মাপের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বালকগণকে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্তাঙ্কন শিক্ষা দাও এবং নিজেও বোর্ডে কম্পাসের সাহায্যে বৃত্ত আঁক। কোন্ বিন্দুকে কেন্দ্র বলে, তাহা দেখাইয়া দাও। কোন্ অংশের নাম পরিধি, তাহা বলিয়া দাও। এখন স্কেলের দ্বারা, মাপিয়া দেখাও, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যত রেখা টানা যায় সকল গুলিই সমান। বালকেরা নিজের নিজের বৃত্তে ঐ রেখাগুলি মাপিয়া দেখিবে। বৃত্তের মধ্যে দুইটী ব্যাসার্দ্ধ টানিয়া, তাহাদের পরিধি সংলগ্ন দুই প্রান্ত, সংযুক্ত কর। একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হইল। এইরূপে (বৃত্তের সাহায্যে) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন শিক্ষা দাও। তারপর বোর্ডে একটা রেখা টানিয়া দাও। সেইটী যেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের, সমান বাহুদ্বয়ের, একটী বাহু। এখন এই বাহুটী অবলম্বন করিয়া, একটী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। এইরূপে রেখাগুলি লম্বভাবে, তির্য্যগ্‌ভাবে, ভূসমান্তর ভাবে, নানা প্রকারে, আঁকিয়া দাও ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। সেগুলি যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, তাহা না মাপিয়া প্রমাণ করিতে বল। যখন কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত সব রেখাই সমান, তখন ত্রিভুজের বাহুদ্বয় যে সমান তাহা বালকেরা না মাপিয়াই বলিতে পারিবে। এখন '৩ বাহু সমান' একটী ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে বল। একটী বৃত্তের দ্বারা এরূপ ত্রিভুজ অঙ্কন করা যখন বালকেরা কঠিন বোধ করিবে, তখন আর একটী বৃত্ত অঙ্কনের কথা বলিয়া দাও। কিন্তু কোথায় কিরূপে অঙ্কিত করিতে হইবে তাহা

প্রথমে বলিয়া দিওনা। যখন তাহারা একেবারেই না পারিবে তখন একটু একটু করিয়া বলিয়া দিবে। বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দিও না, মুখে মুখে শিখাইবে। সাদা-সিদে ভাবে প্রমাণ করিয়া লইবে; ক খ প্রভৃতি অক্ষরের সাহায্য লইবে না। 'এই বাহু, এই বাহুর সমান, এই কোণ, এই কোণের সমান' ইত্যাদিরূপে বাহু ও কোণ দেখাইয়া দেখাইয়া প্রমাণ করিবে।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা প্রমাণের সময়ও এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিবে। রেখার উপর (প্রথম প্রতিজ্ঞানুসারে) সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবার সময়, কেবল প্রথম প্রতিজ্ঞার নাম করিয়া একটা যেমন তেমন ত্রিভুজ অঙ্কন করিতে দিও না। কোম্পাসের দ্বারা দুইটী বৃত্ত অঙ্কন করিয়া সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করিবে। তারপর বৃত্ত দুইটী পুঁছিয়া ফেলিবে।

স্কেলের দ্বারা কেবল সরল রেখা টানিতে পারিবে এবং কম্পাসের দ্বারা কেবল বৃত্ত আঁকিতে পারিবে কিন্তু এই দুই যন্ত্রের দ্বারা যে মাপাদি লইতে পারিবে না, তাহা বলিয়া দাও। জ্যামিতি এক রকমের খেলা, কে না মাপিয়া কেবল রেখা টানিয়া ও বৃত্ত আঁকিয়া এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে পারে—ইহাই পরীক্ষা করা।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা বুঝাইবার পূর্ব্বে কোণের বিষয় বুঝাইয়া দাও। কম্পাসের দ্বারা বেশ বুঝান যাইতে পারে। একখানি কাঁচা বাঁশের কাঠী ভাঙ্গিয়া লইলেও হয়। কম্পাস বা কাঠী ফাঁক করিয়া ধর। বলিয়া দাও যে কম্পাসের দুইটা ডাল বা বাহুর মধ্যে যে ফাঁক তাহাকেই কোণ বলে। কম্পাস আরও ফাঁক কর, কোণ বড় হইবে; কম্পাসের দুই বাহু চাপিয়া আন, কোণ ছোট হইয়া আসিবে। দুইটী কম্পাস, বা দুই খানি ভাঙ্গা কাঠী লইয়া দুইটী কোণ কর। একটা কোণের উপর আর একটা কোণ রাখিয়া, দুইটী সমান কি অসমান পরীক্ষা করিতে বল। তার পর বাহুগুলি পরস্পর সমান করিয়া লও। কোণের সহিত

কোণ মিল করিলে, সমান বাহুতে বাহুতে যে একেবারে সমান হইয়া মিলিয়া যাইবে ইহা দেখাইয়া দাও। কোণ সমান না হইলে এক বাহু এক বাহুতে মিলিবে, কিন্তু আর এক বাহু মিলিবে না।

এখন তার বা কাঠীর দ্বারা ২টী সমান ত্রিভুজ করিয়া লও। কোণ ও বাহু মিলিলে ভূমি যে মিলিবে তাহা দেখাও। সুতরাং ত্রিভুজ দুইটী সমান হইবে। এই প্রতিজ্ঞার যে স্থলে 'দুই সরল রেখায় ক্ষেত্র বেষ্টন করিল বলিয়া' প্রমাণের এক অংশ কথিত হইয়াছে তাহা প্রথম শিক্ষার সময় বাদ দিয়া যাও।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা উত্তম রূপে বুঝিলেই ৫ম প্রতিজ্ঞা সহজ হইয়া আসিবে। কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া বা তার দিয়া ত্রিভুজ তৈয়ার করিয়া একটার উপর আর একটা নানা প্রকারে রাখিয়া (৫ম প্রতিজ্ঞায় যেরূপ আবশ্যক) ৪র্থ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করাইয়া লও।

অন্ততঃ ২৬টী প্রতিজ্ঞা এই রূপে মুখে মুখে শিখাইবে। তারপর পুস্তক পড়াইবে।

যখন যে সূত্রের আবশ্যক হইবে তখন তাহা বুঝাইয়া দিবে। স্বতঃ-সিদ্ধের বিষয় গুলি বালকেরা সহজেই বুঝিতে পারে সুতরাং প্রথমে তাহার পৃথক আলোচনা না করাই ভাল।

ব্যবহারিক প্রমাণ।—কতকগুলি প্রতিজ্ঞার উত্তম রূপে ব্যবহারিক প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়। নিম্নে ৩২ প্রতিজ্ঞার প্রমাণ প্রদত্ত হইল। অন্যান্য প্রতিজ্ঞার ব্যবহারিক প্রমাণ প্রায় জ্যামিতিতেই লিখিত হইয়া থাকে।

একটা কাগজের ত্রিভুজ কাটিয়া লও। (সমকোণী ত্রিভুজ করিও না)। এখন কাগজ ভাঁজ করিয়া ক কোণ, খগ সরল রেখার উপর পাত কর। বাম হইতে খ কোণ ও ডান হইতে গ কোণ ভাঁজিয়া আনিয়া ত বিন্দুতে ৩টী কোণ একত্র মিলিত কর। ৩টী কোণ এক রেখায়
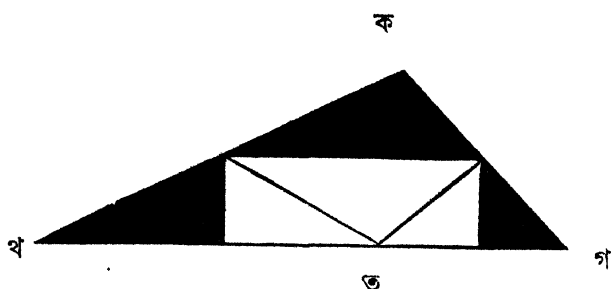
৬৬ চিত্র—কাগজ ভাঁজ করিয়া ৩২ প্রতিজ্ঞা।

একেবারে মিলিয়া যাইবে সুতরাং এই ৩টী কোণ ২ সমকোণের সমান।

ব্যবহারিক জ্যামিতি।—ব্যবহারিক জ্যামিতিতে প্রমাণাদি বা অঙ্কনের প্রক্রিয়া লিখিয়া দিতে হয় না। কেবল মাত্র প্রস্তাবিত চিত্রাঙ্কন করিয়া দিলেই হইল। এই চিত্রাঙ্কনের প্রণালী ও চিত্রটী ঠিক হওয়া চাই। চিত্র ভুল হইলেই সমস্ত ভুল হইয়া গেল। দৃষ্টান্ত "কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সরল রেখাকে সমদ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে"—এখন একটা রেখা টানিয়া, তাহা মাপিয়া, ও স্কেলের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়া, কেবল মাত্র সেই মধ্যবিন্দু স্থলে একটা চিহ্ন দিলেই এই প্রশ্নের উত্তর হইল না। কারণ এইরূপ মাপের দ্বারা মধ্যবিন্দু নির্দ্ধারণ করা সকল সময় সম্ভবপর হয় না। ৪ ইঞ্চ রেখাকে স্কেলের সাহায্যে ২ সমান ভাগে ভাগ করা যায়; ৩½ ইঞ্চ রেখাকেও ভাগ করা যায়; কিন্তু যদি রেখাটী ৩·৭ ইঞ্চ হয়, তবে স্কেলের সাহায্যে কেমন করিয়া উহার মধ্যবিন্দু নির্দ্দেশ করিবে? স্কেলে এত সূক্ষ্ম ভাগ থাকে না। এই জন্য রেখা দ্বিখণ্ডিত করিবার একটা সাধারণ প্রক্রিয়া আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট অংশের অর্দ্ধেক অপেক্ষা বৃহত্তর একটী অংশ অনুমান করিয়া, তাহাকে ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া লও এবং নির্দ্দিষ্ট রেখার প্রান্তদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া দুইটী

বৃত্ত অঙ্কিত কর। এই বৃত্ত দুইটী যে যে স্থলে ছেদ করিল তাহা রেখার দ্বারা সংযুক্ত কর। সেই রেখা যেখানে নির্দ্দিষ্ট রেখাকে ছেদ করিবে সেই বিন্দুই মধ্যবিন্দু। অঙ্কনের সময় সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত না করিয়া কেবল মাত্র আবশ্যকীয় চাপ অঙ্কন করিলেই কাজ চলিয়া থাকে বলিয়া চাপ অঙ্কন করাই নিয়ম। কোনরূপ প্রমাণ লিখিতে বা মুখে বলিতে হয় না বটে, কিন্তু মধ্যবিন্দুটী ঠিক হইল কিনা তাহা কম্পাসের দ্বারা মাপিয়া দেখিতে হয়। পরীক্ষকগণ কম্পাসের দ্বারা মাপিয়া পরীক্ষা করেন। সুতরাং চিত্রাঙ্কন বিশেষ যত্নের সহিত করিতে হয়। স্কেল, কম্পাস ব্যতীত ব্যবহারিক জ্যামিতির শিক্ষা চলে না।

৩। পরিমিতি।

পরিমিতি শিক্ষার আবশ্যকতা।—আমাদিগের দেশ কৃষি প্রধান। জমি জমা লইয়াই আমাদের কারবার। সুতরাং জমি মাপ করিবার প্রণালী প্রত্যেকেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পরিমিতি শিক্ষার আসবাব।—যদি চেন, ফিতা না থাকে তবে একটা শক্ত দড়িতে ফুটের চিহ্ন দিয়া লইবে। আর একটা দড়িতে হাতের চিহ্ন দিয়াও লইবে।
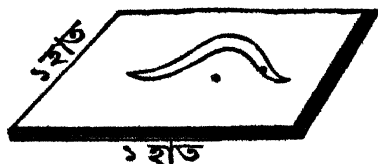
৬৭ চিত্র।—বর্গহাত মাপিবার কাঠ।

প্রত্যেক হাত বা ফুটের মাথায় কাল রং লাগাইয়া দিবে বা কাল সূতা জড়াইয়া বাঁধিবে। দড়ি

দুই গাছি ১০০ ফুট ও ১০০ হাত হইলেই যথেষ্ট হইবে। ৪ হাত লম্বা সরু বাঁশ বা শক্ত নল, ২।৩টী রাখা আবশ্যক। ইহাতেও ছুরির দ্বারা হাতের চিহ্ন কাটিয়া রাখিবে। ১ খান ১ বর্গফুট ও ১ খান ১ বর্গহাত তক্তা ও রাখা আবশ্যক। ১ বর্গহাত বা ১ বর্গফুট জমি কতটা তাহার একটা ধারণা করাইয়া দিতে হইবে। ঐ কাঠ দুখানির মাঝ খানে, এক এক খানি টুকরা কাঠ পেরেক দিয়া আঁটিয়া দিলে ধরিবার পক্ষে সুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, কোদালী দ্বারা ২০ হাত দীর্ঘ ১৬ হাত প্রস্থ এক খণ্ড জমির চারিদিকে দাগ কাটিয়া রাখিবে। এক কাঠা জমিতে কতটা স্থান বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে তাহার ধারণা জন্মিবে।

শিক্ষাদানের ধারা।—বালকগণকে মাপিতে শিখাইবে। বেঞ্চখানা কত হাত লম্বা? এ ধুতি খানি, এ দড়ি গাছি, এই রাস্তাটা, এই বাঁশটা এত হাত লম্বা বলিলেই আমরা সেই সকল জিনিষের একটা আন্দাজ পাই। কারণ ধুতি, বেঞ্চ, রাস্তা, বাঁশ, দড়ি প্রভৃতি সাধারণতঃ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইয়া থাকে তাহা আমাদিগের জানা আছে। কিন্তু এক খণ্ড জমি এত হাত লম্বা বলিলে আমাদিগের সে জমির ধারণা হয় না। কারণ জমির প্রস্থের নির্দ্দিষ্ট একটা পরিমাণ নাই। পরিমাণ বহু প্রকারের হইয়া থাকে, সেইজন্য জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ দুইই জানা আবশ্যক। ১ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি যতটা, ততটা জমিই ভূমির মাপের 'একক'। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১ হাত করিয়া হইলে তাহাকে ১ বর্গহাত কহে। (১ বর্গহাত তক্তাখানি দেখাও; জমিতে এক হাত দীর্ঘ ও ১ হাত প্রস্থ জমি মাপিয়া দেখাও)। এখন একখণ্ড জমি দেখাইয়া দাও ও ১ বর্গহাত তক্তা দ্বারা সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে তাহা মাপ করিতে বল।

৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ একখণ্ড জমি মাপিয়া লও। সেই জমিতে কত বর্গহাত জমি আছে তাহা তক্তা দ্বারা মাপিয়া দেখ। পরে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৫ হাত ও ৪ হাতের চিহ্ন দিয়া চিত্রের অনুরূপ সমান্তর রেখা টান বা জমির উপরে দাগে দাগে কাঠী বা দড়ি সাজাও।

এই ক্ষেত্রে ২০টী, ১ বর্গহাত ক্ষেত্র হইল। প্রত্যেকটি যে এক বর্গহাত, তাহাও মাপিয়া দেখাও। দৈর্ঘ্য প্রস্থে গুণ করিলে এইজন্যে ক্ষেত্রফল জানিতে পারা যায়। ফুটের দড়ি দিয়া, জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপিয়া তাহার কালি বাহির করার নিয়ম শিখাও।

৬৮ চিত্র।—জমির মাপ শিক্ষা।

বিঘা কাঠা প্রভৃতি মাপের দ্বারা যে রৈখিক মাপ ও ক্ষেত্রফল উভয়ই বুঝিতে পারা যায় তাহা বালকগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। 'এই জমি এক বিঘা লম্বা' বলিলে আমরা বুঝিব যে ঐ জমি ৮০ হাত লম্বা। কিন্তু 'এই জমি এক বিঘা' বলিলে বুঝিব যে সেই জমি ৬৪০০ বর্গহাত স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১ কাঠা বলিলে ৩২০ বর্গহাত জমি বুঝায়। ৩২০ বর্গহাত অর্থাৎ এক কাঠা জমির পরিমাণ কত রকম হইতে পারে তাহা স্কেলের সাহায্যে বোর্ডে ৭টী ভিন্ন ভিন্ন

চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাও ও এই অঙ্কগুলিও তাহার নিম্নে লিখিয়া দাও :—

৩২০ হাত লম্বা × ১ হাত প্রস্থ
১৬০ " " × ২ " "
৮০ " " × ৪ " "
৪০ " " × ৮ " "
২০ " " × ১৬ " "
১০ " প্রস্থে × ৩২ " লম্বা
৫ " " × ৬৪ " "

তারপর বিঘায় বিঘায় গুণ করিলে যে 'বিঘা' হয়, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে বর্গ বিঘা ইহা বুঝাইয়া দাও। বিঘায় কাঠায় গুণ করিলে যে কাঠা হয়, তাহা নিম্নের চিত্রানুকরণে বুঝাইতে পারা যাইবে। মনে কর দৈর্ঘ্য ২ বিঘা ও প্রস্থ ৫ কাঠা—ক্ষেত্রফল কত? ২ × ৫ = ১০ কাঠা।

	১ বিঘা = ৮০ হাত	১ বিঘা = ৮০ হাত
১ কাঠা = ৪ হাত	১ কাঠা	৬ কাঠা
" = ৪ "	২ "	৭ "
" = ৪ "	৩ "	৮ "
" = ৪ "	৪ "	৯ "
" = ৪ "	৫ "	১০ "

৬৯ চিত্র।—কাঠা বিঘায় গুণ।

প্রত্যেকটী ক্ষেত্র ১ বিঘা বা ৮০ হাত লম্বা ও ১ কাঠা বা ৪ হাত প্রশস্ত। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রের কালি ৮০×৪=৩২০ বর্গ হাত=১ কাঠা। বড় ক্ষেত্রে, ১০টী ছোট ছোট এক কাঠার ক্ষেত্র আছে। কাজেই বিঘায় কাঠায় গুণ করিলে কাঠা হয়। কাঠায় কাঠায় গুণ করিলে যে বর্গ কাঠা হয় তাহাকে (১৬ বর্গ হাত) ধূল বলে। ইহা ১ কাঠা জমির ২০ ভাগের এক ভাগ। চিত্রাঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দাও। এইরূপে আর্য্যার অন্যান্য অংশও বুঝাইয়া দিবে।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।—৬ ইঞ্চ লম্ব ও ৪ ইঞ্চ ভূমিযুক্ত একটী সমকোণী ত্রিভুজ। এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার সময় আমরা লম্ব ও ভূমি গুণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক লই কেন? স্কেলের সাহায্যে একখানা কাগজ হইতে ৬×৪ ইঞ্চ এক খণ্ড কাগজ কাটিয়া লও। ইহার ক্ষেত্রফল ৬×৪=২৪ বর্গ ইঞ্চ। ক্ষেত্রটীকে কর্ণরেখা ক্রমে দুইটী সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ কর। ত্রিভুজ দুইটী যে সমান তাহা একটার উপর আর একটা স্থাপন করিয়া দেখাও। প্রত্যেকটী ত্রিভুজের লম্ব ৬ ইঞ্চি ও ভূমি ৪ ইঞ্চ। আর প্রত্যেক ত্রিভুজ এই কাগজের আয়ত ক্ষেত্রের অর্দ্ধেক। সুতরাং ২৪ বর্গ ইঞ্চের অর্দ্ধেক। সেই জন্য সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল লইতে $\frac{৬\times৪}{২}$ এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়। আবার লম্বের দ্বারা প্রত্যেক ত্রিভুজকেই দুইটী সমকোণী ত্রিভুজে ভাগ করা যায়। সুতরাং অন্যান্য ত্রিভুজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

পঞ্চম প্রকরণ—ভূগোলেতিহাস বিষয়ক।

১। ভূগোল

শিক্ষার আবশ্যকতা।—(১) পৃথিবীর নানাস্থানে উৎপন্ন পদার্থাদির বিষয় জানিতে পারিলে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কোথায়, কিরূপে, কোন্ সহজ পথে যাইতে পারা যায়, তাহাও ভূগোল শিক্ষায় জানিতে পারা যায়। (২) যুদ্ধ বিগ্রহাদি পরিচালনার জন্য ভূগোলের জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ কোন্ পথে শত্রু আসিতে পারে, তাহাকে কোন স্থানে বাধা দেওয়া যাইতে পারে, পথে নদী পর্ব্বতাদির কিরূপ সহায়তা গ্রহণ করা যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় ভূগোলের আলোচনায় জানা যাইতে পারে। (৩) বিজ্ঞান চর্চ্চায় ভূগোল সহায়তা করে। নানাদেশে যে সকল অদ্ভুত বৃক্ষ, পশু, পক্ষী, নদী পর্ব্বতাদি আছে তাহা অবগত হইয়া সেই সকল বিশেষ পদার্থের বিশেষত্বের অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। (৪) রাজনৈতিক আলোচনাতেও ভূগোলের যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়। কোন্ জাতি কিরূপ বলবান, কিরূপ অর্থশালী, কিরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করে এবং এই সকল বিষয়ে দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টন হইতেই বা তাহারা কি

সহায়তা পাইয়া থাকে, তাহা ভূগোল পাঠে বুঝিতে পারা যায়। (৫) মানচিত্র ও নক্সা বুঝিবার একটা ক্ষমতা জন্মে। আমাদের সাংসারিক কার্য্যে অনেক সময় এই জ্ঞানের বিশেষ আবশ্যকতা হইয়া থাকে। (৬) পত্রিকা ও সাহিত্য পুস্তকাদি লিখিত অনেক বিবরণ ভূগোলের জ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। (৭) ভূগোলে বালকেরা সৃষ্টিতত্ত্বের বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া ভগবদ্ভক্ত হয়। (৮) তাহাদের কল্পনাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, পর্য্যবেক্ষণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সতেজ হয়। (৯) অজ্ঞাত স্থানের বিবরণাদি জ্ঞাত হইয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করে।

ভূগোল শিক্ষার কথা।—পূর্ব্বে ভূগোল শিক্ষায় শিক্ষকগণ প্রথমে পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় সাধারণ ভাবে শিক্ষা দিয়া, তারপর মহাদেশ দেশ প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিতেন। এইরূপে ক্রমে দেশ হইতে প্রদেশ, বিভাগ, নগর, গ্রাম প্রভৃতির শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এখন এ রীতির বিপরীত প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথমে নিজের গ্রাম, নগরাদির বিষয়; পরে দেশ, মহাদেশ ও পৃথিবীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। পূর্ব্বরীতিতে অপরিচিত মহাদেশের বিবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিচিত গ্রাম নগরে অবরোহণ করা হইত; এখন পরিচিত গ্রাম, নগর হইতে আরম্ভ করিয়া, অপরিচিত দেশ মহাদেশে আরোহণ করা হয়। সুতরাং বর্ত্তমান রীতিই শিক্ষাদানের পক্ষে সুবিধা-জনক। তারপর, পূর্ব্বে সাধারণ ভূগোল ও প্রাকৃতিক ভূগোল ভিন্ন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত কিন্তু প্রায় এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের প্রকৃতিক বাহ্য অবস্থার সঙ্গে তাহার আভ্যন্তরিক প্রাকৃতিক অবস্থাও জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। এই জন্য ভূগোল শিক্ষাদানের প্রারম্ভে বা সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষণের দ্বারা ("পদার্থ পরিচয়" শিক্ষাদানের রীতিতে) শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কঠিন পদার্থ—কঠিন পদার্থে চাপ দিলে ছোট হয় না, কোমল পদার্থ চাপে ছোট হয়। কঠিন পদার্থে সহজে দাগ বসে না—নরমে দাগ বসে। কঠিন পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আকার, তরল পদার্থের আকার পাত্রের অনুরূপ। তাপে কঠিন পদার্থ তরল হয় (মোম ও লাক্ষা গলাইয়া দেখাও) ঠাণ্ডায় আবার শক্ত হয়, জল জমিয়া কঠিন (বরফ) হয়। কঠিন পদার্থের দ্বারা কোমলের উপর দাগ কাটা যায়। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পদার্থ। লৌহ অপেক্ষা কাঁচ কঠিন, কিন্তু কাঁচ (ঠুনক) ভঙ্গুর, লৌহ (ঠমক্) ঘাত সহ।

তরল পদার্থ—তরল পদার্থ গড়াইয়া নীচের দিগে যায়—ফোটা ফোটা হইয়া পড়ে—নির্দ্দিষ্ট কোন আকার নাই—পাত্রানুরূপ আকার—ঠাণ্ডায় কঠিন হয়, তাপে বায়বীয় আকার ধারণ করে।

বায়বীয় পদার্থ—বাতাস সকল স্থানেই আছে—আমরা দেখিনা বটে কিন্তু অনুভব করিতে পারি—বাতাসে গাছ পালা নড়ায়—প্রবল বায়ুকে ঝড় বলে—জলে তাপ দিলে পাতলা হইয়া বায়বীয় আকার ধারণ করে—ঠাণ্ডা দিলেই আবার জল হয়।

গুরু ও লঘু।—লৌহ ভার, কাঠ লৌহ অপেক্ষা হাল্কা—তৈল জলে ভাসে—জলের স্রোতে কাদা ভাসিয়া যায়—জল স্থির হইলে কাদা নীচে পড়ে—বাষ্প হালকা, উপরে উঠিয়া যায়, ধূমও হালকা; বায়ু গরম হইলে পাতলা হইয়া উপরে উঠে—ঠাণ্ডা বায়ু নীচে নামে।

সছিদ্র পদার্থ।—প্রায় জিনিষই সছিদ্র; এক টুকরা ইট বা চক জলে ডুবাইলে ভার হয়—শুষ্ক মাটী সছিদ্র—ভিজা মাটী তেমন নয়, বালী মাটী সছিদ্র—আঠাল মাটী নয়।

মিশ্রণ ও দ্রবণ।—কাদা জলে মিশে—লবণ জলে গলিয়া যায়, লবণ বা চিনি মিশ্রিত জলে তাপ দিয়া লবণ বা চিনিকে পৃথক করা যায়, কাদা মিশ্রিত জল ছাঁকিয়া নিলেই কাদা পৃথক হয়, এক গ্লাস জলে একটু লবণ বা চিনি গলিতে পারে, কিন্তু বেশী দিলে পড়িয়া থাকে।

শিক্ষাদানের ধারা।—আমাদিগের শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভূগোল শিক্ষার পদ্ধতি (১৯০৯) ও বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পদার্থ পরিচয় শিক্ষার পদ্ধতি (১৯০১) একত্র করিয়া নিম্নলিখিত পদ্ধতি রচিত হইল। শিশুশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে যে রূপে উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইবে তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্ন

শ্রেণীতে যেরূপ কথোপকথন ছলে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ভূগোল শিক্ষায়ও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীর উপযোগী কয়েকটী মাত্র পাঠ কথোপকথনের আদর্শে লিখিত হইল। অন্যান্য শ্রেণীর উপযোগী পাঠ গুলিও এইরূপে গড়িয়ালইতে হইবে।

আকাশ।—আমরা যখন বাহিরে দাঁড়াই, তখন মাথার উপরে সুন্দর আকাশ দেখিতে পাই। জানালার ভিতর দিয়া আকাশ দেখা যায় কিনা, দেখত? তোমাদের মত অন্য সকল পাঠশালার বালকেরাও আকাশ দেখিতে পায় কিনা? যাহারা অনেক দূরে থাকে তাহারা আকাশ দেখিতে পায় কিনা? হাঁ—আমরা যেখানে যাইনা কেন, সব সময়েই মাথার উপরে আকাশ দেখিতে পাই।

আকাশে বাতাস আছে। বাতাস কেমন করিয়া বুঝিতে পারি? বাতাস কি দেখা যায়? গাছ পাতা নড়িলে বাতাস জানিতে পারা যায়—হাত নাড়িলে? বাতাস দেখা যায় না বাতাস গায়ে লাগে। এ ঘরে বাতাস আছে? আছে। বাতাসের ভিতর দিয়া সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—কাচের ভিতর দিয়াও সব জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়—বাতাস কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ। আকাশের আকার কেমন? ঢাকনার মত, বাটীর মত। আকাশের কোন ভাগ খুব উঁচু? যে ভাগ ঠিক মাথার উপরে। (টেবিলের উপর একটা কাচের বাটী উপুর করিয়া বুঝাইয়া দাও)। কোন ভাগ খুব নীচু? যেখানে আকাশ মাটীর সঙ্গে লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেখানে আকাশ মাটীর সঙ্গে মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই গোলাকার স্থানকে চক্রবাল বলে।

আকাশের রঙ কেমন? আকাশের রঙ নীল (আসমানী)। সব সময়েই কি নীল দেখিতে পাও? মেঘ হইলে নীল দেখায় না। মেঘ হইলে কেমন দেখায়? সাদা তুলার মত মেঘ হইলে আকাশ সাদা হয় আবার কাল মেঘ হইলে আকাশ কাল হয়। মেঘগুলি বায়ুর মত স্বচ্ছ নহে। আকাশের রঙ ঢাকিয়া ফেলে। মেঘ হইলে আকাশের চাঁদ, তারা, সূর্য্য দেখা যায় না। কাল মেঘ হইলে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে গাছ পালা বাঁচে।

আকাশে মেঘ ছাড়া আর কি কি দেখিতে পাই? চাঁদ, তারা, সূর্য্য। সূর্য্য দিনে আলো দেয়—সূর্য্য আগুনের বলের মত—সূর্য্য উঠিলে আঁধার থাকে না—সূর্য্য না থাকিলে আঁধার হয়। সূর্য্য তাপও দেয়—মেঘ হইলে তেমন আলোও থাকেনা বা তেমন তাপও থাকেনা। সূর্য্যের রঙ, হলদে, সোনার মত। সূর্য্যের দিকে চাহিলে চোখে জ্বালা হয়।

চাঁদ রাত্রিতে দেখা যায়। চাঁদের রঙ্ সাদা, রূপার মত। চাঁদের দিকে চাইলে চোখে জ্বালা হয় না। কোন কোন রাত্রে চাঁদ একেবারেই দেখা যায় না। আবার কখন কখন চাঁদের টুকরা দেখা যায়। (বোর্ডের উপর দ্বিতীয়ার, অষ্টমীর ও পূর্ণিমার চন্দ্র আঁকিয়া দেখাও)

আকাশে অনেক তারা আছে, গণনা করা যায় না। কতকগুলি ছোট, আর কতকগুলি বড়। দিনেও তারা থাকে, সূর্য্যের বেশী আলোকে দেখা যায় না (একটী বাতি জ্বালিয়া দূরে রাখিবে, দিনের বেলা বাতির আলো দেখা যায় না)

মেঘ আমাদের কাছে—সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র অনেক দূরে। তাই মেঘে সূর্য্য চন্দ্র ঢাকা পড়ে। (একখানা পুস্তক দিয়া ছাদের কোন জিনিষকে আড়াল করিয়া দেখাও।)

সূর্য্য—(প্রাতঃকালে বালকগণকে স্কুলের প্রাঙ্গণে সমবেত কর)। এই দেখ এখানে রৌদ্র আসিয়াছে, এই দেখ এখান হইতে রৌদ্র সরিয়া যাইতেছে। এখন এখানে ছায়া পড়িল, আর যেখানে ছায়া ছিল সেখানে রৌদ্র হইল। সূর্য্য আকাশের এক খানেই থাকে না। নীচের দিক থেকে ক্রমেই সূর্য্য উপরের দিকে উঠিতেছে, দুপর বেলায় (বেলা ১২টার সময়) সূর্য্য মাথার উপরে আসে। বিকাল বেলায় আবার নীচে নামিয়া যায় (একদিন বৈকালে বালকগণকে সমবেত করিয়া দেখাও)। যে দিকে উঠে তাহাকে পূর্ব্ব দিক বলে, যে দিকে ডুবিয়া যায় তাহাকে পশ্চিম দিক বলে। উঠিবার সময় ও ডুবিবার সময় সূর্য্যের রঙ্ লাল দেখায় (টেবিলের উপর একটা তার, বেত
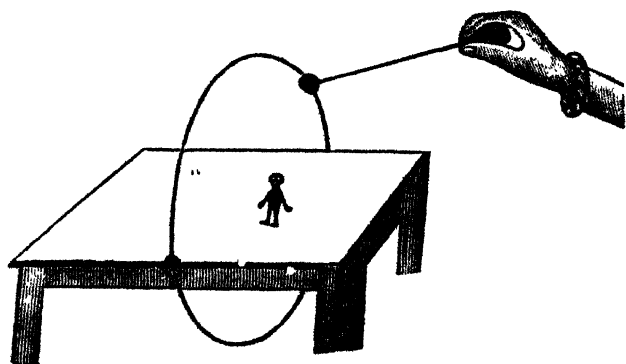
৭০ চিত্র।—সূর্য্যের উদয়াস্ত।

বা বাঁশের চটা গোল করিয়া বাঁধ ও একটা শলাকার মাথায় একটা ছোট আলু বিদ্ধ করিয়া,

তারের পাশ দিয়া ঘুরাইয়া সূর্য্যের উদয় অস্ত প্রভৃতি বুঝাইয়া দাও। সূর্য্য কেমন করিয়া নীচের দিক দিয়া ঘুরিয়া আবার পূর্ব্ব দিকে যায় তাহাও বুঝাইতে পারিবে) সূর্য্য ঘুরিয়া যায় না, পৃথিবীই ঘুরিয়া থাকে ইহা পরে বুঝাইয়া দিবে। রেলগাড়ীতে বা নৌকাতে কোন স্থানে যাইবার সময় আমরা দেখি যে রাস্তার ধারের গাছপালা চলিতেছে। সেইরূপ সূর্য্যও চলিতেছে বলিয়া আমাদিগের ভুল হয়।

ছায়া।—একজন বালককে রৌদ্রে দাঁড়া কর। মাটিতে ছায়া পড়িল। কেন? রৌদ্র বালকের শরীরের মধ্য দিয়া যাইতে পারিল না, বালকের শরীর স্বচ্ছ নহে। বালকের ছায়া বালকের মত, ঘটির ছায়া ঘটির মত, ছাতার ছায়া ছাতার মত। ঘর অন্ধকার কর, (বা রাত্রিতে পরীক্ষা দেখাও) একটী বাতি জ্বাল, আলো মাটির উপর রাখ, একটী বালককে দাঁড়া কর, বালকের ছায়া খুব বড় দেখাইবে। আলো একটু একটু করিয়া উচু কর—আলো মাথার উপর আন, এবারে ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, বালকের পায়ের নীচে; আবার অপর দিকে নামাইতে আরম্ভ কর, ছায়া আবার ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে (যখন পায়ের সমসূত্রে আলো আসিবে) খুব বড় হইল। সূর্য্যের আলোতে প্রাতে, দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায়, ছায়া কি জন্য ছোট বড় হয় তাহা এখন বুঝাইয়া দিতে পারিবে।

দিন ছোট বড়।—(একটু উপর শ্রেণীর জন্য) শীত কালের ১২ টার সময় ছায়া যত বড় দেখায়, গ্রীষ্মকালের ১২ টার সময় তত বড় দেখায় না। ইহাতে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, গ্রীষ্মকালে ১২ টার সময় সূর্য্য যত উপরে যায়, শীতকালে তত উপরে যায় না। বোর্ডের উপর নিম্নের অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সূর্য্যের গ্রীষ্মকালের ও শীতকালের গতি বুঝাইয়া দাও।
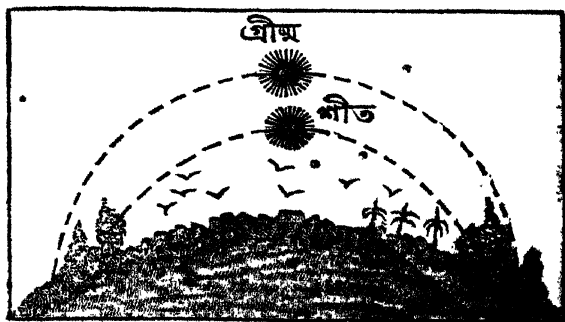
৭১ চিত্র।—শীত ও গ্রীষ্মের সূর্য্য।

শীতকালের সূর্য্যের পথ ছোট, কাজেই দিন ছোট, আর গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের পথ বড়, কাজেই দিন বড়। চিত্রের নির্দ্দেশ মত টেবিলের উপর দুইটী গোলাকার তার উচু নীচু করিয়া লাগাইয়া লইলে দিন বড় রাত্রি ছোট বেশ বুঝাইতে পারা যাইবে। কি গ্রীষ্মে কি শীতে বেলা ১২ টার সময় সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে উঠে। গ্রীষ্মকালে সেই উচ্চ স্থানে আসিতে সময় বেশী লাগে বলিয়া সূর্য্যকে গ্রীষ্মের প্রাতঃকালেও খুব আগে উঠিতে হয়। গ্রীষ্মে ৫॥ টার সময় সূর্য্যোদয় হয়। শীতকালে প্রাতে ৬॥ টার সময় সূর্য্য উঠে, কারণ শীতকালের সূর্য্যের রাস্তা ছোট, একটু দেরী করিয়া উঠিলেও ক্ষতি হয় না। সূর্য্য অস্ত সম্বন্ধেও এইরূপ।

মেঘ বৃষ্টি।—একটা ছোট ঘটিতে অল্প জল দিয়া, আগুনের গামলার উপর রাখ। ঘটির মুখে একটা ছোট মাটীর সরা দিয়া ঢাকিয়া দাও, সরাতে একটা ছোট ছিদ্র কর। ছিদ্র দিয়া ধূঁয়ার মত যে পদার্থ বাহির হইতেছে তাহাকে বাষ্প বলে। বাষ্পের উপর একখানা ঠাণ্ডা স্লেট ধর। বাষ্প জল হইয়া স্লেটের গায়ে লাগিবে। আবার স্লেটে একটু তাপ দাও, স্লেটের সেই জল আবার বাষ্প হইবে। জল যুক্ত স্লেট রৌদ্রে রাখ, জল শুকাইয়া গেল। সূর্য্যতাপে জল বাষ্প হইবে। বাষ্প, বায়ু অপেক্ষা হালকা তাই আকাশে উঠে। অদৃশ্য বাষ্প ঠাণ্ডা লাগিলে, আগে মেঘ হয়, আরও ঠাণ্ডা লাগিলে জল হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ আকাশে ৪ প্রকার মেঘ দেখিতে পাই। (১) খুব কাল মেঘ, ইহাকে ঝোড়ো মেঘ বলে, ভাল কথায় বৃষ্টিপ্রদ মেঘ, ইহাতেই বৃষ্টি হয়। (২) তুলাস্তূপ মেঘ, সাধারণ কথায় তুলা পেঁজা মেঘ বলে, সাদা সাদা পেঁজা তুলার মত মেঘ। (৩) স্তরাবলী মেঘ, চক্রবালের কাছে কাছে, প্রাতে সন্ধ্যায় দেখা যায়, লম্বা লম্বা স্তরের মত সমান্তর মেঘাবলী, সাধারণ কথায় ইহাকে টানা মেঘ বলে। (৪) অলক মেঘ, অনেক উপরে ছাকড়া ছাকড়া (পাকা চুলের মত) ভাবে ভাসিয়া বেড়ায়, এইজন্য সাধারণ ভাষায় ছাকড়া মেঘ বলে।

রামধনু।—মুখে জল লইয়া সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া জোরে ফুৎকার করিলে রামধনুর মত নানা বর্ণের রঙ দেখায়। মেঘে সূর্য্যের আলো পড়িয়া এইরূপে রামধনু হয়। যে দিকে সূর্য্য থাকে, তার বিপরীত দিকে মেঘ থাকিলে রামধনু হয়। দ্বিপ্রহরে কখনও রামধনু দেখা যায় না। সূর্য্য যতই চক্রবালের নিকটবর্ত্তী হইবে, ততই রামধনু বড় হইবে ও আকাশের সমধিক উচ্চ স্থানে দেখা যাইবে। রামধনুর রঙ গুলি যেরূপ সাজান থাকে (যে দিন রামধনু উঠিবে) তাহা দেখাইয়া দাও। নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এইরূপ ভাবে সাজান—বেগুনে, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল।

বায়ুর গতি।—একটা ছোট কাঠের বাক্সের এক পাশ আলগা রাখ। উপরের পিঠে দুইটা ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দুইটী চিম্‌নি বসাও। খোলা মুখের দূরে যে ছিদ্র, (২নং ছিদ্র) তাহার নীচে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ। এক খানা ন্যাকড়ায় আগুন দিয়া "১" চিমণির উপর ধর। আর একখানা পোড়া কাগজ "২" চিম্‌নির উপরে ধর। বায়ুর গতি যেরূপ বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা তীর চিহ্নের দ্বারা চিত্রে দেখান হইল। বায়ু গরম হইয়া উপরে উঠিলে, ঠাণ্ডা বায়ু আসিয়া কেমন করিয়া সে স্থান অধিকার করে, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য। পোড়া নেকড়ার ধূম নীচের দিকে আসিবে, আর পোড়া কাগজের গুঁড়া উপরের দিকে উঠিবে।
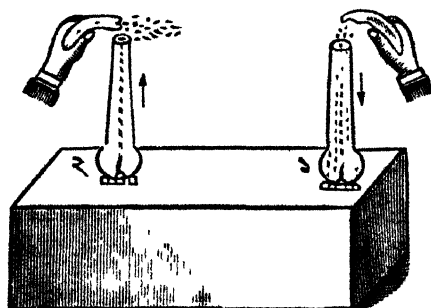
৭২ চিত্র।—বায়ুর ঊর্দ্ধ ও নিম্নগতি।

দিক শিক্ষা।—সূর্য্যের গতি শিক্ষা দেওয়ার সময়ই বালকগণকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সেই সময় উত্তর দক্ষিণও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে, বামে উত্তর ও ডাহিনে দক্ষিণ থাকে। ভঙ্গী-সঙ্গীত শিক্ষা দানের প্রণালীতেও ছোট ছোট বালক দিগকে দিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

যে দিকেতে সূর্য্য উঠে পূর্ব্ব তারে বলি। (১)
পশ্চিম দিগেতে সূর্য্য অস্ত যায় চলি। (২)

পূর্ব্ব দিকে মুখ করি দাঁড়াইলে পর। (৩)
ডাইনে দক্ষিণ থাকে বামেতে উত্তর। (৪)

(১) সকল বালক পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া, ডাহিন হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা পূর্ব্ব দিক দেখাইয়া সমস্বরে বলিবে। (২) সকলে এক সঙ্গে ডাহিনে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া, পশ্চিম দিকে মুখ করতঃ বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা পশ্চিম দিক দেখাইয়া আবৃত্তি করিবে। (৩) সম্পূর্ণ বামে ঘুরিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান (৪) ডাহিন হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ দিকে ও বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা উত্তর দিক দেখাইয়া।
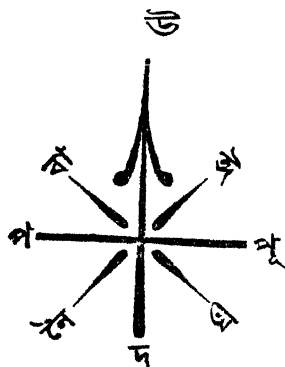
৭৩ চিত্র।—দিক্‌দর্শন।

এই ৪ দিক ব্যতীত ৪টী কোণও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা মেজেতে এইরূপ দাগ কাটিয়া রাখিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। দাগ কাটিবার সময় কম্পাসের সাহায্যে দিক ঠিক করিয়া লইতে হইবে। দুই তিন আনা হইলেই একটা ছোট কম্পাস পাওয়া যায়।

যখন অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র থাকেনা তখন কেমন করিয়া দিক ঠিক করিতে হইবে? তখন ধ্রুব নক্ষত্রের দ্বারা দিক নিরূপণ করিতে পারা যায়। ধ্রুব নক্ষত্র ঠিক করিতে হইলে সপ্তর্ষিমণ্ডল জানা আবশ্যক। উত্তরের দিকে যে বড় বড় সাতটী নক্ষত্র নিম্নের চিত্রানুরূপ সজ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই সপ্তর্ষিমণ্ডল কহে। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটী তারা এক সঙ্গে এবং এইরূপ ভাবে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। ইহার প্রথম দুইটী নক্ষত্রকে, এক কল্পিত রেখা দ্বারা যুক্ত করিয়া, সেই রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে, যে একটী বড় নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করে তাহাকেই ধ্রুব নক্ষত্র বলে।
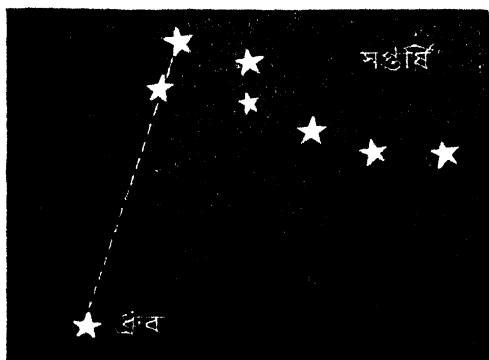
৭৪ চিত্র।—ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল।

সপ্তর্ষি মণ্ডলকে বৃহৎ ঋক্ষ বা বড় ভল্লুকও বলা হইয়া থাকে। ট্রেপিজিয়ম ক্ষেত্রাকারে যে চারিটী নক্ষত্র সজ্জিত, সেইটী ভল্লুকের দেহ, আর তিনটী লেজ। এই সাতটী নক্ষত্রই ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু চমৎকারিত্ব এই যে, ইহার প্রথম দুইটী নক্ষত্র সংযুক্ত করিয়া, সেই রেখা বর্দ্ধিত করিলে সকল প্রকার অবস্থাতেই ধ্রুব নক্ষত্রকে (প্রায়) স্পর্শ করিবে।

নক্সা বা প্লান।—টেবিলের উপর একটা গেলাস ও একটা বাক্স রাখ। বোর্ডে গেলাসের ও বাক্সের ছবি আঁক। জিজ্ঞাসা কর, এই চিত্র দুইটী কি কি? একটা গেলাসের ও একটা বাক্সের ছবি। টেবিলের উপর যে গেলাস আছে তাহার পাশ দিয়া, চকের দ্বারা টেবিলের উপর দাগ কাট, আর বাক্সের চারিধার দিয়াও তদ্রূপ কর। এই দুইটী চিত্র, গেলাসের ও বাক্সের নক্সা। বোর্ডের উপরে ঐ দুই নক্সা আঁক। মাটীর উপর একটা বস্তু যে স্থান অধিকার করে, সেই স্থানকেই সেই বস্তুর নক্সা বলে। বালকগণকে টেবিলের চারি ধারে
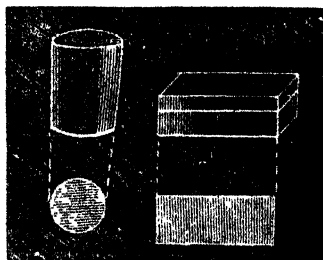
৭৫ চিত্র।—বাক্স ও গেলাসের নক্সা।

দাঁড়াইতে বল। তাহাদের সম্মুখে টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া ঘরের নক্সা প্রস্তুত কর। যে দেয়াল যে দিকে আছে, যে দরজা যে দিকে, নকসাতেও ঠিক সেই সেই দিকে, সে সকল দেয়াল দরজা, রেখা দ্বারা চিহ্নিত কর। দরজা, জানালার স্থান ফাঁক রাখিয়া দাও। বালকগণকে নক্সার পরিচয় করাও। তুমি "গ" দরজার কাছে যাও, তুমি "ঘ" দরজা দিয়া বাহিরে যাও, তুমি "খ" জানালা দিয়া কাগজ ফেলিয়া দাও, ইত্যাদি। এই পর্য্যন্ত বোধ হইলে ঐ নক্সার মধ্যে টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ প্রভৃতি, কেবল রেখার দ্বারা অঙ্কন করিয়া পরীক্ষা কর।
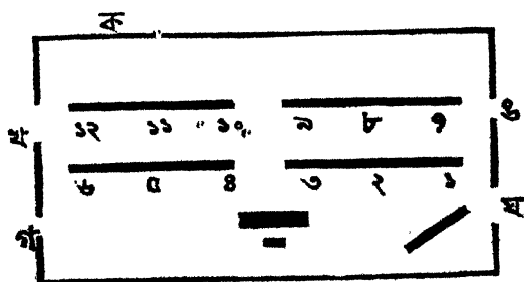
৭৮ চিত্র।—শ্রেণীর নক্সা।

তুমি ১১ চিহ্নিত স্থানে গিয়া বস, তোমার বসিবার স্থান দেখাও, বোর্ডের কাছে যাও ইত্যাদি। এখন এই কাগজ খানি বোর্ডের সঙ্গে লাগাইয়া (উত্তরের দিক উপরে রাখিয়া,) বালকগণকে পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা কর। এই প্রকারে সমস্ত বিদ্যালয়গৃহ ও প্রাঙ্গণের নক্‌সা প্রস্তুত কর। প্রথম শিক্ষার সময় নক্‌সা কখনও বোর্ডে আঁকিও না। টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া যে দিকে যাহা ঠিক সেই দিকেই তাহা আঁকিবে। প্রথমে স্কেলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন নাই।

স্কেলের সাহায্যে নক্‌সা।—উক্তরূপে বালকগণের নকসা বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের দ্বারাও ঐরূপ নক্‌সা প্রস্তুত করাইতে চেষ্টা করিবে। বালকেরা সম্ভবতঃ কেবল দৃষ্টির সাহায্যে ঘরের দেয়াল গুলির সমানুপাত রক্ষা করিয়া চিত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে না। এই সময়ে স্কেলের আবশ্যকতা বুঝাইতে হইবে।

বিদ্যালয়ে চেন কি ফিতা থাকিলে ভাল, নচেৎ দড়ির গায় ফুটের চিহ্ন দিয়া লইলেও কাজ চলিতে পারে। বালকেরা এই দড়ি দ্বারা ঘরের দৈর্ঘ্য মাপিবে। মনে কর ১৬ ফুট হইল। এখন এই ১৬ ফুট দেওয়ালের নক্‌সা কাগজে আঁকিতে হইলে ১৬ ফুট কাগজ চাই। এত বড় কাগজ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না, আর পাইলেও তাহা ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। কাজেই ১৬ ফুটকে ছোট করিয়া আঁকিয়া লইতে হয়। ১ ফুটকে ১ ইঞ্চির সমান ধরিলে, ১৬ ফুট হ'ল ১৬ ইঞ্চ; এখন ফুট স্কেল ধরিয়া একটা ১৬ ইঞ্চ রেখা অঙ্কিত কর। এইরূপে ঘরের প্রস্থ আঁকিয়া লও। মনে কর ১০ ফুট। সুতরাং ১০ ইঞ্চ রেখা টানিলেই, ১০ ফুট রেখা দেখান হইবে। এইরূপে মাপিয়া দরজা জানালার স্থান নির্দ্দেশ কর। ঘরের বিপরীত দিকের দেওয়াল গুলি যে সমান, বালকগণকে তাহা

দেখাইয়া দাও। নক্সায় একটী দৈর্ঘ্যের ও একটী প্রস্থের দেয়াল আঁকিলেই তাহার সমান করিয়া অপর দুইটী দেওয়ালও আঁকা যাইতে পারে। যখন শ্রেণীর কক্ষ অঙ্কন শিক্ষা দেওয়ার পর প্রাঙ্গণ সহ সমস্ত বিদ্যালয়ের নক্সা অঙ্কন করা আবশ্যক হইবে, তখন আবার ১ ফুটকে ১ ইঞ্চের সমান করিয়া লইলেও চলিবেনা। কাজেই ১ ফুটকে ½ ইঞ্চ বা ¼ ইঞ্চের সমান ধরিয়া লইতে হইবে।

চার পাঁচ পয়সা করিয়া কাঠের স্কেল কিনিতে পাওয়া যায়। বাঁশের স্কেল করিয়া নিলেও বেশ হয়। মোটা কাগজের উপর দাগ কাটিয়াও কাজ চলা মত স্কেল করা যায়।

বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে কি তাহার অতি নিকটবর্ত্তী দুই তিনটী রাস্তা কিংবা হাট বাজার পর্য্যন্ত স্থানের নক্সা বালকেরা মাপিয়া প্রস্তুত করিতে পারে। ইহার পর, গ্রামের নক্সা শিক্ষক নিজে প্রস্তুত করিয়া দেখাইবেন বা সার্ভে আফিস হইতে ক্রয় করিয়া লইবেন।

নক্সায় স্কেল অঙ্কিত থাকে। ১ ইঞ্চ কত মাইলের সমান তাহা লেখা থাকে। এখন এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামের দূরত্ব বালকেরা নিজের স্কেলের দ্বারা মাপিয়াই বলিতে পারিবে। বালকগণকে এইরূপ মাপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। নদীর দৈর্ঘ্যের মাপ লইতে হইলে নক্সায় নদীর বক্র দাগের উপর সূতা বসাইয়া যাও। পরে সেই সূতা স্কেল দিয়া মাপিয়া লও।

একখানা কাগজে ¼ ইঞ্চ ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কতকগুলি সমান্তর রুল (পেনসিল দিয়া) কাটিয়া লও। ¼ ইঞ্চ যদি ১ ফুটের সমান ধরা যায় তবে ঐরূপ কাগজে বিনা স্কেলের সাহায্যেই নক্সা অঙ্কিত করা যায়। এরূপ কাগজ কিনিতেও পাওয়া যায়। ছেলেদের পক্ষে এইরূপ রুল কাটা (চেক) কাগজ বেশ সুবিধাজনক।

বন্ধুর-মানচিত্র।—একখানি তক্তা, স্লেট, থালা বা কলাপাতার উপরে ভিজা বালির দ্বারা গ্রামের আদর্শ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যেখানে পাহাড়াদি আছে, সে সকল স্থান বালি দিয়া উঁচু কর; হ্রদ, বিল প্রভৃতির স্থান গর্ত্ত করিয়া রাখ; ছুরির দ্বারা নদীর পথ কাটিয়া দেও। পুটিন দ্বারাও বন্ধুর মানচিত্রাদি বেশ দেখান যায়। আঠাল মাটীতেও উত্তম কাজ করা যায়। কেহ কেহ বালির মানচিত্র করিয়া তাহার উপর নানা বর্ণের গুঁড়া দিয়া রঙ্ করিয়া থাকেন। পুটিনের উপর তেলের রং বেশ ধরে, মাটীর উপর জলের রং (গঁদের আটার সহিত মিশান) দ্বারা কাজ করিতে পারা যায়। পুটিনের কথা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। বালি বা কাদার দ্বারা বালকগণ এইরূপ বন্ধুর মানচিত্রাদি প্রস্তুত করিলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার স্থূল জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

সূত্র শিক্ষা।—আঠাল মাটী বা পুটিনের দ্বারা নিম্নের নক্সানুরূপ একটা আদর্শ প্রস্তুত করিয়া পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ প্রভৃতির অর্থ শিখান যাইতে পারে। একখান চারি ছয় পয়সা দামের টীনের থালা আবশ্যক।

থালার উপর জল ঢালিয়া দিলেই সাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতিতে জল যাইবে, স্থল ভাগ উঁচু থাকিবে। সূত্র মুখস্থ করাইবার আবশ্যকতা নাই। বালকেরা কথার অর্থ বুঝিলে ও আদর্শে দেখিতে পাইলে নিজেরাই সূত্র গড়িয়া লইতে পারিবে। না পারিলে অবশ্য সাহায্য করিতে হইবে। তারপর যে সূত্র যখন আবশ্যক হইবে, সেই সূত্র সেই সময়েই শিখাইয়া লওয়া ভাল। পূর্ব্বে কতকগুলি সূত্র বৃথা মুখস্থ করাইয়া কোন ফল নাই। কেহ কেহ সূত্র মুখস্থ করার আবশ্যকতা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। জিনিষের পরিচয় হইলেই হইল।

শিক্ষার ধারা।—প্রথমে গ্রামের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামের বা মহকুমার বা জেলার মানচিত্রের সাহায্য গ্রহণ কর। বোর্ডের

৭৬ চিত্র।—সূত্রাদি শিক্ষাদানের আদর্শ।

মধ্যস্থানে গ্রাম নির্দ্দেশক একটা বিন্দু দাও। সেখান হইতে বাজারে যাইবার পথ অঙ্কিত কর। গ্রামে উৎপন্ন কি কি জিনিষ বাজারে বিক্রয় হয়, কি বারে বাজার বসে, কোন্ কোন্ গ্রামের লোক সে বাজারে আসে, অন্য স্থানে উৎপন্ন কি কি জিনিষ বাজারে বিক্রয় হয়, এ সমস্তের আলোচনা কর। তারপর গ্রামের যে দিকে নদী যেরূপ ভাবে গিয়াছে তাহা আঁক। সে নদী দিয়া কোন্ কোন্ প্রধান গ্রামে যাওয়া যায়, নদীর স্রোত কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে যায়, বর্ষা-কালে নদীর জল কতদূরে আসে, নদীতে বড় বড় কি মাছ পাওয়া যায় ইত্যাদির আলোচনা কর। পাহাড় পর্ব্বত নিকটে থাকিলে তাহাও আঁকিয়া দেখাও ও সে সকল পাহাড়ে কোন জাতি বাস

করে, কি কি রকমের বড় বড় গাছ জন্মে, পাহাড় কত উঁচু এ সকল বিষয় বলিয়া দাও। তারপর গ্রামের নিকট যে সকল বড় বড় গ্রাম আছে সে সকলের স্থান নির্দ্দেশ কর, আর সেই সকল গ্রাম সম্বন্ধেও দু চার কথা বলিয়া দাও। গ্রাম হইতে কল্পনায় মহকুমায় যাত্রা কর। রাস্তার দু'ধারে যে সকল ধানের, পাটের বা কলাইর ক্ষেত দেখিতে পাইবে তাহার বর্ণন কর। ধান কখন বোনে, কখন কাটে, পাট ও কলাই কখন বোনে ও কখন কাটে তাহাও সংক্ষেপে বলিয়া দাও। তারপর মহকুমায় বা জেলায় গিয়া যাহা দেখিবে তাহা বর্ণনা কর। জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট থাকে, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার থাকে, বড় বড় স্কুল থাকে, বড় ডাক ঘর থাকে। আর সেই জেলায় যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের যে ব্যবসায়, যে সকল ভাল জিনিষ তৈয়ারি হয় তাহা বলিয়া দাও। নদী দিয়া জেলায় যাইতে পারা যায় কি না? রেলের রাস্তা আছে কি না? জেলার মহকুমা কয়েকটীও দেখাইয়া দাও। কোন্ মহকুমায় কোন্ ভাল জিনিষ পাওয়া যায় তাহাও বলিয়া দাও। জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায় যেরূপে যাইতে হয় তাহা দেখাইয়া দাও। মহকুমার হাকিমেরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন। আবার বিভাগস্থ কয়টী জেলা একজন কমিশনারের অধীন তাহাও দেখাও ও বুঝাও। সেই সেই জেলায় কি কি ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, তাহাও বলিয়া দাও। আবার কমিশনারের অধীনস্থ জেলা কয়টীর মহকুমাও শিখাও। তারপর সেই প্রদেশস্থ ছোটলাটের অধীনে যে সকল ডিভিসন ও সেই সকল ডিভিসনে যে সকল জেলা, কেবল তাহাই শিখাও। প্রত্যেক জেলার সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন পদার্থের নামও শিখাইয়া দাও। নিজের প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের সকল গুলি জেলা শিখাইবার আবশ্যকতা নাই। কেবল অন্যান্য প্রদেশের প্রসিদ্ধ দু চারিটী জেলার নাম অভ্যাস

করাও এবং গবর্ণর জেনারেলের অধীনে যে সকল প্রদেশ আছে তাহাদের নাম শেখাও। নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, প্রদেশের বড় বড় নদী, দেশের অতিবৃহৎ নদীগুলি শিখাইবে। পাহাড়, পর্ব্বত, হ্রদ বিষয়েও এইরূপ মত।

নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশের একটী দুইটী তিনটী বা চারিটী করিয়া প্রধান নগর ও সেই সকল নগর জাত সর্ব্বপ্রধান দ্রব্যাদি বা আশ্চর্য্য পদার্থ জানিয়া রাখিলেই হইল। কলিকাতা হইতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান নগর যাইতে হইলে কোন পথে যাওয়া আবশ্যক তাহা দেখাইয়া দিবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য এ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। দেশ বিদেশ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে তাহার শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সময় সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পৃথিবীর আকার ও গোলক।—মানচিত্রাদির শিক্ষার পর গোলকের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। পৃথিবীর আকার গোল। অনন্ত শূন্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিও আকাশে ভাসিতেছে। আকাশের উপর, নীচ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ নাই। জামালকোটা বা এরণ্ড গাছের (স্থান বিশেষে ভেরেণ্ডাও বলে) ডাল ভাঙ্গিয়া, একটা কচুর পাতায় তাহার রস সংগ্রহ কর, একটা খড়ের অঙ্গুরী করিয়া, সেই অঙ্গুরীর সঙ্গে এই রস লাগাইয়া ধীরে ফুঁ দাও। আকাশে গোল গোল অনেক ফুঁপড়ি উড়িতে থাকিবে। সাবান গুলিয়া, একটা নলের (বা পাট কাঠির) সাহায্যেও এইরূপ ফুঁপড়ি উড়ান যায়। বলিয়া দাও যে পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র শূন্যে এইরূপ উড়িতেছে। আমরা পৃথিবী হইতে ছুটিয়া যাই না কেন? এ প্রশ্ন বালকেরা প্রায়ই করিয়া থাকে। আকর্ষণের কথা তাহারা ভাল বুঝিবে না। একটা বড় হাঁড়ির গায়ে পিপিলিকা

লাগিয়া থাকিলে, হাঁড়ি ঘুরাইলেও সে পিপীলিকা পড়ে না। এই দৃষ্টান্তের দ্বারাই আপাততঃ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। জলের ভাগ বেশী, স্থলের ভাগ কম, ইহা বালককে গোলকে দেখাইয়া দাও।

অক্ষরেখা দ্রাঘিমা প্রভৃতি।—একটা বাতাবি লেবুর (স্থান বিশেষে জাম্বুরা বলে) বোঁটার দিক দিয়া অপর দিক পর্য্যন্ত একটা শলাকা বিদ্ধ কর। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ দিক দিয়া এইরূপ শলাকা কল্পনা কর। এই কাল্পনিক শলাকাকেই মেরুদণ্ড বলে। শলাকার উপর বাতাবি লেবু ঘুরাইয়া দেখাও, পৃথিবীও এইরূপে ঘুরিতেছে। বিভিন্ন স্থানের দূরতা নির্ণয় করার জন্য গোলকের উপর কতকগুলি দাগ কাটা থাকে, উত্তর দক্ষিণে লম্বা দাগগুলিকে দ্রাঘিমা (মাধ্যাহ্নিক রেখা) আর পূর্ব্ব পশ্চিমে অঙ্কিত সমান্তর রেখাগুলিকে অক্ষরেখা বলে। পূর্ব্ব পশ্চিমে অঙ্কিত রেখাগুলির মধ্যে যেটী ঠিক মধ্যস্থলে তাহাকে বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত বলে।

এই বিষুব রেখাকে ৩৬০ ভাগে (এক এক ভাগের নাম ডিগ্রি) ভাগ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া দ্রাঘিমার রেখাগুলি টানা হইয়াছে। বিষুব রেখার নিকট পৃথিবীর পরিধি ২৫০০০ মাইল। তাহা হইলে বিষুব রেখার উপর ১ডিগ্রি পরিমিত স্থানে ২৫০০০ ÷ ৩৬০ = ৬৯.৩৯ এত মাইল স্থান আছে। বিষুব রেখার নিকট দুইটী দ্রাঘিমার মধ্যে যতটা ফাঁক, যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই এই ফাঁক কম হইয়া যায়। সুতরাং দূরত্বও কম হইয়া আসে। মেরুর নিকট সব রেখা মিলিয়া গিয়াছে। আবার প্রত্যেক দ্রাঘিমা-রেখাও ৩৬০ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ও তাহার মধ্য দিয়া অক্ষ বৃত্তগুলি অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রীনইচের দ্রাঘিমাকে ০° ধরিয়া অপর সকল দ্রাঘিমা (পূর্ব্ব পশ্চিমে) গণনা করা হয়, ইহাও বলিয়া দিতে হইবে। ৩৬০টী রেখা টানিলে বড়ই অপরিষ্কার দেখায় বলিয়া সাধারণতঃ ৩৬টী রেখা টানা হয়। সুতরাং ২টী দ্রাঘিমার

মধ্যে ফাঁক ৬৯.৩৮×১০=৬৯৩'৯ (প্রায় ৬৯৪) মাইল। আবার দুইটী দ্রাঘিমার মধ্যে সময়ের তফাৎ (২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ১৪৪০০ মিনিট÷৩৬০=৪মিনিট) ৪ মিনিট, ১০টার মধ্যে ৪০ মিনিট, ১৫টী দ্রাঘিমার মধ্যে তফাৎ ৬০ মিনিট অর্থাৎ ১ ঘণ্টা। জাপান আর কলিকাতার মধ্যে প্রায় ৫০টী দ্রাঘিমার ফাঁক। সুতরাং জাপানে সূর্য্যোদয় হইবার প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে কলিকাতায় সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে। জাপানে যখন প্রাতঃকালে লোকজন কার্য্যে ব্যস্ত, কলিকাতায় তখন শেষ রাত্রিতে বালকগণ নিদ্রায় অচেতন। আবার কলিকাতায় সূর্য্যোদয়ের প্রায় ৬ ঘণ্টা পরে লণ্ডনে সূর্য্যোদয় হয়। বালকগণকে বিভিন্ন স্থানের সূর্য্যোদয়ের কাল নির্ণয় করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর কর্কট-ক্রান্তি, মকর-ক্রান্তি ও শীত গ্রীষ্ম মণ্ডলগুলির পরিচয় করানও আবশ্যক। এ সমস্তই যে কাল্পনিক রেখা, বিদ্যালয়ের গোলকের উপরই অঙ্কিত থাকে, পৃথিবীর উপরে এরূপ কোনও রেখা নাই তাহাও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবে।

দিবা রাত্র।—যদি বিদ্যালয়ে গোলক থাকে ভাল, না থাকিলে একটা বাতাবী লেবুর (জাম্বুরার) মধ্য দিয়া একটা শলাকা বিদ্ধ করিয়া লও। টেবিলের উপর কল্কার ছিদ্রের মধ্যে একটা বাতি জ্বালিয়া রাখ। লেবুটীর উপর এক স্থানে একটা আল্পিন পুতিয়া রাখ, যেন সেইটী একজন মানুষ। আর চকের দ্বারা লেবুর উপর বিষুব রেখাটীও আঁকিয়া রাখ। বাতি হইতে প্রায় দুই হাত দূরে, শলাকা বিদ্ধ লেবুটী (শলাকা টেবিলের সহিত লম্বা ভাবে ধরিয়া) ধীরে ধীরে ঘুরাইতে থাক। যে অংশ বাতির দিকে থাকিবে সেই অংশে আলো পাইবে, অপর অংশ অন্ধকারে থাকিবে; আবার ঘুরাইলে অন্ধকার অংশ ধীরে ধীরে আলোতে আসিবে ইত্যাদি রূপে দ্বিপ্রহর, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি বুঝাইয়া দাও। কিন্তু মেরুদণ্ডকে এইরূপ লম্ব ভাবে ধরিয়া পৃথিবী ঘুরাইলে মেরুদ্বয়েও

দিন ও রাত্রি সমান হয়, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা হয় না। যাহারা মেরুর নিকট বাস করে, তাহারা বলে যে সেখানে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস
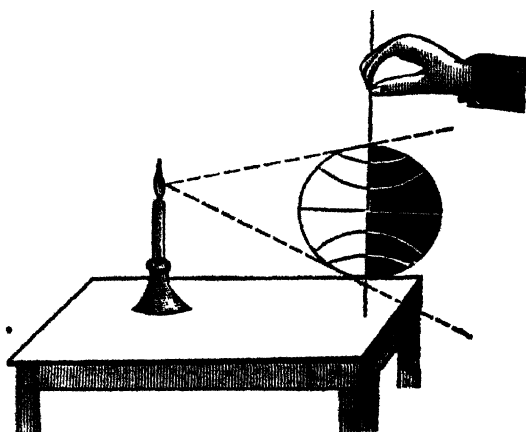
৭৮ চিত্র।—সমান দিন রাত।

রাত্রি। তাহা হইলে পৃথিবীকে কিরূপ ভাবে আলোকের সম্মুখে ধরিলে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে তাহাই দেখা যাউক।

৭৯ চিত্র।—দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি।
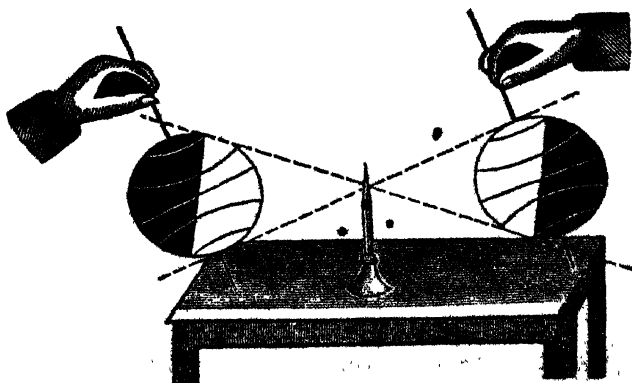
৭৯ চিত্রানুরূপে গোলকটী বামপাশে ধরিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অবস্থায় গোলক ঘুরাইলে উত্তর মেরুতে আলো যাইবে না ও দক্ষিণ মেরুতে কখন অন্ধকার হইবে না। সুতরাং পৃথিবী সূর্য্যের সম্মুখে ৬ মাস এই অবস্থাতে থাকে। এখন আবার গোলকটীকে আলোর অপর পার্শ্বে সরাইয়া আন। গোলক ঠিক ঐরূপেই ধরিয়া রাখ। এখন দেখিবে যে বাতির আলো উত্তর মেরুতে পড়িল, কিন্তু দক্ষিণ মেরু অন্ধকারে থাকিল, ঘুরাইলেও আর দক্ষিণ মেরুতে আলো যাইবে না, ও উত্তর মেরু অন্ধকারে পড়িবে না। সুতরাং পৃথিবী অপর ৬ মাস এইরূপ ভাবে সূর্য্যের দিকে অবস্থান করে। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বস্থ কতক স্থানে উভয় অবস্থাতেই সম্পূর্ণ আলোক পাইয়া থাকে; এই অংশ তাপও অধিক পরিমাণে পায় বলিয়া এই অংশকে গ্রীষ্মমণ্ডল কহে। যে অংশ অল্প অল্প আলোক ও তাপ পায় তাহা নাতিশীতোষ্ণ, আর যাহা ৬ মাস একেবারেই তাপ ও আলোক পায় না তাহাকে শীতমণ্ডল কহে। কর্কট-ক্রান্তি মকর-ক্রান্তিরেখা দুইটী দেখাইয়া দাও।

মানচিত্রে শিক্ষা।—বালকগণকে এই সমস্ত লক্ষ্য করিতে বল: ইউরোপের উপকূলভাগ বেশী। সমুদ্রপথে প্রায় স্থানেই যাতায়াত করা যায়। এই জন্য ইউরোপ বাণিজ্যপ্রধান। এসিয়ার উপকূল ভাগ ইয়ুরোপ হইতে কম, আফ্রিকার উপকূল ভাগ বড়ই কম—অধিকাংশ স্থানই সমুদ্র হইতে দূরে। উপদ্বীপগুলি প্রায়ই দক্ষিণে বিস্তৃত যথা—কামস্কাট্কা, মালয়, ভারতবর্ষ, ইতালী, গ্রীস, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি, কেবল ডেনমার্ক উত্তরে প্রসারিত।, উপসাগরগুলিও প্রায়ই উত্তর দক্ষিণে লম্বাকৃতি—পারস্য সাগর, শ্যামসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর, বাল্টীক সাগর, ইত্যাদি। দেশের উপকূল ভাগ প্রায়ই পর্ব্বতময়—সমুদ্রের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার সহজে পরিবর্ত্তন ঘটে না। হিন্দুকুশ পর্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার বড় বড় পর্ব্বতগুলি চারি দিকে ব্যাসার্দ্ধের মত বিস্তৃত হইয়াছে।

এশিয়ার মধ্যদেশ * খুব উচ্চ, তাই নদীগুলি এই মধ্যদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চারি দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে; যথা—ওবি, ইনিসে, লেনা, এই মধ্যদেশ হইতে উঠিয়া উত্তর সাগরে পড়িতেছে। ইয়াং সিকিয়াং, হংকং প্রভৃতিও এই মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ব্বে প্রশান্ত সাগরে পড়িয়াছে। মনাম্, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু প্রভৃতি এই-রূপে ভারতসাগরে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশ আর্য্যা-বর্ত্ত হইতে উচ্চ। আবার দাক্ষিণাত্যের বম্বে উপকূল মান্দ্রাজ উপকূল হইতে উচ্চ। এই জন্য মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি মান্দ্রাজ উপ-কূলেই পড়িয়াছে। গঙ্গ ও সিন্ধুর মোহানা দুইটী খুব নীচু স্থান, এই জন্য এই দুই নদী মোহানার নিকট অনেক মুখে বিভক্ত হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত, আরব সাগর ও বঙ্গ উপসাগরের বাষ্প হিমালয় ছাড়াইয়া তিব্বতে যাইতে পারে না বলিয়া তিব্বতে বৃষ্টি হয় না। আবার আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বেশি বৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ সমুদ্রে ঘেরা, উত্তরাংশ পর্ব্বতে ঘেরা, শত্রু সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। কেবল পশ্চিমাংশে কয়েকটী গিরিসঙ্কট আছে; সেই পথেই আক্রমণকারিগণ ভারতে আগমন করিয়াছিল। সাহারা মরুভূমি এককালে ভূমধ্য সাগরের অংশ ছিল, কারণ সাহারার বালুকায় সমুদ্রজাত জীবজন্তুর যথেষ্ট কঙ্কাল পাওয়া যায়। আগ্নেয় গিরিগুলি প্রায়ই সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া আগ্নেয় গিরির শ্রেণী যাবাদ্বীপ পর্য্যন্ত প্রসারিত; আবার আর এক শ্রেণী আগ্নেয় গিরি আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। মনে হয় যেন পৃথিবী একটী আগ্নেয় গিরির মালা পরিয়া রহিয়াছে। এইরূপে প্রাকৃতিক অবস্থার বিশেষত্বের দিকে বালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করান কর্ত্তব্য। শীত গ্রীষ্মাদির তারতম্য বুঝিতে হইলে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারা আবশ্যক।

ভূগোলের পাঠ মুখস্থ করাইবার প্রণালী।—ভূগোলের বিবরণ যেমন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, সেইরূপ পরীক্ষার জন্য ভূগোলের নাম গুলি মুখস্থ করানও আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নাম গুলি অভ্যস্ত করাইতে হইবে। নিম্নে নগর শিখাইবার প্রণালী প্রদত্ত হইল। অন্যান্য পাঠও এইরূপ প্রণালীতে শিখাইতে হইবে।

মনে কর ইংলণ্ডের প্রধান নগর শিখাইতে হইবে। বোর্ডে ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত কর, এবং তাহাতে একটী একটী করিয়া নগরের চিহ্ন দাও ও নাম লেখ এবং সেই সেই সহর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য মোটামুটী বিবরণ বল যথা :—(বোর্ডে অঙ্কিত মানচিত্রে লণ্ডন সহরের স্থান নির্দ্দেশ করতঃ, নগর-জ্ঞাপক-বিন্দু চিহ্ন দিয়া ও লিখিয়া) লণ্ডন সহর এইখানে—টেম্‌স নদীর উপর, আয়তনে ও ঐশ্বর্য্যে এত বড় সহর পৃথিবীতে আর নাই। আমাদিগের রাজা এই নগরে থাকেন। এইখানে পার্লিয়ামেণ্ট নামক মন্ত্রী সভার বৃহৎ বাড়ী আছে (পার্লিমেন্ট গৃহের ছবি দেখাও) টেমস্ নদীর নীচে ৮০০ শত হাত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে :—“উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর”—লণ্ডন সহর একটী বড় বন্দর, সমুদ্র হইতে বেশী দূরে অবস্থিত নহে, এই সহরের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ (কলিকাতা, লণ্ডন, পিকিন, চিকাগো, প্যারিস ও বার্লিন নগরের লোকসংখ্যা জানা আবশ্যক)

এই লিভারপুল সহর—একটী বড় বন্দর—এইখানে তুলার আমদানি হয়—আর এখান হইতে আমাদিগের দেশে লবণ রপ্তানি হয়।

এই ম্যানচেষ্টার সহর—আমাদিগের দেশের ব্যবহার্য্য ধুতি চাদর কাপড় এইখান হইতে আসে। এখানে অনেক কাপড়ের কল আছে। একটা বড় এঞ্জিনের সঙ্গে হাজার দুহাজার তাঁত জোড়া থাকে। সেই এঞ্জিনের জোরে এক সঙ্গে অনেকগুলি তাঁত চলে ও এক সঙ্গে অনেক কাপড় প্রস্তুত হয় বলিয়া বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়াও সস্তায় বিক্রয় হয়। (কাপড়ের কলের ছবি দেখাও)।

এই সেফিল্ড সহর—এইখানে খুব ভাল ভাল ছুরী, কাঁচী, ক্ষুর প্রস্তুত হয়। (সেফিল্ড লেখা একখান ছুরী কি কাঁচী দেখাও)

এই অক্সফোর্ড ও এই কেম্ব্রিজ—এই দুইটী সহরে ইংলণ্ডের দুইটী প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়—অক্সফোর্ডে সাহিত্য দর্শন প্রভৃতির আলোচনা হয় ও কেম্ব্রিজে গণিত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। আমাদিগের আনন্দমোহন বসু (পরাঞ্জেপ্যের নামও কর) কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ

করিয়াছিলেন। আর আমাদিগের বহুভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হরিনাথ দে অক্সফোর্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত।

এই ব্রিস্টল বন্দর—এখানে রাজা রামমোহন রায়ের (রামমোহন রায়ের গল্প বল) মৃত্যু হয়—এখানে তাঁহার সমাধি মন্দির আছে।

এইটী গ্রিনউইচ সহর—এইখানে ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মানমন্দির আছে। হিন্দুদিগের মানমন্দির কাশীতে ছিল।

এইরূপে আরও ৩।৪ টী (ডোভর, বার্ম্মিংহাম, লিডস্‌, নিউকাসেল) সহরের বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের সহিত আমরা সংসৃষ্ট বলিয়াই ইংলণ্ডের এতগুলি নগর শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু অন্যান্য দেশের ২।৪টী প্রধান নগর শিখিলেই যথেষ্ট হইবে।

বোর্ডের মানচিত্রে এই সহর গুলি উত্তমরূপে লেখা হইয়া গেলে বালকগণকে বোর্ড লিখিত এক একটা সহরের নাম পড়িতে বল ও তাহার বর্ণনা করিতে বল। বালকগণ অবশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিবে। 'ম্যান্‌চেষ্টারে কাপড় প্রস্তুত' হয় বলিলেই এ সহরের যথেষ্ট বর্ণনা হইল। এইরূপ সকল সহরের বর্ণনা হইয়া গেলে, সহরের নাম গুলির আদ্যাক্ষর মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুছিঁয়া ফেল। লণ্ডনের ল, লিভারপুলের লি, ম্যানচেষ্টারের ম্যা রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ পুছিয়া ফেল। এখন আবার বালকগণকে পূর্ব্বের ন্যায় এক একটী সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল। ইহার পর আদ্যাক্ষরগুলিও পুঁছিয়া ফেলিয়া কেবল সহরের বিন্দু চিহ্নগুলি রাখ। পূর্ব্বরূপ সহরের নাম করিতে বল ও বর্ণনা করিতে বল। তারপর বিন্দুগুলিও পুঁছিয়া দাও ও বালকগণকে সহরের স্থান ঠিক করিয়া বিন্দু দিতে বল ও নাম করিতে বল। ইহার পর বালকগণকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সহরের নাম করিতে বল। এইরূপ বাহিরের চিত্র অন্তরে চালনা করিতে হয়। কিন্তু একদিন এ বিষয় শিক্ষা দিয়াই যেন শিক্ষক একথা মনে না করেন যে ইংলণ্ডের নগর বিষয়ে তাঁহার

বালকগণ পাকা হইয়া গেল। বার বার আলোচনা না করিলে, কিছুতেই মনে থাকিতে পারে না। সুতরাং বৎসরে প্রত্যেক পাঠের অন্ততঃ (মধ্য শ্রেণীর জন্য) ৫।৭ বার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বালকগণ প্রত্যেক দিন নিজকৃত মানচিত্রে পাঠের বিষয় সন্নিবেশিত করিবে। এইজন্য ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্রাঙ্কন শিক্ষা নিতান্তই প্রয়োজন।

মানচিত্রাঙ্কন।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার "চিত্রানুকরণ" পদ্ধতিতে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, মানচিত্রাঙ্কনেও তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। মুদ্রিত ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র দৃষ্টে তদনুরূপ মানচিত্র অঙ্কন করা, চিত্রানুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে পরীক্ষার সময় মানচিত্রাঙ্কনের প্রশ্ন হইয়া থাকে, সে সময়ে কোনও আদর্শ প্রদত্ত হয় না, নিজের স্মৃতি শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয়। সে সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আবশ্যক।

(১) পরীক্ষার কাগজে যে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হয়, তাহার আয়তন লম্বায় ৭ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ পরিমাণ হইলেই চলিতে পারে। কাগজে প্রথমে এইরূপ মাপে, চারিদিকে কালী দিয়া একটু মোটা করিয়া বরডার (পাড়) টানিয়া লইবে। একটী রেখা দিলেই হইবে। দুইটী রেখা দিবার প্রয়োজন নাই। কখনই বরডার ভিন্ন মানচিত্র আঁকিবে না। বরডারে যে কেবল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, কাজেরও সুবিধা হয়। এই বরডারের দীর্ঘ প্রস্থ রেখা সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রথমে একটী করিয়া অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা টানিয়া লইতে হয়।

(২) মানচিত্র অঙ্কন কালে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা গুলি টানিয়া লইলে মানচিত্র অঙ্কনে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে পরীক্ষার জন্য এত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর নয় বলিলেও হয়। কিন্তু পরীক্ষায় সাধারণতঃ যে সকল মানচিত্র

অঙ্কিত করিতে দেওয়া হয় সে সকলের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা মনে রাখা বিশেষ কঠিন কাজ নহে। প্রত্যেক মানচিত্রে সমস্ত রেখার অঙ্ক মনে রাখিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য দ্রাঘিমা মনে রাখিলেই চলিবে। ৮০ চিত্রে ঠিক মধ্য অক্ষরেখা ও ঠিক মধ্য দ্রাঘিমা মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটী ঠিক আঁকিলেই অপর গুলি দিতে পারা যায়। গ্রিনউইচ হইতে যতই পূর্ব্বে যাইতেছে ততই দ্রাঘিমা ১০, ২০, ৩০, ৪০, করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, আবার বিষুব রেখার যতই উত্তরে যাইতেছে ততই ১০, ২০, ৩০, ৪০, করিয়া অক্ষরেখার অঙ্কও বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাই মনে রাখিলে আর সকল অঙ্কই দিতে পারা যায়। যাহা হউক সমস্ত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা না টানিলেও অন্ততঃ মধ্য রেখা দুইটী অঙ্কন করা নিতান্তই আবশ্যক। আর সেই দুইটীর অঙ্কও বর্ডারের বাহিরে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা না করিলে মানচিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বর্ডারের রেখা একটু মোটা করিতে হইবে, কিন্তু অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাগুলি খুব সরু হইবে।

মধ্য অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাগুলি একটু সঙ্কেতে মনে রাখিতে হয় যথা—ভারতবর্ষের মধ্য দ্রাঘিমা ৮০, অঙ্ক ২০ (দুইটী শূন্য) আফ্রিকার ২০ আর ০ (এও দুই শূন্য) দক্ষিণ আমেরিকার ৬০ আর ২০, অষ্ট্রেলিয়া ১৩৫ আর ২৫ (দুইটী ৫), ইতালীর ১২ আর ৪২ (দুইটী ২), ইংলণ্ডের ২ আর ৫৩ (৫ আর ৩ এর বিয়োগ ফল ২), চীন সাম্রাজ্যের ১০৫ আর ৩৫, জাপানের ১৪০ আর ৪০, ভূমধ্য সাগরের ১৫ আর ৩৫। পরীক্ষায় প্রায়ই এই সকল মানচিত্র অঙ্কন করিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এ সকল ছাড়া বঙ্গদেশ বা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মানচিত্রও আঁকিতে দেওয়া হয় (২৩ ও ৮৩, ২৫ ও ৯১)।

(৩) সরল রেখাদি টানিয়া মানচিত্রকে মোটামুটি রকমের একটা সরল রৈখিক ক্ষেত্রে পরিণত করিতে পারিলে, আঁকিবারও সুবিধা হয় আর মনে রাখিবারও সুবিধা হয়। নিম্নে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।
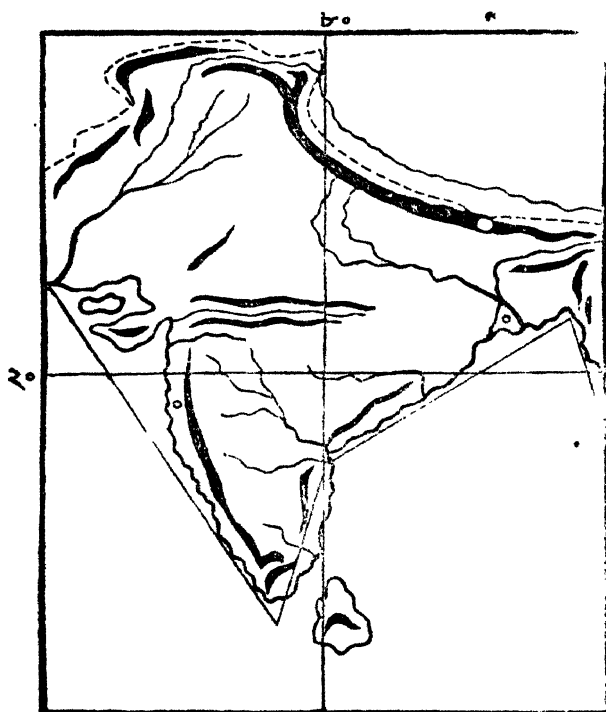
৮০ চিত্র। মানচিত্রাঙ্কন।

সিন্ধু দেশের নিকটস্থ বরডার ৩ অংশে, তার নীচের অক্ষরেখা ৪ অংশে, তার নীচের দ্রাঘিমা ৪ অংশে ও তার উপরের অক্ষরেখাংশ ২ ভাগে ভাগ করিয়া যেরূপে রেখা সংযুক্ত হইয়াছে তাহা এবং অন্যান্য বিন্দু ও রেখা লক্ষ্য কর। দুই তিন দিন দেখিয়া অভ্যাস করিলেই মনে থাকিবে। এ সমস্ত চিত্র অবশ্য প্রথমে পেনসিলের দ্বারা খুব পাতলা করিয়া আঁকিতে হইবে। তারপর মানচিত্র শেষ হইলে রবার দিয়া পুঁছিয়া ফেলিবে।

(৪) মানচিত্র প্রথমে পেন্‌সিলে আঁকিবে, পরে কালি দিবে।

সমুদ্রের ধারে একটু মোটা করিয়া দাগ দিবে। মানচিত্রের মধ্যে দেশ বিভাগ করিতে হইলে, সে রেখাগুলি সরু করিয়া দিবে বা বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে।

(৫) পর্ব্বতের স্থানে মোটা কালির দাগ দিবে, প্রসিদ্ধ শৃঙ্গের স্থান গুলি ফাঁক রাখিবে। নদীর রেখা গুলি আঁকা বাঁকা করিয়া দিবে। নদীর রেখা উৎপত্তির নিকট সরু হইবে ও যতই সমুদ্রের নিকট আসিবে ততই একটু করিয়া মোটা হইবে। কিন্তু বেশী মোটা না হয়। নগরগুলির স্থানে এক একটা বিন্দু দিয়া রাখিবে।

(৬) নগর, নদী, পর্ব্বতাদির নাম গুলি ছাপার মত করিয়া লিখিবে। জড়া করিয়া লিখিও না। লেখা সুন্দর না হইলে মানচিত্র ভাল দেখাইবেনা। মানচিত্রের নামটী এক কোনে বড় অক্ষরে সুন্দর করিয়া লিখিবে।

(৭) পরীক্ষার মানচিত্রে কোনরূপ রঙ ব্যবহার করিবেনা। পরীক্ষক মনে করিবেন যে তুমি তাঁহাকে রঙ দিয়া ভুলাইয়া, তোমার অঙ্কনের ত্রুটী ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছ।

(৮) মানচিত্র খুব পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। রবার দিয়া পেন্‌সিলের দাগ তুলিতে গিয়া কাগজের মসৃণত্ব নষ্ট করিবে না বা পেনসিলের দাগ ঘসিয়া সমস্ত কাগজ ময়লা করিবেনা। যদি কোন কারণে কাগজ খানি ময়লা হইয়া যায়, তবে তোমার এই ময়লা মানচিত্রের শুদ্ধ রেখাগুলির উপর একটু জোরে পেন্‌সিল দিয়া দাগ কাটিলে, (খাতার) নিম্নের কাগজে একটা সাদা দাগ পড়িয়া যাইবে। ময়লা কাগজখানি ভাজিয়া রাখ ও এই নিম্নের কাগজের দাগের উপর সাবধানে কালি দিয়া মানচিত্র অঙ্কন কর।

(৯) খুব কঠিন মানচিত্র হইলেও, পরীক্ষাগৃহে মানচিত্রাঙ্কনে অর্দ্ধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করিবেনা।

ভূগোল শিক্ষাদানের ধারাবাহিক প্রণালী।—মনে কর তুমি শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জলচপ থানার এলাকা-

ধীন দিঘীরপার গ্রামস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এখন তোমাকে যে ধারা অনুসারে ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে, নিম্নে তাহার ক্রম প্রদর্শিত হইল :—

(১) প্রাঙ্গণ + খেলার স্থান + শ্রেণীকক্ষ + অন্যান্য শ্রেণী + বারান্দা

(২) নদী + টিলা + পুকুর + বিদ্যালয় + পথ + দেবালয় + বাজার + ডাকঘর + কৃষিক্ষেত্র

(৩) বিয়ানী + মাতিয়ুরা + দিঘীরপার + সোপাতলা + কসবা

(৪) পাথারিয়া + বড়লেখা + পঞ্চখণ্ড + বাহাদুরপুর + ঢাকা উত্তর

(৫) রাতাবাড়ী + পাথারকাঁদি + জলঢুপ + করিমগঞ্জ

(৬) সুনামগঞ্জ + হবিগঞ্জ + করিমগঞ্জ + উত্তর শ্রীহট্ট + দক্ষিণ শ্রীহট্ট

(৭) লুসাইপাহাড় + নাগাপাহাড় + শ্রীহট্ট + কাছাড় + খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়

(৮) মণিপুর + সুরমা উপত্যকা + ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা

(৯) উত্তরবঙ্গ (রাজসাহী) + আসাম + পূর্ব্ববঙ্গ (ঢাকা চট্টগ্রাম)

(১০) মধ্যপ্রদেশ + বঙ্গদেশ + পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম + যুক্তপ্রদেশ + পঞ্জাব + ব্রহ্ম + বোম্বাই + মন্দ্রাজ + উত্তরপশ্চিম সীমান্ত + ব্রীঃ বেলুচিস্থান

(১১) আরব + আফগনিস্থান + ভারত সাম্রাজ্য + পূর্ব্বউপদ্বিপ + তিব্বত + চীন + তুরস্ক + তুরকিস্থান + পারস্য + জাপান + সাইবেরিয়া

(১২) আতলানতিক + ভারতমহাসাগর + এসিয়া + ইউরোপ + আফ্রিকা + উঃ প্রশান্ত + উঃ মহাসাগর + দঃ মহাসাগর + আমেরিকা + দঃ আমেরিকা + ওসেনিয়া

(১৩) সূর্য্য + হর্সেল + শনি + বৃহস্পতি + পৃথিবী (চন্দ্র) + শুক্র + মঙ্গল + বুধ + নেপচুন

(১৪) কালপুরুষ ও লুব্ধক + সপ্তর্ষি + সৌরজগৎ + ধ্রুব + মেষাদি দ্বাদশ রাশি + ছায়াপথ ইত্যাদি

(১৫) ব্রহ্মাণ্ড।

১। শ্রেণীকক্ষ—একখানা থালা বা স্লেটের উপর অল্প ভিজা বালিদ্বারা আস্তর (½ ইঞ্চ মত পুরু) কর। তাহার উপর ছোট ছোট (একটু শক্ত) কাগজের সরু ও লম্বা ফালির দ্বারা বেঞ্চ সাজাও ও কাগজের অনুরূপ খণ্ডের দ্বারা চেয়ার, টেবিল, বোর্ড প্রভৃতি রচনা কর। খড় বা কাঠি ভাঙ্গিয়া দরজা জানালা প্রস্তুত কর। বড় জিনিসকে ক্ষুদ্রাকারে দেখানই ইহার উদ্দেশ্য। তারপর শ্রেণীর নক্‌সাপ্রস্তুত কর। ৩৪০ পৃষ্ঠায় নক্‌সা শিক্ষার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। ছাত্রেরাও নিজ নিজ স্লেটে ইহার অনুকরণ করিবে। তারপর এই শ্রেণীকক্ষের সহিত যোগ করিয়া অন্যান্য শ্রেণী, বারান্দা, খেলার স্থান প্রভৃতি প্রস্তুত কর—বিদ্যালয় হইল।

২। বিদ্যালয়—স্লেট বা থালার উপর বালির আস্তর কর। ছোট এক টুক্‌রা কাগজ ভাঁজ করিয়া ঘরের চালের মত কর ও বালির ভিতর (স্লেটের মধ্যস্থলে) পুতিয়া দাও। এই যেন তোমার স্কুল। তারপর ছোট ছোট গাছের ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া বিদ্যালয়ের যে যে স্থানে বড় বড় গাছ আছে স্লেটের সেইখানে পুতিয়া দাও। অন্যান্য ঘরও কাগজ দিয়া দেখাও। বালির উপর একটা পেন্‌সিলের দাগ দিয়া পথ দেখাও। একটু গভীর করিয়া দাগ দিয়া নদী প্রস্তুত কর। খাল, বিল প্রভৃতিও বালির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া দেখাইতে হইবে। টিলার স্থানে, বালি (নৈবিদ্যের মত) উচ্চ করিয়া রাখ। কৃষিক্ষেত্রের স্থানে ঘাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্রভাগ সার করিয়া পুতিয়া দাও। তারপর বিদ্যালয়ের নক্‌সা প্রস্তুত কর। ১৬ পৃষ্ঠায় দেখ। গ্রামে কি কি কৃষি হয়; করিমগঞ্জ ও জলচুপ যাইবার পথ কোন্‌টী? নদী দিয়া কোন্ কোন্ গ্রামে যাওয়া যায়। কোন্ সময়ে নদীর জল বাড়ে, ডাকঘর হইতে কিরূপে পত্রাদি বিলি হয়। কোন্ রাস্তায় অন্যান্য জেলার পত্র যায়, কোন দেবতার দেবালয়, টিলায় জল পড়িয়া কেমন করিয়া নদী হয়—গ্রামের বড় জমিদারের বৃত্তান্ত—জমিদার বাড়ীর কথা (এই পরিবারের কোন রমণী একটী থলিয়া প্রসব করেন, থলিয়া বাটীর বহির্ভাগে ফেলিয়া দেওয়া হয়; কাকে থলিয়া ছিন্ন করে, থলিয়া হইতে দ্বাদশ শিশু বহির্গত হয়, সেই দ্বাদশ শিশুই জমিদারীর পত্তন করেন। গ্রামের বর্ত্তমান পুকুরের নাম বারপালের দিঘী—বর্ত্তমান জমিদার কালীকিশোর চৌধুরী) গ্রামের নানারূপ গল্প, রঘুনাথ শিরোমণির গল্প বল। বাজারে যে সকল জিনিষ বিক্রয় হয় (আমদানী রপ্তানি) কাঁটাল, আনারস, ধান বিক্রয় হয়। এখন গ্রামের নক্‌সা প্রস্তুত কর—দিঘীরপার গ্রাম হইল। নিম্নলিখিত চিত্রের অনুরূপ করিয়া নক্‌সা প্রস্তুত করিলেই হইবে:—

ঘর বাড়ী সাদা চোকার দ্বারা, বাজার ছোট ছোট চৌকায় লাইন করিয়া, টিলাগুলি সাদা রুইতনের টেক্কার মত করিয়া, বৃক্ষবন সাদা বড় বিন্দু ও কৃষিক্ষেত্র সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুদ্বারা, বড় পথ সাদা মোটা লাইনে ও গলিপথ সাদা সরু লাইনে আঁকিবে। পুকুর একটা আয়তক্ষেত্র, বিল হাওর এঁকাবেকা লাইনের ক্ষেত্র, কূপ একটী ছোট বৃত্ত; নদী দুইটী এঁকাবেঁকা লাইনে আঁকিবে। যাহা মাটীর নীচে যেমন পুকুর, নদী, বিল প্রভৃতি তাহা কেবল লাইনের দ্বারা, আর যাহা মাটীর উপরে যেমন ঘর, বাড়ী, পাহাড়, বৃক্ষ, তাহার সীমা লাইনের দ্বারা আঁকিয়া, সেই ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে চক্ ঘসিয়া সাদা করিয়া দিবে। (কাগজে আঁকিতে হইলে পেন্সিল ঘাসয়া কাল করিয়া দিবে) যথা :—
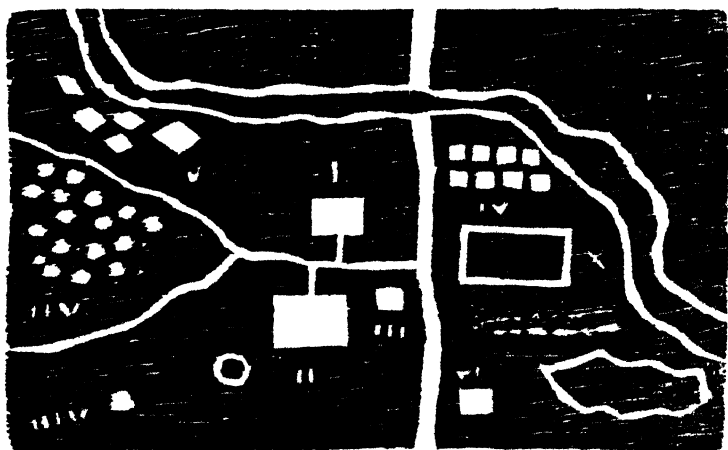
৮১ চিত্র। বোর্ডে গ্রামের নক্সা।

৩। গ্রাম—দিঘীরপার গ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রামের নাম শিখাও—কোন্ গ্রাম কোন্ দিকে? প্রসিদ্ধ কয়েকটী গ্রামের বৃত্তান্ত বল, যথা সোপাতলায় বাসুদেবের বাড়ী, কসবায় অনেক কারবারী লোকের বাস, মাতিয়ুরা মুসলমান প্রধান গ্রাম, বিয়াণীতে বড় বাজার, ডাকঘর ও মঃ ইং স্কুল। অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে পরগণা বলে।

৪। পরগণা—পরগণা অনুসারে খাজানা আদায় হয়। নিকটবর্ত্তী ও নিজ থানার অন্তর্গত কয়েকটী বড় পরগণার নাম শিখাও। বড় লেখা পরগণায় রেলষ্টেসন; ঢাকার উত্তরে পুরাতন বরাক, পাণের বরজ; বাহাদুরপুরে মাইনর স্কুল, রায় বাহাদুরের

বাড়ী ইত্যাদি। এই সমস্ত পরগণা জলচুপ থানার অধীন। (বাঙ্গালা দেশের যেখানে পরগণার চল নাই সেখানে পরগণার বিষয় বাদ দেওয়া যাইতে পারে)।

৫। থানা—চৌকিদারের কার্য্য, কনেষ্টবলের কার্য্য, দারোগার কার্য্য বুঝাইয়া দাও। তাহারা কেমন করিয়া শান্তি রক্ষা করে, তাহার দৃষ্টান্ত দাও। গ্রামের কোনও দুষ্ট লোকের শাস্তি হইয়া থাকিলে, তাহার গল্প বল। জলচুপ থানার বর্ণনা কর। জলচুপে রেজেষ্ট্রি আফিস আছে, রেজেষ্ট্রি করার প্রণালী বল। জলচুপের আনারস প্রসিদ্ধ। অন্যান্য স্থানের আনারসের সহিত জলচুপের আনারসের তুলনা কর। পাথারকান্দিতে একটা ছোট থানা আছে, সেখানে জঙ্গলী আফিস আছে—জঙ্গলী আফিসের কার্য্য বর্ণনা কর। এই সমস্ত থানা মিলিয়া করিমগঞ্জ মহকুমা। নক্সা দেখাও ও প্রস্তুত করাও।

৬। মহকুমা—অনেকগুলি মহকুমা লইয়া একটা জেলা। ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফের কার্য্যের বর্ণনা কর—ম্যাজিষ্ট্রেট চোর ডাকাত প্রভৃতির দমন করেন, মুনসেফ জমিজমা ও টাকা কড়ি বিষয়ক বিবাদ নিষ্পত্তি করেন, গ্রামের দৃষ্টান্ত দাও। করিমগঞ্জে হাই স্কুল আছে—কি কি পড়া হয়, বল। দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, ইহার বৃত্তান্ত বল। হাকালুকী হাওরের গল্প কর। বদরপুরের সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ও বারুণী স্নানের মেলার বর্ণনা কর। বদরপুর জংসন হইতে কোন্ কোন্ দিকে রেল গিয়াছে মানচিত্রে দেখাইয়া দাও। ভাঙ্গায় কাঠের কারবার আছে। শ্রীহট্টের মানচিত্রে অন্যান্য মহকুমা দেখাও ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর—এই দক্ষিণ শ্রীহট্ট (মোলবী বাজার) রাজনগরে লৌহের অস্ত্র ও রাজা সুবিদ নারায়ণের বাটীর ভগ্নাবশেষ। এই সুনামগঞ্জ—ছাতকে চুণ ও কমলালেবু, অন্যান্য গ্রামে ঘি, আলু, তেজ পাতা,—প্রচুর মৎস্য (এক পয়সায় আটটী বড় রোহিত মৎস্যের মাথা) জগন্নাথপুরে রাজা বিজয় সিংহের পুরাতন বাড়ী। দেখার-হাওর ও শণির-হাওরের বর্ণনা কর। নবগ্রামে অদ্বৈতাচার্য্যের জন্ম। এই হবিগঞ্জ—আজমিরিগঞ্জে শুষ্ক মৎস্য, বিথঙ্গলের আখড়া, লস্করপুরের তাঁতির কাপড়, বানিয়াচোঙ্গে লাউড়ের রাজার বাড়ী। এই উত্তর শ্রীহট্ট—বালাগঞ্জের পাটী, সদরের বেতের জিনিষ, হাতীর দাঁতের পাটী, পাখা, চিরুণী, ফেঞ্চুগঞ্জে ষ্টীমার ষ্টেশন, ঢাকা দক্ষিণে শ্রীচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটী, রণকেলির হাওর, মহালক্ষ্মীর মন্দির (পীঠস্থান) ইত্যাদি—জেলা। কাদার দ্বারা বা পুটীনের দ্বারা জেলার বন্ধুর মানচিত্র প্রস্তুত কর (পরিশিষ্টে বন্ধুর মানচিত্রের শিক্ষা প্রণালী পড়)—বন্ধুর মানচিত্রে ও

নক্সায় কি পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। শ্রীহট্টের আয়তন ৫॥ হাজার বর্গ মাইল, গ্রামসংখ্যা ৮॥ হাজার, লোকসংখ্যা ২২॥ লক্ষ।

৭। **জেলা**—সদর ষ্টেশনের বর্ণনা কর—ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ, ডাক্তার সাহেবের ও উকীল মোক্তার, কেরাণী প্রভৃতির কি কার্য্য সংক্ষেপে বলিয়া দাও। দাতব্যচিকিসালয়, জেলখানা (শ্রীহট্ট জেলে নানা প্রকার সুন্দর বেতের টেবিল, চেয়ার ও নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হয়) কলেজ প্রভৃতির বর্ণনা কর। শ্রীহট্টের সদরে সাজলালের দরগা, মনা রায়ের টিলা, আলী আমজাদের ঘড়ী। শ্রীহট্টের সহিত অন্যান্য জেলার যোগ কর যথা—কাছাড় (সদর ষ্টেষন শিলচর)—বিভাগস্থ কমিশনারের আফিস, স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের আফিস। চা প্রসিদ্ধ। বেত, নানারূপ কাঠ, মণিপুরী কাপড় ও বাসন পাওয়া যায়। গুরখা সৈন্যের ক্যানটনমেণ্ট আছে। (৩) খাসিয়া জন্তিয়া পাহাড়—এই পাহাড় প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চ, শিলং সহর বর্ত্তমান রাজধানী, ছোট লাটের বাড়ী (ছোট লাটের নাম বলিয়া দাও) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের আফিস (ডিরেক্টারের নাম বল) মচমাই নদীর জল প্রপাতের বর্ণনা কর,—উত্তম কমলালেবু পাওয়া যায়—খাসিয়া জাতির বর্ণনা কর—কয়লা, তুলা, পান, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। (৪) নাগা পাহাড়—পাটকই শ্রেণী ; কহিমা রাজধানী, নাগাজাতির বিবরণ, তুলা, রবার হস্তিদন্ত। (৫) লুসাই পাহাড়—অম্বর নামক প্রস্তরীভূত বৃক্ষ নির্য্যাস পাওয়া যায়। রাজধানী আইজল, লুসাই জাতির বিবরণ। মানচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সমস্ত লইয়া সুরমা উপত্যকা বিভাগ—বক্সুর মানচিত্র প্রস্তুত কর ও তাহার সাহায্যে শিক্ষা দাও।

৮। **বিভাগ**—অনেকগুলি ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটী কমিশনারের উপর একজন কমিসনার বিভাগের কর্ত্তা—অনেকগুলি ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের উপর একজন ইন্‌স্পেক্টার বিভাগস্থ শিক্ষার কর্ত্তা। সুরমা উপত্যকার বর্ণনা কর। বরাবেকর গতি, সুরমা কুশিয়ারায় বিভক্ত, সুরমার উপনদী (কুইগাঙ্গ, পিয়াইন, লোভা) কুশিয়ারার উপনদী (লঙ্গলাই, জুরি, মনু) ; খাসিয়া জন্তিয়া পাহাড়ের বর্ণনা। ছাতাচূড়া, ইটা, প্রতাপগড় ; দিনারপুর পাহাড়ে প্রস্রবণ। চেরাপুঞ্জিতে অত্যন্ত বৃষ্টি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বর্ণনা কর—৭টী জেলার নাম শিখাইয়া দাও (মানচিত্রের সাহায্যে), ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ দেখাও, প্রধান প্রধান ৩.৪টী উপনদী দেখাও। যে সকল স্থানে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, কেরোসিন তৈল, চা, রবার, তসর পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দাও। কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের কথা বল। মণিপুর স্বাধীন রাজ্য ; ইংরাজরাজকে কর

দিতে হয়। রাজধানী ইম্‌ফল। মণিপুরী জাতির বর্ণনা কর। ঘোঁড়া ও মহিষ প্রসিদ্ধ।

৯। **উপপ্রদেশ**—আসামের চতুঃসীমা দেখাও—গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্ট বাসী প্রকৃত আসামী নয়—ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা। আসামী ভাষার ও অহম জাতির বর্ণনা কর। পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বিভাগ ও জেলা গুলির নাম শিখাও। কোন্ জেলার কোন্ জিনিষ প্রসিদ্ধ বলিয়া দাও। ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহরের ও গঙ্গা নদীর বর্ণনা কর। প্রদেশের বন্ধুর মানচিত্র ও সমতল মানচিত্রে পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির ও জেলার সীমা দেখাও।

১০। **প্রদেশ**—অনেকগুলি কমিশনরের উপর একজন ছোট লাট—অনেকগুলি ইন্‌স্পেক্টরের উপর একজন ডিরেক্টার। অন্যান্য প্রদেশ গুলি মানচিত্রে দেখাও ও কোন্‌টী লাট কোন্‌টী ছোটলাট ও কোন্‌টী চিফ্ কমিশনরের অধীন তাহা শিখাইয়া দাও। প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানী শিখাও এবং এই কয়েকটী নগর দেখাইয়া দাও: আগ্রা (তাজমহলের বর্ণনা কর ও ছবি দেখাও) দিল্লী (জুম্মামসজিদ) কাশী (বিশ্বেশ্বরের মন্দির) পুরী (জগন্নাথের মন্দির) নাসিক (পঞ্চবটী বন) করাচী বন্দর (মকায় যাইবার পথ) রামেশ্বর সেতুবন্ধ, অযোধ্যা। রামচন্দ্র কোন্ রাস্তায় লঙ্কায় গিয়াছিলেন দেখাও। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সহরের বিস্তারিত বর্ণনা কর ও চিত্র দেখাও। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে অতুলনীয়, বর্ণনা কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বল।

১১। **দেশ**—অনেকগুলি প্রদেশ লইয়া একটা দেশ—বড়লাট ভারত সাম্রাজ্যের অধিপতি—ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিনিধি—বড়লাটের নাম বল—মানচিত্রে শিমলা দেখাও—কলিকাতায় বড় লাটের বাড়ীর ছবি দেখাও। ভারতের প্রধান প্রধান ৬।৭টা নদী ও ৪।৫টা পর্ব্বতের পরিচয় করাও। রাজপুতনার মরুভূমি ও চিল্কাহ্রদ দেখাও। আন্দামান দ্বীপে খুনী আসামীদিগকে দ্বীপান্তরিত করে কেন, বুঝাইয়া দাও। ভারতবর্ষের সহিত যোগ করিয়া এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাম ও প্রধান নগর শিখাও। এসিয়ার খুব বড় বড় ১০।১২টা নদী ও ৫।৬টা পর্ব্বত দেখাও। ২।৩টী সাগর উপসাগর দেখাও। চীনের প্রাচীরের কথা বল। জাপান যুদ্ধের কথা বল।

১২। **মহাদেশ ও মহাসাগর**—এশিয়ার সহিত যোগ করিয়া ইউরোপ দেখাও ও ইউরোপের দেশগুলির রাজধানীর পরিচয় করাও। ইউরোপের ৫।৬টী

প্রধান নদী ও ৪।৫টী পর্ব্বত শিখাও। ইংলণ্ডের রাজধানী ছাড়া লিবরপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, বারমিংহাম ও টেমস নদী দেখাইয়া দাও। আফ্রিকার ইজিপ্ত (নীলনদী ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং কেইরো সহ) কেপকলনি (কেপটাউন) এবং শাহারা মরুভূমি দেখাও, পিরামিডের বর্ণনা কর ও ছবি দেখাও। ভূমধ্য সাগর কেন বলে ? আমেরিকার কানাডা, ইউনাইটেড ষ্টেটস্, মিসিসিপি, আমেজান, আন্দিজ দেখাও। অষ্ট্রেলিয়া খুব বড় দ্বীপ। উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগরের তুষারের বর্ণনা কর। অন্যান্য মহাসাগর দেখাও। কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে লণ্ডনে আসিবার পথ দেখাও ও বর্ণনা কর। এখন পৃথিবীর আকার বর্ণনা কর—শূন্যে অবস্থান (৩৬৪ পৃষ্ঠা পড়)।

১৩। **পৃথিবী**—অন্যান্য গ্রহগুলির নাম কর—সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রহ ঘুরিতেছে—সূর্য্যের বর্ণনা কর। সূর্য্য ও আটটী গ্রহ লইয়া সৌরজগৎ। আকাশে বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ দেখাইয়া দাও (অন্যান্য গ্রহ সহজে পরিচয় করাইতে পারিবে না)। এইরূপ অনেক সৌরজগৎ আকাশে ভাসিতেছে। দিবা রাত্রের পরিবর্ত্তন ও ঋতুর পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া দাও (৩৬৬ পৃষ্ঠায় পড়)। প্রতিপদাদিতে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও। চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই—সূর্য্যালোকে আলোকিত। গ্রহণ বুঝাইয়া দাও।

১৪। **সৌরজগৎ**—কতকগুলি নক্ষত্র পুঞ্জের পরিচয় করাও। অনেক নক্ষত্র সূর্য্য অপেক্ষা বড়। কালপুরুষ ও লুব্ধক দেখাও—লুব্ধক সূর্য্য অপেক্ষা ২০০০ গুণ বড়। সপ্তর্ষি ও ধ্রুব দেখাও (৩৫৭ পৃষ্ঠায় পড়), মেষাদি দ্বাদশ রাশির পরিচয় না করাইলে সূর্য্যের দৃশ্যমান গতি বুঝিতে পারিবে না। সকলগুলির পরিচয় করান একটু শক্ত, তবে কালপুরুষের নিকট বৃষ রাশির পরিচয় পাইলে মিথুন, সিংহ, কন্যা, বৃশ্চিক প্রভৃতি ৫।৬টা রাশির পরিচয় করান যাইতে পারে, কারণ এই সমস্ত রাশিতে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র আছে (নক্ষত্রগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, অল্পোজ্জ্বল)। ছায়াপথ বহুদূরস্থিত অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, দেখাইয়া দাও। (যে ব্যক্তি গ্রহ ও রাশিগুলি চিনেন, তাঁহার নিকট হইতে এই গুলি শিখিয়া লও। পুস্তক লিখিত বর্ণনা পড়িয়া আকাশের নক্ষত্রের পরিচয় করা কঠিন।)

১৫। **ব্রহ্মাণ্ড**—দৃশ্য এবং অদৃশ্য সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ লইয়া ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

২। ইতিহাস।

ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য।—ইতিহাস শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটী :—(১) অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা জন্মান (২) স্বদেশের প্রতি অনুরাগ জন্মান *। ইহা ছাড়া অনেকগুলি গৌণ উদ্দেশ্যও আছে যথা—(১) কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বারা বিচার শক্তি বৃদ্ধি করা, (২) স্মরণ শক্তিকে বৃদ্ধি করা (৩) নূতন বিষয় জানিবার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করা। (৪) অন্যান্য দেশের কার্য্য কলাপ দৃষ্টে নিজের অবস্থা উন্নত করা (৫) কুসংস্কার বর্জ্জন করা (৬) সৎকার্য্যের প্রতি আশক্তি জন্মান। (৭) মানবজাতির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া নিজে সাবধান হওয়া।

---

* From a Lecture of Sir J. Fitch on "The National Protrait Gallery"—"It (a visit to the gallery) will, I hope, strengthen in us the feeling of patriotism. By this I do not mean that theatrical patriotism which exults in conquests, and which expresses itself by waving the Union-Jack and singing 'Rule Britania' in our schools and public places ; but a rational patriotism, founded on knowledge and on an affectionate and grateful recognition of what has been done for us by our ancestors and of the preciousness of the inheritence which they have left us." অনুবাদ—'এই জাতীয়-চিত্রশালা দর্শনে যে আমাদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি হইবে, ইহা আমার বিশ্বাস। যে নাট্যমঞ্চোপযোগী স্বদেশানুরাগ দিগ্বিজয়ে উল্লসিত এবং বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে জাতীয় পতাকা সঞ্চালনে ও জাতীয় সঙ্গীত কীর্ত্তনে প্রকাশিত, আমি সেরূপ স্বদেশানুরাগের কথা বলিতেছিনা; যে স্বদেশানুরাগ প্রকৃষ্ট জ্ঞানে সংস্থাপিত এবং ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে পূর্ব্বপুরুষগণকৃত কার্য্যাদির ও তাঁহাদিগের পরিত্যক্ত অমূল্য সম্পত্তির যথার্থ মর্ম্ম-গ্রহণে শক্ত—আমি সেইরূপ সঙ্গত স্বদেশানুরাগের কথা বলিতেছি। ("পণ্ডিতপ্রবর স্যার জস্যুয়া ফিচ্)

ইতিহাস প্রকৃত ঘটনাবলীর বিবরণ, সুতরাং কার্য্য কারণের পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত। উপদেশ অপেক্ষা যখন দৃষ্টান্তের শিক্ষা সর্ব্বকালেই অধিকতর ফলপ্রদ, তখন ইতিহাসের শিক্ষা যে নীরস উপদেশাদির অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে তেমন করিয়া শিখান চাই। 'এই পর্য্যন্ত মুখস্থ করিয়া আসিবে'— যে শিক্ষক ইহাই আদেশ করিয়া ইতিহাস শিক্ষা শেষ করিয়া থাকেন, তিনি উপকার না করিয়া বরং অপকারই করিয়া থাকেন। প্রকৃতরূপে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে মুখ্য উদ্দেশ্য দুইটীকে সর্ব্বদা স্থির রাখিতে হইবে।

নিম্ন শ্রেণীতে ইতিহাস।—নিম্ন শ্রেণীতে ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনা ধারাবাহিকরূপে না শিখাইয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, উপাখ্যান রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে শিক্ষক শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার উপাখ্যান বলিবার ক্ষমতা থাকা চাই। পুস্তকের বিবরণ, ইতিহাসের নীরস ভাষায় ব্যক্ত করিলে, কোনই ফল হইবে না। যে প্রণালীতে ঠাকুর মা উপকথা বলিয়া থাকেন, কতকটা সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। তাই বলিয়া প্রকৃত ঘটনার সহিত অপ্রকৃত ঘটনা যোজনা করিতে হইবে না। দুঃখের কথাগুলি একটু কাতরস্বরে, ভয়ের কথাগুলি ভীতি সূচক মৃদুস্বরে, রাগের কথাগুলি একটু কর্কশ স্বরে ব্যক্ত করিলেও সঙ্গে সঙ্গে হাতে ও মুখে, দুঃখ ভয় রাগ প্রভৃতির বাহ্যিক প্রকাশ দেখাইলে, বালকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে। কথকগণ যে প্রণালীতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা গুলির কথন করিয়া থাকেন, এ প্রণালীও কতকটা সেইরূপ। কথকগণ মধ্যে মধ্যে যেমন সঙ্গীত করিয়া থাকেন, ইতিহাসের শিক্ষকগণ তদ্রূপ প্রসিদ্ধ কবিগণের ঐতিহাসিক কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া উপাখ্যানকে আরও সরস করিতে পারেন।

ইতিহাস শিক্ষাতে পরিচিত বিষয়ের সাহায্যেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। গ্রামের কোন প্রসিদ্ধ লোকের জীবন চরিত বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা কর। কিন্তু সাবধান, লোক বিশেষের কেবল গুণের ভাগই বিকাশ করিতে হইবে। আবার সেই গুণাগুণ কেবল বর্ণনা করিয়াই যাইবে; তাহা হইতে যে সকল নীতি শিক্ষা হইতে পারে, তাহা পৃথক-ভাবে দেখাইয়া দিও না। "রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গেলেন" এই ঘটনাই উত্তমরূপে বর্ণনা কর 'তোমাদেরও এইরূপ পিতৃভক্ত হওয়া উচিত' ইত্যাদিরূপ উপদেশের অবতারণা করিও না। সরস হইলে এই উপদেশ, অজ্ঞাতভাবে বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। দৃষ্টান্ত অমুক মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব বড় জমিদার ছিলেন, প্রজাদিগকে খুব ভাল বাসিতেন ও তাহাদিগের উপকার করিতেন। অমুক প্রকার কার্য্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, অমুকের ঘর করিয়া দিয়াছিলেন, পূজার সময় সমস্ত গ্রামকে খাওয়াইতেন, গরীবদের কাপড় দিতেন; স্কুল, ডাক্তারখানায় চাঁদা দিতেন ইত্যাদি, (২) অমুক মৌলবী ছিলেন, অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখেন, হাটিয়া দিল্লীতে গিয়া আরবী পড়েন, পরে বড় মৌলবী হইয়াছিলেন, সরকারে খুব সম্মান করিত, সত্য কথা কহিতেন, ৫ সন্ধ্যা রীতিমত নমাজ করিতেন ইত্যাদি। (৩) অমুক সাহা ৫৲ টাকা পুঁজী নিয়ে এক দোকান করে, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিত, কোথায় কোন্ জিনিষ সস্তা খোজ রাখিত, দুই বৎসরের মধ্যে দোকান খুব বড় হইল, শেষে পাটের কারবার আরম্ভ করিল, খুব হিসাবী ছিল, মরিবার সময় ছেলেদের জন্য ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যায় ইত্যাদি।

এইরূপ জেলার ২।৩টী লোকের বা ঘটনার ও পরে সেই প্রদেশের বিশেষ বিশেষ ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিবে। তারপর ভারত ইতিহাসের অতি প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি শিখাইয়া দিবে। ভারত ইতিহাস শিক্ষার

উপযোগী জীবনী ও ঘটনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বালকগণের বয়স ও বিদ্যালয়ের সময় বিবেচনায় বিষয়গুলির সংখ্যা কম বা বেশী করিয়া লইতে হইবে। আর এই সকল উপাখ্যান বলিতে হইলে শিক্ষক-গণকে, জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বড় বড় ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হইবে। ছোট ছোট ইতিহাসে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা উপাখ্যানের পক্ষে উপযোগী নহে।—

রামায়ণের গল্প, মহাভারতের গল্প, মহম্মদের গল্প, মুসলমান রাজাদের গল্প, (আকবরের, আওরঙ্গজেবের ও তাজমহলের) শিবাজীর গল্প, চৈতন্যের গল্প, পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ইংরেজদিগের গল্প, পলাশীর যুদ্ধ, ঠগী, গঙ্গা সাগরে সন্তান নিক্ষেপ, সতীদাহ, সিপাহী বিদ্রোহ, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গল্প, বিদ্যাসাগরের গল্প। কি কি গুণে সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কি কি কারণে তাঁহারা জন সাধারণের নেতৃত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর আমাদিগের উপকারার্থ তাঁহারা কোন্ বিশেষ ব্যাপার লইয়া জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছিলেন—জীবনী বর্ণনায় এই গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেশ শাসনের রীতিও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে চৌকিদার থাকে, এরা সকলে এক এক থানার দারোগার অধীন, আবার অনেকগুলি থানার দারোগা মাজিষ্ট্রেটের বা ডেপুটি কমিশনারের অধীন; আবার এইরূপ নানা জেলার মাজিষ্ট্রেট, একজন বিভাগীয় কমিশনারের অধীন, আবার নানা বিভাগের কমিশনার একজন ছোটলাট (বা গভর্ণরের) অধীন, নানা প্রদেশের ছোটলাট একজন গভর্ণর জেনারেলের অধীন। এইরূপ আর নানা দেশের গভর্ণর জেনারেল এক রাজার অধীন। নিজের জেলা ও প্রদেশের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিবে। সাময়িক ছোটলাট, বড়লাট ও রাজার নাম জানা নিতান্তই আবশ্যক।

উচ্চ শ্রেণীতে ইতিহাস।—রীতিমত শিক্ষাদান করিবার

পূর্ব্বে বালকগণকে শাসননীতির একটু আভাস প্রদান করা কর্ত্তব্য। মাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, ছোটলাট, বড়লাট, প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ কি কার্য্যের জন্য নিযুক্ত ও তাঁহারা কিরূপে শাসন পরিচালনা করেন, ইহা স্থূল ভাবে বুঝাইয়া দিবে। ইংরেজের পূর্ব্বে কোন জাতি ভারত শাসন করিতেন; কোন দেশ হইতে তাঁহারা আসিয়া, কেমন করিয়া ভারত অধিকার করিলেন, তাহাও অতি সংক্ষেপে বলিয়া দিবে। আবার মুসলমান জাতির পূর্ব্বে, ভারত-শাসন কার্য্য যে ভারতবাসীর হাতেই ছিল, তাঁহারা যে সে সময়ে পৃথিবীতে খুব উন্নত জাতি ছিলেন, নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ইহাও বলা আবশ্যক। এই সমস্ত বলিয়া ইতিহাসের শিক্ষা আরম্ভ করিবে। কেহ কেহ বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ অতীতের ইতিহাস শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ অতীতের ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমানের দিকে অগ্রসর হয়েন। প্রথা দুইটিই ভাল, তবে যে শিক্ষক যে প্রথায় কার্য্য করিয়া সুবিধা পান, তিনি সেই পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইতিহাস শিখাইবার নিয়ম।—(১) ইতিহাস শিক্ষায় ভূগোলের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মনুষ্যের অবস্থার যে যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝাইতে হইবে। পার্ব্বত্য জাতি সবল ও পরিশ্রমী, নিম্ন স্থানের লোক দুর্ব্বল; শীত প্রধান স্থানের লোক শ্বেতবর্ণ, গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের লোক কৃষ্ণ বর্ণ; সমুদ্র তীরবাসী লোক ব্যবসায়-পটু ইত্যাদি। যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণনায়, ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনায় মানচিত্রের সাহায্য আবশ্যক। সুতরাং যে দেশের ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইবে, সে দেশের মানচিত্র দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(২) যে অংশ শিক্ষা দিবে, সেই অংশ প্রথমে বালকগণকে গল্পচ্ছলে শুনাও, পরে বালকগণকে পুস্তক পড়িতে দাও। প্রশ্নোত্তর করাইয়া

ইতিহাসের প্রধান বিষয় গুলি মুখে মুখেই বালকগণকে শিখাইয়া দিতে পারা যায়।

(৩) বালকগণের বয়স বিবেচনায় কিঞ্চিত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ইতিহাস শিখান কর্ত্তব্য। রাজাদিগের নাম মুখস্থ করা অপেক্ষা, এই শিক্ষাই কার্য্যকারী।

(৪) এক সঙ্গে অনেক শিখাইতে চেষ্টা করিও না। অনেক ইতিহাসের পুস্তকে এক অনুচ্ছেদের ছত্রে ছত্রে বহু ঘটনার বিবরণ সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বালকগণের আনন্দ না হইয়া, বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে।

(৫) যে সকল কঠিন রাজনৈতিক বা সামাজিক ঘটনা বালকগণের পক্ষে সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভব পর নহে, সে বিষয় পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

(৬) শিক্ষক উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে, ইতিহাস পড়াইতে পারিবেন না, ইহাই যেন তাঁহার মনে থাকে। মানচিত্র, ছবি বা অন্যান্য যে সকল জিনিষ সংগ্রহ করা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে নানারূপ পুরাতন মুদ্রা, তাম্রফলক, দলিল, পুঁথি, পুরাতন রাজ প্রাসাদ বা কীর্ত্তি স্তম্ভের ইষ্টক বা পাথর, ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র, পুরাতন অস্ত্র শস্ত্র, প্রভৃতি দ্রব্যাদির সংগ্রহ রাখিতে পারিলে ইতিহাস শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

(৭) বালকগণের দ্বারা এক প্রস্থ ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন করাইতে চেষ্টা করিবে। আকবরের রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত ছিল, আওরঙ্গজেবের সময়েই বা তাহার কি পরিবর্ত্তন হইল, লর্ড ক্লাইবের সময় ইংরাজদিগের কি পরিমাণ অধিকার ছিল, তারপর ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে (ওয়েলেসলি, ডালহৌসী, বেন্‌টিং, ক্যানিং, ডফ্‌রিন) লর্ড কার্জ্জনের সময় তাহার কি পরিমাণ প্রসার হইল ইত্যাদি বিষয়ক মানচিত্র স্মরণ

শক্তির খুব সহায়। *আজ কাল ইতিহাসের প্রায় পুস্তকেই এ সকল মানচিত্র থাকে। (জপেন সাহেব কৃত "ভারত ইতিহাসের মানচিত্র" নামক ইংরেজী ভূচিত্রাবলী কলিকাতা লঙম্যানস গ্রীনের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়—মূল্য—২৲)।

সন তারিখ শিক্ষা।—সন তারিখ শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ কোন সহজ প্রণালী দেখা যায় না। কেবল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করাই তারিখ মনে রাখিবার একমাত্র উপায়। তবে শিক্ষকগণ বালকগণের স্মৃতির সাহায্যার্থ নানরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিম্নে সাধারণ কয়েকটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

(১) সদৃশ বা বিসদৃশ প্রথায়।—একটী সদৃশ প্রথার দৃষ্টান্ত (তারিখ গুলি সমস্তই এক রকমের):—

যথা—৫৫৭ পূঃ খৃঃ বুদ্ধদেবের জন্ম। হিন্দু ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন।

৫৭ পূঃ খৃঃ বিক্রমাদিত্যের সংবৎ আরম্ভ। সাহিত্য যুগের অভ্যুদয়।

৬৫৭ খৃঃ অঃ মুসলমানদিগের ১ম আক্রমণ।

১৩৫৭ খৃঃ অঃ বাহমণি রাজত্বের গঠন শেষ (১৩৪৭ সনে আরম্ভ)

১৫৫৬ খৃঃ অঃ আকবরের রাজ্য প্রাপ্তি ও মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি।

১৬৫৮ খৃঃ অঃ আরঙ্গজিবের রাজ্য প্রাপ্তি ও মোগল রাজত্বের অবনতি।

(১৬৫৮ হইতে ১ বাদ দিয়া, আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত যোগ করিলে উভয়েরই রাজ্য প্রাপ্তির সময় ৫৭ই পড়িবে)

১৬৫৭ খৃঃ অঃ প্রতাপ গড়ের যুদ্ধ, হিন্দুর পুনরুত্থান।

১৭৫৭ খৃঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ, ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত।

১৮৫৭ খৃঃ অঃ সিপাহী বিদ্রোহ ও মহারাণী কর্ত্তৃক ভারত শাসনের ভার গ্রহণ।

(২) কবিতা বা ছড়ার সাহায্যে—

বেন্‌টিং লাটের কথা শুন দিয়া মন।
আঠার আটাশে তাঁর হেথা আগমন॥
উনত্রিশে সতীদাহ হ'ল নিবারণ।
কিছু দিন পরে হল ঠগের দমন॥

বত্রিশে কাছাড় দেশ রাজ্য ভুক্ত হল।
দুবৎসর পরে রাজ্য কুর্গও গেল॥
খন্দদের নরবলি হইল বারণ।
কোল জাতি করিলেক বশ্যতাগ্রহণ॥
শাসনের ব্যয় ভার লাঘব হইল।
পারসী উঠিয়া গিয়া বাঙ্গলা চলিল॥
ইংরাজী শিক্ষার চল পঁয়ত্রিশে হল।
রাজা রাম এর তরে অনেক খাটিল॥
সেই সনে ডাক্তারী কলেজ বসিল।
সেই সনে বেনটীং ভারত ছাড়িল॥

(৩) অন্যান্যরূপ সঙ্কেতের সাহায্যে :—

(ক) ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০ মনে করিয়া লও। এখন এই ছড়া মনে রাখ ;—

ত্রাণনৃপ—আকবর
তাপমনি—জাহাঙ্গীর
ত্রিপথেব—সাজাহান
তপনব—আরাঙ্গেব

ত্রাণনৃপ (অর্থাৎ ত=১,ণ=৫,ন=৫,প=৬, ১৫৫৬) আবার অর্থ=ত্রাণনৃপ অর্থাৎ যে নৃপ ভারতকে অশান্তি হইতে ত্রাণ করিয়াছিলেন। এইরূপ তাপমণি (১৬০৫) অর্থাৎ মদ্য মাংসসাদি তাপ প্রদানকারী জিনিষের যিনি মণি ছিলেন। ত্রিপথেব (১৬২৮)=ত্রিপথ +ইব. অর্থাৎ রাজা, পিতা ও বন্দি যিনি এই তিন পথেই ছিলেন। 'তপনব' (১৬৫৮) অর্থাৎ রাজার পূর্ব্ব পুরুষেরা যে তপ বা তপস্যা বা ধর্ম্ম অনুসারে চলিয়াছিলেন. তিনি তাহা ছাড়িয়া নব তপ লইয়া ছিলেন।

(খ) তারপর গভর্ণর জেনারেলদিগের নাম মনে রাখার সঙ্কেত :—প্রত্যেক লাটের নামের আদ্যাক্ষর লইয়া **হে কসোয়ো কমি ময়া বেয় এ হাদা কে ?** *

---

* হে হেসটিংস, ক কর্ণওয়ালিস, সো সোর (জন সোর), য়ো ওয়েলেসলি, ক কর্ণওয়ালিস (পুনর্ব্বার), মি মিণ্টো, ম ময়রা, য়া আমহার্ষ্ট, বে বেনটিং, য় অকল্যাণ্ড, এ এলেনবরা, হা হারডিঞ্জ. দা দালহাউসী, কে কেনিং।

অর্থ, 'হে' (কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া) কসোয়ো অর্থাৎ খুব কসাকসি (কৃপণতা) কর, তাহলে কমি (কম) ময়া (খাবার জিনিষ) 'বেয় (ব্যয়) হইবে। এ (এই) হাদা (অর্থাৎ হাঁদা, বোকা) কে? যে এ কথা বোঝে না।

তারপর রাজ প্রতিনিধিদিগের নাম উক্ত প্রকারে কে এল মেন ৯ ঋ ডালা এক।† অর্থ, কে এল? উত্তরে যেন কেহ বলিতেছে 'মেন' অনেক লোক। ইংরেজীতে উত্তর দেওয়া হইল, পাছে যাহারা আসিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারে। তারপর যেন প্রশ্ন হইল, কয় জন লোক? সঙ্কেতে উত্তর হইল ৯ ঋ, ৮।৭ জন (স্বরবর্ণের ৮ম ও ৭ম বর্ণ বলিয়া) কিন্তু ডালা মাত্র একখান। কাজেই খুব কসাকসি করিয়া ব্যয় করিতে হইবে। (এ সমস্ত অর্থ অবশ্য কষ্ট কল্পনা, কেবল মনে রাখিবার সহায়তার জন্য এরূপ করিতে হয়।)

তবে বেশী তারিখ শিক্ষা দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। যে সকল বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ইতিহাসের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই সকল ঘটনার তারিখই আবশ্যক। প্রধান ঘটনাগুলি যে শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল তাহার একটা জ্ঞান থাকা উচিত। ১ম পাণিপথের যুদ্ধের তারিখ ১৫২৬ না লিখিয়া ১৫৩০ কি ১৫৪০ লিখিলে তত মারাত্মক হয় না, যেমন ১৬২৬ লিখিলে হয়। মায়াল সাহেব কৃত 'থারটী ইয়ার্স অব টিচিং' নামক পুস্তকে সময় নির্দ্দেশক তালিকা প্রস্তুত করিবার যে উপদেশ আছে, তাহা দৃষ্টে একটী তালিকা প্রস্তুত হইল। (২য় পরিশিষ্ট দেখ)। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একখানা তালিকা প্রস্তুত করিলে, অন্ততঃ শতাব্দীর ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ইতিহাস পাঠনার আদর্শ।—বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের মানচিত্র দেয়ালে ঝুলান, টেবিলের উপরে রাজা লক্ষ্মণসেনের বাটির ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক, কাষ্ঠ, প্রস্তর খণ্ড প্রভৃতি; চক ও ব্ল্যাক বোর্ড—উপকরণ।

(এই পাঠ উচ্চ প্রাথমিকের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। এই আদর্শ পাঠনা ভূদেব বাবুর পুস্তক হইতে গৃহীত)

---

† কে কেনিং, এ এলগিন, ল লারেন্স, মে মেয়ো, ন নর্থব্রুক, ৯ লিটন, ঋ রিপন, ডা ডাফরিণ, লা লানসডাউন, এ এলগিন, ক কর্জ্জন।

শি। নবদ্বীপ দেখাও।—নবদ্বীপ এক্ষণে কিজন্য প্রসিদ্ধ?

বা। এইখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করেন। অনেক সংস্কৃত টোল আছে। গৌরাঙ্গ এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

শি। পূর্ব্বে ঐ নবদ্বীপ সমুদায় গৌড় দেশের রাজধানী ছিল। এইজন্যই আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রধান সমাজ। এখন ইংরাজী ভাষায় বিদ্বান লোক কোন্ সহরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক?

বা। কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

শি। যেমন কলিকাতা ইংরাজদিগের রাজধানী বলিয়া এখানে ইংরাজীতে বিদ্বান লোক অধিক হইয়াছে, তেমনি নবদ্বীপ হিন্দুরাজাদিগের রাজধানী ছিল বলিয়া তথায় সংস্কৃত বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঐ নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন (এই লক্ষ্মণ সেনের রাজবাড়ী ভাঙ্গা ইট) সেন উপাধি বিশিষ্ট আর কোন রাজার নাম শুনিয়াছ?

বা। বল্লাল সেন।

শি। যে বল্লাল সেনের নাম শুনিয়াছ, এই লক্ষ্মণ সেন সেই বংশেরই একজন রাজা বলিয়া মনে হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে লক্ষ্মণ সেনের বয়স ৮০ বৎসর মত। সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রাজকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিতেন না। কেবল ধর্ম্ম কার্য্যেই মন দিয়াছিলেন। একদিন রাজা লক্ষ্মণ সেন বসিয়া আছেন; এমন সময় তাঁহার পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন বলিতে পার?

বা। রাজা দাঁড়াইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন ও বসিবার আসন দিলেন।

শি। হাঁ, ঠিক কথা। তারপর রাজ পুরোহিত বলিতে লাগিলেন "মহারাজ, শাস্ত্রের উক্তি মিথ্যা হইবার নয়। বঙ্গদেশ যে যবনাধিকৃত হইবে তাহার কাল উপস্থিত। শুনিলাম যবন সেনা আগত প্রায়, অতএব চলুন শ্রীক্ষেত্রে প্রস্থান করি।" মানচিত্রে শ্রীক্ষেত্র দেখাও—নবদ্বীপ হইতে কোন রাস্তায় শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া যায়—শ্রীক্ষেত্রের অপর নাম কি?

বা। (মানচিত্রে প্রদর্শন)—শ্রীক্ষেত্রের অপর নাম জগন্নাথ বা পুরী।

শি। রাজা বৃদ্ধ—বৃদ্ধ অবস্থায় প্রায়ই পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছা হয়। রাজা পণ্ডিত বর্গের পরামর্শ গ্রহণে অসম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন

কিনা ভাবিতে লাগিলেন। অনেকেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু কেহ কেহ রাজার প্রতি স্নেহ বশতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। এরূপভাবে রাজাকে পরিত্যাগ করা কি ভাল হইয়াছিল ?

বা। কখনই না—যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর।

শি। যে সময়ে নবদ্বীপে এই ব্যাপার ঘটে তাহার একমাস পূর্ব্বে দিল্লীর (মানচিত্রে দেখাও) বাদসাহ কুতুবুদ্দিন একদিন মঞ্চোপরি বসিয়া বন্য পশুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। পূর্ব্বকালের রাজাদিগের ইটী একটী প্রধান আমোদ ছিল। তাঁহারা কেবল বন্য পশুদিগের পরস্পর যুদ্ধ দেখিয়াই তুষ্ট হইতেন এমন নহে, বলবান মল্লগণের সহিত ঐ সকল পশুর সংগ্রাম করাইতেন—তাহাতে অনেক নরহত্যাও হইত। আর কোন দেশের গল্পে এইরূপ মানুষও পশুর যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ ?

ছাত্র। হাঁ, সে দিন ভূগোল পড়ার সময় রোমনগরের উপলক্ষে শিক্ষক মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন।

শি। কুতুবুদ্দিন যুদ্ধ দেখিতেছেন এমন সময় একটা বিকৃতাকার পুরুষ সেইখানে প্রবেশ করিলেন। তাহার হস্ত বানরের হস্তের ন্যায় দীর্ঘ, আকার খর্ব্ব এবং গাত্র সমুদয় বড় বড় লোমে আবৃত। আচ্ছা বলদেখি, ঐ ব্যক্তিও মুসলমান—মুসলমানেরা গায়ে জামা পরে। তবে ঐ ব্যক্তির গায়ের বড় বড় লোম কিরূপে দেখা গেল ?

বা। যাহারা কুস্তি করিতে যায় তাহারা গায় জামা পরে না। তাহারা কেবল কাচা পরে।

শি। সেই খর্ব্বাকার ব্যক্তি রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রকাণ্ডকায় হস্তির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলে, দর্শক মাত্রেই চমৎকৃত হইয়া থাকিল। কাহারও মুখে কথা নাই। ঐ ব্যক্তি হস্তির সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া, পরে তাহার শুণ্ডে এমনি দারুণ প্রহার করিল যে হস্তিটা চীৎকার করিতে করিতে দূরে পলায়ন করিল।

বা। গায় ত খুব জোর !

শি। তখন বাদসাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অনেক পুরস্কার প্রদান করিলেন। এই ব্যক্তির নাম বক্তিয়ার খিলিজি (বোর্ডে লিখন)। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে বক্তিয়ার বেহার জয় করিয়াছিলেন। এইবারে ইনি বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দিল্লী হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয় ?

কোন দেশে সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে, সাধারণতঃ সেই দেশে যে নদী গিয়াছে তাহারই তীরে তীরে যাইতে হয়।

বা। তবে দিল্লী হইতে যমুনা নদীর ধার দিয়া আসিলে এলাহাবাদ পর্যন্ত আসা যায় (মানচিত্রে দেখাইয়া) তারপর গঙ্গার পাশে পাশে যাইয়া কাশী ও বেহার পার হইলেই বঙ্গদেশে উপস্থিত হওয়া যায়।

শি। হাঁ, বক্তিয়ার খিলিজি প্রায় ঠিক ঐ পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহারই আগমনের কথা শুনিয়া নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার কেবল গঙ্গার পার ধরিয়া আসিতে থাকিলে কোথায় গিয়া পড়িতেন?

বা। সমুদ্রে।

শি। তবে কোন্ স্থান হইতে তিনি নবদ্বীপের পথ ধরিয়া লইলেন? নবদ্বীপ কোন নদীর উপর?

বা। নবদ্বীপ ভাগীরথীর উপর—ভাগীরথী গঙ্গার এইখান থেকে বাহির হইয়াছে। এই স্থানকে ছাপঘাটীর মোহানা বলে—মুরশিদাবাদ জেলার একটী গ্রাম (মানচিত্র দেখাইয়া)।

শি। ঐ সকল স্থানে নদীর ধোয়াটমাটীতে পরিপূর্ণ। অনেকস্থল কেবল বালুকাময়। এইজন্যই নদীর মুখ সকল সময় ঠিক থাকে না। যে খানে বর্ষাকালে গঙ্গার বেগ অধিক লাগে সেই স্থানেই ভাগীরথীর মোহানা হয়। বক্তিয়ার এই মোহানা হইতে, ভাগীরথীর তীরে তীরে আসিয়া নবদ্বীপের নিকট উপস্থিত হইলেন। সৈন্য সামন্ত দূরে রাখিয়া কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগর রক্ষী কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, আমরা বেহার-জেতা যবন রাজার দূত।

বা। নগররক্ষীরা তাহাদিগকে কেন মারিল না?

শি। দূতকে মারিতে নাই—সকল রাজারই এই নিয়ম। এইরূপ বঞ্চনা করিয়া মুসলমান সেনাপতি রাজবাড়ীর দ্বারে উপনীত হইলেন এবং অসতর্ক রক্ষিবর্গকে হনন করিতে লাগিলেন। রাজা আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া রাজ বাটীর পশ্চাতের দরজা দিয়া ভাগীরথীর তীরে পলায়ন করিলেন ও একখানি নৌকাযোগে জগন্নাথ চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে বঙ্গদেশে যবনের অধিকার হইবে, আর যবনও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা, ইহাই মনে করিয়া নগরবাসী এবং রাজার সৈন্য সামন্তও নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে বঙ্গদেশ মুসলমানের হস্তগত হইল।
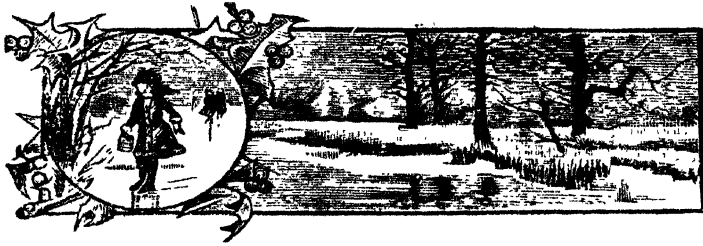
ষষ্ঠ প্রকরণ—বিজ্ঞান বিষয়ক।

১। পদার্থ পরিচয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।—পদার্থ বিশেষের গুণাগুণের পরিচয় করাকে পদার্থ পরিচয় বলে। পরীক্ষণ ও পর্যাবেক্ষণ দ্বারা কাচ খণ্ডের স্বচ্ছত্ব, কঠিনত্ব, ভঙ্গুরত্ব প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিলেই কাচ রূপ বস্তুর গুণাগুণের পরিচয় হয়। বালকেরা পুস্তকে যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়া থাকে, তাহা পণ্ডিতগণের পর্য্যবেক্ষণের ফল। যাহাতে বালকগণ নিজের পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা, সেই সেই ফল, সেই সেই পদার্থ হইতেই, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে লাভ করিতে পারে, পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় বালককে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে; আর তাহার সেই পর্য্যবেক্ষণী শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। এই পর্য্যবেক্ষণ শক্তির উন্মেষ ব্যতীত, পদার্থ পরিচয় শিক্ষায় আরও কয়েকটী বিশেষ ফল লাভ হয়। (১) নিজের হস্ত ও চক্ষুর সাহায্যে

নানাবস্তু পরীক্ষা করিতে শিখিয়া বালকেরা বিশেষ আনন্দ লাভ করে (২) পুস্তকাদির সাহায্য ব্যতীত বালকগণ আবশ্যকীয় নানা প্রাকৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। (৩) জীব জন্তুর গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। (৪) কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের সমবায় উন্নতি সাধিত হয় (৫) বালকগণ যে নিজ শক্তি নিয়োগেও অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিয়া আত্ম শক্তিতে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে।

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয়।—গরু, ঘোড়া, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পশু; মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি ফড়িং; পিপীলিকা, উই, মাকড়সা প্রভৃতি কীট; সীম, মটর, আলু, আম, বাঁশ, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদ; সোণা, রূপা, পিত্তল, লোহা প্রভৃতি ধাতু ও ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম প্রভৃতি সাধারণ বিষয়ই পদার্থ পরিচয় শিক্ষার বিষয়। তবে এ সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ শিক্ষকগণের সাহায্যার্থে সমুচিত বিষয় নির্দ্দেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

যখন বালকগণ বিদ্যালয়ের নিয়মিত কাজ করিতে করিতে বিরক্তি বোধ করে, তখন শিক্ষকগণ পদার্থ পরিচয় শিক্ষা দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। পদার্থ পরিচয় পাঠ্য তালিকা ভুক্ত কোন বিষয় নহে, আর বার্ষিক পরীক্ষায়ও এ বিষয়ের পরীক্ষা গৃহীত হয় না। বালককে আনন্দ দান করাই এ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, জ্ঞানদান তাহার অন্তরালে—পদার্থ পরিচয় শিক্ষা দানের সময় শিক্ষকের যেন এই কথা বিশেষ ভাবে মনে থাকে।

পদার্থপরিচয় শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত।—একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শিক্ষকগণ শিক্ষাদানের পদ্ধতির একটা আভাস পাইবেন। মনে করুন প্রচলিত মুদ্রার আকার বিষয়ে পাঠ দান করিতে হইবে। বালকগণের হাতে একটা করিয়া পয়সা দিয়া জিজ্ঞাসা করুন:—

শি। এ গুলি কি?

ছা। এ পয়সা।

শি। ইহার আকার কেমন, কোন জিনিষের মত?

ছা। ইহার আকার গোল, থালার মত।

শি। আর কোন জিনিষের মত?

ছা। লুচির মত, (চাঁদের মত ইত্যাদি)।

শি। (একখানি কাঠের, টীনের বা শ্লেটের বা সেইরূপ অন্য কোন শক্ত পদার্থের ছোট টুকরা হাতে দিয়া) এ টুকরা খানির আকার কেমন?

ছা। চৌকার মত আকার।

শি। হাতে চাপিয়া ধর; হাতে ব্যথা লাগে কি?

ছা। চৌকার এই চারিটী কোণ হাতে লাগে।

শি। পয়সাটা চাপিয়া ধর, হাতে লাগে কি?

ছা। না লাগেনা, পয়সা গোল, ইহার কোণ নাই।

শি। পকেটে রাখিলে কি হাতে করিয়া নিলে ব্যথা লাগিবার সম্ভাবনা নাই। (হাতে কতকগুলি মারবেল দিয়া) এ গুলিরও ত কোণ নাই, হাতে চাপিয়া দেখত লাগে কিনা?

ছা। হাতে চাপিলে লাগেনা। তবে পয়সা, মার্ব্বেলের মত গোল করিলেও ত হইত?

শি। আচ্ছা, তোমাদের মার্ব্বেল গুলি দাও (মার্ব্বেলগুলি এক সঙ্গে লইয়া, একটু জোরে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া) এই মার্ব্বেল গুলির দশা কি হইল?

ছা। টেবিলের উপর দিয়া গড়াইয়া, চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

শি। পয়সাগুলি কি এমনি করে গড়াইয়া যায়?

ছা। না, পয়সা মার্ব্বেলের মত গোল নয়, অমন করে ছড়ায় না।

শি। অমন করে ছড়াইলে কি হইত?

ছা। পয়সা গুলি অতি সহজেই হারাইয়া যাইত।

শি। (পয়সার সঙ্গে কয়েকটা আধুলী হাতে দিয়া) কোন্‌টা পয়সা ও কোন্‌টা আধুলী কেমন করে বুঝিতেছ।

ছা। পয়সাটা তামার তৈয়ারী, লাল রং—আর আধুলীটা রূপার তৈয়ারী, সাদা রং; রং দেখিয়াই পয়সা ও আধুলী চিনিতে পারিতেছি।

শি। আচ্ছা তুমি চোখ বুজিয়া থাক। একজন একটা পয়সা চাহিল, কেমন করিয়া দিবে?

ছা। (একটু চিন্তা করিয়া) তা দিতে পারি। এই আধুলীর ধার কাটা আছে, হাত দিলেই বুঝিতে পারা যায়। পয়সার ধার তেলতেলে।

শি। (হাতে একটা সিকি ও একটা আধ পয়সা এবং একটা আনী দিয়া) কোন্‌টা সিকি, কোন্‌টা আধ পয়সা ও কোনটা আনী চোক বুজিয়া ঠিক করত।

ছা। (চোখ বুজিয়া) এই পাশ কাটাটা সিকি, এই যেটার পাশে ঢেউ তোলা সেটা আনী, এই তেলতেলে পাশওয়ালাটা আধ পয়সা।

শি। আকারে এত রকম করা হইয়াছে কেন?

ছা। আমরা অন্ধকারেও টাকা, পয়সা, সিকি ও আনী দিতে ভুল না করি ইত্যাদি। ('পাঠনার নোট' পরিচ্ছেদের ৯ ও ১০ম নোট পাঠ করুন।)

পদার্থ পরিচয় শিক্ষার ধারা।—(১) বালকেরা যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ দেখে, প্রথমতঃ সেই সকল পদার্থ বিষয়েই পদার্থ পরিচয়ের পাঠ দিতে হইবে। যে বস্তু সম্বন্ধে পাঠ দিতে হইবে, সে বস্তু সংগ্রহ করা আবশ্যক। যদি পদার্থটী ছোট ও সহজ প্রাপ্য হয় (যেমন পাথুরে কয়লা, লোহার প্রেক, ধুতরা ফুল ইত্যাদি) তবে প্রত্যেক ছাত্রের হাতে এক একটী করিয়া পদার্থ প্রদান করিতে হইবে। যদি পদার্থ বৃহৎ হয় বা অধিক সংগ্রহের পক্ষে অসুবিধা হয় তবে একটী বস্তু সংগ্রহ করিয়া (যেমন গরু, টেবিল, গৃহ ইত্যাদি) তাহার চারিদিকে বালকগণকে দাঁড়া করাইয়া পাঠ দিতে হইবে। কথা এই যে বালকগণ যেন বস্তুর সমস্ত অংশ নিজ হাতে পরীক্ষা করিতে পারে। অভাব পক্ষে কোন কোন পদার্থের ছবি বা পুতুলের সাহায্যে (যেমন সিংহ, কয়লার খনি, আলোক স্তম্ভ ইত্যাদি) পাঠ দিতে হয় বটে, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক না হইলে এরূপ পদার্থ সম্বন্ধে পাঠ না দেওয়াই ভাল।

(২) পদার্থ পরিচয়ের পদার্থ শ্রেণীর উপযোগী হওয়া আবশ্যক। আবার সেই পদার্থের এমন সমস্ত গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক,

যাহা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারে। আলোচনায় কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল।

(৩) বালকেরা যাহাতে পদার্থটী পরীক্ষা করিয়া নিজেরাই তাহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিতে পারে এরূপ ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে।

(৪) যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দেওয়া হইবে (সহজ প্রাপ্য হইলে) সেই পদার্থ সংগ্রহের জন্য বালকগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে। যদি বালকগণ পদার্থটীর অংশ বা সমস্ত পদার্থটী অঙ্কন করিতে সমর্থ হয়, তবে অঙ্কন করান আবশ্যক। আর যদি মাটী দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি গঠন করিতে পারে, তবে আরও ভাল।

(৫). শিক্ষাদানে একটা শৃঙ্খলার অনুসরণ করা বিশেষ আবশ্যক। গরুর বিষয় আলোচনা করিবার সময় গরুর মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ পর্য্যন্ত বর্ণনা কর, কিংবা লেজ হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত আলোচনা কর। কিন্তু মাথার এক কথা বলিয়া, তারপর লেজের এক কথা আলোচনা করিয়া, আবার মাথার এক কথা বলা, রীতি বিরুদ্ধ। এইজন্য শিক্ষককে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

(৬) ব্ল্যাক বোর্ডের উপযুক্তরূপ ব্যবহার করা আবশ্যক। যে পদার্থ বিষয়ে পাঠ দিবে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ গুলি বোর্ডে আঁকিয়া দেখাইতে হইবে, আর পাঠের সংক্ষিপ্ত সারও বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। (পাঠনার নোটের পরিচ্ছেদ দেখ)।

(৭) যাহা শিখাইলে, তাহা শৃঙ্খলাক্রমে বর্ণনা করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ মুখে মুখে বর্ণনা করিবে, উচ্চ শ্রেণীর বালকগণ লিখিয়া বর্ণনা করিবে। এই প্রথা রচনা শিক্ষারও প্রধান সহায়।

২। বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা।—কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি আমাদিগের জীবন ধারণের প্রধান সহায়। এই কৃষি, বাণিজ্যের সম্যক উন্নতি কেবল বিজ্ঞান আলোচনার উপর নির্ভর করে। কোন দেশ-বিশেষের সভ্যতার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, সেই দেশের বিজ্ঞান আলোচনার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিলেই তথাকার সভ্যতার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। বিজ্ঞানোন্নত দেশ সমুদায়ই ধনে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধিশালী হইয়া পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানের আলোচনা যে সকল শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা আবশ্যকীয় ও ফলপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য।

পদার্থপরিচয় বিজ্ঞানালোচনার প্রারম্ভ। আবার কিণ্ডারগার্টেন পদার্থ পরিচয়ের প্রারম্ভ। তবে পদার্থপরিচয় ও বিজ্ঞানে এই মাত্র সামান্য প্রভেদ আছে যে, পদার্থপরিচয় পর্য্যবেক্ষণ সাপেক্ষ, আর বিজ্ঞান পরীক্ষণ সাপেক্ষ।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়।—উদ্ভিদবিদ্যা পড়াইতে হইলে মূল্যবান যন্ত্রাদির আবশ্যক হয় না; একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র হইলেই হইল। অভাব পক্ষে একখানা স্থূলমধ্য কাচ (মূল্য ২।৩ টাকা) হইলেও কাজ চলিতে পারে। আর যখন উদ্ভিদ বিদ্যার সহিত কৃষির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তখন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে উদ্ভিদের আলোচনায় বিশেষ ফল লাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। উদ্ভিদের পরে শরীরতত্ত্ব; কিঞ্চিৎ ব্যয় বাহুল্য বটে। তবে একেবারে কতকগুলি আদর্শ কিনিয়া রাখিলে আর বিশেষ ব্যয়ের আবশ্যক হয় না। কিন্তু পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন, ব্যয়সাপেক্ষ। একবারে জিনিষ কিনিলেও চলে না। আরক প্রভৃতি ফুরাইয়া যায়, আর যন্ত্রাদিও সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। তবে ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন পড়ান কর্ত্তব্য বটে। কারণ সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূলেই এই দুই বিজ্ঞান নিহিত আছে। শিক্ষকগণের পক্ষে এই চারিটী বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক; সুতরাং ট্রেনিং স্কুলে এই চারিটী বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য।

পরীক্ষণ বিষয়ে সাধারণ উপদেশ।—(১) কোন পরীক্ষণ প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে নিজে সেই পরীক্ষণের পরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অপ্রস্তুত ভাবে শ্রেণীতে আসিয়া কোন পরীক্ষণের চেষ্টা করিও না।

(২) পরীক্ষণের জন্য যে সকল দ্রব্যাদির আবশ্যক হইবে তাহা পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। পরীক্ষণের সময় দ্রব্যাদির জন্য দৌড়াদৌড়ি করা বড়ই কদর্য্য।

(৩) যে সময় কোন দ্রব্য উত্তপ্ত বা শীতল করিতে হয়, সে সময় বালকগণ (চুপ করিয়া না বসিয়া) নিজ নিজ খাতায় সেই পরীক্ষণের যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবে।

(৪) আবশ্যক বিবেচনায় শিক্ষকও ব্ল্যাক বোর্ডে সমস্ত যন্ত্রের বা তাহার অংশের ছবি আঁকিয়া দিবেন। বালকেরা তাহা নকল করিয়া লইবে।

(৫) ব্যবস্থা থাকিলে বালকগণের দ্বারাও পরীক্ষণ করান কর্ত্তব্য। নিজের হাতে পরীক্ষণ করিলে উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায় ও বিশেষ রূপ মনে থাকে।

(৬) পরীক্ষণের প্রত্যেক কার্য্য শান্ত ভাবে ও ধীরে ধীরে দেখাইবে। তাড়াতাড়ি করিলে বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে পারিবে না।

(৭) পরীক্ষণে কি ফল লাভ হইবে তাহা পূর্ব্বে বলিয়া দিও না। বালকের সম্মুখে পরীক্ষণের কার্য্য করিয়া যাও ও বালকগণকে সেই কার্য্য ও তাহার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে বল। পূর্ব্বে বলিয়া দিলে ঔৎসুক্য নষ্ট হইয়া যায়।

বায়ুর উর্দ্ধচাপ পরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যে শিক্ষক "বায়ুর উর্দ্ধচাপ পরীক্ষণ করিতেছি" বলিয়া আরম্ভ করেন তিনি বালকগণের তেমন মনাকর্ষণ করিতে পারেন না। কিন্তু যে শিক্ষক কিছু না বলিয়া, এক গেলাশ জল লইয়া, তাহার মুখে এক খানা শক্ত কাগজ দিয়া,

গেলাশ উল্টাইয়া দেখাইলেন যে জল পড়িল না, তিনিই বালকগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হই-লেন। কারণ এই পরীক্ষণে, 'জল কেন পড়িল না' তাহাই জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, বালকেরা নিজ নিজ বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা করিতে থাকিবে।

(৮) এক বিষয় সম্বন্ধে অনেক রকমের পরীক্ষণ দেখান ভাল নয়। আবার নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য শক্ত শক্ত পরীক্ষণও দেখান উচিত নয়। পরীক্ষণ যেমন সংখ্যায় কম হওয়া উচিত, তেমনি সরল হওয়াও আবশ্যক।

(৯) অনেক সময় বালকেরা পরীক্ষণের বিষয় ও পরীক্ষিত সত্য পৃথক করিয়া লইতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত পরীক্ষণের পর পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে বালকগণকে প্রশ্ন করিলে হয় ত কেহ কেহ উত্তর করিবে "গেলাশের মুখে কাগজ আটিয়া দিলে জল পড়িবে না"। এইজন্য পরী-ক্ষিত সত্য (বায়ু ঊর্দ্ধ দিকেও চাপ প্রদান করে) বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক।
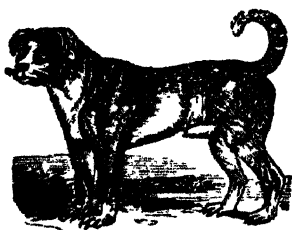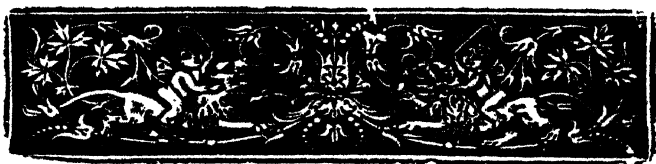
সপ্তম প্রকরণ—শিল্প বিষয়ক।

১। চিত্রাঙ্কন।

আবশ্যকতা।—সূক্ষ্ম কার্য্যে, চক্ষুর ও হস্তের যে কার্য্যকারিতা শক্তির আবশ্যক হয়, চিত্রাঙ্কনে তাহার যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারা যায়। শিল্প ব্যবসায়ীদিগের এ বিদ্যা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায়, চিত্র বিদ্যার যথেষ্ট আবশ্যকতা হইয়া থাকে। যন্ত্রাদির আভ্যন্তরিক অবস্থা, জীব দেহের ব্যবচ্ছেদ, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি স্থিতি, স্তরের ভূগর্ভস্থ বিন্যাস প্রভৃতি অনেক সময় চিত্র দৃষ্টেই বুঝিয়া লইতে হয়। বহু বর্ণনা করিয়াও যে বিষয় প্রকাশ করা কঠিন, এরূপ অনেক বিষয়ও চিত্রের সাহায্যে অতি সহজে প্রকাশ করা যায়। এ সকল ছাড়া চিত্র বিদ্যার একটা মোহিনী শক্তি আছে। সঙ্গীতের মত ইহাতে মানুষের মন প্রফুল্ল রাখিতে পারে। চিত্র বিদ্যায় সৌন্দর্য্য ও সমতার জ্ঞান বিকাশ করিয়া দেয়। বিশেষ, চিত্র না জানিলে শিক্ষকতা কার্য্য চালান কঠিন হইয়া পড়ে; কারণ শিক্ষককে বালকের পরিচিত, অপরিচিত নানা পদার্থের চিত্র আঁকিয়া অনেক বিষয় বুঝাইতে হয়।

বিভাগ।—একটা ছবি দেখিয়া তদ্রূপ বা তাহার অপেক্ষা বড় কি ছোট চিত্র অঙ্কনকে 'চিত্রানুলিপি' কহে। একটা দ্রব্য দেখিয়া তদ্রূপ কি তাহা অপেক্ষা বড় কি ছোট চিত্রাঙ্কনকে 'দ্রব্যানুলিপি' কহে। আবার আঁকিবার প্রথাও দুই রকম—এক প্রকার যন্ত্রাদির (স্কেল কম্পাস প্রভৃতি) সাহায্যে (যান্ত্রিক অঙ্কন); অন্যরূপ যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীত (অযান্ত্রিক অঙ্কন বা মুক্ত পাণী অঙ্কন)। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ যে সকল চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকেই করিতে হয়।

শিক্ষার আরম্ভ।—কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি বর্ণনা কালে, শিশু শ্রেণীতে যেরূপ ভাবে অঙ্কন শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা (২০১পৃঃ) একরূপ বলা হইয়াছে। সেই রূপেই আরম্ভ করিতে হইবে।

বালকেরা অঙ্কন খুব পচ্ছন্দ করে, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত লাইন শিক্ষার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না। যেমন গান শিখিতে গেলে, শিক্ষার্থী সা'রে গা মা সাধন করিবার কষ্ট সহ্য করিতে চায় না, একেবারেই গান শিখিতে চায়, অঙ্কন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এটী স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং এই ভাবের সহিত যোগ রাখিয়া বালকগণকে সহজ সহজ দ্রব্যাদির অঙ্কন শিখাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। কিণ্ডারগার্টেন প্রকরণের কাঠি সাজান প্রবন্ধে (১৯৩ পৃঃ) এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। নানা আকৃতির, কতকগুলি গাছের পাতা সংগ্রহ কর। পুরাতন খবরের কাগজের ভাঁজে ভাঁজে পাতাগুলি রাখিয়া, কোনও ভারি জিনিষ দিয়া চাপা দিয়া রাখ। পাঁচ সাত দিনেই পাতা গুলি চাপে সমান হইয়া যাইবে। এইরূপ এক একটী পাতা বালকদিগকে দাও। তাহারা পাতাটী স্লেটের উপর রাখিয়া, তাহার চারি পার্শ্বে পেন্সিল দিয়া দাগ কাটিবে। পাতা উঠাইয়া নিলেই স্লেটে পাতার ছবি দেখিতে পাইবে। এইরূপে কিছুদিন অভ্যাসের পরে, কেবল পাতা দেখিয়া পাতা আঁকিতে শিক্ষা দিবে। তারপর পাতার ছবি দেখিয়া, সেইরূপ পাতা আঁকিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপে খুব সহজ ফুলের (যেমন রঙ্গন, চামেলী, যুঁই

ইত্যাদি) মাথার অংশ (কেবল পাপ্ড়ি গুলি) আঁকিতে অভ্যাস করিবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে বালকগণ শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট চিত্র অঙ্কন করিতে সক্ষম হইবে।

কাগজ, পেন্সিল ও রবার—চিত্রাঙ্কনের কাগজ পুরু ও খস্খসে রকমের হওয়া আবশ্যক। পাতলা ও তেলতেলে কাগজে চিত্রাঙ্কন ভাল হয় না। যে পেন্সিলের উপর H বা H B লেখা থাকে (ইহাকে ড্রইং পেন্সিল বলে) অঙ্কনের পক্ষে তাহাই সুবিধাজনক।

সাধারণ নরম পেন্সিলে আঁকিতে গেলে কাগজ ময়লা হইবে ও দাগগুলি মোটা হইবে। ড্রইং পেন্সিলের অগ্রভাগ ছুরি দ্বারা বেশ সরু করিয়া লইতে হইবে। ভোঁতা হইয়া গেলে, আবার সরু করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য একখানা ছুরি থাকাও দরকার। একখানা রবার থাকা আবশ্যক, কিন্তু বালকেরা যাহাতে রবারের যথেচ্ছা ব্যবহার না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা প্রথম অঙ্কনের সময় পেন্সিল দিয়া খুব জোরে দাগ না কাটে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ সাবধান করিতে হইবে। চিত্রের কাঠাম করিয়া লইবার সময়, এত পাতলা করিয়া দাগ দিতে হইবে যে, রবারের দ্বারা এক টান দিলেই যেন সে দাগ উঠিয়া যায়। চিত্র শেষ হইলে, আবশ্যকীয় দাগের উপর দিয়া একটু জোরে পেন্সিল চালাইয়া, সে দাগটী পরিস্ফুট করিবে ও অন্য দাগগুলি রবার দিয়া তুলিয়া ফেলিবে। অনেক বালক রবারের ব্যবহারও জানে না। রবারের দ্বারা দাগ তুলিতে হইলে, এদিক ওদিক করিয়া ঘসিতে নাই। বাম হইতে ডানদিকে, নীচ হইতে উপরে, অর্থাৎ একদিক হইতে রবার ঘসিতে থাকিবে। দুইদিকে ঘসিলে কাগজ ছিঁড়িয়া যাইতে পারে বা কাগজের মসৃণতা নষ্ট হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বালকের হাতে রবার না দেওয়াই ভাল; কারণ রবার হাতে আছে এই ভরসায়, সে অসাবধানে যেমন তেমন করিয়া রেখা টানিতে থাকিবে। রবার না দিলে সাবধান হইতে অভ্যাস করিবে; একথা মন্দ নয়।

চিত্রানুলিপি।—পাঠ্য পুস্তকে বা পরীক্ষার প্রশ্নে যে সকল চিত্র থাকে, তাহার অধিকাংশই সমপার্শ্ব চিত্র। বালকেরা এইগুলি অঙ্কন করাই একটু কঠিন মনে করে। এসকল চিত্রাঙ্কনে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

যে চিত্রের অনুকরণ করিতে হইবে তাহাকে একটী কাল্পনিক লম্বরেখা টানিয়া সমান দুই ভাগে বিভক্ত কর। তোমার কাগজে একটা লম্বা লম্ব রেখা টানিয়া, মনে করিয়া লও যেন সেইটাই তোমার কাল্পনিক রেখার নকল। এখন এই রেখার বাম পার্শ্বে যেরূপ রেখাদি আছে, তাহা উপর হইতে আঁকিতে আরম্ভ কর। প্রথমে বামদিকের এক অংশ আঁকিয়া, তদ্রূপ ডাইনে নকল কর। আবার বামদিকের অন্য এক অংশ আঁক, আর তদ্রূপ ডাইনে নকল কর। এইরূপ করিয়া ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাক। নিম্নের চিত্রে ১,২,৩ প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা কোন্ রেখা প্রথমে ও কোন্‌টী পরে আঁকিতে হইবে তাহার একটু আভাস দেওয়া হইল।
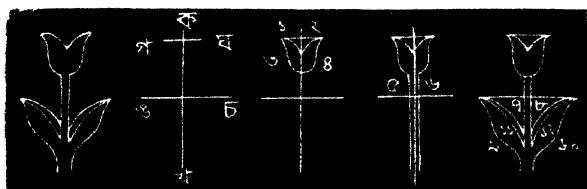
৮৩ চিত্র।—সমপার্শ্ব চিত্রাঙ্কন।

একেবারে সমস্ত রেখা না আঁকিয়া, সময় সময় বিন্দুর দ্বারা মোটামুটি সমস্ত চিত্রটী চিহ্নিত করিয়া লইলেও সুবিধা হয়। লম্বালম্বি একটী রেখা ছাড়া পাশাপাশি আরও কতকগুলি রেখা টানা আবশ্যক হইতে পারে। কি কি রূপ রেখা টানিলে অঙ্কনের সুবিধা হইবে, তাহার আদর্শ অনেক চিত্র পুস্তকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। চিত্র শেষ হইলে অবশ্য এ রেখাগুলি রবারের দ্বারা পুঁছিয়া ফেলিতে হইবে। বক্র রেখাগুলি একটানে আঁকিবে; একটু একটু করিয়া আঁকিতে গেলে বক্রত্বের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইবে। খুব অভ্যাস না করিলে উত্তম চিত্রকর হওয়া যায় না।

পরীক্ষার দুই মাস পূর্ব্বে ইতিহাস ভূগোল মুখস্থ করিয়া সেই বিষয়ে পাশ করা যায়, কিন্তু চিত্রাঙ্কন সমস্ত বৎসর অভ্যাস না করিলে পাশ করা যায় না।

দ্রব্যানুলিপি।—দ্রব্যানুলিপি শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, দ্রব্যানুলিপি বিষয়ক চিত্র দৃষ্টে বালকগণকে চিত্রানুলিপি করাইতে হইবে। গোলা, বাটী, ঘটী, ঢোল, বোতল, গেলাস, ছক, বাক্স, টেবিল প্রভৃতির চিত্র নকল করাইতে হইবে। ইহাতে তাহারা বিষয়ের একটা ভাব পাইবে। আমরা নিকটস্থ ও দূরস্থ দ্রব্যাদি কিরূপ দেখি তাহা বুঝাইতে হইবে। যদি নিকটে রেলের পথ কি অনেক দূর বিস্তৃত সড়ক পথ, কি লম্বা ঘর বা বারান্দা থাকে তবে বালকগণকে সেইরূপ কোনও স্থানে লইয়া যাইবে। দেখাও যে, রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন দুই রেলের মধ্যের ফাঁক মিশিয়া গিয়াছে; আর শেষে যেন, আকাশ ও মাটী যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানে গিয়া মিলাইয়া গিয়াছে। আর এক কথা—রেলের রাস্তা যতই দূরে গিয়াছে, ততই যেন উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। আর টেলিগ্রাফের থামগুলি সব সমান হইলেও যেন দূরের থামগুলির মাথা ক্রমশঃ ছোট হইয়া নীচু হইয়া পড়িয়াছে। যদি বালক এই শেষ বিষয়টী বুঝিতে না পারে, তবে এক কাজ কর। আগে তাহাকে আয়ত ক্ষেত্রাকার দ্রব্যাদির বাহির সহিত পেন্সিল মিল করাইতে শিখাও। বালকের হাতে পেন্সিল বা একখান সরল কাঠি দাও। তাহাকে সেই কাঠিখানা ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া, বোর্ডের ধারের সহিত, টেবিলের ধারের সহিত, ডেস্কের ধারের সহিত মিল করিতে বল। তুমি নিজেও একটা পেন্সিল বা কাঠি লইয়া মিল করিবার প্রণালী দেখাইয়া দাও। এই সময় হইতেই এক বিষয় সাবধান করা কর্ত্তব্য—বালকগণ মাপ লইবার সময় যখন পেন্সিল বা কাঠি ধরিবে, তখন বাহু যেন সহজ ভাবে, বেশ টান করিয়া রাখে। বাহু ভাঙ্গিয়া, পেন্সিল ধরিয়া মাপ

লইলে, প্রথমবার যেরূপ মাপ পাওয়া যাইবে, দ্বিতীয় বারে তাহা নাও হইতে পারে, কারণ পূর্ব্বে বাহু যে পরিমাণ বক্র ছিল, তাহাত দ্বিতীয় বার ঠিক থাকিবার কথা নহে। এইজন্য সকল সময় বাহু টান করিয়া মাপ লওয়াই কর্ত্তব্য। পেন্সিলকে আবশ্যক মত লম্বভাবে বা ভূসমান্তরভাবে ধরিতে হইবে। কিন্তু একথা যেন মনে থাকে যে, কোন সময়েই পেন্সিলকে তেড়া করিয়া ধরিয়া কোনও তেড়া রেখার সহিত মিল করিতে হইবেনা। মাপ লইবার সময় হয় ভূরেখার উপরে কোনও লম্বের মাপ লইবে বা ভূরেখার সমান্তর কোনও ব্যবধানের মাপ লইবে; পেন্সিল সকল অবস্থাতেই বাহুর সহিত সমকোণে অবস্থিত থাকিবে। বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সরাইয়া সরাইয়া উচু নীচু করিতে হইবে। একচক্ষু মুদ্রিত করিলেই মাপ লইবার সুবিধা হয়। যেরূপে পেন্সিল ধরিতে হইবে তাহা নিম্নের চিত্র দৃষ্টে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে।
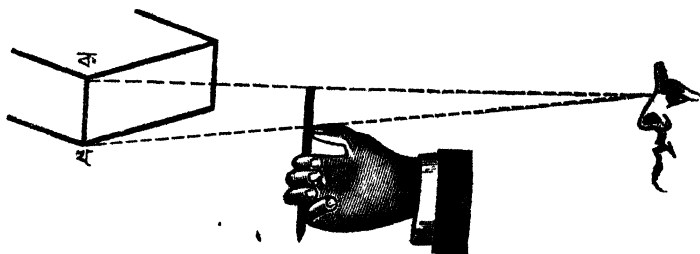
৮৪ চিত্র।—পেনসিল দিয়া মাপ লওয়া।

এইরূপে পেন্সিল বা কাঠির দ্বারা দ্রব্যের লাইনের সহিত পেন্সিল মিল করিয়া ধরিতে শিখিলে, বালকগণকে একটা খুব লম্বা ঘর বা বারান্দায় দাঁড়া করাইবে। সেই ঘর বা বারান্দার মেজেতে কতকগুলি লম্বা লম্বা কাঠি, আড়াআড়িভাবে সাজাইয়া রাখ। এখন বালকগণকে সেই

ঘর বা বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়া করাইয়া, সেই লম্বা কাঠিগুলির সহিত (ভূসমান্তরভাবে ধরিয়া) পেন্সিল মিল করিতে বল। প্রথমে, যে কাঠি নিকটে তাহার সহিত পেন্সিল মিল করিতে বল। তারপর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমে মিল করিতে থাকুক। বালকগণকে বুঝাইয়া দাও যে, কাঠি যতই দূরে যাইতেছে পেন্সিল ততই উচ্চ করিয়া মিল করিতে হইতেছে। আবার এইরূপে ছাদের বিমের (কড়িকাষ্ঠ) সঙ্গে পেন্সিল মিল করাও। এবারে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে যতই দূরের বিমের সহিত পেন্সিল মিল করিতে হইতেছে, ততই পেন্সিলটী নীচের দিকে নামাইতে হইতেছে। যদি কোনও গৃহ বা বারান্দায় গিয়া এরূপ পরীক্ষার সুবিধা না থাকে, তবে আর এক উপায় বলিয়া দিতে পারি। একটু পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। একটা মাঠের মধ্যে বা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে, এক লাইনে, দূরে দূরে পাঁচ সাত হাত ফাঁকে ফাঁকে চারি পাঁচটা আড় (হরাই জণ্ট্যাল বারের মত) বসাইয়া লও; আর প্রত্যেক আড়ের নীচে মাটীর উপরে একখান করিয়া কাঠি আড়াআড়ি
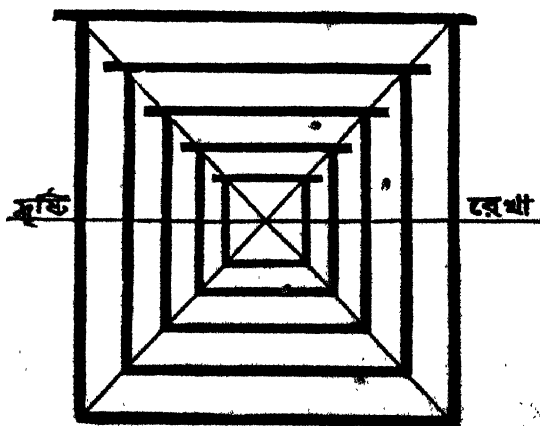
৮৫ চিত্র।—দৃষ্টি বোধ।

ভাবে রাখ। সামান্য বাথারীর (কাবারী, কাইম) দ্বারা এইরূপ আড় করিলেই হইবে। তবে খুঁটির বাথারীগুলি যেন ছয় হাতের কম না হয়। ইহাতেও পূর্ব্বের মত পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। বালকেরা এই আড়গুলি যেরূপ দেখিল তাহা বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া দেখাও (৮৫ চিত্র), বুঝাইয়া দাও যে যদি বহুদূর পর্য্যন্ত এইরূপ আড়া সাজান থাকিত, তবে যেখানে আকাশ ও মাটী মিশিয়াছে, সেই খানে শেষে তাহারাও ছোট হইতে হইতে এক বিন্দুতে পরিণত হইত। এই বিন্দুর নাম 'মিলন বিন্দু'। আমাদিগের চক্ষুর উপরে যে সকল জিনিষ থাকে তাহা যেন নামিয়া আসে, আর চক্ষুর নীচে যাহা থাকে তাহা যেন উঠিয়া গিয়া মাটী ও আকাশের মিলিত রেখার উপরে মিলিত হয়। এই রেখাকে 'চক্রবাল রেখা' বলে। সমস্ত মিলন বিন্দু এই চক্রবাল বা খ রেখাতেই পতিত হইবে।

কতকগুলি জুতার খালি বাক্স, কি কতকগুলি আস্ত ইঁট এক লাইন করিয়া সাজাইয়া যাও। বালকগণকে এক প্রান্ত হইতে সেই ইঁটগুলি দেখিতে বল। কি দেখিল? ইঁটগুলি ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে। এক পাশে দাঁড়া করাইয়া দেখাও। পাশগুলিও ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত রেখাকে যদি বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই চক্রবাল রেখায় গিয়া এক বিন্দুতে মিলিত হইবে।

এখন একটা বাক্স লও। বালকদিগের সম্মুখে ধর। তাহারা বাক্সের কয় পিঠ এক সঙ্গে দেখিতে পারে, তাহা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে। চক্ষু ঠিক রাখিয়া একবারে একসঙ্গে, তিন পিঠের অধিক দেখা যায় না। তারপর বাক্সটী নানা অবস্থায় ধরিয়া বালকদিগের দ্বারা বোর্ডে বাক্সের চিত্র অঙ্কন করাও। প্রথমে বুঝাইয়া দেও যে, বাক্সের পাশের রেখাগুলি বাড়াইয়া দিলে ইহারাও বহুদূরে গিয়া চক্রবাল রেখার এক বিন্দুতে মিলিয়া যাইবে। নিম্নের চিত্রানুযায়ী, বাক্সের স্থান পরিবর্ত্তন করাইয়া বালকদিগকে শিক্ষা দাও :—
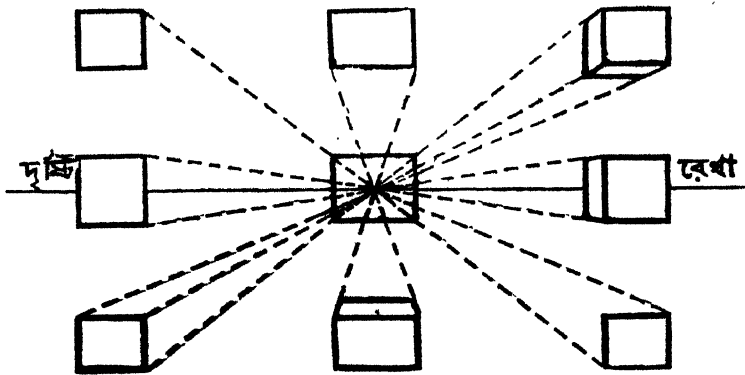
৮৬ চিত্র।—সমঘন বা কিউব অঙ্কন।

দৃষ্টান্ত :—বাক্সের যখন তিন পিঠ দেখা যায় তখন কিরূপে আঁকিতে হইবে? প্রথমে বালক বাক্সের সম্মুখের পিঠ আঁকিয়া লইবে (যেমন বামদিকের ঊর্দ্ধ চিত্র)। তাহার পর তাহার তিন কোণ হইতে সরু রেখা টানিয়া মিলন বিন্দুতে মিলিত করিবে (বামের নিম্ন চিত্র)। তারপর বাক্সের অপর ছুইটী পিঠ আন্দাজে আঁকিবে এবং কোণের নিকটস্থ রেখাগুলি সংলগ্ন করিয়া দিবে (ডাহিনের ঊর্দ্ধ চিত্র)।

সমঘন বা কিউব অঙ্কন শিক্ষা দানের ধারা।—কাগজের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটী রেখা টান। ভূমিতে যে স্থানে কিউবের সম্মুখস্থ কোণ আছে (১ কোণ) তাহার ঠিক নীচ দিয়া, সমকোণ করতঃ, ভূমিতে একটা কাঠি রাখিলে, যে রেখা পাওয়া যায়, এইটী যেন সেই রেখা। ইহার নাম ভূরেখা। ইহার উপর একটী লম্ব উত্থান কর ; যথা ১,২। কিউবের ১০,৪ বাহু বর্দ্ধিত করিলে ভূরেখার যেখানে মিলিত হইবে বলিয়া মনে হয়, সেই স্থানটী লক্ষ্য করিয়া রাখ (যেন ৩); তার পর পেন্সিলের এক প্রান্ত কিউবের ১ বিন্দুতে রাখিয়া, পেন্সিলের যে

স্থানে ৩ বিন্দু মিলিত হইবে বুঝিবে, পেন্সিলের সেই স্থান ধরিয়া আনিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত ভূরেখার ১ হইতে মাপ লইয়া, ৩ বিন্দু নির্দ্ধারণ
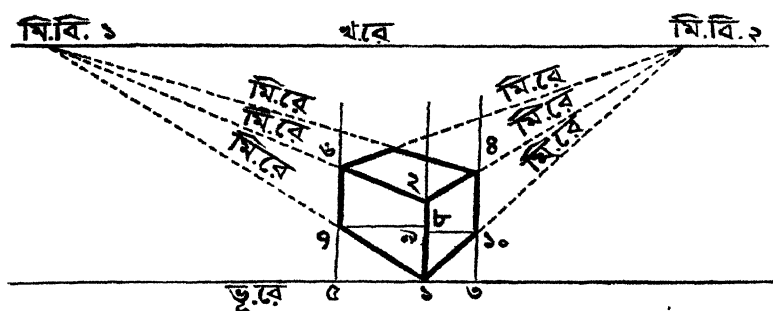
৮৭ চিত্র।—কাগজে কিউব অঙ্কন।

কর। তারপর ৩ বিন্দু হইতে অন্য একটা লম্ব উত্তোলন কর যথা ৩,৪। এই প্রণালীতে ৫, বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়া, ৫,৬ লম্ব উত্তোলন কর। পেন্সিল লম্বভাবে ধরিয়া, কিউবের ১,২ বাহুর মাপ ঠিক করিয়া তোমার চিত্রের ১,২ রেখার মাপ ঠিক কর। তারপর পেন্সিল ভূসমান্তর ভাবে ধরিয়া ও তাহার এক প্রান্ত ১,২ রেখায় সংলগ্ন রাখিয়া, ক্রমে পেন্সিল উঠাইতে থাক। যেখানে দেখিবে যে কিউবের ১০ কোণ আসিয়া পেন্সিলের সহিত মিলিল, ১,২ রেখার সেইস্থান নির্দ্দিষ্ট (যেমন ৮) রাখ; ও সেই বিন্দু হইতে ভূরেখার সমান্তর একটা রেখা টান যেমন, ৮,১০। এইরূপে ৯,৭ টানিয়া লও; এখন ১,৭ও ১,১০ সংযুক্ত কর। তারপর কিউবের ১০,৪ বাহু মাপিয়া চিত্রে ৪ বিন্দু নির্দ্ধারণ কর। এইরূপে ৬ বিন্দুও ঠিক করিয়া লও। ২,৪ ও ২,৬ সংযুক্ত কর। তোমার এই সমস্ত মাপ ঠিক হইল কিনা তাহা এখন এইরূপে পরীক্ষা কর। (১) ১,১০ ও ২,৪ বর্দ্ধিত করিয়া দিলে, এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া আবশ্যক। (২) সেইরূপ ১,৭ ও ২,৬ বর্দ্ধিত করিলেও এক বিন্দুতে মিলিত হওয়া

আবশ্যক। (৩) আবার এই দুই বিন্দু (মি. বি. ১ ও মি. বি ২) সংযুক্ত করিলে যে রেখা (ঘরে) পাওয়া যাইবে, তাহা ভূরেখার সমান্তর হওয়া আবশ্যক। এই তিনটী বিষয় যদি ঠিক হয় তবে তোমার মাপ ঠিক হইয়াছে ও চিত্রও ঠিক হইয়াছে। তাহা না হইলেই মাপে বা অঙ্কনে ভুল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত ঠিক হইলে কিউবের উপরের পিঠ অঙ্কন করা শক্ত নয়। মি. বি ১ এর সঙ্গে ৪ ও মি. বি ২এর সঙ্গে ৬ যোগ করিয়া দাও; এই দুই রেখা যেখানে ছেদ করিবে, সেই খানেই কিউবের উপর পিঠের দূরস্থ কোণ। এখন কিউবের পার্শ্বস্থ রেখাগুলি রাখিয়া, অন্য রেখাগুলি মুছিয়া ফেল। কেহ কেহ "মাপ" শিখাইবার জন্য, প্রথমেই কিউবের মাপ লওয়া না শিখাইয়া, বালকগণকে ব্ল্যাক বোর্ড বা দেওয়াল-সংলগ্ন-মানচিত্র বা ঐরূপ কোনও পদার্থের (বেধ বাদ দিয়া) চিত্র অঙ্কন করাইয়া থাকেন। এ প্রথাও বেশ। তারপর আবার কিউব অঙ্কন শিখাইবার জন্য কেহ কেহ প্রথমে এইরূপ প্রথাও অবলম্বন করিয়া থাকেন:—টেবিলের উপর এক খানা সাসীর কাচ (৪ খানা ইঁটের সাহায্যে) খাড়া করিয়া রাখ। কাচের সম্মুখে একটা কিউব রাখ। অপর পার্শ্বে একটী চতুর বালককে দাঁড়া করাইয়া, তাহাকে, কাচের উপর কিউবের কোণগুলি যে যে স্থানে দেখা যাইতেছে, সে সকল স্থান কাচের উপর চিহ্নিত করিতে বল। তারপর রেখা টানিয়া, কাচের উপরের সেই বিন্দুগুলি (কিউবের পাশের লাইন অনুসরণ করিয়া) যোগ করিতে বল। একটা সাদা চক-পেন্সিল লাল কালিতে ডুবাইয়া লইলেই, তাহা দ্বারা কাচে দাগ কাটা যাইবে। ভূতলস্থ কিউব এইরূপে চিত্রতলে অঙ্কিত হইল। 'চিত্রতল'ও 'ভূতল' কথা দুইটীও একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে। স্লেট, ব্ল্যাক বোর্ড, কাগজ প্রভৃতি পদার্থ, অর্থাৎ যাহার উপর আমরা চিত্র অঙ্কিত করি তাহাই 'চিত্রতল' আর যে ভূমির উপর কিউব আছে সেই ভূমি (চক্রবাল রেখা পর্য্যন্ত) 'ভূতল'। সাধারণ কাগজে কিউব

অঙ্কিত করিতে হইলে অনেক সময়েই এত স্থান পাওয়া যায় না যে, কিউবের বাহুগুলি (মি. রে.=মিলন রেখা ক্রমে) দুইটী মি. বি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। তবে চোখের দ্বারাই এরূপ বুঝিতে পারা চাই যে, বাহুগুলি বর্দ্ধিত হইলে শূন্যে গিয়া যেন একই রেখায় মিলিত হয়। কাগজে কিউবের চিত্র বড় হইলে ২,৪ ও ১,১০ এবং ২,৬ ও ১,৭ রেখা গুলি প্রায় সমান্তর হইয়া থাকে। অনেক সময় ১,১০ ও ১,৭ রেখা টানিয়া ২,৪ ও ২,৬ রেখা দ্বয়, যথাক্রমে তাহাদের সমান্তর করিয়া টানিলেও কিউবের চিত্র হয়।

বালকগণ যদি উত্তমরূপে কিউবের অঙ্কন প্রণালী বুঝিতে পারে, তবে অন্যান্য দ্রব্যের অনুলিপি করিতে আর কাঠিন্য বোধ করিবে না। সেইজন্য কিউবের অনুশীলন খুব অধিক হওয়া আবশ্যক। কারণ চেয়ার, টুল, ডেস্ক, বাক্স, প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই কিউব হইতে উৎপন্ন। সিলিণ্ডার ও বলের চিত্র শিক্ষা করা তত শক্ত নয় বলিয়া বর্ণিত হইল না। সিলিণ্ডার ও বল আঁকিতে শিখিলেই গাছ, পালা, ফুল, ফল, মানুষ, গরু, প্রভৃতি সকলই আঁকিতে পারিবে। কারণ এসমস্তই সিলিণ্ডার ও বলের সংযোগে গঠিত।

রেখা চিত্র।—বালকগণকে, বিশেষতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণকে রেখা চিত্র শিক্ষা দিলে, স্বল্প সময়ে অনেক বিষয়ের চিত্র অঙ্কন করিয়া বিষয়াদি বুঝাইবার সুবিধা হয়। ড্রিল কসরৎ প্রভৃতির নানারূপ ভঙ্গী, রেখা চিত্রের দ্বারা অতি সহজে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারা যায়। উক্ত ভঙ্গী গুলির লিখিত বর্ণনা অপেক্ষা, রেখা চিত্রে বুঝিবারও অধিকতর সুবিধা হয়। আর রেখা চিত্র শিক্ষা করা বিশেষ কঠিনও নয়। পর পৃষ্ঠায় চিত্রের সামান্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

এরূপ চিত্রাঙ্কনে বালকদিগকে এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে :—মাথা প্রায় একটা গোলাকার শূন্যের দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে।
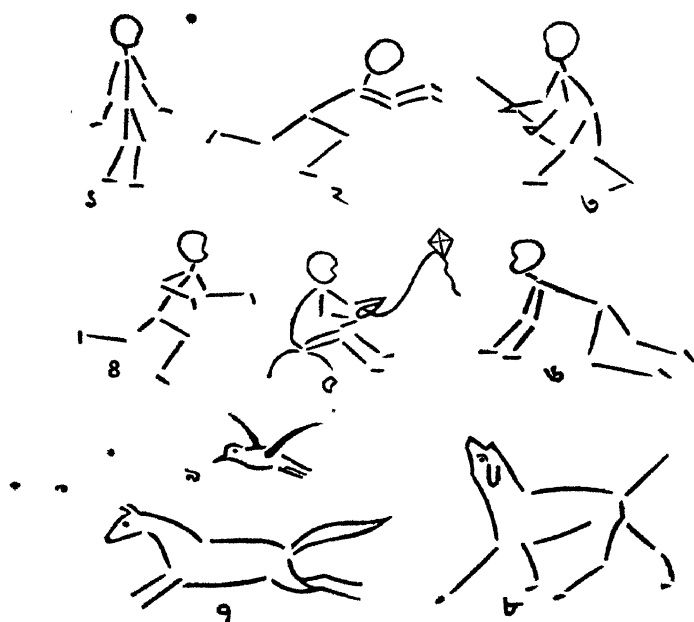
৮৮ চিত্র।—রেখার দ্বারা চিত্র।

যেমন ১,২,৩। বা পারিলে একটু মুখের ভঙ্গী দেখাইতে হইবে (৪,৫,৬)। প্রত্যেক যোড়ের স্থান ফাঁক রাখিয়া দিতে হইবে। মাথা ও গলার মধ্যে, গলা ও ধড়ের মধ্যে, ধড় ও হাত পার সন্ধিস্থলে ফাঁক। পিঠের রেখা অবস্থানুসারে একেবারে সরল (যথা ১) সম্মুখে কুব্জ (যথা ৬) বা পশ্চাতে কুব্জ (যথা ৪) করিতে হইবে। যদি এক অঙ্গের উপর দিয়া অন্য অঙ্গ বা কোনও বস্তু দেখাইতে হয়, তবে উপরে যে অঙ্গ বা বস্তু থাকিবে তাহার রেখা সম্পূর্ণই থাকিবে। নীচের রেখা কাটিতে হইবে ও কাটার দুই পার্শ্বে একটু একটু ফাঁক রাখিতে হইবে, যথা ৪র্থ চিত্রে—ডান হাত শরীরের উপর বলিয়া হাতের রেখা ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু পিঠের রেখা কাটিয়া হাতের দুই পাশে একটু ফাঁক

করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গুলির রেখাটী আবশ্যক মত সরল বা সম্মুখে একটু বক্র করিতে হইবে। ৩ নং চিত্রে যে হাত দিয়া বাঁশ ধরিয়াছে তাহার অগ্রভাগ বক্র, কিন্তু ১ নং চিত্রে যে হাত ঝুলিয়া আছে তাহা সরল। চরণের রেখা সম্বন্ধেও এইরূপ। ৪ চিত্রের সম্মুখের চরণ সরল রেখায়, কিন্তু পশ্চাতের চরণের অগ্রভাগে ভর পড়িয়াছে বলিয়া একটু বক্র।

এইরূপে বালক ঘুড়ি উড়াইতেছে, নৌকা বাহিতেছে, স্লেট হাতে স্কুলে যাইতেছে, দুইজনে হাতাহাতি করিতেছে, লাঠি খেলিতেছে, প্রভৃতি অনেক রূপ ছবি রেখাচিত্রে সুন্দর ভাবে দেখান যাইতে পারে।

ব্ল্যাক-বোর্ড চিত্রাঙ্কন।—ব্ল্যাক বোর্ড চিত্রের দুইটী প্রকরণ। (১) বোর্ডের উপর বালকগণের শিক্ষাদানার্থ বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতির পূর্ণ বা আংশিক চিত্র অঙ্কন করা। (২) বোর্ডের উপর দুই বাহু দ্বারা একসঙ্গে সমপার্শ্ব চিত্র অঙ্কন করা। এই দ্বিতীয় প্রকরণই সাধারণতঃ "ব্লাক-বোর্ড চিত্রাঙ্কন" বা দ্বৈবাহ্বিক চিত্রাঙ্কন নামে প্রচলিত। প্রথম প্রকরণের চিত্রাঙ্কন করিতে হইলে পূর্ব্ব লিখিত চিত্রানুলিপির প্রণালী অনুসারে কিছুদিন চেষ্টা করিলেই হাত ঠিক হইয়া যাইবে। তবে এ পরিমাণ অভ্যাস হওয়া উচিত যে, পড়াইবার সময় যেন আবশ্যক মত স্বল্প সময়ে বোর্ডে সাধারণ দ্রব্যাদির সকল প্রকার অবস্থা সহজে অঙ্কন করিতে পারা যায়। দ্বিতীয় প্রকরণও অভ্যাসের উপর নির্ভর করে, তবে কিঞ্চিৎ উপদেশ আবশ্যক :—

(১) দুই হাতে দুইখানি চক্-পেন্সিল লও।

(২) বোর্ডের খুব নিকটে দাঁড়াইওনা। যে স্থানে দাঁড়াইয়া বাহু প্রসারণ করিলে, চক্-পেন্সিলের মাথা বোর্ডে গিয়া লাগে, এত দূরে দাঁড়াইবে।

(৩) বোর্ডে আঁকিবার পূর্ব্বে, দুই হাত, দুচার বার (চিত্রের রেখানুকরণে) শূন্যে ঘুরাইয়া, হাত ঠিক করিয়া লইবে।

(৪) বক্র রেখাগুলি যথাসম্ভব এক টানে আঁকিতে চেষ্টা করিবে।

২। মৃন্মূর্ত্তিগঠন।

আবশ্যকতা।—চিত্রাঙ্কন শিক্ষার যে আবশ্যকতা ইহারও প্রায় তদ্রূপ। অধিকন্তু ইহাতে দুই হস্তের সমস্ত গুলি অঙ্গুলির পরিচালনা আবশ্যক হয় বলিয়া ইহা দ্বারা হাতের জড়তা ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সমস্ত গুলি অঙ্গুলি নানারূপ সূক্ষ্ম কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মত ইহাতেও নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে।

মাটী প্রস্তুত।—উত্তম আটালে মাটীই এই কার্য্যের উপযোগী। যে মাটীতে প্রতিমাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে সেই মাটী হইলেই চলিবে। মাটীতে জল দিয়া উত্তম রূপ মথিয়া লইতে হইবে। শক্ত কোন জিনিষ থাকিলে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। যখন (রুটির জন্য) মথা ময়দার মত হইবে অর্থাৎ সহজে হাতে লাগিয়া থাকিবে না, কিন্তু যেমন করিয়া গড়িতে ইচ্ছা হয়, তাহাই পারা যাইবে, তখন মাটী ঠিক হইল। নিম্নের চিত্রানুরূপ ৫।৬ ইঞ্চ লম্বা কতকগুলি বাঁশের চটী প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এই গুলির দ্বারা কাটা ছাঁটার কাজ করিতে হইবে ঃ—

৮৯ চিত্র। মাটী কাটিবার ছুরি।

আরম্ভ।—বালকগণকে সর্ব্বপ্রথমে বল্ বা গোলক প্রস্তুত শিক্ষা দিতে হইবে। মাটী লইয়া বাম হাতের তালুর উপরে রাখিয়া ডান হাতের তালু দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বল্ প্রস্তুত করিতে পারিবে। তারপর সেই বল্, চটীর দ্বারা সমদ্বিখণ্ডিত কর, এবং চটীর

অগ্রভাগের সাহায্যে সেই অর্দ্ধ গোলার মধ্যের মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া, দুইটী বাটী প্রস্তুত কর। যদি বাটীর ভিতর বা বাহির অপরিষ্কার বোধ হয়, তবে আঙ্গুলে একটু জল লাগাইয়া, বাটীর সমস্ত গাত্র মাজিয়া মাজিয়া সমান করিতে হইবে। ইহার পর মাটী দ্বারা একটা ঢোল প্রস্তুত কর। মধ্য হইতে মাটী খুঁড়িয়া ফেলিয়া ঢোল হইতে গেলাস, বোতল, বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। তারপর একটা ছক্ (কিউব) প্রস্তুত কর ও পূর্ব্ববৎ মাটী তুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে ডালা শূন্য বাক্‌সে পরিণত কর। একটা ডিম প্রস্তুত কর। একদিক অপেক্ষা, ডিমের অপর দিক একটু বেশী মোটা। তারপর পাখীর গলা ও ঠোঁট প্রস্তুত কর। ডিমের যে দিক সরু, সেইদিকে ঠোঁট ও গলা লাগাইয়া দাও। ডিম হইতে পাখী হইল। (৯০ চিত্র দেখ)।

ফল গঠন।—বিদ্যালয়ে মানুষ গরু প্রভৃতির মূর্ত্তি শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা বা সময় হয়না। কতকগুলি সাধারণ ও সহজ ফল প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল। যে ফল শিখাইতে হইবে তাহা সংগ্রহ করা নিতান্তই আবশ্যক। বালকেরা দেখিয়া দেখিয়া গড়িতে থাকিবে। বল্ বা গোলক হইতে কমলা লেবু করা যায়। বৃন্তের স্থানে ও তাহার বিপরীত স্থানে আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া দিলেই ঠিক কমলা হইল। তবে একটা বৃন্ত না লাগাইলে ফল ভাল দেখায় না। একটু মাটী দ্বারা ছোট একটা বৃন্ত প্রস্তুত কর, আর যে স্থানে সেই বৃন্তটী লাগাইবে সেখানে পেন্সিলের মাথা দিয়া একটু গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে তোমার বৃন্তটী আস্তে টিপিয়া ধর। বৃন্ত লাগিয়া গেল। আবার বোঁটাটা খাড়া করিয়া রাখিলেও ভাল দেখায় না; একটু হেলাইয়া দিবে। লেবু, জাম, শশা প্রস্তুত করিয়া একটী বৃন্ত লাগাও। পেয়ারা, দাড়িম্ব, বেগুণ প্রভৃতি ফল প্রস্তুত বিষয়ে একটু উপদেশ আবশ্যক হইতে পারে। সাধারণ পেয়ারার আকার গোল নহে—নীচের দিকে

মোটা, বোঁটার দিকে সরু। তারপর ফলের উপর পল তোলা আছে। সকল জাতীয ফলের গঠনেই দুই হাতের আঙ্গুল চালান আবশ্যক। প্রথম মাটীর একটা বল্ করিয়া লও। বাম হাতের আঙ্গুল কয়টীর উপরে সেই বলটী রাখিয়া, ডান হাতের আঙ্গুল কয়টীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই ফলটী ঘুরাও ও একটু একটু করিয়া উপরের দিকে (পেয়ারার ঊর্দ্ধভাগের মত) লম্বা করিয়া লইয়া যাও। আকার ঠিক হইলে, ডান হাতের আঙ্গুলের টিপিতে পল তোলার কাজ শেষ কর। তারপর বোঁটার স্থানে টিপিয়া একটু নীচু করিয়া রাখ। পূর্ব্বের মত বোঁটা প্রস্তুত করিয়া লাগাও। এবারে আরও একটু কাজ আছে। পেয়ারার নীচে ফুল দেখাইতে হইবে। ঔষধের বড়ির মত ৪৫টী বড়ি প্রস্তুত কর, তাহা টিপিয়া চেপ্টা কর। পেয়ারার নীচে একটু একটু দাগ কাটিয়া সেই গুলির মধ্যে ঐ চেপ্টা খণ্ডগুলি চক্রাকারে লাগাইয়া দাও। একটা ফুলওয়ালা পেয়ারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। দাড়িম্বের ফুলও এইরূপ পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হইবে। বেগুণের বোঁটার সঙ্গে যে কুণ্ড (calyx) থাকে তাহা পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া লইলেই প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হয়।
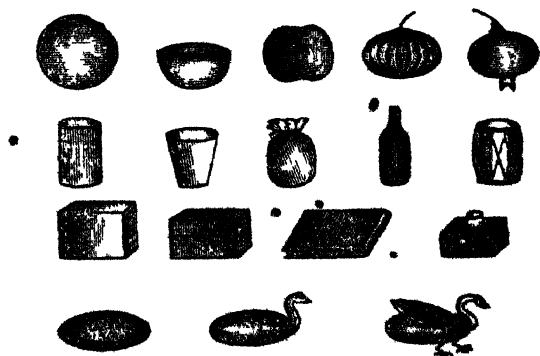
৯০ চিত্র। মৃত্তিকায় ফলাদি গঠন।

এই বিবরণ পড়িয়া কাজ কঠিন বোধ হইতে পারে; কাজ কিন্তু তেমন কঠিন নয়। বালকেরা অতি সহজেই এই সমস্ত গঠন শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার স্বাভাবিক শিল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালকেরা দু-চার দিনের মধ্যেই, চমৎকার গঠন কৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে। একবার কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিলেই শিক্ষকগণ বুঝিতে পারিবেন যে একার্য্য তেমন শক্ত নয়।

৩। সঙ্গীত।

আবশ্যকতা।—সঙ্গীতে যেমন নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করা যায়, এমন আর কিছুতে হয় বলিয়া মনে হয় না। আর এই আনন্দ বিনা ব্যয়ে সকলেই যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ের আলোচনা যে অত্যাবশ্যকীয় তাহা বলা বাহুল্য। উত্তম সঙ্গীতে হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি গুলিকে খুলিয়া দিয়া, মানুষের মন পবিত্র করে ও চরিত্র উন্নত করে। এইজন্য ধর্ম্ম মন্দিরে সঙ্গীতের ব্যবস্থা। রোগে, শোকে, দুঃখে, কষ্টে, সঙ্গীতের সাহায্যে আশ্চর্য্য শান্তি লাভ করা যায়। ইহা ছাড়া গানে ফুসফুসের উপকার হয়, আর রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয়।

ইংরেজ বালকদিগের জন্য যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদিগের দেশে কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু বালকদিগের বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ব্যবস্থা না করিলে, আমরা যে নিজ হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইব, তাহা আমাদিগের প্রকৃতি নয়। এ কথা আমরা জানি যে, সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ দিবেন বই বাধা দিবেন না। কিন্তু তবুও সকল ব্যবস্থার জন্যই আমরা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশের অপেক্ষা করিয়া থাকি। যেটা ভাল বুঝিতে পারা যায়, সুবিধা হইলে সেটা কার্য্যে পরিণত করাই সঙ্গত। কর্ত্তৃপক্ষেরও সকল বিষয়ে আদেশ দেওয়া সম্ভব পর নহে।

বিদ্যালয়ে অবশ্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বিদ্যার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া সম্ভব পর নহে। আর বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিখাইয়া এক এক জনকে তানসেন করাও উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ সঙ্গীতাদি বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক; তাহা না হইলে সঙ্গীতের রসাস্বাদন করিতে পারা যায় না। বিদ্যালয়ে সেই ক্ষমতার উন্মেষ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। আর যাহাতে অন্ততঃ ধর্ম্মসঙ্গীতে বা কীর্ত্তনাদিতে যোগদান করিয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় সহকারী হইতে পারে, বালককে সে বিষয়ে উপযুক্ত করিয়া দেওয়াও অন্য উদ্দেশ্য বটে। সপ্তাহে ২ কি ৩ দিন, ১৫ কি ২০ মিনিট করিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিলেই বিদ্যালয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

শিক্ষার ধারা।—শিক্ষক নিজে একটী সহজ সুরের ক্ষুদ্র সঙ্গীত বাছিয়া লইবেন। লক্ষ্ণৌ ঠুংরীকেই অনেকে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযুক্ত সুর বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, একতালা, ঠুংরী, যৎ, কাওয়ালী, ছেপকা প্রভৃতি সহজ সহজ তালে, খাম্বাজ, ভৈরবী, ললিত, সাহানা মল্লার, বিভাস, ঝিঁঝিট, বেহাগ প্রভৃতি সুরে রচিত গান, আরম্ভের পক্ষে উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে প্রথম শিক্ষা-দানের সময়ে কোন সুরেই তরঙ্গ, মূর্চ্ছনা, গিঠথারী প্রভৃতির অবতারণা করিতে নাই। যতদূর সম্ভব সুর সরল হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক প্রথমে গানের প্রথম লাইন ২।৩ বার গাইবেন, বালকেরা শুনিবে। তারপর বালকগণও শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে গান আরম্ভ করিবে। বালকেরা খুব সহজেই সুর নকল করিতে পারে। সুতরাং শিখাইতে কষ্ট হইবে না। প্রথম দিন কেবল প্রথম একটী কি দুটী লাইন মাত্রই আলোচনা করিবে। সেই লাইন দুইটী এক রকম অভ্যাস হইলে, অন্তরা আরম্ভ করিতে হইবে। দু চার দিন অন্তরার অভ্যাস হইয়া গেলে, আবার প্রথম হইতে সমস্ত গান এক সঙ্গে গাইতে হইবে। ইহার পর শিক্ষক গান আরম্ভ করিয়া দিবেন মাত্র, কিন্তু বালকগণের সঙ্গে সমস্ত লাইন গাইবেন না। প্রত্যেক অন্তরার প্রথম অংশ আরম্ভ করিয়া দিয়া, তিনি থামিয়া যাইবেন, বালকেরা গাইয়া যাইবে। এইরূপে অভ্যাস করাইবেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নিম্নলিখিত গানটী প্রায় বিদ্যালয়েই প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে :—

খাম্বাজ—একতালা।

(১) তোমারি গেহে, পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।

(২) আমারি প্রাণ, তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥

(৩) দিয়েছ জনম জননী ক্রোড়ে, রেখেছ পিতার বক্ষে মোরে,
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে॥

(৪) তোমার বিশাল বিচিত্র ভুবন, করেছ আমার নয়ন লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে।

(৫) অন্তরে বাহিরে স্বদেশে বিদেশে, যুগ যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে সন্তোষে, তুমি ধন্য ধন্য হে॥

শিক্ষকের সাহায্যার্থ নিম্নে স্বরলিপি প্রদত্ত হইল :—

(১) সা সা সা | গ গ | ম ম ম | প ধ |
তো মা রি | গে হে | পা লি ছ | স্নে হে |

সাঁ নি | ধ ম | প ধ ম | গ |
তু মি | ধ ন্য | ধ ০ ন্য | হে |

(২) নি নি নি | নি নি | সাঁ সাঁ সা | প ধ |
আ মা রি | প্রা ণ | তো মা রি | দা ন |

সাঁ নি | ধ ম | প ধ ম | গ ‖
তু মি | ধ ন্য | ধ ০ ন্য | হে ‖

(৩) ম প প | নি নি | নি সাঁ সাঁ নি | সাঁ সাঁ |
দি য়ে ছ | জ ন ম | জ ন নী | ক্রো ড়ে |

নি নি নি | সাঁ সাঁ সাঁ | সাঁ সাঁ ঋ নি | ধ প |
রে খে ছ | পি তা র | ব ০ ক্ষে | মো রে |

ধ ধ ধ প | ম গ ঋ গ | ম ম ম | প ধ |
বেঁ ধে ছ | স খা র | প্র ণ য় | ডো রে |

সাঁ নি | ঋ ম প ধ ম | গ ||
তু মি | ধ ন্য ধ ০ ন্য | হে ||

সাঋগামা সাধনাও একটু শিখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। একখানা বড় কাগজে নিম্নলিখিত রূপে সা ঋ গা মা বড় বড় অক্ষরে * লিখিয়া দাও।

৯১ চিত্র।—স্বরসাধন পত্র।

* বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনে সাধারণতঃ যে কয় প্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সে সমস্তের নাম জানা আবশ্যক। এই স্বর সাধনার চিত্রে যে বড় অক্ষরটী (সা) দেখিতেছ

এই কাগজ খানি দেয়ালে ঝুলাইয়া রাখ। পরে একখান লম্বা কাঠীর (ম্যাপপয়ণ্টার) দ্বারা (একাদিক্রমে) সুরের এক একটী অক্ষর কাঠীর অগ্রভাগ দিয়া স্পর্শ কর, আর সঙ্গে সঙ্গে সা, ঋ, গা, মা, রীতিমত ভাবে গাহিয়া যাও; বালকগণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে। আবার এইরূপ র্সা, নি, ধা পা করিয়া কাঠী নামাইয়া আন। এইরূপ প্রত্যহ ৪।৫ বার অভ্যাস করাইলে ভাল হয়। সুরের আরম্ভ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। আজকালকার মত এই যে আরম্ভে সা হইতে উপরের দিক না গিয়া, র্সা হইতে নীচের দিকে নামিয়া আসাই সুবিধা। যাহা হউক শিক্ষক যেরূপ সুবিধা মনে করেন তাহাই করিবেন। এইরূপ কয়েকদিন সা ঋ গা মার অভ্যাস হইলে পর, ঐরূপ কাঠী সঞ্চালনের দ্বারা ঐ কাগজের উপর সারে, রেগা, গামা ইত্যাদি, দুইটী দুইটী করিয়া ও সারেগা, রেগামা ইত্যাদি রূপ তিনটী তিনটী করিয়া সুরের অভ্যাস করাইতে হইবে। একটা হারমনিয়ম সংগ্রহ করিতে পারিলে বিশেষ সুবিধা হইবার কথা।

সুরের কথা।—সারি গামা প্রভৃতি নামগুলি ষড়জ (নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয় স্থান হইতে জাত কেকাতুল্য স্বর) ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত, নিষাদ প্রভৃতি শব্দের সংক্ষিপ্ত মাত্র। আমাদিগের স্বর সহজে যতদুর উচ্চে উঠে ও সহজে যতদুর নিম্নে নামে এই সীমার মধ্যের অংশকে সাত ভাগে ভাগ করিয়া, এক একটি স্বরকে যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ প্রভৃতি নামাকরণ করা হইয়াছে। এই সপ্তস্বর, যেটী যে ভাব ব্যঞ্জক নিম্নে তাহা লিখিত হইল :—

তাহার নাম 'টুলাইন পাইকা', তার উপরে ঋ 'গ্রেট প্রাইমার এণ্টিক', গা 'গ্রেট প্রাইমার', মা 'স্মলপাইকা এণ্টিক', পা 'ইংলিস্‌', ধা 'পাইকা', নি 'স্মলপাইকা', ও র্সা 'বরজাইস'।

সা—গম্ভীর বা তেজ ব্যঞ্জক স্বর।

ঋ—উত্তেজক ব আশা উদ্দীপক।

গা—ধীর বা শান্তি বিধায়ক।

মা—কোমল বা ভয়ভক্তি প্রণোদক।

পা—জমকাল বা আনন্দ ব্যঞ্জক।

ধা—করুণ বা শোক জ্ঞাপক।

নি—হৃদয় বিদ্ধকারী বা মোহ সঞ্চারক।

তবে গানের অর্থের সঙ্গে ও গায়কের গান করিবার কায়দার সঙ্গে স্বরের এই সমস্ত ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এ সমস্ত কথা বালকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেনা বলিয়া এ বিষয়ের অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

তিনটী গ্রামের (উদারা, মুদারা, তারা) কথাও একটু বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাল যে সময় পরিমাপক উপায় বিশেষ, ইহা বলিয়া দিবে; এবং তালের সহিত সঙ্গত হইলে যে মধুর হয়, আর তাল ভঙ্গেই যে শ্রুতিকটু হয়, তাহা পরীক্ষণের দ্বারা দেখাইবে। কোনরূপ বাদ্য যন্ত্রের প্রয়োজন নাই; কেবল একটা কাঠীর দ্বারা টেবিলের উপর (তাল রক্ষার জন্য) টক্ টক্ করিয়া শব্দ করিলেই হইবে। গানগুলির সুরের নাম ও তালের নাম বলিয়া দিবে; সঙ্গীতের দিকে বালকগণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিলেই হইল,—বিদ্যালয়ে তাহাকে সমস্ত শিখাইবার প্রয়োজন নাই আর সময়ও নাই। তবে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে অবশ্য সমস্ত বিষয়ের রীতি মত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

৪। সূচীশিল্প।

আবশ্যকতা।—বস্ত্র যখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, তখন এই বস্ত্র রক্ষার উপায় শিক্ষা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। সূচী-বিদ্যা

জীবিকা নির্ব্বাহেরও একটী সহজ সদুপায়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের এ বিদ্যার তত আবশ্যক না হইতে পারে। কিন্তু মধ্যবিৎ ও দরিদ্রের গৃহে সূচীশিল্প অন্নব্যঞ্জনের মত নিত্য আবশ্যকীয়। এই শিল্প, প্রত্যেক বালিকার শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ গৃহস্থালীতে যেমন তাহাদিগকে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের অশনের ভার লইতে হইবে, তেমনি বসনের ভারও লইতে হইবে। বালকগণেরও এই শিল্প কিঞ্চিৎ জানা আবশ্যক। বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে, জামার সেলাই খুলিয়া গেলে, বালিশের খোলের আবশ্যক হইলে দর্জ্জির আশ্রয় গ্রহণ করা লজ্জার কথা।

আসবাব।—কাঠের বা টিনের বা বেতের একটী ছোট বাক্স। তাহাতে সূঁচ, সূতা, ছুরী, কাঁচি, বোতাম প্রভৃতি উপকরণ থাকিবে। বাক্সটীর মধ্যে ছোট ছোট ২।৩টি খোপ থাকিলে আরও ভাল হয়। নানা প্রকারের সূঁচ (৫;৬ ৭;৮ নং) আবশ্যক। যে সূঁচ টিপিলে বাঁকিয়া যায় না তাহাই ভাল সূঁচ। সাদা রঙের দুইটী তিনটী রিল, ২।৩টী গুটী সূতা, ২।১টী কাল রিল, একখানা বড় কাঁচী (কাপড় কাটিবার জন্য) ও একখানি সরু ছোট কাঁচী, একখানি ছোট ছুরী, একটী অঙ্গুলি-ত্রাণ, একটী ফিতার গজ, কতকগুলি পিন, একটু মোম ও আবশ্যক মত কতকগুলি বোতাম হইলেই মোটামুটী সেলাইএর আসবাব হইল।

শিক্ষার ধারা।—প্রথমে বালিকাকে এক টুকরা ছেঁড়া কাপড় দিবে ও একটা সূঁচে সূতা লাগাইয়া তার ডান হাতে দিবে। সে নিজের ইচ্ছামত কাপড়ের ভিতর সূঁচ চালাইয়া যেমন তেমন ভাবে সেলাই করিবে। ইহাতে সে সূঁচের ব্যবহার নিজের চেষ্টাতেই কতক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারিবে। এরূপ ৬।৭ দিন শিক্ষার পর, তাহাকে আর এক খণ্ড কাপড় দাও আর সেই কাপড়ের উপর নীল পেনসিল

দিয়া একটী সরল রেখা টানিয়া দাও। বালিকাকে এবার এই রেখার বরাবর সেলাই করিতে বল। এইরূপে আবার ৬।৭ দিন চলিয়া গেলে, কাপড়ের উপর একটা লাল পেনসিল দিয়া দাগ কাটিয়া, সেই লাল দাগের উপর সমান দূরে দূরে নীল পেনসিলের দ্বারা বিন্দু চিহ্ন দিয়া দাও। এবার বালিকাকে লাল রেখার উপর দিয়া ও কেবল ঐ সকল নীল বিন্দুর মধ্য দিয়া শূঁচ চালাইতে বল। তারপর কাপড়ে একটী বৃত্ত আঁকিয়া দাও ও ছাত্রীকে সেই বৃত্তের দাগের উপর সেলাই করিতে বল। এইরূপে অভ্যাস করাইলেই বালিকার হাত ঠিক হইয়া আসিবে। প্রথমে সাদা কাপড়ের উপর সাদা সূতা দিয়া সেলাই না করাইয়া, কাল সূতার দ্বারা সেলাই করান কর্ত্তব্য; কারণ সাদার উপরে কাল রঙ ভাসিয়া উঠে বলিয়া শিক্ষার্থী তাহার নিজকৃত সেলাইএর সৌন্দর্য্য বা দোষ গুণ সহজেই বুঝিতে পারে। সেলাইএর সময় বালিকারা যাহাতে প্রথম হইতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করিতে শিক্ষা করে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। অনেকগুলি বালিকাকে এক সঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে বোর্ডে সেলাইর ধারা আঁকিয়া দেখাইতে হইবে।

আবশ্যকীয় সেলাই।—প্রথমে লপ্‌কী বা সাদা সেলাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এইটীই শিক্ষা করা সহজ। তারপর মুড়ি সেলাই ও তৎপর বখেয়া সেলাই শিক্ষা দিলেই সাধারণ কাজ চলিবার মত বিদ্যা হইবে। বোতামের ঘর করা, চুনট করা, মশারির ঝুল ও চাল—ফিতার ভিতর দিয়া সেলাই করা, বালিশের খোলে ঝালড় লাগান প্রভৃতি পরে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আর একটা অতি আবশ্যকীয় সেলাই, রিপু করা। এটী শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ছাঁটের মধ্যে পুতুলের জামার ছাঁট প্রথমে শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর ছোট ছোট পিরাণ, ফ্রক্, বডি ড্রয়ার্স, সেমিজ ইত্যাদি। ইহা অপেক্ষা

অধিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা বা অবসর থাকিলে মোজা বুনান, মোজার রিপু, রুমালে নাম লেখা শিখান যাইতে পারে। উলের কাজ তেমন আবশ্যকীয় মনে হয় না। তবে উলের কাজে যে একটা সৌন্দর্য্য বোধ জন্মে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ছোট টুপি, ফ্রক্, গলাবন্ধ, মোজা প্রভৃতির কাজ মন্দ নয়। কারপেটের জুতা, আসন, খঞ্চিপোষ প্রভৃতি কার্য্য সুন্দর হইলেও সে সকল কার্য্যে যে পরিমাণ সময় নষ্ট হয় ও যে পরিমাণ চক্ষুর প্রতি অত্যাচার করিতে হয়, তাহাতে সে সমস্ত কার্য্যে অধিক প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। কল্কা কাটা (Embroidery) কাজ এদেশে অনেক কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে—কাজও বেশ। বিদ্যালয়ে সূতা দ্বারা ফুল কাটা শিখান যাইতে পারে। লেসের কার্য্যও খুব আদরের। সূঁচ এবং কাঠিম (bobbin) আর আলপিনের সাহায্যে লেস্ প্রস্তুত শিক্ষা দিতে পারা যায়। কাঠিমের দ্বারা লেস্ ও কার্ প্রস্তুতের প্রণালী অত্যন্ত সহজ—একবার দেখিলেই বালিকারা অতি সহজে শিখিয়া লইতে পারিবে।

৫। উদ্যান রচনা।

আবশ্যকতা।—(১) বালক বালিকাগণের সৌন্দর্য্য বোধ বিকশিত করা (২) প্রকৃতির লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রদান করা (৩) জীবন ধারণের প্রধান সম্বল কৃষিকার্য্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা (৪) নিজ হস্তে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (৫) আর এক উপকার এই হয় যে, এই কার্য্যের প্রতি, অনুরক্ত হইলে তাহাদিগের অবসর সময় এই কার্য্যেই ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয়, সুতরাং সৎ কার্য্যের অভাবে আর অন্যায় কার্য্য করিবার অবসর পায় না।

শিক্ষাদানের প্রণালী—এক খণ্ড জমিতে আ'ল দিয়া নিম্নের চিত্রানুরূপ ভাগ করিয়া দাও :—

৯২ চিত্র। জমি বিভাগ।

এক ভাগ জমি (পাঠশালার ছাত্রের পক্ষে) যেন ৩×৬ হাতের বেশী না হয়। সেই স্থান তাহাকে পরিষ্কার করিতে দাও; কিরূপে কোদ্‌লাইতে হয় (খুব ছোট ছেলের জন্য নয়), কিরূপে নিড়াইতে হয়, কিরূপে ঘাস বাছিতে হয় দেখাইয়া দাও। তারপর নানারূপ সার সংগ্রহ কর, যথা—পচা গোবর, খৈল, পচামাছ, ভেড়া ছাগলের নাদি, হাঁস পায়রা কুক্কুটের বিষ্ঠা, ছাই, উঠান ঝাট্‌না, পোড়ামাটী প্রভৃতি। এক এক দল বালককে এক এক রকমের ফুলের বা সবজীর বীজ দাও আর প্রত্যেক বালককে এক প্রকারের সার দাও। বালকেরা জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া বীজ রোপণ করিবে এবং রীতিমত জল সিঞ্চন করিবে। প্রত্যেক বালকের এক খান করিয়া খাতা থাকিবে। তাহাতে প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে নিজ-হস্ত-রোপিত বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বিষয় (পেন্‌সিলের দ্বারা) নোট করিবে। নিম্নে এইরূপ নোট করিবার একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল।—

অমুক বীজ——অমুক সার

৭।৬।০৭—সন্ধ্যার সময় বপন করিয়া জল দিলাম।

৮।৬।০৭—অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। জল দিয়াছি।

৯।৬।০৭—অঙ্কুর বড় হইতেছে। জল দিলাম না। বৃষ্টি হইয়াছে।

১০।৬।০৭— ঐ। জল দিয়াছি।

১১।৬।০৭—একটা পাতা খুলিয়াছে। জল দিলাম না।

১২।৬।০৭—আর একটা পাতা দেখা দিয়াছে। মাটী ভিজা আছে।

১৩,৬।০৭—একটা লাল পোকায় নূতন পাতাটা নষ্ট করিয়াছে। সেই পোকাটা মারিয়াছি।
১৪,৬।০৭—গাছ ১ ইঞ্চ বড় হইয়াছে। ছোট ছোট ঘাস তুলিয়া ফেলিলাম ইত্যাদি।

এক বালককেও দুই তিন রকমের সার দেওয়া যাইতে পারে। সে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে।

ছোট ছেলেদের জন্য ফুলের টব বা ছোট ছোট হাঁড়িতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। একটা টবে কেবল মাটী দিয়া গাছ লাগাও, সার ও জল দিওনা। ২য় টবে মাটী ও সার দাও, জল দিওনা। ৩য় টবে মাটী আর জল দাও, সার দিওনা। ৪র্থ টবে মাটী, সার ও জল দাও। কোন গাছ কিরূপ বাড়িতেছে তাহা বালকগণকে লক্ষ্য করাও।

শিক্ষক নিজে ছাত্রগণের সহিত কোদালি না ধরিলে ছাত্রগণকে এই কার্য্যে ব্রতী করিতে পারিবেন না। আর শিক্ষক যদি নিজ হাতে যত্ন করিয়া বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে উত্তম ফুল ও সবজীর বাগান রচনা করিতে পারেন, তবে সেই সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বালকগণ অতি আনন্দের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। পুষ্পের সৌন্দর্য্যে যখন কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন বালকেরা কেন হইবে না ?

নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কৃত 'সরল কৃষি বিজ্ঞান' (মূল্য ১৲) নামক পুস্তকখানি প্রত্যেক শিক্ষকের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম প্রকরণ—নীতিধর্ম্ম বিষয়ক।

১। নীতিশিক্ষা।

কে দায়ী ?—অভিভাবক বলেন যে বালকের স্বভাব চরিত্রের জন্য শিক্ষক দায়ী, শিক্ষক বলেন যে অভিভাবক দায়ী। শিক্ষক বলেন যে বালকের সহিত যখন তাঁহার কেবল ৫।৬ ঘণ্টা মাত্র সময়ের সম্বন্ধ, তখন অভিভাবকই বালকের চরিত্রের জন্য দায়ী; আবার অভিভাবক বলেন যে, সেই ৫।৬ ঘণ্টা কাল শিক্ষক বালকের মনের উপর যে পরিমাণ আধিপত্য করিয়া থাকেন, তাহার সহিত তুলনায় ১৮।১৯ ঘণ্টার আধিপত্য অকিঞ্চিৎকর, সুতরাং শিক্ষকই দায়ী। ফল কথা, উভয়েই দায়ী। শিক্ষকের উপদেশ কোথায় ভাসিয়া যাইবে, যদি বালক বাড়ীতে আসিয়া পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর আচার ব্যবহারে চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পায়। আবার পিতা মাতার সদুপদেশও সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, যদি বালক বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষকের দোষ ত্রুটী প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পায়।

শিক্ষার উপায়।—"উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের শক্তি অধিকতর প্রবল" একথা পুরাতন হইলেও ধ্রুব সত্য; বালকের আত্মীয় বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই চরিত্রবান হইলে, বালক কথনই কুচরিত্র হইতে পারে না। তবে যে ভাল ভাল পরিবারের ছেলেকেও চরিত্রহীন হইতে দেখা যায় তাহার কারণ এই, পিতা মাতার অসাবধানতা বশতঃ সে ছেলে কুসঙ্গে মিশিবার সুবিধা পায়। ব্যাপার খুব শক্ত। চারিদিকের পাপ প্রলোভনের দৃষ্টান্তের মধ্যে বালক বালিকাকে সচ্চরিত্র করিয়া রাখা বড়ই কঠিন।

(১) বালক যাহাতে কুসঙ্গে মিশিতে না পারে তাহার উপায় করা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। বালক সঙ্গী চায়, সে আমোদ আহ্লাদ চায়; সে সমস্ত দিন এক প্রকার কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে চায়না, ইহা তাহার প্রকৃতি। সুতরাং তাহার আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পিতা মাতা যদি ছেলের সহিত মিলিয়া খেলা করিতে পারেন, তবে ইহার অপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। পিতাকে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অন্ন চিন্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, আর মাতা মূর্খ। তবে যে সকল স্থলে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর সেখানে সেই ব্যবস্থাই হওয়া কর্ত্তব্য।

বালক বালিকা বিনাকার্য্যে থাকিতে চায়না। তাহাদিগকে কেবল 'পড় পড়' বলিয়া আবদ্ধ রাখা যায় না বা উচিতও নয়। চিত্রাঙ্কন, মৃত্তিকাদি দ্বারা পুতুল গঠন, কাগজ কাটিয়া ফুল পাতা প্রস্তুত করণ, উদ্যানে পুষ্প বৃক্ষাদি রোপণ ও নানারূপ আমোদজনক কার্য্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। কোন কাজ না পাইলেই অন্যায় কার্য্য করিবে বা কুসঙ্গে মিশিবে।

(২) চাকর চাকরানীর হস্তে বালক বলিকার ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বড়ই দোষের। তাহারা চরিত্রহীন ও সর্ব্বদা কুৎসিৎ

আমোদ এবং গল্পে লিপ্ত থাকে। বালক বালিকাকেও সেই সকল গল্প শুনায় ও সেই সকল আমোদের স্থলে লইয়া যায়। অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরা প্রায়ই এইজন্য চরিত্রহীন হইয়া পড়ে।

(৩) চরিত্র উন্নত করিবার একটা প্রধান উপায়, সময়-নিষ্ঠ হওয়া। নির্দ্দিষ্ট সময় ঘুম হইতে উঠিবে, নির্দ্দিষ্ট সময় পড়িতে বসিবে, নির্দ্দিষ্ট সময় স্কুলে যাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার ১০ মিনিট পূর্ব্বে বালক স্কুলে পৌঁছিবে। অনেক পূর্ব্বে স্কুলে যাইয়া মন্দ ছেলেদের সঙ্গে মেশে ও শিক্ষকের নিন্দা বা বিদ্যালয়ের দ্রব্যাদি নষ্ট করে।

(৪) অপরাহ্ণে বেড়ান ভাল বটে, কিন্তু প্রায়ই বালকেরা দুষ্ট ছেলেদের দলে মিশিয়া কুৎসিৎ গল্প বা পরনিন্দায় সময় কাটায়। ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া বেড়াইবেন বা পরিচিত ২।১টী ভাল ছেলের সঙ্গে বেড়াইতে দিবেন।

(৫) সন্ধ্যার (প্রদীপ জ্বালার) পরে কোন বালককে বাহিরে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। কুসঙ্গে মিশিয়া, কুৎসিৎ গানে বা আমোদে লিপ্ত থাকে বলিয়া, ঠিক সন্ধ্যার সময় অনেক বালক বাড়ীতে ফিরিয়া আসে না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে 'রামের বাড়ী হইতে খাতা আনিতে গিয়াছিলাম বা যদুকে পাটীগণিত ফিরাইয়া দিতে গিয়াছিলাম' ইত্যাদি। এ সকল খাতা বা পুস্তক আনিবার কথা প্রায়ই সত্য হয় না।

(৬) যাত্রা, নাটক প্রভৃতির অভিনয় দেখিবার জন্য বালকগণকে একা ছাড়িয়া দেওয়া বড়ই অনিষ্টজনক। কুসঙ্গে মিশিয়া কুকার্য্য করিবার জন্য এই সকল স্থানই উপযুক্ত ক্ষেত্র। অনেক সময় দেখিতে না দেওয়াই ভাল। তবে ভাল যাত্রা নাটক হইলে অভিভাবক নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

(৭) অপরাহ্লে অর্দ্ধ ঘণ্টার অধিক ক্রিকেট, ফুটবল কি হাডু ডুডুর মত খেলায় লিপ্ত থাকিতে দিবেনা। অনেকক্ষণ খেলা করিয়া এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়ে যে সন্ধ্যাবেলা পড়িতে পারেনা। অতি সত্বরই ঘুমাইয়া পড়ে।

(৮) বৃথা গল্প বা তর্ক করিতে শুনিলে তখনই থামাইয়া দিবে। ইহাতে চরিত্র নীচ হইয়া পড়ে। নাটক নভেল পাঠে ভাষার বোধ জন্মে বটে, কিন্তু চরিত্রে ভোগ বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। তবে যে সমস্ত নভেল পাঠে এরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা পড়িতে দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) অভিভাবকের উদাসীনতায় অনেক বালক নষ্ট হইয়া যায়। নিজে আফিস হইতে আসিয়াই পাশা খেলায় বসিলেন। রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত খেলাই চলিল। ছেলে কি করে না করে তার খোঁজ নাই। নিজের নিকটে বসাইয়া পড়াইতে হইবে, আর মধ্যে মধ্যে শিক্ষকের নিকটও খোঁজ নিতে হইবে। কিরূপ সঙ্গে মিশে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হইবে। যে দিনের যে কাজ সে দিন তাহা সম্পন্ন করিল কিনা, ইহা প্রত্যহ খোঁজ লওয়া আবশ্যক।

(১০)। অনেক অভিভাবক আবার অতি শাসনে ছেলে নষ্ট করিয়া থাকেন। দিনরাত্র কড়া কথা, দিনরাত্র মার মার, রাত্রদিন চোখ রাঙ্গান অতি অনিষ্টকর। আদরের সঙ্গে শাসন চাই। আদরের মাত্রাই আবার অধিক হওয়া আবশ্যক। যে অভিভাবককে বালক উত্তম খেলার সাথী মনে করে, তিনিই প্রকৃত অভিভাবক।

(১১)। অনেক অভিভাবক নানাকারণে বাধ্য হইয়া উপশিক্ষক (প্রাইভেট টিউটার) নিযুক্ত করেন। এরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে অল্প বেতনের শিক্ষক নিযুক্ত করিতে নাই। হয় অধিক বেতন দিয়া ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে, না হয় একেবারেই নিযুক্ত

করিবেনা। অল্প বেতনের শিক্ষকের দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। ছেলে কম পড়ে, সুতরাং অল্প বেতনের একজন যেমন তেমন লোক হইলেই চলিবে—ইহা মারাত্মক বিশ্বাস। যেমন তেমন শিক্ষক পড়া পড়াইতেত পারিবেই না, অধিকন্তু ছেলেটীর মাথা খাইয়া যাইবে। ছোট ছোট ছেলে শিখানই শক্ত।

(১২)। বালকগণকে বিলাসী হইতে দিবেনা। ভাল জামা, ভাল মোজা, ভাল জুতা পরিব ; আতর, ল্যাভেণ্ডার ও সুগন্ধি তৈল মাখিব ; মাথার উপরে নানারকমের সিঁথি কাটিব ইত্যাদি রূপ আবদারের প্রশ্রয় দিতে নাই। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। অবস্থা বিবেচনায় সাধারণ জামা, মোজা ব্যবহার করিতে দিবে। মাথার চুল-খুব ছোট করিয়া কাটিবে। বিলাসিতায় সময় নষ্ট হয় ও মনকে কলুষিত করে।

(১৩)। আহারাদি সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আহারের মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে। পুত্র এবার এণ্ট্রাস পরীক্ষা দিবে, অতএব তিন বেলা তাহাকে লুচী মোহনভোগ খাওয়াইতে হইবে—ভুল ধারণা। স্বল্প আহারেই বুদ্ধি সতেজ হয়। যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের অধিক আহারের প্রয়োজন বটে। অধিক মিষ্ট বা অম্ল দ্রব্য ভক্ষণে যে কেবল শারীরিক রোগ জন্মে তাহা নহে, বুদ্ধিবৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। আবার অধিক মিষ্ট দ্রব্যাদি খাইলে, মিষ্ট খাইবার জন্য একটী নেশা হইয়া পড়ে। অনেক বালক শেষে পয়সা চুরি বা দোকানে দেনা করিয়া সন্দেশ খাইতে আরম্ভ করে।

যাহা বলা হইল সে সমস্ত বিষয়ে অভিভাবকের দায়িত্বই অধিক। শিক্ষকের কর্ত্তব্য বিষয়ে 'সুশাসন' পরিচ্ছেদে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বালককে সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত রাখাই যে তাহাকে চরিত্রবান করার একমাত্র উপায় তাহাও কথিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের নিয়মিত

৪।৫ ঘণ্টার পরও শিক্ষক বালকগণকে লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। অপরাহ্ণে ব্যায়ামাদির চর্চ্চা করা যাইতে পারে বা খেলারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অবসর দিনে বালকগণকে দিয়া কবিতা প্রভৃতির আবৃত্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় করান যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে বালকগণকে সঙ্গে করিয়া কোন সুন্দর স্থানে বেড়াইতে যাওয়া উত্তম প্রথা; ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ দুইই হয়। সভা সমিতিতেও বালকগণকে ব্যাপৃত রাখিতে পারা যায়। বিদ্যালয়ের সভা সমিতিতে যে বালকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগদান করে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে শিক্ষকগণ সভাকেও বিদ্যালয়ের রচনা শিক্ষার শ্রেণী বিবেচনা করিয়া, সভাতে কেবল রচনার পারিপাট্য ও ব্যাকরণগত ভুল লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সভায় অভিনয় হইবে, কবিতার আবৃত্তি হইবে, হাসির গল্প হইবে, গান হইবে, কৌতুক প্রদর্শন হইবে ও এইরূপ নানা আমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রচনা বক্তৃতা প্রভৃতিও থাকিবে।

কোন কোন শিক্ষক বালকগণের নৈতিক বৃত্তির উন্মেষ কল্পে এই-রূপ আদেশ করিয়া থাকেন, যথা—বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, পথে বা খেলিবার মাঠে, যে সকল ঘটনায় নিম্নলিখিত গুণের একটীর বা একাধিকের পরিচয় পাইবে, সেই সকল ঘটনার সংক্ষেপ বর্ণনা লিখিয়া রাখিবে:—সত্যানুরাগ, সহানুভূতি, সদাচার, সততা, সৎসাহস, স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্বদেশানুরাগ, ইত্যাদি। শিক্ষক সপ্তাহে একদিন এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করেন।

কেমন করিয়া বালকের চরিত্র রক্ষা করিতে হইবে তাহাই লিখিত হইল। তাহার চরিত্র কিরূপে উন্নত করিতে হইবে তাহা বলা কঠিন। ধর্ম্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতিতে এই বিষয়ের যথেষ্ট উপদেশ ও উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। সে সমস্তের কিরূপ প্রয়োগ করিলে বালকগণের চরিত্র উন্নত হইবে তাহা ধর্ম্মোপদেশক বলিতে পারেন। বিদ্যালয়ে এ পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা হয় নাই। আমরাও জানি না।

২। ধর্ম্ম।

আবশ্যকতা।—বাল্যকালে মন সরস ও নমনীয় থাকে। এই সময়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে পারিলে যে সুফল ফলিবে সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। যদি চরিত্রের ভিত্তিতে ধর্ম্মভাব না থাকে, তবে কেবল শুষ্ক নীতির সাহায্যে চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখা সুকঠিন। এইজন্য বিদ্যালয়ে ধর্ম্মানুশীলন নিতান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার প্রণালী।— বিদ্যালয়ে কি প্রণালীতে ধর্ম্মানুশীলনের শিক্ষা প্রদান করিলে সুফল লাভ করিতে পারা যাইবে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। খৃষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে প্রার্থনা হয়, বাইবেল পড়া হয় ও তাহার ব্যাখ্যা করা হয়। কাশীর হিন্দু কলেজের (শ্রীমতী আনী বেসান্তের) জন্য কতকগুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে। সেখানে ঐ পুস্তকের পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। আর প্রত্যেক ছাত্রকে রীতিমত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোলপুর বিদ্যালয়েও রীতিমত উপাসনা বন্দনার ব্যবস্থা আছে। আর রবীন্দ্র বাবু নিজে প্রত্যহ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। আলিগড় কলেজের মুসলমান ছাত্রগণকে রীতিমত নমাজ করিতে হয়। আর সেখানেও মধ্যে মধ্যে কোরাণসরিফ কি অন্য ধর্ম্ম গ্রন্থাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। গুরু-কুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রীতিমত ব্রহ্মচর্য্যের পালন করিতে হয়। যাহা হউক এই সমস্ত দৃষ্টে আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে, বালকগণ যাহাতে রীতিমত স্বধর্ম্মানুযায়ী দৈনিক উপাসনা বন্দনা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে সে বিষয়ে শিক্ষকগণকে যত্নশীল হইতে হইবে। কিন্তু শিক্ষক নিজে ধর্ম্মশীল না হইলে বালকগণকে কেবল উপদেশের দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিবেন না। এ সমস্ত বোর্ডিং স্কুলের

ব্যবস্থা। ডে স্কুলের ছাত্রগণের জন্ম শিক্ষক অপেক্ষা অভিভাবক অধিকতর দায়ী।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ আমাদিগের দেশে। কোন ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইবে? শাক্ত না বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম না খৃষ্টান, বৌদ্ধ না জৈন, সিয়া না সুন্নি? বিদ্যালয়ে কোন ধর্ম্ম বিশেষ লইয়া তর্ক করিতে হইবে না। যে বালক, যে ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাকে সেই ধর্ম্মানুযায়ী দৈনিক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে বাধ্য করিবে মাত্র। কোন বালক তর্ক করিতে আসিলে, তাহাকে কঠোর শাসনে তর্ক হইতে নিবৃত্ত করিবে; ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিচারাদির সময় বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর।

কিছুদিন পূর্ব্বেও দেখিয়াছি যে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতি নাতিনীরা অতি প্রত্যূষে "ঠাকুর তুমি কালো, আমায় কর ভালো" প্রভৃতি সরল কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে। ছেলেরা এখন ঘুম থেকে "খাব খাব" করিয়া উঠে, আর সমস্ত দিনেও সে খাওয়া মেটে না। মিটিবেও না। যা'ক সে কথা—ছোট ছোট ছেলেদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায়, বন্দনাপূর্ণ ছোট ও সরল কবিতা আবৃত্তি করাইবে। নিম্নে এইরূপ একটী কবিতার আদর্শ প্রদত্ত হইল:—

তুমি ভালবাস বলে, কত সুখে থাকি।
দুঃখ পেলে এস কাছে, যেই আমি ডাকি।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি দয়াময়,
না চাহিতে দয়া করে, দাও সমুদয়।
আশীর্ব্বাদ কর'বেন, জীবন ভরিয়া,
তোমারে বাসিতে ভাল, না যাই ভুলিয়া।
কুকথা না মুখে আনি, লোভে নাহি পড়ি,
কার সনে আড়াআড়ি, কভু নাহি করি।

ভক্তি করি গুরুজনে, কাজে রাখি মন,
দুষ্ট বুদ্ধি মনে যেন না আসে কখন।
তুমি থেকে সাথে সাথে চালাও আমারে,
ভক্তি ভরে হে ঠাকুর, প্রণমি তোমারে॥

কয়েকটী ব্রাহ্মশিশুকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এইরূপ একটী কবিতা আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছিলাম। শিলচর নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের হোষ্টেল নিবাসী হিন্দু ছাত্রগণ সোমবার প্রাতে সমবেত হইয়া সমস্বরে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের "নমস্তে সতে সর্ব্ব লোকাশ্রয়ায়" স্তোত্র (৩য় উল্লাস) পাঠ করে ও মুসলমান ছাত্রগণ শুক্রবার প্রাতে মৌলুদ সরিফের "দরুদ" নামক স্তোত্র পাঠ করে। যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় স্বধর্ম্মানুযায়ী সন্ধ্যা বন্দনা করে; আর যাহারা কোনরূপ দীক্ষা গ্রহণ করে নাই তাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিঃশব্দে উক্ত স্তোত্র পাঠ করে।

নবম প্রকরণ—নানা বিষয়ক।

১। পাঠনার নোট লিখিবার পদ্ধতি।

সু শিক্ষকগণ কোন বিষয় শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে সেই বিষয় সম্বন্ধে উত্তমরূপ চিন্তা করিয়া বালকগণের শিক্ষা দানের নিমিত্ত উপযুক্ত তত্ত্ব ও প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন এবং স্মৃতির সাহায্যার্থ সেই সমস্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই লিপিকেই পাঠনার (পড়াইবার) নোট (টোকা) বলে। ইহার সাহাযেই শিক্ষক, পরিপাটীরূপে, শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন।

পাঠনার নোট প্রস্তুত করিতে হইলে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। নূতন শিক্ষকের পক্ষে প্রথম প্রথম উত্তম নোট প্রণয়ন কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করিলে এবং নোট প্রস্তুতের চেষ্টা করিলে বিষয় অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া যায়।

শিক্ষাদানের নোট সাধারণতঃ দুই প্রকারে লিখিত হইয়া থাকে, এক বিস্তৃত নোট, অপর সংক্ষিপ্ত নোট। পরীক্ষা কাগজে বিস্তৃত

নোট লেখা রীতি; কারণ পরীক্ষক সেই নোট দেখিয়া পরীক্ষার্থীর জ্ঞান ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আর শিক্ষকতা কার্য্যের অন্ততঃ প্রথম তিন বৎসর বিস্তৃত নোট লেখাই কর্ত্তব্য। কারণ এই সমস্ত নোট দৃষ্টেই পরিদর্শকগণ নূতন শিক্ষকের উপযুক্ততার বিচার করিয়া থাকেন।

যদি এক বৎসর চেষ্টা করিয়া নোট প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে আর অন্যান্য বৎসর বড় একটা বেগ পাইতে হয়না। নোটের খাতার এক পৃষ্ঠা করিয়া লেখা উচিত, অপর পৃষ্ঠা সাদা থাকিবে। শিক্ষকতা কার্য্যের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা মনে আসিয়া থাকে। সময় সময় আবার কার্যক্ষেত্রেও অনেক অচিন্ত্য-পূর্ব্ব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, নোট প্রস্তুতের সময়, বালকদিগের যে অভাব অনুমান করিয়া প্রণালী নির্দ্ধারণ করা হয়, কার্য্যকালে হয়ত অন্যরূপ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং নূতন প্রণালী উদ্ভাবনের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। সাদা পৃষ্ঠায় এই সকল নূতন কথা লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

লিখিবার নিয়ম।—শিক্ষাদানের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে:—

(১) শ্রেণী—বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞান বিবেচনা করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যক। যাহারা সুদকষা জানেনা তাহাদিগকে কোম্পানি-কাগজ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। শিক্ষাদানের ভাষা, দৃষ্টান্ত, প্রণালী প্রভৃতিও বালকগণের অবস্থানুযায়ী করা আবশ্যক।

(২) সময়—শ্রেণী ও পাঠ্য বিষয়ের বিবেচনায়, সময় নির্দ্ধারণ করিয়া, সেই সময়ের উপযুক্ত পাঠনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ২০, ৩০ কি ৪০ মিনিটের উপযুক্ত নোটই সাধারণতঃ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সময়ের পরিমাণ বুঝিয়া পাঠনার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, বরং

একটু কম হইলে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু অল্প সময়ে অধিক পাঠ দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর।

(৩) বিষয়—বিষয় শ্রেণীর উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে একটী বিষয়ও পড়ান যাইতে পারে—কেবল বিষয়ের 'সাধারণ তত্ত্বের' ও 'প্রণালীর' পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। 'তুলাদণ্ডের' বিষয় নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে হইলে, একটা দাঁড়িপাল্লা ও একপ্রস্ত বাটকারা আনিয়া, কোন জিনিষ মাপিয়া, তাহার ব্যবহার দেখান যাইতে পারে। কিন্তু সেই বিষয় উচ্চ শ্রেণীতে পড়াইতে হইলে তুলাদণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিষয় (ভারমধ্য, বলমধ্য, আশ্রয়মধ্য) শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) উদ্দেশ্য—প্রত্যেক দিনের শিক্ষাদানে, একটী প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের প্রতি লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। সাহিত্য শিক্ষায় আজ বহুব্রীহি সমাস শিখাইব, আর এই এই শব্দের অর্থ শিখাইব; পাটীগণিত শিক্ষায় আজ ভগ্নাংশ কথার অর্থ বুঝাইব ইত্যাদি। এক পাঠে একটী বা দুইটীর অধিক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মধারয়ের আলোচনা দুই চারি দিন হইলে, তাহার পর বহুব্রীহি আরম্ভ করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া নোট প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যের কথা নোটের কাগজে লিখিয়া রাখিতে হয়। অনেক সময় কেবল বিষয় উল্লেখেই উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হইয়া থাকে; যথা, বিষয় 'সবুজ ও কমলা রং' উদ্দেশ্যও তাই, সবুজ ও কমলা রং শিক্ষা। এরূপ স্থলে উদ্দেশ্য উল্লেখ না করিলেও চলে।

(৫) উপকরণ—শিক্ষাদানে যে সমস্ত উপকরণ আবশ্যক, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে ও পাঠনার নোটে একটী একটী করিয়া লিখিতে হইবে। বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যক মনে করিলে উপকরণের মধ্যে

তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক। অনাবশ্যকীয় উপকরণ বা অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবেনা। আর শ্রেণী বিবেচনায় উপকরণের আবশ্যকতা নির্দ্ধারণ করিবে। 'বিদ্যালোক সম্পন্ন হৃদয় কুটীর' বুঝাইবার জন্য দেশলাই ও মোমবাতির আবশ্যকতা নাই, কারণ যে শ্রেণীর জন্য উক্ত অংশের নোট লিখিতে হইবে তাহারা আলোকের কার্য্য জানে ও বুঝে। (১ম পাঠনার নোট দেখ)।

(৬) সূচনা বা উপক্রমণিকা—বিষয়ের প্রতি বালকগণের চিন্তা আকর্ষণ করিবার জন্য (সময় সময়) পাঠনার প্রারম্ভে নানারূপ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বিষয় ভেদে এই প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। সাহিত্য শিক্ষায়, পাঠের সংক্ষিপ্তসার বলিয়া, বা গ্রন্থকার সম্বন্ধে কোন ঘটনা বলিয়া, বা পাঠ সংসৃষ্ট ক্ষুদ্র গল্প করিয়া পাঠনা আরম্ভ করা যাইতে পারে। পাটীগণিত শিক্ষায়, প্রায়ই দুই তিনটী মানসিক অঙ্কের অনুশীলন করাইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়। ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষায়, পূর্ব্বদিনের পাঠ সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠ আরম্ভ রীতি। বস্তু বিচার শিক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা তাহার প্রতিকৃতি বা ছবি উপস্থিত করিয়াই বালকগণের চিন্তাকর্ষণ করা যাইতে পারে। তবে এসম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; অবস্থা বিশেষে ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারে 'উপক্রমণিকা' বহুপ্রকার হইতে পারে। কেবল ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে উপক্রমণিকাতে ২ হইতে ৫ মিনিটের অধিক সময় নষ্ট না হয়। আর উপক্রমণিকা না হইলেও যে বিশেষ কোন দোষ হয়, তাহাও নহে। কোন কোন পাঠে উপক্রমণিকা একেবারেই আবশ্যক হয় না।

(৭) বিষয় বিভাগ—পাঠনার বিষয়টীকে শৃঙ্খলার সহিত ভাগ করিয়া লইতে হইবে। এক ভাগ শিক্ষা দেওয়া হইলে, অপর ভাগ আরম্ভ করিবে। এইরূপ ভাগ যেন সংখ্যায় খুব অধিক না হয়। যথা,

ভারতবর্ষের নদীর বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে, ইহাকে এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরাংশের নদী (২) বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণাংশের নদী (৩) নদীর গতি (৪) নদীর উপত্যকা বা বেসিন (৫) প্রধান প্রধান শাখা নদী (৬) নদী তীরস্থ প্রধান প্রধান নগর (৭) বাণিজ্যাদির সুবিধা ও অসুবিধা।

(৮) পদ্ধতি—বিষয়ের প্রত্যেক বিভাগ শিক্ষা দিবার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখিতে হইবে। পদ্ধতি লিখিতে এই কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক যে জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাত, সরল বিষয়ের সাহায্যে জটিল, নিকটস্থ বস্তুর সাহায্যে দূরস্থ বস্তু ও বর্ত্তমানের সাহায্যে ভূত ভবিষ্যৎ শিক্ষা দিতে হইবে।

(৯) পুনরালোচনা—পাঠনা কালে যে সমস্ত নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহার মধ্য হইতে অত্যাবশ্যকীয় অংশ বাছিয়া লইয়া, সেই সম্বন্ধে, পাঠের শেষে (২ হইতে ৫ মিনিটকাল) পুনরালোচনা করা আবশ্যক। পুনরালোচনার উদ্দেশ্য বালকের স্মরণ ও বোধ শক্তির পরীক্ষা করা এবং বিষয়ের অত্যাবশ্যকীয় অংশে তাহার মনযোগ আকর্ষণ করা; এইজন্য পুনরালোচনায় কেবল কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

(১০) বোর্ডের ব্যবহার—প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষাতেই উপযুক্ত রূপ বোর্ডের ব্যবহার আবশ্যক। পাঠনা কালে বিশেষ আবশ্যকীয় শব্দ, সূত্র, সিদ্ধান্ত বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে। আর পাঠ বিশদীকরণার্থ আবশ্যক মত নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। নোটে সেই সমস্ত শব্দ সূত্র, সিদ্ধান্ত এবং চিত্রাদির উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি।—নোট লিখিবার আর একটী বিস্তৃত পদ্ধতি আছে। ইহাকে "পঞ্চাঙ্গ পদ্ধতি" বলে। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। এ পদ্ধতিও উত্তম তবে নূতন শিক্ষকের পক্ষে তত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত

পদ্ধতিতে নোট লিখিতে শিখিলেই এ পদ্ধতি অনুসারে নোট লেখা শক্ত হইবে না। এই পদ্ধতি নিম্নলিখিত পাঁচ অংশে বিভক্ত :—

১। প্রবেশ।—বালকের পূর্ব্বজ্ঞাত বা পরিচিত বিষয়াদির এরূপ উল্লেখ করিতে হইবে যে বালক নূতন বিষয় বুঝিতে যেন সে সকলের সহায়তা পাইতে পারে। কিরূপে বালকের পূর্ব্ব জ্ঞানের সহিত নূতন বিষয়ের সংযোগ করিতে হইবে তাহা শিক্ষককে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ইহাই উপক্রমণিকা বা সূচনা।

২। প্রদান—শিক্ষক বিষয়ের নূতন তত্ত্ব সম্বন্ধে বালককে শিক্ষা দান করিবেন। কিন্তু সাবধান যেন নূতন তত্ত্ব শিখাইতে গিয়া কেবল মাত্র কতকগুলি নূতন শব্দ শিখাইয়াই শিক্ষক সন্তুষ্ট না হন।

৩। প্রকাশ।—বালককে যে সকল নূতন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইল, সে গুলি কিরূপে উপযুক্ত ও পরিমিত ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এখানে কতক 'আদানের প্রথা' অবলম্বন করিতে হইবে।

৪। প্রসঙ্গ।—কোন পরিচিত পদার্থ বা ঘটনার সহিত সংযোগ করিতে পারিলে, নূতন বিষয় মনে রাখিবার সুবিধা হয়। বালকের স্মৃতির সাহায্যার্থে এরূপ উপায় অবলম্বনীয়। নিঃসংসৃষ্ট বিষয়েও স্মৃতির সাহায্য হইয়া থাকে, যেমন কোন কথার স্মরণার্থ চাদরে গেরো দিয়া রাখা হয়। এখানে গেরোর সহিত বিষয়ের কোন সাদৃশ্য থাকে না বটে, কিন্তু গেরো দেখিয়া, কি ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ইহাই ভাব প্রসঙ্গ।

৫। প্রয়োগ।—বালক যে নূতন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহার প্রয়োগ আবশ্যক। পাটী-গণিতের নিয়ম অঙ্কে প্রয়োগ করিবে; ব্যাকরণের নিয়ম পদ-বিন্যাসে বা পদ-রচনায় প্রয়োগ করিবে, পদার্থ পরিচয়ের বিষয় রচনায় লিপিবদ্ধ করিবে বা বস্তু বিচারে প্রয়োগ করিবে, বিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষণে প্রয়োগ করিবে ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে যদি উপার্জ্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে না শিখিল তবে সে জ্ঞানের কোনই আবশ্যকতা নাই।

এইগুলি নোট লিখিবার সাধারণ নিয়ম।—নোট লিখিবার নানারূপ ধারা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে নানা বিষয়ের নোট প্রদত্ত হইল :—

১। গদ্য সাহিত্য।—সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যে প্রণালীতে শিক্ষাদানের নোট লিখিয়া থাকেন নিম্নে তাহারই আদর্শ

প্রদত্ত হইল। আবশ্যক মত ইহা অপেক্ষাও অল্পকিছু সংক্ষেপ করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে নবীন শিক্ষকের সুবিধা হইবেনা।

অক্ষয় কুমার দত্ত কৃত চারু পাঠ তৃতীয় ভাগের "সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের তারতম্য" প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদ পড়াইতে হইলে যে রূপ নোট আবশ্যক তাহার আদর্শ :—

"জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি! বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব-জাতি পশু জাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য সুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধা-ময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোক সম্পন্ন সুচারু চিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান তিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়া নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পরিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।"

মধ্য শ্রেণী।

বিষয়—গদ্য সাহিত্য—উদ্দেশ্য-জ্ঞানোপার্জ্জনে বালকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা।

সময়—৪০ মিনিট।

উপকরণ—ব্লাকবোর্ড ও চক।

বিষয়	পদ্ধতি
উপক্রমণিকা	"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে," কেন? বিদ্যাসাগর দরিদ্র কিন্তু তাঁহার বন্ধু পাইকপাড়ার রাজা ধনী ছিলেন, কাহার প্রভাব বেশী ইত্যাদি।

বিষয়	পদ্ধতি
২। শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা। জ্ঞান ও বিদ্যা—	জ্ঞান বিদ্যার ফল স্বরূপ; বিদ্যা জ্ঞান লাভের উপায়। আবার "বিদ্, জ্ঞানে"।
বিদ্যাহীন মনুষ্য	বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নয়, তবে কি? কেন?
	মনের গৌরব কি? আর দেহের গৌরব কি?
পৌর্ণমাসী প্রভৃতি	পূর্ণ মাস—মাস পূর্ণেই পূর্ণ চন্দ্র—ষ্ণ ও ঈপ।
	সুধাময়ী শুক্লযামিনী, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত—অর্থ ও সমাস। অজ্ঞানতা যদি তিমির সদৃশ, তবে জ্ঞান কি? কেন?
অজ্ঞানতার দৃষ্টান্ত	লঙ্কায় রাক্ষসগণ বাস করে, পৃথিবী ত্রিকোণ ও গজ কচ্ছপের উপর অবস্থিত, সূর্য্যই ঘুরিতেছে, রাহু চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে ইত্যাদি।
চিত্ত-প্রাসাদ ও হৃদয় কুটীর—	প্রাসাদ = বৃহৎ অট্টালিকা—সজ্জিত, আলোকিত।
	কুটীর = ক্ষুদ্র গৃহ—অপরিষ্কার ও অন্ধকার।
পৌর্ণমাসীর...	কাহার সহিত কাহার তুলনা? অলঙ্কার?
প্রতীয়মান হয়	বাক্যের ভাবার্থ কি?
নিকৃষ্ট সুখ ও নিকৃষ্ট কার্য্য	ইন্দ্রিয়াদির অপরিমিত পরিতৃপ্তি সাধনে যে সুখ;
	অতি ইতর রকমের রঙ্গ তামাসায় যে আনন্দ।
	নিকৃষ্ট কার্য্য যথা—চুরি, ডাকাতি, পরহিংসা, পরপীড়া, পরনিন্দা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি।
	অশিক্ষিত ব্যক্তি কেন নিকৃষ্ট সুখ ও নিকৃষ্ট কার্য্যে রত থাকে? শিক্ষিত থাকেনা কেন?
জ্ঞানজনিত সুখ ও ধর্ম্মোৎপাদ্য সুখ	আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, লুপলাণ্ডের বৃত্তান্ত, রামায়ণ মহাভারতের আখ্যায়িকা পাঠে বা শ্রবণে সুখ—জ্ঞানজনিত।
	পরোপকার, পরসেবা, গুরুভক্তি, কর্ত্তব্য পালন, সাধুতা, সত্যনিষ্ঠার সুখ—ধর্ম্মজনিত।

বিষয়	পদ্ধতি
ভূলোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তর	'দ্যুলোক' কথা শিখাইতে হইবে। উৎকৃষ্টতর কেন ? ভূলোকই বা অপকৃষ্ট কেন ?
একজাতীয় প্রাণী	একজাতীয় প্রাণীর দৃষ্টান্ত দাও। তবে কি বিষয়ে প্রভেদ ?
পুনরালোচনা	জ্ঞানের প্রভাব আশ্চর্য কেন ? মানব জাতি পশু অপেক্ষা কি গুণে শ্রেষ্ঠ ? অশিক্ষিতের মন অমাবস্যা আর সুশিক্ষিতের মন পৌর্ণমাসী. ইহার ভাব বুঝাইয়া দাও। অজ্ঞান-তিমিরাবৃত, ধর্ম্মোৎপাদা, ভুবনাধিবাস—ব্যাস বাক্য ও সমাস ?।

২। পদ্যসাহিত্য।—সাধারণতঃ ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রগণ পরীক্ষা কাগজে যেরূপ ভাবে নোট লিখিয়া থাকে নিম্নে তাহারই আদর্শ দেখান হইল। এই নোট নিম্ন প্রাথমিকের শ্রেণী উপলক্ষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। উচ্চ প্রাথমিকের জন্য প্রায় এইরূপই হইবে, তবে কিঞ্চিৎ কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নিম্ন প্রাথমিকের ছাত্রগণের পক্ষে দুই দিনের (৩০ মিনিট করিয়া) মত পাঠ হইয়াছে। কিছু কমাইয়া উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণীর জন্য (৩০।৪০ মিনিটের) একদিনের পাঠ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ নোটকেই 'বিস্তৃত নোট' বলে। (শিলচর নর্ম্মাল স্কুলের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু জগন্নাথ দে কৃত "শিক্ষাদানের নোট" হইতে গৃহীত) 'সদ্ভাবশতকের' নিম্নোদ্ধৃত অংশের পাঠনার নোট ঃ—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর,
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর ;
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুকরে
কেমন পুলকে তারা মধু পান করে ;
কিন্তু এরা হারাইবে এদিন যখন,
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন ?

আশায় বঞ্চিত হলে আসিবেনা আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার।
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি।

নিম্ন প্রাথমিকের প্রথম শ্রেণী

বিষয় পদ্য সাহিত্য—সময় ৩০ মিনিট

উদ্দেশ্য—প্রবন্ধের বিষয়।

উপকরণ—পদ্ম, মধু মক্ষিকা (বা ছবি), বোর্ড, চক।

বিষয়	পদ্ধতি
১। বোর্ডে লিখিত নূতন শব্দের পাঠ:— বিশ্বপতি, ঝঙ্কার, বঞ্চিত, গুঞ্জন	১। নূতন শব্দ কয়েকটী শৃঙ্খলার সহিত বোর্ডে লিখিত হইবে। বালকগণ প্রথমে তাহা আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিবে। নির্দ্দেশ মাত্র যে কোন শব্দ পড়িবে। তৎপর ভিন্ন ছাত্রকে পড়িতে বলিয়া পাঠ শিক্ষা হইয়াছে কিনা দেখিতে হইবে।
২। সূচনা:— ফুলের বাগানে ভ্রমণ ফুল ও পতঙ্গাদি বিষয়ে কথোপকথন।	২। বালকগণকে সঙ্গে লইয়া ফুলের বাগানে যাইতে হইবে ও ফুটন্ত ফুলে পতঙ্গাদি দেখাইয়া প্রশ্নোত্তর ছলে পতঙ্গের উদ্দেশ্য কি তাহা আদায় করিতে হইবে। ফুল ফুটিলে পতঙ্গাদি জুটে আর শুকাইয়া গেলে কোন পতঙ্গ তাহাতে আসেনা।
৩। আদর্শ পাঠ ও ব্যাখ্যা:—	প্রথমে পাঠটী পড়িতে হইবে; তৎপর দৃষ্টান্ত, বর্ণনা ও প্রশ্নের সাহায্যে ভাব বুঝাইতে হইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
সরোবরে কমল নিকর	কমল ফুল দেখাইতে হইবে (অভাবে স্থল পদ্ম, গোলাপ ইত্যাদি দেখাইয়া পদ্ম বর্ণনা করা যাইতে পারে।) 'কমল' কথা শিখাইতে হইবে এবং 'পদ্ম' নাম আদায় করিতে হইবে। পদ্ম কোথায় ফুটে? দির্ঘীকা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সরোবর ও জলাশয় কথা শিক্ষা দিতে হইবে। নিকর=সকল। পদ্মবন ও তাহার শোভা বর্ণনা করিতে হইবে।
আশ্চর্য্য মনোহর শোভা	বাগানের শোভা মনোহর, কি আশ্চর্য্য! ইহা বুঝাইতে হইবে। যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাইনা এরূপ বস্তুকে 'আশ্চর্য্য' বস্তু" বলি; দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইবে। যেরূপ শোভা সকল সময় দেখা যায় না তাহাই আশ্চর্য্য শোভা। যে শোভা দেখিলে মনে খুব আনন্দ হয়, তাহাই মনোহর শোভা।
মধুকর	মৌমাছি কিরূপ, ছবি আঁকিয়া দেখাইতে হইবে। 'মধুকর' কেন বলে? অলি ও ভ্রমর শিখাইতে হইবে।
গুণ গুণ রবে	পাখী সব রব করিতেছে ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা রব=শব্দ বুঝাইতে হইবে। পাখা নাড়াতেই এইরূপ শব্দ হয়, মৌমাছি বসিয়া থাকিলে শব্দ হয়না ইহাও বুঝাইতে হইবে।
পুলকে মধু পান করে	কলকে করবী বা অন্য ফুলের রস চুষিয়া খাইতে দিয়া, মধু কি বুঝাইতে হইবে। বালকগণ পুলকের সহিত সন্দেশ খায় ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা "পুলকে=আনন্দের সহিত" আদায় করিতে হইবে।
গদ্য	কমলগুলি কোথায় ফুটিয়াছে? তাহারা কিরূপ শোভা ধরিয়াছে? তাহাদের মধু কাহারা পান করিতেছে? কিরূপ শব্দ করে? এইরূপ প্রশ্নের সাহায্যে গদ্য করাইতে হইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
	প্রশ্নদ্বারা আদায় করিয়া বোর্ডে সার লিখিতে হইবে। [জলাশয়ে পদ্ম ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমর তাহার মধুপান করিতেছে]
এরা............ যখন	"এরা" কে? 'এদিন' অর্থাৎ ফুটন্ত অবস্থা। হারাইবে এদিন = শুকাইয়া যাইবে।
গুঞ্জন করিতে	গুণ গুণ রব করিতে। কিরূপে এই শব্দ উৎপন্ন হয়?
আশায় বঞ্চিত হলে	রাম পরীক্ষায় পুরস্কারের আশা করিয়াছিল, কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে, কিছু পাইবার ইচ্ছা করাই 'আশা' আর তাহা না পাইলে আশায় বঞ্চিত হল বলা যায়। অলি কি আশায় ফুলে আসে? কিরূপে তাহাতে বঞ্চিত হইতে পারে?
মধুর ঝঙ্কার	শিশুগণ পায়ে নূপুর বা মল পরিলে ঝঙ্কার শব্দ হয় ইত্যাদি বলিয়া "ঝঙ্কার কথা বুঝাইতে হইবে। তাহা শুনিতে কেমন লাগে? কোকিল, দৈয়াল, বুলবুল ইত্যাদির স্বরের দৃষ্টান্ত দ্বারা মধুর শব্দ কি বুঝাইতে হইবে। কাক, পেঁচা, ময়ূর ইত্যাদির কর্কশ স্বরের কথাও বলিতে হইবে। ইহাদ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুণ গুণ রব ও গুঞ্জনকেই বুঝাইতেছে।
পদ্য—	হারাইবে কে? কি হারাইবে? অলি আসিবে কি? কি করিতে আসিবে না? কেন আসিবে না? আর কি করিবে না? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া গদ্য আদায় করিতে হইবে। বোর্ডে লিখিতে হইবে (ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে ভ্রমর আর আসিবে না)
সুসময়ে...নয় ব্যাখ্যা	পিতামাতা ও সহপাঠীদের দৃষ্টান্তে "বন্ধু" শব্দ বুঝাইতে হইবে। আদর করা যে বন্ধুর কার্য্য, প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিতে হইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
	ফুটন্ত অবস্থায় পদ্মের বন্ধু কে ছিল? পদ্ম শুকাইয়া গেলে আর তাহারা আসে কি? কেন আসে না? 'হায়, দুঃখের সময়ে' উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে হইবে। মানুষের সুসময় কখন বলা যায়? অসময় কি? ধনীদের অনেক আত্মীয় স্বজন থাকে কিন্তু দরিদ্রের নিকট কেহ যায় না। প্রশ্ন দ্বারা আদায় করিতে হইবে। ভাবার্থ এই:—আমাদের টাকা পয়সা যখন থাকে, তখন অনেক আত্মীয় কুটুম্ব জুটে, আর যখন টাকা পয়সা থাকে না, তখন কেহ আমাদের কাছে আসে না।
ঈশ্বর…যিনি	বিশ্ব=সমস্ত সংসার; মানুষ, গরু, গাছ, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, লইয়া বিশ্ব। যিনি এই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা যাঁহার পূজা করি ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইতে হইবে, তিনিই ঈশ্বর। পতি—স্ত্রীলোকের পতি, গৃহ পতি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা, পতি=কর্ত্তা, আদায় করিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদের সকলের কর্ত্তা, এই বিশ্বের পতি।
সকল…তিনি	ঈশ্বর আমাদিগকে সকল সময় রক্ষা করেন। দরিদ্র অবস্থায়ও অনুগ্রহ করেন। বিপদেয় সময়ও ছাড়িয়া যান না। অতএব তিনি আমাদের সকল সময়ের বন্ধু। প্রকৃত, ইহা প্রকৃত সোণার আংটি ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা প্রকৃত=যথার্থ, ঠিক, বুঝাইতে হইবে। ঈশ্বর কিরূপে আমাদের প্রকৃত বন্ধু? কে প্রকৃত বন্ধু নয়? প্রকৃত-বন্ধু ও অপ্রকৃত বন্ধু বা নকল বন্ধু বুঝাইতে হইবে।
ঈশ্বরই প্রকৃত বন্ধু	বোর্ডে সার—[ভাল অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, মন্দ অবস্থার সময় কেহই কাছে আসে না; কিন্তু ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন। অতএব ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ বন্ধু।]

বিষয়	পদ্ধতি
৪। সমস্বরে পাঠ	বালকগণ আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠটি পড়িবে।
৫। ব্যক্তিগত পাঠ	প্রত্যেক বালক পড়িবে। (আমি মধ্যে মধ্যে আদর্শ দেখাইব, কিন্তু পাঠের সময় বিশেষ বাধা দিব না)
৬। পুনরালোচনা	বোর্ড মুছিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে :— ভ্রমরগুলি কখন পদ্ম বনে আসে? কখন আসে না? মানুষের কোন সময় খুব বন্ধু জুটে? কখন জুটে না? কে আমাদের প্রকৃত বন্ধু? কিরূপে? তাঁহার প্রতি কি করা উচিত? ইত্যাদি।
বোর্ড বিশ্বপতি ঝঙ্কার আশ্চর্য্য গুঞ্জন বন্ধু বঞ্চিত	সার :—জলাশয়ে পদ্মফুল ফুটিয়াছে। ভ্রমরগণ তাহাতে মধুপান করিতেছে। ফুলগুলি শুকাইয়া গেলে ভ্রমর আর আসে না; ভাল অবস্থায় আমাদের অনেক আত্মীয় জুটে, খারাপ অবস্থার সময় কেহই কাছে আসে না। ঈশ্বর সকল সময়েই আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন। অতএব ঈশ্বরই আমাদের যথার্থ বন্ধু।

৩। পদার্থ পরিচয়।—প্রথম দুইটা নোটে যেরূপ ভাবে বিষয় ও পদ্ধতির বিভাগ করা হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে হয়তঃ পাঠকগণ একটু চিন্তান্বিত হইয়াছেন; কোন্‌টাকে বিষয় করিতে হইবে, আর কোন্‌টাই বা পদ্ধতি হইবে, তাহা হয়ত ভালরূপ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক, বিষয় নির্দ্ধারণের যে একটা বিশেষ বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে তাহা নহে; আবশ্যক মত বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। নিম্নে অনুরূপ একটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল। (ওয়াকার কৃত অবজেক্ট লেসনস হইতে।)

মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণী—বিষয় শিশির।

সময়, ৪০ মিনিট।

উপকরণ—জলগরম করিবার পাত্র, আগুণ বা স্পিরিট ল্যাম্প, দেশলাই, জল, ঠাণ্ডা থালা।

বিষয়	পদ্ধতি
১। শিশিরের উৎপত্তি— (ক) যদি একখানি থালায় একটু জল রাখিয়া বাহিরে রাখা যায়—জল ক্রমশঃ উড়িয়া যায়। জল বাষ্পীভূত হইল।	(ক) শীতের প্রাতঃকালে মাঠে বেড়াইবার সময় ঘাস ভিজা দেখিতে পাই। বৃষ্টি না হইলেও ঘাস ভিজিয়া থাকে।
(খ) গরম জলের উপর একখানা ঠাণ্ডা থালা ধর; থালা সরাইয়া পরীক্ষা কর। থালায় হাত দিলেই জল দেখিতে পাইবে।	(খ) পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে।
(গ) একটা গেলাসে খুব ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া সেই গেলাসটী (গরম) রান্না ঘরে আনিলেই দেখিতে পাইবে যে গেলাসের চার পাশে, জলের আবরণ পড়িয়াছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে উষ্ণ বাতাস (বা বাষ্প) কোন শীতল বস্তুর সংস্পর্শে আসিলেই ঘনীভূত হইয়া জলে পরিণত হয়। (১)	(১) সমুদ্র সর্ব্বদা সূর্য্যের উত্তাপ পাইতেছে। সেইজন্য সমুদ্র হইতে সর্ব্বদা বাষ্প উঠিতেছে, এই বিষয় এখন বালকগণকে ২।৪টী প্রশ্ন করিয়াই আদায় করা যাইতে পারে। তারপর বুঝাইতে হইবে. মাটী শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। গরম বাতাস ঠাণ্ডা মাটীতে লাগিয়া ঘনীভূত হয়। এই রূপে শিশিরের উৎপত্তি হয়।
২। শিশির সঞ্চার— নানারূপ প্রাকৃতিক অবস্থার ভেদে শিশির সঞ্চারে তারতম্য ঘটে। প্রধানতঃ (১) স্থান (২) শিশির সঞ্চার হইবার জন্য যে	

বিষয়	পদ্ধতি
জিনিষ বাহিরে রাখা হইয়াছে. সেই জিনিষের শৈত্যের পরিমাণ (৩) বায়ুর অবস্থা।	
পরিষ্কার রজনীতেই উত্তমরূপ শিশির সঞ্চার হয়, কারণ পৃথিবীর তাপ বায়ু পথে শীঘ্রই ঊর্দ্ধে পরিচালিত হয়, মেঘে বাধা পায় না। মাটী খুব শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে (২)।	(২) মেঘলা রাত্রিতে শিশির সঞ্চার হয় না কেন? গাছের নীচে শিশির সঞ্চার হয় না কেন? জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে।
মৃত্তিকা বা প্রস্তর অপেক্ষা বৃক্ষাদিতে অধিক শিশির পাত হয়, কারণ বৃক্ষাদি প্রস্তরাদি অপেক্ষা অল্প সময়ে তাপ বিকীরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ অতি শীঘ্র শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে।	
৩। শিশিরের কার্য্য— পৃথিবীকে শীতল করা ও বৃক্ষাদি উৎপত্তির সহায়তা করা। কতক পরিমাণে বৃষ্টির কাজ করা। (৩)	(৩) তিব্বতে সময় সময় এত শিশির পাত হয় যে, কখন কখন মৃত্তিকা কর্দ্দমে পরিণত হয়।

৪। পাটীগণিত (গুণন)—অঙ্কের নোট প্রস্তুত করিতে হইলে প্রায় সময়ই উদাহরণকে বিষয় ধরিয়া লইতে হয়। নিম্নের নোটে তাহাই দেখান হইয়াছে। অঙ্কের নোটের সূচনায় বালকের পূর্ব্ব জ্ঞানের পুনরালোচনা আবশ্যক। জড়িত প্রশ্ন হইলে, তদ্রূপ সহজ সহজ প্রশ্ন করিয়া বিষয় আরম্ভ করা রীতি। যেরূপ প্রশ্নের উত্তর বালকেরা মুখে মুখেই দিতে পারে, সূচনায় কেবল তাহাই জিজ্ঞাসা করিবে।

শ্রেণী—২য় মান

বিষয় পাটীগণিত—সময় ৪০ মিনিট।

উপকরণ—বালকগণের শ্লেট, পেন্‌সিল; শিক্ষকের বোর্ড ও চক।

পূর্ব্বজ্ঞান—একটী অঙ্কের দ্বারা গুণকরা বালকেরা শিখিয়াছে।

উদ্দেশ্য—দুইটী অঙ্কের দ্বারা গুণশিক্ষা।

উদাহরণ	পদ্ধতি
১। সূচনা— পূর্ব্বজ্ঞানের পুনরালোচনা।	১। বোর্ডে ১১ লেখ। শেষের একের মানে কি? বামে আর একটা এক লেখ। এই একেরই বা মানে কি? ২৬ এর ২এর মানে কি? সেই জন্য ২৬ মানে ২০+৬।
২। দুইটী বা ততোধিক অঙ্কযুক্ত সংখ্যার অর্থঃ— ২৬=২×১০+৬ ৩৬৪=৩×১০০ +৬×১০+৪ কোন রাশিকে ২৬ দ্বারা গুণ করাও যে কথা, সেই রাশির ২০ গুণকে আর ৬ গুণের সঙ্গে যোগ করাও সেই কথা। ২৬ জন বালকের একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে হইবে।	২। যদি শ্রেণীতে ২৬ জন বালক থাকে, আর প্রত্যেকের ৫৭ টা করিয়া মারবেল থাকে, তাহা হইলে সকল ছেলের কতগুলি মারবেল আছে? কেমন করে হিসাব করা যায়? আগে ৬জন বালকের কয়টা মারবেল আছে দেখ, তারপর ২০ জনের কয়টা আছে হিসাব করা যাউক। এখন সকলের কয়টা আছে তা কেমন করে জানা যাবে? তবে ২০ দিয়ে যেমন করে গুণ করা যায় তাই আগে শিখিতে হইবে।
৩। ১০ দিয়া গুণ করিবার সময় সংখ্যার শেষে একটী শূন্য দিলেই হয়।	৩। ১০ দিয়া গুণ করার কাজ যে শূন্য বসাইলে হয় তাহা যোগ করিয়া দেখাও। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দাও।

উদাহরণ	পদ্ধতি
২০ এর দ্বারা গুণ করার সময়, ২ দিয়া গুণ করে তাহার শেষে একটা শূন্য বসাও।	রামের ১০ থলে মারবেল আছে, আর যদুর ২০ থলে আছে। কার বেশী? যদুর মারবেল, রামের মারবেল হইতে কত বেশী। মনে কর প্রত্যেক থলেতে ১৫টা করে মারবেল আছে। রামের কয়টা, যদুর কয়টা? এখন তবে ২০ দিয়ে কেমন করে গুণ করিবে? (প্রথমে ১০ দিয়া, তারপর ২ দিয়া) ১৬৪কে ২০ দিয়া গুণ করিতে হইবে। ১৬৪ × ১০ = ১৬৪০ ১৬৪ × ২০ = ৩২৮০ এইরূপে দেখ। ১৬৪ / ২০ / ৩২৮০ উত্তরটী লক্ষ্য করুক, যদি শেষে শূন্যযুক্ত রাশি দ্বারা গুণ করিতে হয়, তবে উত্তরের শেষেও শূন্য হয়। ৩০, ৪০, প্রভৃতি দ্বারাও গুণ করাইতে হইবে।
৪। এখন দুই অঙ্কের রাশির দ্বারা গুণ — ৫৭ × ২৬	৪। ২৬ জন বালকের ৫৭টা করিয়া মারবেল আছে। ৫৭ × ৬ = ৩৪২ ৫৭ × ২০ = ১১৪০ যোগ করিয়া ৫৭ × ২৬ = ১৪৮২ আবার একটু অঙ্ক সোজা সুজিও কষা যায়— ৫৭ / ২৬ / ৫৭ × ৬ = ৩৪২ / ৫৭ × ২০ = ১১৪০ / ৫৭ × ২৬ = ১৪৮২

৫। পাটীগণিত (ভগ্নাংশ)—আবার অঙ্কের নোট অন্য রকমেও লিখিতে পারা যায়, নিম্নে আদর্শ দেওয়া গেল। এখানে উহারণকে বিষয় ধরা হয় নাই। (জইস কৃত হ্যাণ্ডবুক অব্ স্কুল মেনেজমেণ্ট হইতে)।

বিষয়—ভগ্নাংশের যোগ।

শ্রেণী—পঞ্চম।

সময়—৩০ মিনিট।

উপকরণ—ব্ল্যাক বোর্ড, কয়েক খণ্ড কাগজ, একখান ছুরী বা কাঁচি।

বিষয়	পদ্ধতি
১। যদি ভগ্নাংশের হর সমান থাকে তবে কেবল লব যোগ করিলেই হইবে।	একখানা লম্বা কাগজের ফালী (ফাইল) লইয়া কাটীয়া ৮ সমান ভাগে ভাগ করিব। এইরূপ ২ টুকরা ও তিন টুকরা কাগজ একখানে করিলে ৫ টুকরা হইবে অর্থাৎ— $\frac{২}{৮}+\frac{৩}{৮}=\frac{৫}{৮}$ এইরূপ আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে হইবে।
২। ভিন্ন ভিন্ন হরযুক্ত ভগ্নাংশের যোগ। (১) ভগ্নাংশের লব ও হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে ভগ্নাংশের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।	(১) আর এক খণ্ড কাগজের ফালী লইয়া তিন সমান ভাগে ভাগ করিব। ২ টুকরা কাগজ সমস্তের $\frac{২}{৩}$। আবার এই তিন টুকরা কাগজ কাটিয়া সমান ৬ টুক্রা করিব। আগে যে ২ টুক্রা কাগজ লইয়াছিলাম, এখন সেই দুই টুকরা ৪ টুকরা হইয়াছে। এখন সেই ৪ টুকরা সমস্তের $\frac{৪}{৬}$ কারণ সমস্তকে ৬ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সুতরাং— $\frac{২}{৩}=\frac{৪}{৬}$ $\frac{২}{৩}=\frac{২\times২}{৩\times২}$ এই অঙ্ক বালকগণের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া লইবে।

বিষয়	পদ্ধতি
(২) ভগ্নাংশ গুলিকে সমান হরে আনিয়া তাহাদের যোগ করিলেই যোগ করার কাজ হয়।	(২) উদাহরণ—$\frac{২}{৩}+\frac{১}{৪}$ সাধারণ হর—১২ $\frac{২}{৩}=\frac{৮}{১২}$ $\frac{১}{৪}=\frac{৩}{১২}$ $\therefore \frac{২}{৩}+\frac{১}{৪}=\frac{৮}{১২}+\frac{৩}{১২}=\frac{১১}{১২}$ সমান হর বার বার না লিখিয়া একবার লিখিলেই হয়। যথা— $\frac{২}{৩}+\frac{১}{৪}=\frac{৮+৩}{১২}=\frac{১১}{১২}$

৬। **ইতিহাস।**—যাঁহারা নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই ইতিহাস ভূগোলের উত্তমরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে। কারণ তাঁহারা স্থানগুলির উত্তম বিবরণ প্রদান করিয়া, বালকগণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন। নিম্নের নোট লিখিত ইতিহাসের বিষয় শিক্ষায়, যদি শিক্ষক আগ্রার কেল্লা ও যে ক্ষুদ্র কক্ষে সাহাজানকে বন্দী রাখা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিতে পাবেন, তবে বালকগণের উক্ত বিষয় মনে রাখা বেশ সহজ হইবে। অভাব পক্ষে চিত্রাদি প্রদর্শন করান কর্ত্তব্য। এই নোট দেখিয়া কোন কোন শিক্ষক মনে করিতে পারেন যে, এ সকল কথাত পুস্তকেই আছে, পৃথক্‌ নোটের আবশ্যকতা কি। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে পুস্তক দেখিয়া শিক্ষাদান ও গল্পচ্ছলে শিক্ষাদানে অনেক প্রভেদ, তাঁহারা এ প্রশ্ন করিবেন না। শিক্ষক যাহাতে বালকদের নিকট এই ঘটনার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে পারেন, সেইরূপে তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই নোট তাঁহার স্মরণার্থ লিপি মাত্র। (শিলচর ট্রেনিং ক্লাসের ইন্‌ষ্ট্রাক্টার মৌলবী আজহর আলী লিখিত নোট হইতে)।

মধ্য বাঙ্গালা শ্রেণী

বিষয়—ইতিহাস। সময় ৪০ মিনিট।

(আরঙ্গজেবের সিংহাসন প্রাপ্তি।)

উপকরণ—ভারতবর্ষের মানচিত্র, আগ্রা-দুর্গের চিত্র, আরঙ্গজেবের চিত্র, ব্লাক বোর্ড, চক।

বিষয়	পদ্ধতি
সূচনা, সাজাহানের পুত্রগণের বিবরণ।	দারা জ্যেষ্ঠ, আকবরের মত একেশ্বরবাদীও উদার, কিন্তু উদ্ধত। পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেন। সুজা দ্বিতীয়, মদ্যাশক্ত, কিন্তু বুদ্ধিমান, বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা। আরঙ্গজেব তৃতীয়, চতুর, রণনিপুণ ও মুসলমান ধর্ম্মে গোঁড়া, দক্ষিণাত্যের শাসন কর্ত্তা। মুরাদ কনিষ্ঠ, সাহসী কিন্তু সরল; গুজরাটের শাসন কর্ত্তা। (মানচিত্রে স্থান গুলি দেখাইতে হইবে।)
(১) সাজাহানের পীড়া।	(১) সাজাহানের কঠিন পীড়া দারা গোপন রাখিয়া রাজ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য পুত্রগণ জানিতে পারিয়া প্রত্যেকেই রাজপদ প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। সাজাহানের আরোগ্য লাভ। কিন্তু পুত্রগণের ষড়যন্ত্রের বৃদ্ধি।
(২) পুত্রগণের ষড়যন্ত্র ও পরস্পরের যুদ্ধ।	(২) প্রথমে সুজার সৈন্য অগ্রসর, দারার পুত্র সলিমান কাশীর নিকট যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করে। সুজার মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ। মুরাদ আরঙ্গজেবকে মিলিত হইতে অনুরোধ করেন। আরঙ্গজেব প্রত্যুত্তরে সম্মত, মুরাদকে রাজা দিয়া মক্কায় যাইবেন এইরূপ প্রস্তাব করেন। নর্ম্মদারতীরে দুই ভ্রাতার সৈন্য একত্র (মানচিত্রে দেখ)। যশোবন্ত সিংহ কর্ত্তৃক চালিত দারার সৈন্য পরাজিত। দারার যুদ্ধে আগমন। উজ্জয়িনীর নিকট (মান চিত্রে দেখ) দারা পরাজিত।

বিষয়	পদ্ধতি
(৩) সাহাজান বন্দী, আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ (১৬৫৮)। (১)(২)(৩) লিখিত বিষয় ব্লাকবোর্ডে লিখিতে হইবে। পাঠের শেষে এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়াই পুনরালোচনা করিতে হইবে।	(৩) আরঙ্গজেব ও মুরাদের আগ্রা প্রবেশ। উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে মুরাদ আহত ও পীড়িত। দারার লাহোরে পলায়ন। আরঙ্গজেব কর্তৃক আগ্রা দুর্গে সাজাহান বন্দী। আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ। ১৬৫৮ খৃঃ অঃ।

৭। ভূগোল।—নিম্নে ভূগোলের নোট লিখিবার একটা আদর্শ প্রদত্ত হইল। কিন্তু এই আদর্শ দেখিয়া কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, সমস্ত দেশের বিবরণই বুঝি এইরূপে লিখিতে বা শিখাইতে হইবে। আবশ্যক বোধে নোট বড়, ছোট বা খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। ভারতবর্ষ শিক্ষা দিতে হইলে, নদী, সাগর, পর্ব্বত প্রভৃতি পৃথক পৃথক করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বঙ্গদেশের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ভাগীরথী এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূগোল শিক্ষায় কেবল ব্রহ্মপুত্রের বিষয়ই একদিন শিক্ষা দিতে হইবে। তবে যত অনাবশ্যকীয় বিষয় হইবে বা যত নিসংসৃষ্ট দেশ হইবে ততই শিক্ষণীয় বিষয় কমাইতে হইবে। নিম্নের নোট বিলাতের কোন ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রের লেখা। নোটের শেষে শিক্ষকের সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা পাঠে, 'নোট সমালোচনা' প্রণালীও শিক্ষা হইবে। টৈইলার কৃত হাউ টু প্রিপেয়ার নোটস্ অব লেসনস্ হইতে) :—

নব জিল্যাণ্ড।

সময় ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য—নব জিল্যাণ্ড যে উপনিবেশের পক্ষে উপযোগী, তাই দেখান।

উপকরণ—গোলক, ভূমণ্ডলের মানচিত্র, ব্লাক বোর্ড, চক।

বিষয়	পদ্ধতি
১। সূচনা—দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের অসুবিধা দেখিয়া অনেক লোক বিশেষতঃ কৃষকাদি নব জিল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের বাসের পক্ষে নব জিল্যাণ্ড উপযোগী কিনা?	বালকেরা এ বিষয়ের কিছু জানে বলিয়া বিশ্বাস, সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা স্বাভাবিক।
২। উপনিবেশে যাহা থাকা আবশ্যক :— (১) জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; ইংলণ্ড হইতে শীতে অধিকতর উষ্ণ; শস্য উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট বৃষ্টি; অনাবৃষ্টি নাই।	২। উপনিবেশের স্থান নির্ণয় করিতে হইলে বালকেরা কি কি চায়, তাহার প্রশ্ন করিতে হইবে। তারপর উপনিবেশে কি কি আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।
(২) খাদ্য—শস্য, শাক সবজী, ফল। পশু—গরু, মেষ, শূকর ইত্যাদি, এবং মৎস্য।	দেশ স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই ইত্যাদি। বালকগণের চিন্তাকে বিষয়ের সূচী অনুসারে চালিত করিতে হইবে।
(৩) ব্যবসায়, ভূমি উর্ব্বরা। কয়লা, লোহা, জল, কাষ্ঠ, উত্তম পথ, উত্তম রেল রাস্তা (সম্ভব পর হইলে) নগর ও বন্দর, যেখানে উদ্বৃত্ত দ্রব্য পাঠান যাইতে পারে ও যেখান হইতে অন্য জিনিস পাওয়া যাইতে পারে।	ব্লাকবোর্ডে সংক্ষিপ্ত সার লিখিতে হইবে।
(৪) অধিবাসী—ইংরেজ বা বৃটনবাসী, অসভ্য জাতি নাই।	

বিষয়	পদ্ধতি
৩। স্থানের উপযোগিতা বিষয়ক ভৌগোলিক বিবরণ।	
(১) আকারাদি—তিনটী দ্বীপ, উত্তর, দক্ষিণ এবং ষ্টুয়ার্ট; কয়েকটী মিলিয়া প্রায় বৃটন দ্বীপত্রয়ের সমান।	ব্লাকবোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করিতে হইবে।
(২) অবস্থান ও তাহার ফলাফল—ইংলণ্ডের বিপরীত দিকে, বিষুব রেখার নিকট। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে। ইংলণ্ড হইতে শীত কম, গ্রীষ্ম অধিক, বৃষ্টিও অধিক।	ইংলণ্ড হইতে নবজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত জাহাজে যাইবার পথ দেখাইতে হইবে—মানচিত্রে ও গোলকে। শীত গ্রীষ্মাদির তারতম্য কেন, তাহা বালকগণের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।
(৩) ভূভাগ, মৃত্তিকা ও ফসল। উত্তর দ্বীপে অনেক পর্ব্বত আছে। উর্ব্বরা উপত্যকা আছে; অনেক খরস্রোতা নদী উপত্যকা দিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে একটা পর্ব্বত শ্রেণী নাম আলপস্। পশ্চিমে ও পূর্ব্বে প্রশস্ত উর্ব্বরা সমতল ভূমি আছে। অনেক নদী আছে, পূর্ব্বের নদীগুলি বড়।	ব্লাকবোর্ডের মানচিত্রে পর্ব্বতগুলি চিহ্নিত করিতে হইবে। দেশের বর্ণনা করিতে হইবে। যাহা যাহা আবশ্যক তাহা এই দেশে আছে, ইহা বালকগণকে প্রশ্ন করিয়া আদায় করিতে হইবে।
জলকষ্ট নাই, উত্তম মৎস্যের অভাব নাই। উত্তরের পথগুলি ভাল নয়, দক্ষিণের ভাল।	
(৪) উৎপন্ন দ্রব্য—বিলাতী শাক সবজী ও পশ্বাদি। মেষ ও গম যথেষ্ট। যথেষ্ট কয়লা। ইহা ছাড়া লোহা, তামা ও সোণা।	নব জিলাণ্ড হইতে এদেশে কি কি আমদানী হয়।
(৫) সহর ও বন্দর—ওয়েলিংটন, অকলাণ্ড, ডিউন ডিন, ক্রাইষ্টচার্চ্চ।	মানচিত্রে স্থান সমূহ চিহ্নিত করিতে হইবে।
(৬) লোকসংখ্যা—১০জন উরোপবাসী ও ১জন মেওয়ারী এই অনুপাত; মোটসংখ্যা ৫০০,০০০।	পুনরালোচনা ও পরীক্ষা।

সমালোচনা—ভূগোলের নোট লিখিতে শিক্ষকেরা সাধারণতঃ যে পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক ভালই করিয়াছেন। প্রথমে অবস্থান, চতুঃসীমা, আকার, ভূভাগ প্রভৃতির বর্ণনা করা যে শিক্ষকগণের একটা বাঁধা নিয়ম আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, বেশ মনোরম ও কাজের কথা দিয়া পাঠনা আরম্ভ করা হইয়াছে। বিষয়ের দ্বিতীয় শীর্ষের কথাগুলি ভাল হয় নাই "কি কি অবস্থা দেখিয়া উপনিবেশের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়" এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। যেখানে ভালপথ ঘাট, কি রেল রাস্তা আছে, তাহা দেখিয়াই যে উপনিবেশের স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, এ শিক্ষা ইংরাজ বালককে দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। আর এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়াও আমরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাই নাই। তৃতীয় শীর্ষের অন্তর্গত বিষয়গুলির সুন্দর নির্ব্বাচন হইয়াছে। বহুনাম ও বহুসংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক কেবল ইংরাজদিগের বাসের পক্ষে নবজিল্যাণ্ড কি পরিমাণ উপযোগী এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা যাহা আবশ্যক তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। পদ্ধতির অন্তর্গত নোটগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, তন্মধ্যে কতকগুলি বেশ হইয়াছে আর কতকগুলি লেখার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, মনে হয় যেন কেবল শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্যই শিক্ষক সেগুলি লিখিয়া রাখিয়াছেন। (শিক্ষকের দস্তখত ও তারিখ)

৮। বিজ্ঞান।—নিম্নে বিজ্ঞানের নোট লিখিবার ধারা প্রদত্ত হইল। পদার্থপরিচয়ের অনেক বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া, উক্ত বিষয়ক নোট প্রস্তুত করিতেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। (গারলিক ও ডেকসটারকৃত অবজেক্ট লেসনস হইতে):—

বায়ুর চাপ।

উপকরণ—একটা গেলাস, শক্ত কাগজ, বোতলেরমত মুখ বিশিষ্ট টিনের পাত্র (তার তলায় আবার ঝাঁঝরার মত ছিদ্রকরা) কাচের ফ্লাস্ক, খুব পাতলা কাগজ, তুলা, স্পিরিট ল্যাম্প, চীনে মাটীর বোতল, একটু বেশী সিদ্ধ করা ডিমের শ্বেত খণ্ড (ডিমখণ্ড চীনে মাটীর বোতলের মুখের চেয়ে একটু বড়):—

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	পরীক্ষণের ফল	সিদ্ধান্ত
(১) (ক) একটা গেলাস জলে পূর্ণ কর, তার উপর শক্ত কাগজ খানি দিয়া ঢাকিয়া দাও, সাবধানে গেলাসটী উল্টাইয়া ফেল।	কাগজ পড়িয়া যাইবে না, জলও পড়িবে না।	বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে চাপ প্রদান করে।
(খ) ছিদ্র যুক্ত টিনের পাত্রটী জলে ডুবাইয়া পূর্ণ কর, পাত্রের মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিয়া উঠাও।	তলার ছিদ্র দিয়া জল পড়িবে না।	
(২) টিনের বোতলের মুখ থেকে আঙ্গুল সরাও।	জল পড়িতে আরম্ভ করিবে।	বায়ু নীচের দিকে চাপ প্রদান করে।
(৩) (ক) পাতলা কাগজ খানি ফ্লাস্কের মুখে বাঁধিয়া গরম কর।	কাগজ উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিবে।	খালি ফ্লাস্কে তাপ দিলে, অভ্যন্তরের কতক বায়ু বাহির হইয়া যায়।
(খ) চীনে মাটীর বোতলের মুখে ডিম খণ্ড রাখ।	ডিম বোতলের মধ্যে পড়িবে না।	
(গ) ডিম সরাইয়া রাখ; কাগজ জ্বালাইয়া বোতলের ভিতর ফেলিয়া দাও, আবার ডিম বোতলের মুখে রাখ।	এবারে বোতলে ডিম ঢুকিয়া পড়িবে।	বাহিরের বাতাস বোতলে প্রবেশ করিতে গিয়া, ডিম খণ্ডকে বোতলের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে।
(ঘ) আবার ঐ চীনে মাটীর বোতলে কাগজ জ্বালাইয়া ফেলিয়া দাও, একটী বালককে এখন বোতলের উপর হাত রাখিতে বল।	বালকের বোধ হইবে যেন তাহার হাত বোতলের ভিতর ঢুকিতে চাহিতেছে।	বায়ু নীচের দিকে চাপ প্রদান করে।
(৪) আবার (৩) এর (গ) পরীক্ষা কর, বোতলটী এবার কাত করিয়া রাখ।	ডিম খণ্ড এবারেও বোতলের ভিতর প্রবেশ করিবে।	বায়ু পার্শ্বেও চাপ প্রদান করে।

পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ	পরীক্ষণের ফল	সিদ্ধান্ত
(৫) পূর্ব্বে যে জলের চাপের পরীক্ষা করিয়াছ তাহার উল্লেখ কর।	বায়ু ও জল দুইই ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও পার্শ্বে চাপ প্রদান করে।	জলের মত বায়ুও সকল দিকে চাপ প্রদান করে।

ব্লাক্ বোর্ডে

বায়ু ঊর্দ্ধ দিকে চাপ প্রদান করে
,, নিম্ন দিকে ,, ,,
,, পার্শ্বে ,, ,,
} যেমন জল করিয়া থাকে

বায়ু (জলের মত) সকল দিকেই চাপ প্রদান করে।

৯। **শিক্ষক ছাত্রের কথোপকথন।**—কথোপকথনচ্ছলে কথন কোন বিষয়ের পদ্ধতি লিখিতে হইলে নিম্নের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। (মিসিস্ ব্রাণ্ডাস্ কৃত কিণ্ডার গার্টেন টিচিং ইন ইণ্ডিয়া হইতে):—

প্রাথমিক শ্রেণী।

বিষয়—মাকড়সা।

সময়——৩০ মিনিট।

উপকরণ—ব্লাক বোর্ড, মাকড়সা ও তাহার জালের চিত্র।

সম্ভবপর হইলে একটা জীবন্ত মাকড়সা।

শিক্ষক—মহম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে কেমন করিয়া শত্রুদের হাত থেকে পলাইয়া গেলেন, তাহা সেদিন তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা কোথায় গিয়া লুকাইয়া ছিলেন?

ছাত্র—তাঁহারা একটা গহ্বরে লুকাইয়া ছিলেন ?

শি—শত্রুগণ সেই গহ্বরের ভিতর অনুসন্ধান করিলনা কেন ?

ছা—শত্রুরা দেখিল যে গহ্বরের মুখেই একটা মাকড়সা জাল পাতিয়া আছে, আর নিকটেই একটা ঘুঘু—তার বাসায় বসিয়া আছে ; এই সকল দেখিয়া তাহারা মনে করিল এইখানে নিশ্চয়ই লোক নাই।

শি—আচ্ছা, আজ তোমাদিগকে এই মাকড়সার কথাই বলি। এই মাকড়সাটা দেখ—বোর্ডে মাকড়সার ছবিও দেখ, মাকড়সার কি কি দেখিতেছ বল।

৯৪ চিত্র।—মাকড়সার জাল।

ছা—এটা একটা ছোট প্রাণী ; ইহার শরীরটার দুই ভাগ, মাথা আর ধড়। এক এক দিকে ৪ খান করিয়া, ৮ খান পা আছে। দুইটা হুল আছে, আর বড় বড় দুইটা চক্ষু আছে।

শি—হাঁ—সবই ঠিক হইয়াছে কেবল হুল ও চোখের কথা ছাড়া। যে দুটাকে হুল মনে করিয়াছ, সে গুলি খুব শক্ত ছোট ছোট নখের মত, আর যেটাকে একটা চোখ মনে করিয়াছ, তাহা একটা চোখ নয়, ৬টা কি ৮টা। যদি এক দিকেই ৬টা চোখ থাকে, তবে দুই দিকে কটা ?

ছা—দুই দিকে তবে ১২টা চোখ, কি আশ্চর্য্য!

শি—আবার কোন কোন মাকড়সার ১৬টা চোখও থাকে। এত গুলি পা ও চোখ দিয়া মাকড়সা কি করে?—মাকড়সা কি খায় জান?

ছা—মাকড়সা কীট পতঙ্গ খায়।

শি—হাঁ। কেমন করে কীট পতঙ্গ ধরে?

ছা—জাল দিয়া ধরে।

শি—মাকড়সা কেমন করে জাল বোনে জান? জান না? তবে শোন। এটা খুব একটা চমৎকার কথা। আচ্ছা গোপাল, মাকড়সার ধড়টা আমায় দেখিয়ে দাওত। এই ধড়ের নীচে চারটা ছোট ছোট নল আছে, আর প্রত্যেক নলের নীচে প্রায় ১০০০ ছোট ছোট ছিদ্র আছে। মাকড়সা, আমাদের মুখের লালার মত এক রকম রসের দ্বারা সূতা তৈয়ার করিয়া এই সকল ছিদ্র দিয়া বাহির করে। সেই সূতা বাতাস লাগিবা মাত্র শুকাইয়া শক্ত হয়। মাকড়সার পিছনের পা দুখানির অগ্রভাগ চিরুণির মত। এই দুই পা দিয়া সেই সব সূতা গুলি একত্র করিয়া ও পাকাইয়া মোটা সূতা তৈয়ারী করে। সেই সূতা দিয়া জাল বোনে। তোমরাও ত মাকড়সার জাল দেখেছ? সূতাগুলি বেশ সরু না মোটা?

ছা—খুব সরু, ভাল রেশমের মত।

শি—সরু বটে কিন্তু সেই এক গাছির মধ্যে আবার কত গাছি আরও সরু সূতা আছে। আচ্ছা সেই একটা নলের ভিতর কতগুলি ছিদ্র আছে?

ছা—এক হাজার ছিদ্র।

শি—কয়টা নল আছে বলত?

ছা—৪টা নল।

শি—আচ্ছা যদি প্রত্যেক ছিদ্র দিয়াই এক এক গাছ সূতা বাহির হয়, তবে সর্ব্ব সমেত কত গাছি সূতা হয়?

ছা—চার হাজার সূতা। কি ভয়ানক!

শি—তাই এখন দেখ জালের এক এক গাছি সূতা, ৪০০০ গাছি সরু সূতা পাকাইয়া প্রস্তুত করিয়াছে। কেমন কারিকর দেখ। জেলের জালের চেয়েও কত বেশী কারিকরী। বোর্ডে চিত্র আছে, তাহা দেখিয়া মাকড়সার জালটার একটা বর্ণনা কর।

ছা।—গাড়ীর চাকীর শলাকার মত, মাঝ খান থেকে কতকগুলি সূতা জালের বাহিরের দিকে গিয়াছে, সেগুলি আবার অন্য সূতার সঙ্গে নানা স্থানে বাঁধা, এই শলাকা গুলির উপর দিয়াই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সূতা বাঁধিয়া গিয়াছে।

শি।—যখন ফড়িং উড়িয়া যাইতে যাইতে এই জালে বাঁধিয়া পড়ে, তখন মাকড়সা কি করে?

ছা।—মাকড়সা দৌড়িয়া গিয়া পোকাটাকে ধরে।

শি।—এখন বুঝিতে পারিতেছ যে মাকড়সার ৮খানি পা, আর ১২টী চক্ষুর দরকার কি? চারি দিকে চোখ রাখিতে হয়, পোকা ফড়িং পড়িলেই দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে হয়, তা না হইলে তাহারা পলাইয়া যাইবে বা জাল ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।

১০। সংক্ষিপ্ত কথোপকথন।—এই কথোপকথনের পদ্ধতি উক্তরূপ না লিখিয়া সংক্ষেপেও নিম্নলিখিত রূপে লেখা যাইতে পারে। (মিসিস্ মরটিমার কৃত নোটস অব লেসনস্ ফর ইনফ্যান্টস হইতে):—

বিষয়—বিড়াল।

শ্রেণী—(৫।৬ বৎসরের) শিশু।

উপকরণ—একটা পোষা বিড়াল।

১। সাধারণ বর্ণনা—বালকেরা বিড়ালের হাত, ধড়, মাথা প্রভৃতি দেখাইবে ও কোন্‌টা কেমন তাহা বলিবে। মাথাটা গোল, চোখ দুটী বড়, শরীরটা লম্বা, গায়ের লোম বেশ নরম ও ঘন। বিড়ালের চারখানা পা। তোমাদের কয়খানা? বিড়ালের পায়ের নীচে কি আছে? (থাবা) আচ্ছা এখন এই থাবা দেখ। থাবাতে কি কি দেখিতে পাচ্ছ? (ছোট ছোট কটা রঙের নরম গদি) ঐই জন্যই বিড়াল চলিয়া গেলে শব্দ হয় না, ঘরে ঢুকিলে টের পাওয়া যায় না? জুতা পায়ে দিয়া হাঁটিলে টের পাওয়া যায় না? আচ্ছা আবার বিড়ালের নখ দেখ কেমন ধারাল? এই নখ দিয়া কি করে? (আঁচড়ায়) আচ্ছা তোমার গায়ে বিড়ালের পা লাগিলেই কি আঁচড় লাগে? (না) কেন লাগেনা? জাননা তবে বলি শুন। বিড়াল নখগুলি তার

পায়ের গদির নীচে লুকাইয়া রাখে যখন ইচ্ছা হয় তখন বাহির করে। যদি বিড়ালকে উৎপাত কর, কি মার তাহা হইলে সে তোমাকে আঁচড়াইবার জন্য নখগুলি বাহির করিবে।

২। **বিড়ালের চলাফেরা ও খাদ্যাখাদ্য** ঃ—আবার না রাগলেও বিড়াল তার নখগুলি বাহির করিয়া থাকে। কখন বলতে পার? (কোন জিনিষ ধরবার জন্য) হাঁ তার খাবার জিনিষ ধরবার জন্য। আচ্ছা বিড়াল কি খায়? কোন্ সময় বিড়াল তোমার কাছে না ডাকতেই আসে? (খাবার সময়) তোমাদের কার কার বাড়ীতে বিড়াল আছে? আচ্ছা লোকে বিড়াল রাখে কেন? (ইঁদুর ধরার জন্য) আচ্ছা বিড়াল ইঁদুর ধরে খেলে তোমার মা খুসী হন কেন? (ইঁদুর আমাদের খাবার জিনিষ নিয়ে যায়) আবার তোমার মা কখন কখন বিড়ালের উপর রাগ করেন কেন? কখন রাগ করেন? (যখন আমাদের থালা থেকে মাছ চুরি করে নেয় (শিক্ষক এখানে বিড়ালের পাখী ধরে খাওয়ার গল্প করিতে পারেন; খাঁচা ভেঙ্গে যে পোষা পাখীও ধরিয়া খায় এরূপ একটা ঘটনা বিবৃত করিবেন) আচ্ছা তাহইলে বিড়ালকে আমরা কি করি? কিন্তু সব সময়ই কি তাকে মারা উচিত? বিড়াল যখন রাগ করে, তখন তাহার লেজটা দেখেছ? বিড়াল কেমন করে ডাকে? (দুই রকমে ডাকে, মিউ মিউ করে আর পরর্ পরর্ করে) হাঁ যখন তার মন খুসী হয় তখন পরর্ পরর্ করে। মিউ মিউ করে কখন? (যখন সে মার খায় বা কোন জিনিষ চায়) বিড়ালের বাচ্চা দেখেছ? তারা কি খায়? (মার দুধ) বিড়ালী বাচ্চাকে দুধ দেয়, আর কি করে? (আর গা পুঁছে দেয়) কি দিয়ে? (তার জিভ দিয়ে) বিড়ালের জিভ বড় খস্ খসে। তোমার কেমন, হাত দিয়ে দেখত? (বেশ নরম)। বিড়াল তার বাচ্চাগুলি নিয়ে কেমন খেলা করে দেখেছ? সে সময় বিড়ালীকে উৎপাত করিতে নাই।

৩। **সংক্ষিপ্তসার**—বালকগণ সমস্বরে আবৃত্তি করিবে ঃ—(১) বিড়ালের মাথা গোল। (২) বিড়ালের চোখদুটী বড় বড়। (৩) বিড়ালের গার লোম বেশ নরম আর গরম। (৪) বিড়াল খুসী থাকিলে পরর্ পরর্ করে, আর যখন কিছু চায় তখন মিউ মিউ করে।

৪। তারপর (সুবিধা হইলে বালকগণকে সিংহ ও ব্যাঘ্রের ছবি দেখাইয়া) এই বিড়াল কাদের মাসী পিসী জান? (না।) বিড়াল এই বাঘের মাসী, আর সিংহের পিসী।

মন্তব্য।—৫।৬ বৎসরের বালকগণের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বিড়ালের অন্যান্য বিবরণ উপর শ্রেণীতে শিক্ষা করিবে। নোট লিখিবার সময় যেন বালকগণের বয়সের দিকে দৃষ্টি থাকে।

১৫ চিত্র।—সিংহ।

১৬ চিত্র।—ব্যাঘ্র।
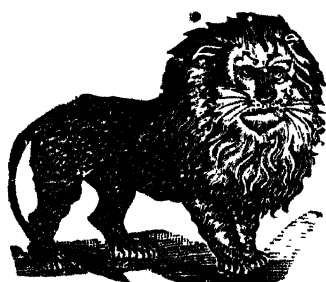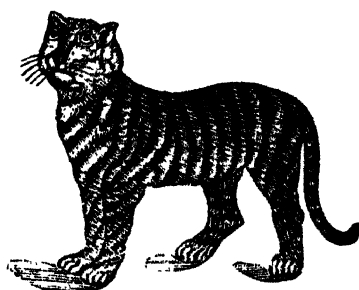
যে দিন বিশেষ কোন বিষয় লেখাইয়া দিতে হইবে সেই দিন সেই বিষয়ই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে, যথা রাজগণের বংশাবলীর তালিকা, আকবরের রাজত্ব-চিহ্নিত-মানচিত্র, আবৃত্তির জন্য কোন নূতন কবিতা ইত্যাদি। যে দিন সাপ্তাহিক বা অন্যবিধ পরীক্ষা, সেইদিন সেই পরীক্ষার প্রশ্নই নোটের খাতায় লিখিয়া আনিতে হইবে। নোটের খাতা যেন শিক্ষকের দৈনিক কার্য্যের রোজ নামচা।

২। পাঠনা-সমালোচনা পদ্ধতি।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা শিক্ষকের কার্য্য পরিচালনার্থ একটী সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিলাম। ইনস্পেক্টার প্রভৃতি পরিদর্শকগণ এই সকল বিষয় দৃষ্টেই শিক্ষকের উপযুক্ততা বিচার করিয়া থাকেন। নর্ম্মাল ও ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে পরস্পরের পাঠনা সমালোচনা করিয়া থাকে। যখন একজন পাঠদানে নিযুক্ত হয় তখন অন্যান্য সকল ছাত্র তাহার প্রণালীর দোষগুণ (এই প্রণালীক্রমে) সংক্ষিপ্ত নোটের আকারে লিখিয়া রাখে। পরে শিক্ষার্থী শিশুগণ চলিয়া গেলে নিজ নিজ নোট দেখিয়া শিক্ষকের নির্দ্দেশক্রমে, দোষগুণের বিচার করিয়া থাকে।

সমালোচনা বলিলে আমরা সাধারণতঃ দোষ প্রদর্শনই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সে ভুল বিশ্বাস। সমালোচনায় দোষগুণ দুইই লক্ষ্য করিতে হইবে। অখ্যাতির অপেক্ষা সুখ্যাতির ভাগই অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমালোচনায় দোষ প্রদর্শন করিতে হইলে, সেই দোষের হেতু ও সেই দোষ সংশোধনের উপায়ও সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

পরীক্ষকগণ, শিক্ষানবীশ শিক্ষককে শিক্ষাদানের পূর্ব্বে অধ্যাপনার বিষয়, শিক্ষার্থী ছাত্রগণের বয়স, শ্রেণী বা অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাদানের সময় বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন। শিক্ষককে নির্দ্ধারিত বিষয়ে নূতন পাঠনার নোট প্রস্তুত করিয়া বা পূর্ব্বকৃত নোটের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়মধ্যে শ্রেণীস্থ বালকগণের বয়স ও পূর্ব্বজ্ঞান বিবেচনায় নির্দ্ধারিত বিষয়টী তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণা শক্তির আয়ত্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইল কি না ও বালকগণ সেই শিক্ষায় লাভবান্ হইয়া আনন্দানুভব করিল কিনা, পরিদর্শক, পরীক্ষক ও সমালোচকগণ ইহাই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষকগণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

১। শিক্ষক বিষয়ক—

* (ক) স্বর—উচ্চ, মৃদু, কর্কশ, শ্রুতিমধুর, ধীর, দ্রুত।

শিক্ষকের স্বরের বিষয়ে এইগুলি লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। সমালোচনা কালে স্বর কিরূপ তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে। শ্রুতিমধুর স্বরই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল তাহা বলা বাহুল্য। মানুষের স্বাভাবিক স্বর কর্কশ নয়। যাহারা সদা কুচিন্তান্বিত হইয়া নিরানন্দ থাকে, তাহাদের স্বরই কর্কশ হইয়া থাকে। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির স্বর মধুর। আমরা যে স্বরে সাধারণতঃ কথা বলি, তাহাই শিক্ষাদানের পক্ষে উত্তম স্বর।

(খ) ভাষা অনর্গল (বাধ বাধ না হওয়া) বিশুদ্ধ (ব্যাকরণগত দোষ না থাকে) বিশদ (বুঝিতে কষ্ট না হওয়া) সুস্পষ্ট (উচ্চারণে জড়তা না থাকে) শ্রেণীর উপযোগী (কঠিন ভাষা না হওয়া)।

সমালোচকগণ অশুদ্ধ ভাষা ও অশুদ্ধ উচ্চারণের নোট রাখিবেন যথা 'মেঘের' স্থানে 'ম্যাঘ' —উচ্চারণের দোষ; 'তাঁহার কাছে শুনিয়াছি,' স্থানে 'তিনির কাছে শুনিয়াছি'—অশুদ্ধ ভাষা।

(গ) ভাব—কঠোর, প্রীতিপদ, উৎসাহবর্দ্ধক, নৈরাশ্য প্রণোদক।

প্রীতিপদ ও উৎসাহবর্দ্ধক ভাবেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কটমট দৃষ্টি ও নেত্রসঞ্চালন, কঠোর ভাবের পরিচায়ক। 'তোমার কিছু হবে না, তুমি ঘাস কাট গিয়ে'—নৈরাশ্য প্রণোদক।

* (ঘ) অবস্থান—দণ্ডায়মান স্থান হইতে সমস্ত ছাত্র শাসন যোগ্য কি না। ভঙ্গী, গতিবিধি, মুদ্রাদোষ, পরিচ্ছদ।

যে ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়, কোন কোন শিক্ষকের অভ্যাস, তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়ান। এ সময়ে অন্য ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। কথা বলার সময় একটু হাত মুখের ভঙ্গি আবশ্যক। ইহাতে ভাব প্রকাশের অনেক সহায়তা করে। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও ভাল নয় বা ভল্লুকের মত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করাও ভাল নয়। জিভ বাহির করা, চোক মিটমিট করা, গোঁপ দাড়ি কামড়ান, অঙ্গুল মটকান, গায়ের ময়লা তোলা, পা নাচান আস্তিন টানা প্রভৃতি মুদ্রাদোষ। আবার কেহ কেহ এক কথা বড় বেশী ব্যবহার করেন যথা:—"আমি নাকি একবার নাকি যখন নাকি কাশী গেলেম নাকি সেখানে নাকি বড় গরম নাকি তাই নাকি আমার নাকি কলেরা হ'ল নাকি" এও মুদ্রাদোষ। পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। সাধারণ পোষাক মলিন না হইলেই সুরুচিসঙ্গত। অবস্থার অধিক ব্যবস্থা, কুরুচির পরিচায়ক। যাহার সোণার বোতাম ব্যবহার করিবার মত অবস্থা, তাহার পক্ষে সোণার বোতাম ব্যবহার দূষণীয় নহে। কিন্তু গরিবের পক্ষে সোণার গিলটি করা বোতাম ব্যবহার করা কুরুচির পরিচায়ক।

* (ঙ) পূর্ব্বাভ্যাস—অধ্যাপনায় শিক্ষকের পূর্ব্বাভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায় কি না?

যে শিক্ষক বাড়ী হইতে পাঠনার নোট লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া আসেন, তাঁহার প্রশ্ন করিতে, কি পড়াইতে বাধ বাধ হয় না, আর তাঁহার পাঠনায় চিন্তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

২। শ্রেণীবিষয়ক—

(চ) স্থাপনা—বালকগণ উপযুক্ত স্থানে শৃঙ্খলামত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-বেশে ও সুন্দররূপ উপবেশন করিয়া বা দণ্ডায়মান হইয়া আছে কি না?

ইচ্ছামত কেহ বসিয়া আছে বা কেহ দাড়াইয়া আছে, এক বেঞ্চে ঘেষ ঘেষি করিয়া অনেক বালক বসিয়াছে, অন্য বেঞ্চ খালি; কেহ বেঞ্চে পা তুলিয়া, কেহ অপরের গায়ে

হেলিয়া বসিয়াছে; কেহ ত্রিভঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি বিশৃঙ্খল ভাব সম্বন্ধে শিক্ষককে সাবধান হইতে হইবে। চাদরে বা জামায় গা ঢাকিয়া সমান দূরে দূরে বসিলে বা দাঁড়াইলে বেশ সুন্দর দেখায়।

(ছ) দ্রব্যাদি—বালকগণের পুস্তক, খাতা, পেন, পেনসিল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত আছে কি না; আর সে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না?

কোন জিনিষ না থাকিলেই নিজ শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণাতে যাইতে হয়। ইহাতে কেবল যে কাজের বিশৃঙ্খলা হয় তাহা নহে, বালকগণেরও উদাসীনতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বালকেরা যাহাতে আবশ্যকীয় জিনিষ আনিতে না ভুলে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খাতা কিম্বা পুস্তকের মলাট ও শ্লেট যেন অপরিষ্কার না থাকে।

(জ) শাসন—বালকগণ সমস্ত ত্রুটী বিষয়ে শিক্ষক কর্তৃক শাসিত হইয়াছে কি না?

(চ) ও (ছ) লিখিত ত্রুটি ছাড়া, দুষ্টামী, অন্যমনস্কতা প্রভৃতি আরও অনেক ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রুটী দেখিলেই শাসন করিতে হইবে। চক্ষু চালনা দ্বারা যে শাসন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। একবার দুষ্ট ছেলেটীর দিকে কটমট করিয়া চাহিলেই সে সাবধান হইবে। পাঠনার সময় অন্যরূপ শাসন করিতে হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে, বালকগণের মনোযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে।

(ঝ) শিক্ষা—শিক্ষায় বালকগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছে কি না?

বালকগণের মুখ দেখিয়া ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠে সুখবোধ না করিলে বালকেরা অমনোযোগিতা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে।

* (ঞ) ব্যবহার—বালকগণের বিনয়, ভদ্রতা, আজ্ঞা-প্রতিপালন, মনোযোগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিবে।

নূতন শিক্ষক দেখিলে দুষ্ট বালকেরা কিছু উৎপাত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিক্ষক যদি শ্রেণীতে উপস্থিত হওয়া মাত্রই পড়াইতে আরম্ভ করেন, আর সমস্ত ছাত্রকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখেন, তবে গোলমালের বা অমনোযোগের সম্ভাবনা কম। শিক্ষক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে, বালকেরা দাঁড়ায় কি না, শিক্ষকের আজ্ঞা মাত্র পুস্তক, শ্লেট, খাতা, পেনসিল প্রভৃতি লয় কি না, ইত্যাদি বিষয়ও সমালোচকগণ দেখিয়া থাকেন।

(ট) স্বাধীন ভাব—বালকগণ স্বাধীন ও নির্ভীক ভাবে এবং সুস্পষ্ট রূপে প্রশ্নাদির উত্তর দিয়াছে কি না ?

স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ অন্য বালকের সাহায্য লইতে চেষ্টা করিয়াছে কি না। অনেক সময় ফিস্ ফিস্ করিয়া এক বালক অন্য বালককে সাহায্য করে। দূর হইতে শিক্ষক শুনিতে পান না। আর যে সকল বিষয়ের একটা কথা বলিয়া দিলেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারা যায়, সেখানে অন্যকে সাহায্য করা সহজ। শিক্ষক খুব কড়া শাসনে এই দুর্নীতি পরিত্যাগ করাইবেন। নির্ভীক ভাবে অর্থাৎ আন্দাজী উত্তর দিতে হইলে তেমন সাহস থাকে না। সুস্পষ্টরূপে—মনে সন্দেহ থাকিলে কথাগুলি পরিষ্কাররূপে বাহির হয় না।

(ঠ) পূর্ব্বজ্ঞান—বিষয় সম্বন্ধে বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞান ছিল কি না ?

যে ৪র্থ প্রতিজ্ঞা জানে না, এরূপ ছেলে ৫ম প্রতিজ্ঞা বুঝিবে না। বালক হয়ত মূলের বিষয়ই জানে না, শিক্ষক তাহাকে মিশ্রবর্ণ শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং পূর্ব্বজ্ঞানের পরিচয় আবশ্যক। সুচতুর শিক্ষকেরা প্রথমেই ২।৪ টা প্রশ্ন করিয়া বালকগণের পূর্ব্বজ্ঞানের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন।

* (ড) বুদ্ধি চালনা—বালকগণ স্মরণশক্তি, তুলনাশক্তি, সিদ্ধান্তবৃত্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, কল্পনাশক্তি প্রভৃতি মানসিকবৃত্তির পরিচালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল কি না ?

স্মরণশক্তি—প্রশ্ন করিয়া একটু সময় না দিলে, বালকগণ স্মরণশক্তির ব্যবহার করিতে পারে না। তুমি-তুমি-তুমি করিয়া গেলে স্মরণ করিবার অবসর পায় না।

তুলনা শক্তি—বিড়াল ও কুকুর বা তাহাদের চিত্র প্রদর্শন করাইয়া জিজ্ঞাসা কর, বিড়ালের মুখের সঙ্গে কুকুরের মুখের তুলনা কর ; বালকগণ নিজে দেখিয়া বুঝিবে "বিড়ালের মুখ গোল কুকুরের লম্বা ইত্যাদি ; ভারতবর্ষের মানচিত্র ও ইংলণ্ডের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাও, দুইটাই ত্রিভুজের মত, তারপর জিজ্ঞাসা কর এই দুই ত্রিভুজে পার্থক্য কি, বালকেরা নিজে তুলনা করিয়া উত্তর দিবে "ভারতবর্ষের ত্রিভুজের ভূমি উপরে ইংলণ্ডের ভূমি নীচে"। বালকগণের নিকট এইরূপে আদায় করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত বৃত্তি—আমি যে লোহা আনিয়াছি ইহা আগুনে পোড়াইলে লাল হইল, তুমি যে লোহা আনিয়াছ তাহাও লাল হইল, যদু যেটা আনিয়াছে তাহাও তদ্রূপ হইবে, এখন কি সিদ্ধান্ত করিতে পারি ? বালক উত্তর দিবে, সব লোহা পোড়াইলেই লাল হয়।

উদ্ভাবনীশক্তি—আগুনের তাপে ঘটীর জল বাষ্প হইয়া যাইতেছে। এই বাষ্পই মেঘ হইতেছে। প্রতিদিন এরূপ অনেক মেঘ হইতেছে। সমুদ্র ও নদী থেকেও এইরূপ বাষ্প উঠিয়া থাকে—কোন্ তাপে এইরূপ বাষ্প হয়?—বালকেরা চিন্তা করিয়া বলিতে পারিবে, 'সূর্য্যের তাপে'। অঙ্কে ও জ্যামিতিতে এই শক্তির চালনা হয়।

কল্পনাশক্তি—পাহাড় পর্ব্বত, নদী, হাট, বাজার, নগর প্রভৃতি বর্ণনা করিতে বলিলেই এই শক্তির অনুশীলন হয়। শিক্ষক কর্ত্তৃক অজ্ঞাত বিষয়দির বর্ণনা শ্রবণ করিলেও বালকের এই বৃত্তির অনুশীলন হইয়া থাকে।

* (চ) নবজ্ঞান—বালকেরা কি পরিমাণ নবজ্ঞান লাভ করিল?

পূর্ব্বে যাহা জানিত তাহারই পুনরালোচনা করা হইল, না তাহারা কিছু নূতন শিখিল। যদি নূতন না শিখিয়া থাকে, তবে কেবল বৃথা সময় নষ্ট হইল। প্রত্যেক দিন বালকেরা যাহাতে কিছু নূতন বিষয় শিখিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ণ) ত্রুটি—কোন বালকের চক্ষুর জ্যোতি বা শ্রবণ শক্তির হ্রাসতা কি উচ্চারণের জড়তা কি সাধারণ বুদ্ধি বৃত্তির স্বল্পতা লক্ষ্য করা হইয়াছে কিনা ও তাহার কি প্রতিবিধান করা হইয়াছে।

যে বালকের চক্ষুর জ্যোতির হ্রাসতা আছে তাহাকে বোর্ডের নিকটে; যাহার শ্রবণ শক্তির হ্রাসতা আছে, তাহাকে শিক্ষকের নিকট বসাইতে হইবে। উচ্চারণের জড়তা থাকিলে, তাহার দ্বারা কঠিন শব্দের অংশগুলি পৃথক করিয়া উচ্চারণ করাইয়া লইবে। বুদ্ধির স্বল্পতা থাকিলে, তাহার প্রতি একটু বেশী মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। অধ্যাপনা বিষয়ক—

(ত) পরিমাণ—নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমাণের অধিক কি অল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন শিক্ষক, পরীক্ষক বা পরিদর্শকের নিকট নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়া, বালকগণকে পরিমাণের অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে পরিদর্শক বে-হিসাবী মনে করেন, পরীক্ষক কম নম্বর দেন।

(থ) নূতন শিক্ষা—পূর্ব্ব শিক্ষার সহিত যোগ করিয়া নূতন শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে কিনা?

কোন কোন সময়ে পূর্ব্বদিনের শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বিষয় আরম্ভ করিতে হয়। ইতিহাস শিক্ষায় এই প্রথা অনুসরণ করা আবশ্যক। অঙ্ক জ্যামিতিতেও ইহার আবশ্যকতা আছে। সাহিত্যের কোন গল্পের এক অংশ পড়া হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ পড়াইবার সময় পূর্ব্বদিনের পাঠের স্থূল বিষয়ের পুনরালোচনা করা প্রয়োজন।

(দ) উপক্রমণিকা—শিক্ষাদানের উপক্রমণিকা উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কিনা?

অধ্যাপনার বিষয়ে বালকের মন আকর্ষণ করাই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য। স্বল্প কথায় সুন্দররূপে উপক্রমণিকা বিবৃত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে নানারূপ দৃষ্টান্ত পাঠনার নোট পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে।

(ধ) বিভাগ—বিষয়টী শৃঙ্খলামত বিশেষ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে কিনা।

পদার্থপরিচয় ও জ্যামিতি শিক্ষায় শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন। ইতিহাস ভূগোলেও অনেক সময় শৃঙ্খলার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

* (ন) প্রণালী—যে প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইয়াছে, তাহা ফলপ্রদ হইয়াছে কিনা?

বালকেরা যদি মনোযোগের সহিত শুনিয়া থাকে, তবে ফলপ্রদ হইবারই সম্ভাবনা। তারপর শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে বালক যাহা বলে, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়, বালক কিছু শিখিয়াছে কিনা?

* (প) উপকরণ—শিক্ষাদানের জন্য যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা প্রচুর কিনা ও তাহার সৎ ব্যবহার হইয়াছে কিনা?

চক্ষুর সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করা যায় তাহাই যখন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তখন চক্ষুর সাহায্যার্থে যত উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় ততই ভাল। আবার সে গুলির সৎ ব্যবহার আবশ্যক। দেয়ালে মানচিত্র ঝুলাইয়া রাখিলে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে বালকের নিকট কেবল ভূগোলের পাঠ মুখস্থ লইয়াই পড়া শেষ করিলে, তাহা হইলে মানচিত্র ব্যবহার হইল কৈ?

* (ফ) ব্লাকবোর্ড—ব্লাক বোর্ডের উপযুক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে কিনা, অঙ্কিত চিত্রগুলি উত্তম ও উপযুক্ত হইয়াছে কিনা।

প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষায় যথেষ্টরূপ ব্লাক বোর্ডের ব্যবহার করিতে হইবে। কঠিন শব্দ, সংক্ষিপ্ত নিয়ম, মানচিত্র প্রভৃতি ব্লাকবোর্ডে লিখিয়া দিবে। চিত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন অংশ

দেখাইবে। আর চিত্রাদির রেখা একটু মোটা করিয়া দিবে। দূরের বালকগণের দেখিবার অসুবিধা হইবে না।

* (ব) পদ্ধতি—পরিচিত বস্তুর সাহায্যে অপরিচিত, জ্ঞাত পদার্থের সাহায্যে অজ্ঞাত, প্রত্যক্ষ বিষয়ের সাহায্যে অনুমেয়, বর্ত্তমানের সাহায্যে ভূত ভবিষ্যত শিক্ষা দিবার যে প্রণালী তাহা অবলম্বিত হইয়াছে কিনা।

চিল বা বাজের সাহায্যে, অপরিচিত ঈগল পাখীর বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারা যায়। পর্ব্বতের উচ্চতা, নদীর দৈর্ঘ্য প্রভৃতি কেবল সংখ্যার দ্বারা উল্লেখ করিলে, সেই উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য বিষয়ে বালকগণের কোন জ্ঞান জন্মে না। এইজন্য নিকটস্থ কোন বৃক্ষের উচ্চতা মাপের দ্বারা ঠিক করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন স্থানের উচ্চতা বুঝাইতে হইলে, উক্ত বৃক্ষের সহিত তুলনায় বুঝাইয়া দিলে বালকগণের একটা ধারণা জন্মিতে পারে। সেইরূপ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধেও কোন পরিচিত রাস্তার পরিমাণ জানা থাকিলে, তাহার সাহায্যে নদী প্রভৃতির দৈর্ঘ্য বিষয়ক জ্ঞান দান করা সহজ হইতে পারে। একটা বাতি ও বলের সাহায্যে দিবা,রাত্রির কারণ বুঝাইয়া দিলে পৃথিবী ও সূর্য্যের সম্পর্কে কিরূপে দিবারাত্রির সংঘটন হয়, তাহা অনুমান করা সহজ হইতে পারে। কেহ কেহ ইতিহাস শিক্ষায়,প্রথমে বর্ত্তমান কালের বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, তাহার সহিত অতীত ঘটনাবলীর সংসৃষ্ট বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

৪। প্রশ্ন বিষয়ক—

* (ভ) সরলতা—প্রশ্নগুলি সরল, শুদ্ধ ও উদ্দেশ্য প্রতিপাদক হইয়াছে কিনা।

অতি অল্প কথায়, সহজ ভাষায়, প্রশ্ন রচনা করিতে হইবে। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার যেন কোন উদ্দেশ্য থাকে, আর প্রশ্নের রচনা এরূপ কৌশল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যে, প্রশ্নের দ্বারা যেন সেই উদ্দেশ্য সাধন হয়; অর্থাৎ বালকের নিকট হইতে যাহা আদায় করিবে মনে করিয়াছ, ঠিক তাহাই যেন আদায় হয়। সে প্রশ্নের যেন, সে উত্তর ছাড়া অন্য উত্তর না হয়।

* (ম) প্রশ্নোত্তর—(১) শিক্ষক কোন প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছেন কিনা?

(২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর পাইয়া তিনি কিরূপে সম্পূর্ণ শুদ্ধ উত্তর আদায় করিয়াছেন।

(৩) অশুদ্ধ উত্তর শ্রবণে তিনি কি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ?

(৪) নির্ব্বোধের ন্যায় উত্তর দিলে তিনি তাহার কি প্রতিকার করিয়াছেন।

(১) কোন প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। বালক প্রশ্ন বুঝিতে পারে নাই, কি শিক্ষকের কথায় মনোযোগ করে নাই, কি সে প্রশ্নের যে উত্তর, তাহা সে জানে না—এই সকল কারণের প্রতিকার করা আবশ্যক। (২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর পাইলে অপর অংশের জন্য ভিন্ন প্রশ্ন করিয়া, সে অংশের শুদ্ধ উত্তর আদায় করিতে চেষ্টা করিবে। (৩) শুদ্ধ উত্তর পাইলে বালককে উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বা, বেশ, ঠিক কথা প্রভৃতি উৎসাহ সূচক বাক্যের ব্যবহার প্রয়োজন। (৪) নির্ব্বোধের মত উত্তর দিলে তাহারও কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(খ) শৃঙ্খলা—প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলা পূর্ব্বক করা হইয়াছে কিনা ?

শিক্ষাদানের নিমিত্ত যে সকল প্রশ্ন করা হয়, তাহার শৃঙ্খলা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর একত্র করিলে যদি বিষয়টা ধারাবাহিকরূপে বুঝিতে পারা যায়, তবে প্রশ্নগুলি সুশৃঙ্খল বলা যাইতে পারে। পরীক্ষার নিমিত্ত প্রশ্নে শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ কোনরূপ দৃষ্টি রাখা হয় না।

(র) প্রশ্ন সংখ্যা—শিক্ষক অত্যধিক কি অত্যল্প প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

দুইই দোষের। তবে অত্যল্প অপেক্ষা অত্যধিক অধিকতর দোষের। বালকগণের বয়স, অভিজ্ঞতা ও সময়ের পরিমাণ দৃষ্টে প্রশ্নের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

* (ল) পুনরালোচনা—পুনরালোচনার জন্য যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার দ্বারা বালকের নবোপার্জ্জিত জ্ঞানের উত্তমরূপ পরীক্ষা হইয়াছে কিনা ?

বালকেরা যে শব্দ, অর্থ, সূত্র, সংজ্ঞা প্রভৃতি (সম্পূর্ণ নূতন) শিক্ষা করিল, সেগুলি তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে কি না, তাহাই বুঝিবার জন্য পাঠের শেষে পুনরালোচনার্থ প্রশ্ন করা হয়। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পাঠনার নোট পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৫। বিষয়গত ভুল—

অজ্ঞতা—কোন্ কোন্ স্থানে শিক্ষক নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

আকবরের রাজত্ব কাল শিক্ষা দিতে যদি শিক্ষক মানচিত্রের দ্বারা আকবরের রাজত্বের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে না পারেন, ৫ম প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে যদি তিনি ৪র্থ প্রতিজ্ঞা প্রয়োগ করিতে না পারেন, তবে তিনি অজ্ঞতার পরিচয় দেন।

* (শ) কোন্ কোন্ স্থানে শিক্ষক ভুল শিক্ষা দিয়াছেন।

লালে ও নীলে মিশাইলে সবুজ হয়, কলিকাতা ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে, শ্রীরামপুরী কাগজের ২৪খানে এক দিস্তা হয় প্রভৃতি ভুল শিক্ষা।

সমালোচকগণ এইরূপে সমালোচনা করিয়া, উপসংহারে একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৬। উপসংহারে সংক্ষেপ মন্তব্যের এই রীতি—

(ষ) পাঠদান উত্তম হইলে—উত্তম, উৎকৃষ্ট, বা সুন্দর।

(স) মধ্যম হইলে—মধ্যম, সাধারণ বা মন্দ নয়।

(হ) অধম হইলে—অধম, নিকৃষ্ট বা ভাল নয় বলিয়া সমালোচনা করিতে হয়।

দ্রষ্টব্য।—প্রত্যেক সমালোচনায় * চিহ্নিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে হইবে। যে সকল সাধারণ গুণ প্রায় শিক্ষকেই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কোন কোন গুণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ যোগ্য না থাকিলে (সমালোচনা সংক্ষেপ করিবার জন্য) কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও চলিবে। কেবল মৌখিক শিক্ষাদান সমালোচনা করিবার জন্যই এ পদ্ধতি নির্দ্দেশ করা হইল, অন্যরূপ শিক্ষাদান কালে এই পদ্ধতির অবস্থানুরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে একবার সমালোচনা অভ্যাস হইয়া গেলে, আর নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির আবশ্যক থাকিবে না। তখন সমালোচকগণ নিজেরাই সমালোচনায় নানাবিধ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে পারিবেন।

৩। পরীক্ষা পদ্ধতি।

পরীক্ষার আবশ্যকতা।—যে শিক্ষক সমস্ত বৎসর বালককে পড়াইয়াছেন তিনি বিনা পরীক্ষায়ও বালকের গুণাগুণের সাক্ষ্য দিতে পারেন। কিন্তু যদি গুণের একটা সূক্ষ্মসীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে (যেমন সাহিত্যে ৩৩/১০০, অঙ্কে ৩৩/১০০ ইতিহাসে ২৫/১০০ উত্তীর্ণ হইবার শেষ সীমা) তবে পরীক্ষা না করিয়া গুণাগুণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ প্রথম হইতেই অতি সাবধানে পাঠাভ্যাস করে। পরীক্ষার সময় কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করে। কিন্তু ইহার আবার দোষ আছে। পরীক্ষা আছে বলিয়া বালকগণ অনেক সময় সমস্ত পাঠ্য না পড়িয়া, কেবল যে সকল স্থান হইতে প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনা, তাহাই পাঠ করে। তারপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায়, নানারূপ অসৎ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য প্রলোভিত হয়।

পরীক্ষার প্রকার।—মৌখিক, লিখিত এবং মৌখিক ও লিখিত একত্রে। লিখিত পরীক্ষায়, বালকগণ চিন্তা করিয়া উত্তর দিবার সময় পায় বটে, কিন্তু আবার উত্তমরূপ রচনা শক্তি না থাকিলে, উত্তর লিখিয়া উঠিতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষায়, রচনার তেমন আবশ্যকতা হয় না বটে, কিন্তু আবার চিন্তা করিবার সময় পাওয়া যায় না। এইজন্য কতক লিখিত ও কতক মৌখিক যে রীতি, তাহাই অনেকে উত্তম বলিয়া মনে করেন।

পরীক্ষার প্রশ্ন।—অধিকাংশ বালক যেরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সেইরূপ প্রশ্ন দেওয়াই কর্ত্তব্য। বালক যাহা জানে, তাহাই পরীক্ষা করা প্রশ্নের উদ্দেশ্য; যাহা জানে না তাহা পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য নহে। অনেক পরীক্ষক কঠিন প্রশ্ন দিয়া বাহাদুরী লইতে চান, কিন্তু

ইহাতে নিন্দা বই সুখ্যাতি হয় না। তারপর প্রশ্নগুলি দিয়া, নিজে একবার তাহার উত্তর লিখিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে প্রশ্ন সংখ্যা অধিক হইল কিনা, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ৩ ঘণ্টার প্রশ্ন করিতে হইলে, ২ ঘণ্টায় যে পরিমাণ লিখিতে পারা যায়, তাহারই প্রশ্ন করিতে হইবে। অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় চিন্তা ও পুনরালোচনার জন্য বাদ রাখা উচিত। পরীক্ষার্থীগণের মধ্যে, প্রতিভাসম্পন্ন বালক নির্দ্ধারণের জন্য, একটী মাত্র কঠিন প্রশ্ন দেওয়া যাইতে পারে। পরীক্ষক তাঁহার প্রশ্নের যে পরিমাণ উত্তর আশা করেন, তাহা বালকেরা প্রশ্নের পার্শ্বস্থ মূল্য দেখিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে: সুতরাং যে প্রশ্ন যে পরিমাণে কঠিন বা তাহার উত্তর লিখিতে যে পরিমাণ সময় লাগিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নের মূল্য লিখিয়া দিবেন। প্রশ্নের অন্যান্য যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তাহা ১২০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

প্রশ্নের উত্তর।—প্রশ্নের উত্তর যথাযথ হওয়া আবশ্যক। উত্তরের পরিমাণ প্রশ্নের মূল্য দৃষ্টে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। "আকবরের বিষয় লিখ"—এ প্রশ্নের মূল্য যদি ১ হয়,*—তবে আকবরের বিষয় ৪।৫ লাইনে লিখিতে হইবে। কিন্তু যদি ১০ নম্বর থাকে, তবে ৪ × ১০ = ৪০ লাইন কি ৫০ লাইন লিখিতে পার। সাধারণতঃ ১ নম্বরের জন্য ৩।৪ লাইন পরিমিত লিখিলেই হইবে। তবে যদি এরূপ প্রশ্ন হয় যে "পলাশীর যুদ্ধের তারিখ লিখ"—আর প্রশ্নের নম্বর থাকে ১, তখন অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে "১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল" ভিন্ন আর ৩.৪ লাইন লিখিবার কিছুই নাই।

[পরীক্ষা কাগজের ২. আঙ্গুল পাশ রাখিলেই চলিবে। যত কম কাগজ ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। পরীক্ষায় যখন কাগজ ওজন

* ইতিহাসের প্রশ্ন—৩ ঘণ্টার জন্য—পূর্ণ মূল্য ৬০—ছাত্রবৃত্তি বা এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায়।

করিয়া নম্বর দেওয়া হয় না, তখন কম কাগজে উত্তর দিলেই পরীক্ষকের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। লেখা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর (প্রশ্নের নম্বর দিয়া) পৃথক পৃথক করিয়া লিখিতে হইবে। উত্তরের কোন অংশ ভুল হইলে, কেবল মাত্র একটী টান দিয়া কাটিয়া দিবে। লেখার লাইনের মধ্যে মাত্র এক আঙ্গুল পরিমিত স্থান থাকা আবশ্যক। যদি কোন কথা বা অংশ কোন স্থানে যোগ করিতে হয়, তবে সেই স্থানে একটা ক্যারেট ($\wedge$) চিহ্ন দিয়া উপরের ফাঁকে, সেই কথা বা অংশ যোগ করিয়া দিতে পারা যায়।]

উত্তরের কাগজ পরীক্ষা।—সাপ্তাহিক পরীক্ষায় কাগজ পরীক্ষা করিয়া বালকগণকে ফেরৎ দিতে হয়। উত্তরে যত প্রকার অশুদ্ধ থাকে সমস্তই শুদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত নহে। বর্ণ বিন্যাস ভুল করিলে, সেই শব্দের নীচে দুইটী টান দিয়া রাখিবে, বালকগণ নিজে ভুল শুদ্ধ করিবে। ব্যাকরণ দুষ্ট * পদের নীচে একটী টান দিয়া রাখিবে। কোন স্থানে হঠাৎ কথা ফেলিয়া গেলে সেই স্থানে একটা ক্যারেট ($\wedge$) চিহ্ন দিয়া রাখিবে। বালকগণ সেই শব্দ নিজেই পূরণ করিবে। এক শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্বন্ধ ঠিক না থাকিলে, উভয় শব্দের নীচে × চিহ্ন দিয়া রাখিবে, বালকগণ তাহা নিজেই শুদ্ধ করিবে। অসম্বন্ধ বর্ণনা করিলে বা অসম্বন্ধ শব্দ লিখিলে সেখানে একটা (?) প্রশ্ন বোধক চিহ্ন দিবে। নির্ব্বোধের মত কোন উত্তর লিখিলে তাহার উপর আশ্চর্য্য বোধক চিহ্ন (!) দিবে। যে ভুল বালক শুদ্ধ করিতে পারিবে না মনে হয় কেবল সেই ভুল কাটিয়া শুদ্ধ করিয়া দিবে। যেখানে বালকের বাক্য বা বাক্যাংশ

---

* অধীনস্থ, অনাটন, আবশ্যকীয়, আয়ত্তাধীন, একত্রিত, ত্রৈবার্ষিক, ভ্রাতাগণ, বিধায়, নিন্দুক, নির্দ্দোষী, নিরপরাধী, রাজাগণ, মহারাজা, সাব্যস্ত সাবকাশ, সাহায্যাকৃত, সম্রাজ্ঞী, মহারাজ্ঞী, দিবারাত্রি, সক্ষম প্রভৃতি কথা ব্যাকরণ দুষ্ট হইলেও ভাষায় বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং এরূপ শব্দ না কাটিলেও চলে।

অপেক্ষা, উত্তম বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োগ বিধেয় মনে কর সেই খানে সেই উত্তম বাক্যাদি বালকের বাক্যের উপর লিখিয়া দিবে। লাল কালির দ্বারা ভুল সংশোধন করিবে। নিম্নে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

?

"দশরথ অযোধ্যা মহাদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রধানা মহীষি কৌশল্যার গর্ভে রাম, সুমিত্রার ^ লক্ষণ এবং কৈকেয়ীর

!!! জন্ম গ্রহণ করেন

গর্ভে ভরত ও শত্রুঘ্ন জন্ম লয়েন। দশরথ বার্দ্ধক্যতা দশায় উপনীত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকেই তিনি রাজপদে অবিষিক্ত করিতে অভিলাষ

×

করিল।"

×

বালকেরা যে সকল প্রশ্নের উত্তর করে নাই, তাহার উত্তর প্রত্যেক কাগজে লিখিয়া দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য যে দিন পরীক্ষার কাগজ ফিরাইয়া দিতে হয়, সেইদিন শ্রেণীতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতে হইবে। যাহারা যে প্রশ্নের উত্তর লেখে নাই তাহারা তখন লিখিয়া লইবে বা সম্পূর্ণ লিখিয়া লইতে না পারিলে একটু একটু টোকা (নোট) করিয়া লইবে। পরে বাড়ীতে গিয়া পূর্ণ উত্তর লিখিবে। বালক লিখিল কিনা তাহার দিকে যেন দৃষ্টি থাকে। কোন কোন স্কুলে প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার জন্য, বালকেরা এক এক খানি খাতা বাঁধিয়া রাখে। যেমন সাহিত্যের খাতা—অর্থাৎ বৎসরে সাহিত্য বিষয়ে যত পরীক্ষা হইবে, সে সমস্তই এই সাহিত্যের খাতায় লিখিত হইবে। পৃথক পৃথক আলগা কাগজে সাপ্তাহিক পরীক্ষার উত্তর লেখা সুবিধাজনক নহে। অনেকেই এইরূপ খাতার ব্যবস্থা পছন্দ করেন।

প্রশ্নোত্তরের মূল্য।—সুন্দর রচনা করার ক্ষমতা, একটা বিশেষ শক্তি। যেমন সকলে কবিতা লিখিতে পারে না, তেমনি সকলে

সুন্দর রচনা করিতে পারে না। মূল্য দিবার সময় এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। আবার যে শ্রেণীর বালকের নিকট যেরূপ রচনা আশা করা যাইতে পারে, তাহাই দেখিয়া মূল্য দিতে হইবে। সাপ্তাহিক পরীক্ষার মূল্য ও বাৎসরিক পরীক্ষার মূল্য সম্বন্ধে একটু পার্থক্য রাখা আবশ্যক। সাপ্তাহিক পরীক্ষার যেমন প্রত্যেক প্রশ্নোত্তরে অতি সূক্ষ্ম হিসাবে মূল্য দেওয়া হয়, বাৎসরিক পরীক্ষায় তাহার একটু ব্যতিক্রম করা আবশ্যক। এমন হয় যে একটী বালক কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ও কতকগুলি শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় আন্দাজে লিখিয়া, এক আধ নম্বর জুটাইতে জুটাইতে কোন রকমে ৩৩ পাইয়া পাশের নম্বর রাখিল। কিন্তু তাহার রচনাংশ হয়ত শ্রেণীর উপযোগী নয়। আবার একটী বালকের রচনাংশ উত্তম বটে, কিন্তু অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না বলিয়া ৩০ নম্বর পাইয়া "ফেল" হইল। এরূপ অবস্থায় উভয়কেই সমান নম্বর দেওয়া উচিত, অথবা যাহার রচনা প্রণালী ভাল তাহাকে কিছু বেশী নম্বর দেওয়াও মন্দ নহে। আবার প্রশ্নের ৩টী অঙ্ক মাত্র কসিয়া একজন ৩ × ১০ = ৩০ নম্বর পাইয়া পাশ করিল; আবার এক জনে ৪টী অঙ্ক কসিয়াছে বটে, কিন্তু উত্তরের কাছে আসিয়া ২টী অঙ্কে একটু একটু ভুল করিয়া ২ × ১০ = ২০ নম্বর পাইয়া ফেল করিল। এ ফেলের কোন অর্থ নাই। হঠাৎ ঌ লিখিতে ঌ লিখিয়াছে বলিয়া অঙ্ক ভুল করিয়াছে। একটী অঙ্ক শুদ্ধ করিলেই যখন ১০ নম্বর পায় তখন ঐরূপ অঙ্কের কাগজ পরীক্ষার সময় বিবেচনা করা আবশ্যক। এইজন্য বৎসরিক পরীক্ষার সময়, সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর গুলির হিসাব করা উত্তম প্রথা।

পরীক্ষার আধিক্য।—পরীক্ষার আধিক্য, ভালও বটে আবার মন্দও বটে। ঘন ঘন পরীক্ষা হয় বলিয়া বালকেরা যদি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হয়, আর যদি শিক্ষক কাগজাদি পরীক্ষা করিতে শৈথিল্য করেন, তবে পরীক্ষায় সুফল না হইয়া বরং কুফলই হইয়া থাকে। সময় সময় বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বহুবিধ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া

আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। শিক্ষকেরা মনে করেন যে সময়ের স্বল্পতা ও বিষয়ের আধিক্য হেতু সে আদেশ পালন করা কঠিন। কিন্তু সে বিশ্বাস ভুল। পরীক্ষা বলিলেই যে ৩ঘণ্টার প্রশ্ন বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। কতকগুলি প্রশ্ন মুখে মুখে জিজ্ঞাসা কর, একটী দুইটী প্রশ্নের উত্তর (যেমন রচনা, ড্রইং, অঙ্ক) লিখিতে দাও। এক ঘণ্টা কি অর্দ্ধ ঘণ্টাতেই সমস্ত পরীক্ষা শেষ হইতে পারে। বালকগণকে প্রস্তুত করাইতে হইবে, পরীক্ষার এই উদ্দেশ্য ঠিক রাখিবে। কিন্তু লিখিত পরীক্ষার যে সমস্ত কাগজ তোমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা যাহাতে রীতিমত পরীক্ষা করিয়া সময়মত ফিরাইয়া দিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। তাহা না করিলে বালকগণের পরীক্ষার প্রতি ভয় ভক্তি কমিয়া যাইবে।
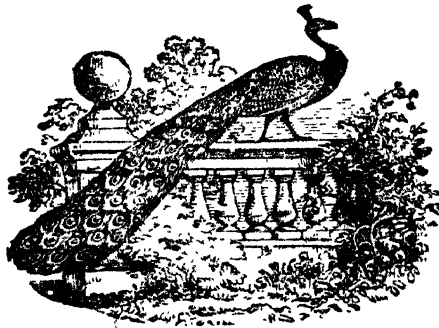
উপসংহার।

পুস্তক শেষ হইল বটে কিন্তু সমস্ত কথা বলা হইল না। বলিতে গেলে যে কেবল পুস্তক বাড়িয়া যায় তাহা নহে, তাহাতে কিছু অপকারও হইতে পারে। সমস্ত কথা পুস্তকে পাইলে, শিক্ষকগণ আর তাঁহাদিগের স্বাধীন চিন্তা শক্তি পরিচালনা করিয়া নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিবেন না। এই শ্রেণীর পুস্তকের উদ্দেশ্যই কেবল শিক্ষককে পথে তুলিয়া দেওয়া মাত্র; তারপর গন্তব্যপথ, গন্তব্যযান ও গন্তব্য স্থান তিনি নিজে ঠিক করিয়া লইবেন।

আর এক কথা—পুস্তকে নানারূপ পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, সকল পদ্ধতি সকলের ভাল লাগিবে না। যিনি যে পদ্ধতিতে কাজ করিয়া সুবিধা বোধ করেন, তিনি সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিবেন। আবার তাই বলিয়া কোন পদ্ধতি বিশেষের দাস হওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। যেমন করিয়া হউক বালককে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। এখন যে পদ্ধতি (লাঠী মারা বাদে) অনুসরণ করিলে সেই ফল লাভ হয়, তাহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। আরও এক কথা, যে যে বিষয়ের শিক্ষাদান সম্বন্ধে এই পুস্তকে উপদেশ প্রদত্ত হইল, শিক্ষকের যদি সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান না

থাকে, তবে তাঁহার পক্ষে কেবল পদ্ধতির পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকতা করিতে চেষ্টা করা বৃথা। এই পুস্তকে শিক্ষাদানের প্রকরণটী মাত্র দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—বিষয়ের জন্য সেই সেই বিষয়ক পুস্তক পাঠ করিয়া উত্তমরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে।

তারপর আরও একটা বিশেষ কথা এই যে প্রকৃত শিক্ষক হইতে হইলে ছাত্র হইতে হইবে; আত্ম শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষ হয় না। চিরজীবনই শিক্ষার সময়। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর হইতেই আত্মশিক্ষার কাল উপস্থিত হয়।

আত্মশিক্ষার বহু উপায় আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি সাধারণ—(১) উত্তম গ্রন্থাদি অধ্যয়ন (২) পাঠ, কথকতা, বক্তৃতাদি শ্রবণ (৩) উন্নত ব্যক্তিদের সহিত আলাপ (৪) দেশ ভ্রমণ; (৫) পর্য্যবেক্ষণ।

আর আত্মশিক্ষা বিশেষ আবশ্যকও বটে, কারণ (/০) বিদ্যালয়ে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষাকরা অসম্ভব, (৵০) যাহা কিছু শিক্ষা করা হইয়াছে সে গুলিকে সতেজ রাখিবার জন্য আলোচনা আবশ্যক। (৶০) চারিদিকের কঠোর প্রতিযোগীতার সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বদা নিজকে নবনব জ্ঞানে উন্নত রাখা আবশ্যক (।০) আত্মোন্নতি পদোন্নতি, ভবিষ্যৎ উন্নতি সমস্তই এই আত্মশিক্ষার উপর নির্ভর।

আত্মশিক্ষার যে সমস্ত উপায় উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তম পুস্তক পাঠই সহজ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু বিশৃঙ্খলভাবে কতকগুলি বাজে পুস্তক পাঠ করিলে, বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না। আত্মশিক্ষার জন্য (ক) নিজের রুচিকর উত্তম পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে। জীবন চরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস, পুরাণ, প্রাণী বৃত্তান্ত, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি উত্তম বিষয়।

(খ) পুস্তক পাঠ করিয়া কি নূতন জ্ঞান লাভ হইল তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

(গ) কোন একটী উদ্দেশ্য স্থির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করা উচিত। কেবল সময় কাটাইবার জন্য পড়ায় কোন ফল নাই।

(ঘ) যে বিষয় শিক্ষা করিলে অবস্থার উন্নতি বা মনের উন্নতি সাধন হইতে পারে, এইরূপ একটী কি দুইটী বিষয় নির্ণয় করিয়া, তাহার অনুশীলন করিতে হইবে।

(ঙ) সম্ভবপর হইলে আরও একটী কি দুইটী ভাষা শিক্ষা করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদিগের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক। ইহার উপর সংস্কৃত কি আরবীয় আলোচনা করিতে পারিলে আরও উত্তম।

(চ) সম্ভবপর হইলে নিজের একটা ক্ষুদ্র পুস্তকাগার করা আবশ্যক। আজকাল বঙ্গবাসী, বসুমতী ও হিতবাদীর অনুগ্রহে পুস্তকের দাম খুব কমিয়া গিয়াছে।

(ছ) পৃথিবীর কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে, কি কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে ইত্যাদি বিষয়ে আপনাকে অভিজ্ঞ রাখিবার জন্য অন্ততঃ পক্ষে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

শেষকথা—উন্নতির মূলমন্ত্রের সাধনা ব্যতিরেকে কখনই কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। শিক্ষক নিজে সেই মন্ত্রের সাধক হইবেন, আর শিষ্য-গণকেও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন। সে মন্ত্র কি?—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।

ইতি তারিখ ২১শে চৈত্র, ১৩১৫।

পরিশিষ্ট।

পালিশ (Polish)।—বেঞ্চ, ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি ব্যবহারে ময়লা হইয়া উঠিলে, প্রথমে সোডা মিশ্রিত গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। ধুইবার সময় নারিকেলের ছোবড়া কাটিয়া লইয়া তাহা দ্বারা ঘসিলে ময়লা ও কালির দাগ অনেক পরিমাণে উঠিয়া যাইবে। পরে শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘসিয়া আর একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। তারপর তাহাতে তুলি বা ছেঁড়া কাপড়ের দ্বারা পালিশ লাগাইতে হইবে।

পালিশ প্রস্তুত করিবার প্রণালী—সাধারণ স্পিরিটের (সুরাসার) মধ্যে কয়েকখণ্ড চাচ (গয়নার ভিতর যে লাক্ষা ভরিয়া দেয়) ফেলিয়া রাখ, চাচ স্পিরিটে গলিয়া যাইবে। যদি ঘন বোধ হয় তবে একটু স্পিরিট দিয়া পাতলা করিতে হইবে। রসগোল্লার পাতলা রসের মত ঘন হইলেই কার্য্যের উপযুক্ত হইবে। যদি একটু লাল্‌চে রঙ পছন্দ কর তবে ইহার সঙ্গে একটু পুনথারাপি (এক রকম লাল রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এইরূপ রঙ সেগুন কাঠের পালিশে প্রায়ই মিশাইয়া থাকে। হলুদ রঙ (কাঁঠালের কাঠের মত) করিতে হইলে একটু পেউড়ী (এক প্রকার হলুদ রঙের গুঁড়া) মিশাইয়া লইবে। এইরূপ পালিশ একবার কি দুইবার লাগাইলেই হইবে।

বার্ণিশ (Varnish)।—যদি পালিশ করিয়া তাহাকে আবার চক্‌চকে করিতে ইচ্ছা হয়, তবে বার্ণিশ লাগাইতে হইবে। অল্প বার্ণিশ প্রস্তুত করিয়া লওয়া অপেক্ষা কেনাই সুবিধা বলিয়া বার্ণিস প্রস্তুতের কথা লিখিত হইল না। সাধারণতঃ এই সকল কার্য্যের পক্ষে কোপ্যাল বার্ণিশই উত্তম। এক সেরের দাম ১৷৹।

ব্ল্যাক বোর্ডের রঙ (Black-Board Varnish)।—যদি নূতন ব্ল্যাকবোর্ডে (অর্থাৎ যে বোর্ডে পূর্ব্বে রঙ দেওয়া হয় নাই) রঙ করিতে হয়, তবে পালিশের সঙ্গে পেউড়ী বা ইটের গুঁড়া মিশাইয়া বোর্ডে একবার কি দুইবার পালিশ

লাগাইতে হইবে। এই পালিশ শুকাইয়া গেলে শিরিষ কাগজ দিয়া ঘসিয়া, পুনরায় নূতন পালিশের সঙ্গে ভুষা কালি (ল্যাম্প ব্ল্যাক) মিশাইয়া, ব'র দুই পালিশ লাগাইলেই বোর্ডের রঙ হইল। বোর্ডে বার্ণিস করিতে নাই। বোর্ডের রঙ উঠিয়া গেলে ভুষা কালি মিশ্রিত পালিশ লাগাইলেই আবার নূতন হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি বোর্ডের পূর্ব্ব রঙ, আলকাতরা (কোলটার) বা জাপান ব্ল্যাক দিয়া রঙ করা হইয়া থাকে, তবে সেই রঙ শিরিষ কাগজ দ্বারা উঠাইয়া, নূতন বোর্ড রঙ করিবার প্রণালীতে রঙ করিতে হইবে। বোর্ডের রঙ কিনিতেও পাওয়া যায়। সুতার গায়ে লাল এনেমাল রঙ মাখাইয়া, সেই সূতা বোর্ডের উপর লাগাইয়া ধরিলে সুন্দর রূলের দাগ পড়িয়া যাইবে। দীর্ঘ প্রস্থে এরূপ রূল কাটিয়া লইলেই চেক বোর্ড হইবে।

বলফ্রেম (Ball-Frame)।—কতকগুলি সুপারী ছিদ্র করিয়া লইবে। তাহার ভিতর লোহার তার পরাইয়া একটা ছোট চৌকাঠের সহিত আটিয়া লও (৬০চিত্র দেখ) ইচ্ছা করিলে তেলের রঙ দিয়া রঙও করিতে পার। অথবা মাটীর কতকগুলি গুঁটী করিয়া তাহাদের মধ্যে ছিদ্র কর। পরে শুকাইয়া গেলে পোড়াইয়া লও। ইহাতেও বেশ বলফ্রেমের গুঁটী হইতে পারে।

পুটীন (Putty)।—একসের চকের গুড়া, আধ পোয়া রজনের গুড়া ও আধ পোয়া মত তিসির তেল (এই অনুপাতে) একত্রে মিশাইলেই পুটিন হয়। প্রথমে চকের গুঁড়া ও রজন চূর্ণ মিশাইয়া তাহাতে একটু একটু করিয়া তেল মিশাইবে ও হাতুড়ী বা পাথরের দ্বারা খুব করিয়া পিটিতে থাকিবে। যখন মিশ্রিত দ্রব্য রুটী গড়ার ময়দার মত হইবে তখনই কাজের উপযুক্ত হইল মনে করিবে। আবশ্যক হইলে তেলের ভাগ একটু কমবেশী করিতে পার। কিন্তু সাবধান বেশী তেল দিও না, তাহা হইলে কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে। কাঠের কোন জিনিষে যদি কাটা কিম্বা গর্ত্ত থাকে তবে এই পুটীনের দ্বারা তাহা বন্ধ করা যাইতে পারে। শুকাইলে এই পুটীন খুব শক্ত হয়। বন্ধুর-মানচিত্র (রিলিফ ম্যাপ) এই পুটীনে প্রস্তুত করিতে হয়।

বন্ধুর-মানচিত্র (Raised map)।—একখানা (১৮"×২২" মত) কাঠের বোর্ড প্রস্তুত করিয়া লও। এক কাঠের হইলে ভাল, না হইলে জোড়ের স্থান বেশ ভাল করিয়া মিলাইয়া লইবে। চার দিকে আধ ইঞ্চ প্রস্থ ও আধ ইঞ্চ উচ্চ বিট্ বা কার্ণিশ লাগাইয়া লও। এই বোর্ডের উপর পেন্‌সিল দিয়া মানচিত্র অঙ্কিত কর। তার উপর (মানচিত্রের ভূমি ভাগের উপর) পুটীন টিপিয়া টিপিয়া বসাও। পর্ব্বতের স্থানে

বেশী পুটীন দিয়া উচ্চ করিবে। সমুদ্রের তটে খুব পাতলা করিয়া পুটীন দিবে। একখানা বন্ধুর-মানচিত্র দেখিতে পারিলে প্রস্তুত করা সহজ হইবে। ভূগোল শিক্ষার অন্যান্য আদর্শও এই পুটীনে প্রস্তুত করিতে হয় (৩৬১ পৃ: দেখ) কাগজের মণ্ডের দ্বারাও বন্ধুর মানচিত্র প্রস্তুত করা যায়। রাত্রে কাগজ ভিজাইয়া রাখ, পরদিন শিল নোড়া দিয়া বেশ করিয়া পিশিয়া লও। জল চিপিয়া ফেলিয়া, তাহাতে একটু গঁদের আঠা মিলাইয়া লইলেই বেশ কাজ করা যাইবে। কাগজমণ্ডের মানচিত্র বেশ হালকা হয়। পুটীনের মানচিত্র ভারি। তবে কাগজের এক অসুবিধা এই যে (নদী, হ্রদ, সমুদ্রে) জল ঢালিয়া দেখান যায় না। পুটীনের মানচিত্রে জল ঢালিলে নষ্ট হয় না। আর পুটীনের মানচিত্র যত সহজে ভাঙ্গা গড়া যায়, কাগজমণ্ডের মানচিত্র তত সহজে যায় না। এইজন্য বিদ্যালয়ের কাজের পক্ষে পুটীনের মানচিত্র করাই সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।

গোলক (Globe)।—একটা ফাঁপা মাটির বল (৮।৯ ইঞ্চ ব্যাস) সংগ্রহ কর। কুম্ভকারকে বলিলেই প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই বলের উপর ছোট ছোট টুকরা কাগজ আঁটিতে আরম্ভ কর। প্রথম স্তর কেবল জল দিয়া, তারপরের স্তরগুলি আঠা দিয়া আঁটিতে হইবে। এইরূপে ১২।১৪ স্তর আঁটা হইলে, কাগজের স্তরের উপর ছুরী দিয়া ইঞ্চ দুই পরিমাণ স্থান এইরূপ ভাবে T কাটিয়া লও। এখন গোলকের উপর একটা লাঠি দিয়া অল্প অল্প আঘাত দিলে, ভিতরের মাটীর গোলকটী ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই কাটা স্থান

৯৮ চিত্র। গোলক।

ফাঁক করিয়া মাটী বাহির করিয়া ফেল। এখন এই কাটা মুখ সংযুক্ত করিয়া সুতা দ্বারা সেলাই কর। একটা বেশ হালকা কাগজের গোলক হইল। পরে এই কাগজের গোলকের উপর দুই (বীপরিত) দিকে দুইটী বিন্দু দিয়া মেরু চিহ্নিত করিয়া লও। পরে ৯৯ চিত্রের অন্তর্গত সাদা অংশের অনুরূপ করিয়া সাদা কাগজ কাটিয়া লও। এই কাগজ, এরূপ ভাবে লাগাইতে আরম্ভ কর যেন কাগজের দুইটী সরু প্রান্ত দুইটী মেরু বিন্দুতে একত্রীভূত হয়। ইহার উপর সুতার সাহায্যে অক্ষরেখা দ্রাঘিমা টানিয়া লও, পরে মানচিত্র অঙ্কিত কর। যদি বন্ধুর-গোলক প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয় তবে এই মানচিত্রের উপর পুটীন আঁটিয়া আবশ্যক মত

৯৯ চিত্র।

উচ্চ নীচ কর। আর যদি সাধারণ গোলক করিতে হয়, তবে এই মান চক্রেই রঙ দাও।

রঙের কথা (Paint and colour)।—বন্ধুর-মানচিত্র ও বন্ধুর-গোলকে রঙ করিতে হইলে তেলের রঙ ব্যবহার করিতে হইবে। তেলের রঙের সাধারণ কৌটা ৵০ কি ।৶০ আনায় পাওয়া যায়। ভাল এনেমান্ রঙ কিনিতে হইলে এক এক কৌটা ॥৶০ কি ॥৵০ আনা লাগিতে পারে। সাধারণতঃ লাল, নীল, হলুদ, সাদা ও কাল রঙ কিনিলেই চলে। এইগুলি মিশাইয়াই অন্যান্য রঙ করিয়া লওয়া যায়। তবে পয়সা থাকিলে সকল প্রকার রঙই ক্রয় করা যাইতে পারে। কাঠের জিনিসেও এ সমস্ত রঙ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যদি কাগজের সাধারণ চিত্রে রঙ দিতে হয়, তবে জলের রং ব্যবহারই সুবিধা। গোলক ও মানচিত্র প্রভৃতিতে নরম তুলি দ্বারা পাতলা বার্ণিশ (কোপ্যাল বার্ণিশ) লাগাইলে সুন্দর দেখায়।

খাতার আদর্শ (Exercise Book)।—শ্রেণীর সকল বালকের খাতা এক আকারের ও এক রকম কাগজের হওয়া আবশ্যক। এমন কি তাহার মলাটগুলিও যেন এক রকমের ও এক রঙের হয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক একখানি খাতা থাকিবে। এক বিষয় সম্বন্ধে যত কাজ, বাড়ীতেই করুক বা স্কুলেই করুক, সমস্তই এক খাতায় থাকিবে। বিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য কোনরূপ খসড়া খাতা থাকিবে না। পর পৃষ্ঠায় অঙ্কের খাতার নমুনা প্রদত্ত হইল। কিরূপে অন্যান্য খাতা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইহা দৃষ্টেই বুঝিতে পারিবে।

খাতার এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। বাড়ীর অঙ্ক বাড়ীতে কালি দিয়া কসিবে, স্কুলের অঙ্ক স্কুলে কালি কি পেন্সিল দিয়া কসিবে। বৎসরের প্রথম হইতে ধারা বাহিকরূপে অঙ্কের নম্বর দিয়া যাইবে। বৎসরে যতগুলি অঙ্ক কসান হইল, ইহাতে তাহার একটা হিসাব থাকিবে। বামের পৃষ্ঠায় গুণ, ভাগ প্রভৃতি খসড়া কার্য্য করিবে। অঙ্কগুলি বালক নিজে চেষ্টা করিয়া কসিয়াছে কি নকল করিয়া আনিয়াছে তাহা এই বাম পৃষ্ঠা পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আর বিদ্যালয়ের কার্য্যের সময় যে সকল বালক অন্য বালকগণের আগে অঙ্ক কসিবে, তাহারা বসিয়া না থাকিয়া এই বাম পৃষ্ঠায় নিজের ইচ্ছামত চিত্রাদি আঁকিবে। বাড়ীতে কোন কঠিন অঙ্ক কসিতে না পারিলে খানিকটা স্থান বাদ রাখিবে। পরে শিক্ষক বুঝাইয়া দিলে সেইখানে তাহা লিখিয়া রাখিবে। কিন্তু বালক সেই কঠিন অঙ্ক কসিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে, বামের পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয়

৩০৬৭
৪৮
২৪৫৩৬
১২২৬৮
১৪৭২ ৬

$\frac{৪৫}{৯} = ৫$

১৩৩২
৬৭৭
৫৫৫

৩৩৩
৪
১৩৩২
৫৫৫

৭৫
৩৭৫
৫০০০
১০০০ $= \frac{৩}{৮}$

৬) ২.১ ৬ (৮৩
২০
৪৯
৪৮
১৮

$\frac{১}{৭}$ = ·১৪২৮৫৭
$\frac{২}{৭}$ = ·২৮৫৭১৪
$\frac{৩}{৭}$ = ·৪২৮৫৭১
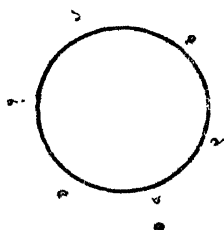
[যে বালকের খাতা, সে সকলের পূর্ব্বেই অঙ্ক কসিয়া শেষ করিয়াছে, আর অবশিষ্ট সময়ে এই হাতের চিত্র আঁকিয়াছে]

২৮ পৃঃ

∴ এক এক প্রকার লোকের সংখ্যা $\frac{৪৫}{৯}$ = ৫

∴ সমস্ত লোকের সংখ্যা (৫ × ৩) জন = ১৫ জন উঃ

বাড়ী ৩.৯।০৮

(৪) সরলকর $\frac{৩}{৪\frac{১}{২} \text{ এর } ১\frac{১}{৩} + ৪\frac{১}{৪}} \times \left(\frac{৫}{১২} + \frac{৪}{১৫}\right)$

প্রথমাংশ = $\frac{৩}{\frac{৯}{২} \times \frac{৪}{৩} + ৪\frac{১}{৪}} = \frac{৩}{৬ + ৪\frac{১}{৪}} = \frac{৩}{১০\frac{১}{৪}} = \frac{১২}{৪১}$

দ্বিতীয়াংশ = $\frac{৫}{৩ \times ৪} + \frac{৪}{৩ \times ৫} = \frac{২৫ + ১৬}{৩ \times ৪ \times ৫} = \frac{৪১}{৬০}$

সমপ্তাংশ = $\frac{১২}{৪১} \times \frac{৪১}{৬০} = \frac{১}{৫}$ উঃ

(৪৫) ৩৩৩ টা টাকা ভাঙ্গাইয়া শিকিতে ও আধুলীতে ৭৭৭টি রেজগী পাইলাম। কয়টা শিকি ও কয়টা আধুলী ?

শিক্ষকের দস্তখত

স্কুল ৪।৯।০৮

(৪৬) $\frac{১}{২+}\ \frac{১}{৩+}\ \frac{১}{৪+}\ \frac{১}{৫}$ এই অবিরত ভগ্নাংশকে সরল কর।

অর্থাৎ $\cfrac{১}{২ + \cfrac{১}{৩ + \cfrac{১}{৪ + \cfrac{১}{৫}}}} = \cfrac{১}{২ + \cfrac{১}{৩ + \cfrac{৫}{২১}}} = \cfrac{১}{২ + \cfrac{২১}{৬৮}} = \frac{৬৮}{১৫৭}$

(৪৭) ১.১৪২৮৫৭ কে .৩৭৫ দিয়া গুণ কর।

গুণফল = $১\frac{১}{৭} \times \frac{৩}{৮} = \frac{৮}{৭} \times \frac{৩}{৮} = \frac{৩}{৭} = .৪২৮৫৭১$

(৪৮) ২পা. ৯শি. ৬পে. এর $\frac{৫}{৬}$—৪পা. এর .৬ + ২১শি. এর .৩ এর ২$\frac{১}{২}$ কত ?

২পা. ৯শি. ৬পে. এর $\frac{৫}{৬}$ = ৮ শি. ৩পে. × ৫ = ২পা. ২শি. ৩পে.

২১শি এর .৩ এর ২$\frac{১}{২}$ = ২১শি × $\frac{১}{৩}$ × $\frac{৫}{২}$ = ৯. ৩. ৯.

= ১১. ৫. ০

৪পা এর .৬ = ৪পা × $\frac{২}{৩}$ = $\frac{৮}{৩}$পা = ২ ৮ ০

বাদ দিয়া ৮ ১৩ ০. উঃ

থাকিবে। যেখানে ভুল করিবে সেখানে শিক্ষক × এইরূপ চিহ্ন দিয়া ভুল দেখাইয়া দিবেন (৪৮ অঙ্কের উত্তরে দেখ)। খাতার পাতায় পাতায় পৃষ্ঠার সংখ্যা লিখিবে। কখনও কাগজ ছিঁড়িবে না। কোন অঙ্ক ভুল হইলে একটান দিয়া কাটিয়া রাখিবে। পরীক্ষার সময় এই সমস্ত খাতা দাখিল করিতে হইবে। বালক সমস্ত বৎসর রীতিমত কাজ করিয়াছে কিনা তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। খাতাগুলি যেন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। বামের দিকে দুই আঙ্গুল স্থান বাদ দিয়া একটা কালির কসি টানিয়া রাখিবে। এই স্থানে বাড়ীর অঙ্ক কসার তারিখ ও বিদ্যালয়ে অঙ্ক কসিবার তারিখ লেখা থাকিবে। শিক্ষকও এইস্থানে দস্তখৎ করিবেন। কসি টানিয়া বাড়ীর কার্য্য ও বিদ্যালয়ের কার্য্য পৃথক করিয়া রাখিবে। রচনা, অনুবাদ, শ্রুতলিপির জন্য যে খাতা থাকিবে, তাহাতেও উক্তরূপ বাড়ীর কার্য্য ও স্কুলের কার্য্য দুইই থাকিবে।

মানচিত্রের খাতা ও চিত্রাঙ্কনের খাতা ফুলস্ক্যাপ আকার বা ডিমাই কি রয়েল কাগজের ⅟₂ আকারের হওয়া আবশ্যক। দলিলাদি নকল করিবার খাতা ফুলস্ক্যাপ আকারের হইবে, কারণ যে সকল ষ্ট্যাম্পে দলিল লেখা যায় তাহার ফুলস্ক্যাপ আকার। জমা খরচ প্রভৃতি খাতার আকার দোকানদারদের খাতার মত হইবে।